অদ্রীশ বর্ধন সম্পাদিত
সেরা আশ্চর্য !
সেরা ফ্যানট্যাসটিক
প্রথম পর্ব

অদ্রীশ বর্ধন সম্পাদিত
সেরা আশ্চর্য !
সেরা ফ্যানট্যাসটিক
প্রথম পর্ব

সেরা আশ্চর্য! সেরা ফ্যানট্যাসটিক
প্রথম পর্ব

সেরা আশ্চর্য!
সেরা ফ্যানট্যাসটিক
প্রথম পর্ব

সম্পাদনা
অদ্রীশ বর্ধন

ফ্যানট্যাস্টিক ও কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস
যৌথ প্রয়াস

Sera Aschorjo! Sera Fantastic : Part 1

An anthology of science fiction and fantasy stories
published under patronage of Satyajit Ray from 1963 to 1993
Edited by Adrish Bardhan

প্রথম ফ্যানট্যাস্টিক প্রকাশ	জানুয়ারি, ১৯৯৪
প্রথম যৌথ প্রকাশ	জানুয়ারি, ২০১৯
প্রচ্ছদ	ধুনজী রানা ও দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য
অলংকরণ	ধুনজী রানা
বর্ণবিন্যাস	সুদীপ দেব
ইবই নির্মাণ	বাংলা ডিজিটাল প্রেস যোগাযোগ : 8951582485/7002409512 ইমেল : bangladigitalpress@gmail.com
পরিবেশক	অরণ্যমন প্রকাশনী ৩/সি যদুনাথ দে লেন, কলকাতা ১২ আলাপন : ৭২৭৮৯৯২৫৪০
ISBN	978-81-938947-4-3
প্রকাশক	ফ্যানট্যাস্টিক এবং কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস যৌথ প্রয়াস **ফ্যানট্যাস্টিক** ৪ রামনারায়ণ মতিলাল লেন, কলকাতা ৭০০০১৪ **কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস** ৩৭২/৩ দমদম রোড, সুরের মাঠ, কলকাতা ৭০০০৭৪ ইমেল : kalpabiswa.publications@gmail.com ওয়েবসাইট : kalpabiswabooks.com

আলাপন :
৯৮৩০০৯২৩৫২/৮৯৫১৫৮২৪৮৫

মূল্য ৪০০ টাকা

উৎসর্গ

কল্পবিজ্ঞানপ্রেমী সমস্ত পাঠকের উদ্দেশে

সম্পাদকের কথা

বিশ্বের প্রথম সায়ান্স-ফিকশন সিনে ক্লাব এই কলকাতায় সত্যজিৎ রায়ের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মূলে ছিল ভারতের প্রথম সায়ান্স-ফিকশন মাসিক পত্রিকা 'আশ্চর্য!' যার প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩ সালে। ১৯৭৫-এ বেরয় 'ফ্যানট্যাসটিক'। প্রথম পত্রিকার একাধিক নামাংকন করেছিলেন বিমল দাস। দ্বিতীয় পত্রিকার নামাংকন করেন সত্যজিৎ রায়। বিমল দাসও মেতে উঠেছিলেন নামাংকনের খেলায়। পত্রিকার চরিত্র প্রকাশ পেয়েছিল প্রতিটি নামাংকনে।

এই চরিত্র যে শুধু কল্পবিজ্ঞানেই সীমিত থাকবে না, ফ্যানট্যাসি এবং ভূতের গল্পও পত্রিকায় ছাপা হবে এবং সিনে ক্লাবে দেখানো হবে—তা জানিয়েছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক সত্যজিৎ রায় এবং প্রধান উপদেষ্টা প্রেমেন্দ্র মিত্র। ক্লাবের জেনারেল মিটিংয়েও তাঁদের এই নির্দেশ শোনা গেছিল।

এই দুই পত্রিকা থেকেই ৩০ বছরের গল্প উপন্যাস বাছতে গিয়ে তাই তাঁদের নির্দেশের কথা মনে রাখতে হয়েছে। ৩০ বছরে সমাদৃত হয়েছে এই সম্পাদকীয় সিদ্ধান্ত—আশা করা যায় এই সঙ্কলনেও তা হবে।

বইমেলা   অদ্রীশ বর্ধন
২৬ জানুয়ারি, ১৯৯৪

প্রকাশকের কথা

আসুন টাইম মেশিনে চড়ে বসা যাক।

গত শতকের ছয়ের দশকে বাংলা কল্পবিজ্ঞান চর্চা এক 'আশ্চর্য!' মাত্রা পায় তরুণ অদ্রীশের হাত ধরে। এমনকী, সায়েন্স ফিকশনের বঙ্গীয়করণ ঘটিয়ে তাকে কল্পবিজ্ঞান করে তোলাটাও তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত। ভারতবর্ষের প্রথম কল্পবিজ্ঞানের পত্রিকা 'আশ্চর্য!' কয়েক বছরের আয়ুষ্কালে এক গভীর ছাপ রেখে গিয়েছে। পৃথিবীর প্রথম সাই ফাই সিনে ক্লাবটিও গড়ে ওঠাটাও এই সময়ে। সত্যজিৎ-প্রেমেন্দ্রর মতো খ্যাতিমান লেখকদের পাশাপাশি তরুণ লেখকদের সঙ্গে করে নিয়ে পত্রিকাটি চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন অদ্রীশ। কাজটা ছিল অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু অদ্রীশ চ্যালেঞ্জটা নিয়েছিলেন। অথচ আচমকাই এক অনভিপ্রেত বিচ্ছেদ তাঁর জীবনটাই বদলে দিল। মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত অদ্রীশ বন্ধ করে দিলেন পত্রিকা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবারও তিনি ফিরে এসেছিলেন তাঁর স্বপ্নের কাছে। বছর কয়েক পরে চালু হল 'ফ্যানট্যাসটিক'। পত্রিকা ও প্রকাশন একই নামে।

কাট টু ২০১৮। বাংলার প্রথম কল্পবিজ্ঞান-ফ্যান্টাসি বিষয়ক ওয়েব ম্যাগাজিন 'কল্পবিশ্ব' শুরু থেকেই পাঠকপ্রিয় হয়ে ওঠার পরে এই বছরই শুরু করল প্রকাশনাও। নতুন লেখা প্রকাশের পাশাপাশি পুরনো বইয়ের পুনর্মুদ্রণের ব্যাপারেও শুরু হয়েছিল চিন্তাভাবনা। আর সেই ইচ্ছেরই প্রথম প্রয়াস এই বই। 'সেরা আশ্চর্য! সেরা ফ্যানট্যাসটিক' কেবল ওই দু'টি পত্রিকার সেরা রচনার সংকলন মাত্র নয়। তা বাংলা কল্পবিজ্ঞানের স্বর্ণযুগের শ্রেষ্ঠত্বের এক আঁজলা উজ্জ্বল নমুনা। তবে প্রকাশের সময়ে বইয়ের আকার ও পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার কথা মাথায় রেখে দু'খণ্ডে প্রকাশ করার কথা ভাবা হল।

জুলে ভার্নকে নিয়ে লেখা সদ্যপ্রয়াত সাহিত্যিক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা, দু'টি দুর্দান্ত উপন্যাস, অসামান্য সব ছোটগল্প এবং অবশ্যই সত্যজিৎ রায়ের প্রবন্ধ 'এস্ এফ'— এই দিয়েই সাজানো হল প্রথম খণ্ডটি। লেখক তালিকায় সত্যজিৎ রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, তারাপদ রায়, অদ্রীশ বর্ধন, অনীশ দেবের মতো নাম। এমন বই হাতে নিলেই যে কোনও পাঠকের মন ভালো হয়ে যাওয়ার কথা।

বইটি পুনঃপ্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন অদ্রীশ বর্ধন ও তাঁর পুত্র অম্বর বর্ধন। তাঁদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

এক হারানো সময়ের উজ্জ্বল জলছাপ এই বইয়ের পাতায় পাতায়। যাঁরা সেদিনের তরুণ, তাঁরা নতুন করে রোমাঞ্চিত হবেন। পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও মুগ্ধ হবে বাংলা কল্পবিজ্ঞানের অন্যতম সেরা এই রচনাগুলি পাঠ করে, এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত।

সূচিপত্র

কবিতা

উপন্যাস

গল্প

প্রবন্ধ

জুলে ভার্ন

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

গ্রহান্তরেও যাই বেড়াতে,
মিথ্যে না একরত্তি;
কাল যা ছিল কল্পনাতে,
আজকে সেটাই সত্যি।
কাল যা ছিল অবিশ্বাস্য,
শুনলে সবাই করত হাস্য,
এখন স্বীকার করছে সবাই
সে-সব কথার মার নেই।
শ্রেষ্ঠ গণক দেখছি রে ভাই
লেখক জুলে ভার্নে-ই।

প্রথম প্রকাশ: ফ্যানট্যাসটিক, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩

সূচিপত্রে ফিরে যান

প্রোফেসর শঙ্কু ও ভূত

সত্যজিৎ রায়

১০ই এপ্রিল

ভূতপ্রেত প্ল্যানচেট টেলিপ্যাথি ক্লেয়ারভয়েন্স—এ সবই যে একদিন না একদিন বিজ্ঞানের আওতায় এসে পড়বে, এ বিশ্বাস আমার অনেকদিন থেকেই আছে। বহুকাল ধরে বহু বিশ্বস্ত লোকের ব্যক্তিগত ভৌতিক অভিজ্ঞতার কাহিনী সেই সব লোকের মুখ থেকেই শুনে এসেছি। ভূত জিনিসটাকে তাই কোনওদিন হেসে উড়িয়ে দিতে পারিনি।

আমার নিজের কখনও এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়নি। চিনে জাদুকরের কারসাজিতে সম্মোহিত বা হিপনোটাইজ্‌ড্ হয়েছি, অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াই করেছি, গেছোবাবার মন্ত্রবলে জানোয়ারের কঙ্কালে রক্ত মাংস প্রাণ ফিরে আসতে দেখেছি। কিন্তু যে মানুষ মরে ভূত হয়ে গেছে, সেই ভূতের সামনে কখনও পড়তে হয়নি আমাকে।

এই অভিজ্ঞতার অভাবের জন্যই বোধ হয় কিছুদিন থেকে ভূত দেখার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে উঠছিল, আর কেবলই ভাবছিলাম ভূতকে হাজির করার বৈজ্ঞানিক উপায় কী থাকতে পারে।

এখানে অবিশ্যি কেবল রাসায়নিক প্রক্রিয়া বা যন্ত্রপাতিতে কাজ হতে পারে না। তার সঙ্গে চাই কন্‌সেনট্রেশন। রীতিমতো ধ্যানস্থ হওয়া চাই—কারণ যে কোনও ভূত হলে তো চলবে না। বিশেষ বিশেষ মৃত ব্যক্তির ভূতকে ইচ্ছামতো আমার ঘরে এনে হাজির করে, তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করে, তারপর তাদের আবার পরলোকে ফেরত পাঠিয়ে দিতে হবে। সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হবে যদি তাদের একেবারে সশরীরে এনে ফেলা যায়, যার ফলে তাদের আমরা স্পর্শ করতে পারি। তাদের সঙ্গে হ্যান্ড-শেক করতে পারি। তবেই না বিজ্ঞানের কৃতিত্ব!

গত তিন মাস পরিশ্রম, গবেষণা ও কারিগরির পর আমার নিও-স্পেক্‌ট্রোস্কোপ যন্ত্রটা তৈরি হয়েছে। এখানে ‘স্পেক্‌ট্রো’ কথাটা ‘স্পেক্‌ট্রাম’ থেকে আসছে না, আসছে ‘স্পেক্টার’ অর্থাৎ ভূত থেকে। ‘নিও’—কারণ এমন যন্ত্র এর আগে আর কখনও তৈরি হয়নি।

যন্ত্রের বিশদ বিবরণ আমার খাতায় রয়েছে, তাই এ ডায়রিতে সেটা আর দিলাম না। মোটামুটি বলে রাখি—আমার মাথার মাপে একটি ধাতুর হেলমেট তৈরি করা হয়েছে। তার দুদিক থেকে দুটো বৈদ্যুতিক তার বেরিয়ে একটা কাচের পাত্রে আমার তৈরি একটা তরল সলিউশনের মধ্যে চোবানো দুটো তামার পাতের সঙ্গে যোগ করা হয়। হঠাৎ দেখলে অ্যাসিড ব্যাটারির কথা মনে হতে পারে।

সলিউশনটা অবশ্য নানারকম বিশেষ মালমশলা মিশিয়ে তৈরি। তার মধ্যে প্রধান হল শ্মশান-সংলগ্ন চিতার ধোঁয়ায় পরিপুষ্ট কিছু গাছের শিকড়ের রস।

এই সলিউশন গ্যাসের আগুনে গরম করলে তা থেকে একটা সবুজ রঙের ধোঁয়া বের হবে, খুব আশ্চর্যভাবে পাত্রের ওপরেই প্রায় এক মানুষ জায়গা নিয়ে কুণ্ডলী পাকাতে থাকে। ভূতের আবির্ভাব হওয়ার কথা সেই কুণ্ডলীর মধ্যেই।

আজ সকালে যন্ত্রটাকে প্রথম টেস্ট করলাম। ষোলো আনা সফল হয়েছি বলব না, এবং এই আংশিক সাফল্যের প্রধান কারণ হল আমার কনসেনট্রেশনে গলদ। ল্যাবরেটরিতে ঢোকার সময় দেখলাম বারান্দার কোণে আমার বেড়াল নিউটন এক থাবায় একটা আরশোলা মারল। ফলে হল কী—হেলমেট পরে বসে ভূতের কথা ভাবতে গিয়ে কেবলই সেই আরশোলার নিষ্প্রাণ দেহটার কথা মনে হতে লাগল।

সেই কারণেই বোধ হয় মিনিট পাঁচেক পরে স্পষ্ট দেখতে পেলাম ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে বিরাট এক আরশোলা তার শুঁড়গুলো যেন আমার দিকে নির্দেশ করে নাড়াচাড়া করছে।

প্রায় এক মিনিট ছিল এই আরশোলার ভূত। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল। বুঝলাম আজ আর অন্য ভূত নামানোর চেষ্টা বৃথা।

কাল সকালে আরেকবার চেষ্টা করে দেখব। আজ সমস্ত দিনটা মনের ব্যায়াম অভ্যোস করতে হবে, যাতে কাল কনসেনট্রেশনে কোনও ত্রুটি না হয়।

১১ই এপ্রিল

অভাবনীয়।

আজ প্রায় সাড়ে তিন মিনিট ধরে আমার পরলোকগত বন্ধু ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক আর্চিবল্ড অ্যাক্রয়েডের সঙ্গে আলাপ হল। নরওয়েতে রহস্যজনকভাবে অ্যাক্রয়েডের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কারণ পরে আমি জেনেছিলাম—এবং সেটা এর আগেই আমি ডায়রিতে লিখেছি। আজ সেই অ্যাক্রয়েড অতি আশ্চর্যভাবে আমার সবুজ ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে আবির্ভূত হলেন।

আশ্চর্য বলছি। এই জন্যে যে, অ্যাক্রয়েডের বিষয় প্রায় পাঁচ মিনিট ধ্যান করার পর যে জিনিসটা প্রথম দেখা গেল ধোঁয়ার মধ্যে সেটা হল একটি নরকঙ্কাল—যার ডান হাতটা আমার দিকে প্রসারিত।

তারপর হঠাৎ দেখি সে কঙ্কালের চোখে সোনার চশমা। এ যে অ্যাক্রয়েডেরই বাইফোকাল চশমা, সেটা আমি দেখেই চিনলাম।

চশমার পর দেখা গেল দাঁতের ফাঁকে একটা বাঁকানো পাইপ—অ্যাক্রয়েডের সাধের ব্র্যায়ার।

তারপর পাঁজরের ঠিক নীচেটায় একটা চেনওয়ালা ঘড়ি। এও আমার চেনা।

বুঝতে পারলাম অ্যাক্রয়েডের চেহারার যে বিশেষত্বগুলি আমার মনে দাগ কেটেছিল, সেগুলো আগে দেখা যাচ্ছে।

ঘড়ি, পাইপ ও চশমাসমেত কঙ্কাল হঠাৎ বলে উঠল—

'হ্যালো, শঙ্কু!'

এ যে স্পষ্ট অ্যাক্রয়েডের গলা!—আর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সঙ্গেই স্যুটপরিহিত সৌম্যমূর্তি অ্যাক্রয়েডের সম্পূর্ণ অবয়ব ধোঁয়ার মধ্যে প্রতীয়মান হল। তাঁর ঠোঁটের কোণে সেন

ছেলেমানুষি হাসি, মাথার কাঁচাপাকা চুলের একগোছা কপালের ওপর এসে পড়েছে। গায়ে ম্যাকিনটশ, গলায় মাফলার, হাতে দস্তানা।

আমি প্রায় হাত বাড়িয়ে অ্যাক্রয়েডের হাতে হাত মেলাতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে অপ্রস্তুত হয়ে নিজেকে সামলে নিলাম। করমর্দন সম্ভব ছিল না। কারণ যা দেখেছিলাম তা অ্যাক্রয়েডের জড়রূপ নয়, শূন্যে ভাসমান প্রতিবিম্ব মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য এই যে প্রেতচ্ছায়ার কণ্ঠস্বর অতি স্পষ্ট। আমি কিছু বলার আগেই অ্যাক্রয়েড তাঁর গভীর অথচ মসৃণ গলায় বললেন,—

'তোমার কাজের দিকে আমার দৃষ্টি রয়েছে। যা করছ, তা সবই খেয়াল করি। তুমি তোমার দেশের মুখ উজ্জ্বল করছ।'

উত্তেজনায় আমার গলা প্রায় শুকিয়ে এসেছিল। তবু কোনওরকমে বললাম, 'আমার নিও-স্পেকট্রোস্কোপ সম্বন্ধে তোমার কী মত?'

সবুজ ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভেতর থেকে মৃদু হেসে অ্যাক্রয়েড বললেন 'আমার দেখা যখন তুমি পেয়েছ, তখন আর মতামতের প্রয়োজন কী? তুমি নিজেই জানো তুমি কৃতকার্য হয়েছ। যারা লোকান্তরিত, তারা মতামতের উর্ধ্বে। মানসিক প্রতিক্রিয়ার কোনও প্রয়োজন আমাদের জগতে নেই। চিন্তা ভাবনা সুখ দুঃখ ভাল মন্দ সবই এখানে অবান্তর।'

আমি অবাক হয়ে অ্যাক্রয়েডের কথা শুনছি, আর এরপর কী জিজ্ঞেস করব ভাবছি, এমন সময় একটা অদ্ভুত হাসির সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্‌বুদের মতো অ্যাক্রয়েড অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর তারপরেই ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা আমার দিকে এগিয়ে এল—

আর আমি বুঝতে পারলাম যে আমার চেতনা লোপ পেয়ে আসছে।

যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি আমার চাকর প্রহ্লাদ আমার কপালে জলের ছিটা দিচ্ছে।

'এই গরমে লোহার টুপি মাথায় পরে বসে আছ বাবু—বুড়ো বয়সে এত কি সয়?'

হেলমেটটা খুলে ফেললাম! বেশ ক্লান্ত লাগছে। বুঝলাম অতিরিক্ত কনসেনট্রেশনের ফল। কিন্তু অ্যাক্রয়েডের প্রেতাত্মা যে আজ আমার ল্যাবরেটরিতে আবির্ভূত হয়ে আমার সঙ্গে কথা বলে গেছে, তাতে কোনও ভুল নেই। আমার গবেষণা, আমার পরিশ্রম অনেকাংশে সার্থক হয়েছে। আশ্চর্য আবিষ্কার আমার এই নিও-স্পেকট্রোস্কোপ!

মনে মনে ভাবলাম—সামান্য শারীরিক গ্লানিতে নিরুৎসাহ হলে চলবে না। কাল আবার বসব এই যন্ত্র নিয়ে। ইচ্ছা হচ্ছে বিগত যুগের কিছু ঐতিহাসিক চরিত্রের প্রেতাত্মার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় করে তাদের সঙ্গে কথা বলব।

১২ই এপ্রিল

অন্ধকূপ হত্যার আসল ব্যাপারটা জানবার জন্য আজ ভেবেছিলাম সিরাজদ্দৌলাকে একবার আনব—কিন্তু সব প্ল্যান মাটি করে দিলেন আমার প্রতিবেশী অবিনাশ চাটুজ্যে।

বৈঠকখানায় বসে সবেমাত্র কফি শেষ করে ন্যাপকিনে মুখ মুছছি, এমন সময় ভদ্রলোক হাজির।

অবিনাশবাবুর মতো অবৈজ্ঞানিক ব্যক্তি জগতে আর দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ। ভদ্রলোকের জন্ম হওয়া উচিত ছিল প্রস্তরযুগে। বিংশ শতাব্দীতে তিনি একেবারেই বেমানান। আমার সাফল্যে ঔদাসীন্য ও ব্যর্থতায় টিটকিরি—এ দুটো জিনিস ছাড়া ওঁর কাছে কখনও কিছু পেয়েছি বলে মনে পড়ে না।

ঘরে ঢুকেই আমার সামনের সোফায় ধাপ করে বসে পড়ে বললেন, 'উশ্রীর ধারে ঘোরাফেরা হচ্ছিল কী মতলবে?'

উশ্রীর ধারে? আমি মাঝে মাঝে অবিশ্যি প্রাতর্ভ্রমণে যাই ওদিকটা, কিন্তু গত বিশ পঁচিশ দিনের মধ্যে যাইনি। সত্যি বলতে কী, বাড়ি থেকেই বেরোইনি। তাই বললাম—

'কবেকার কথা বলছেন?'

'আজকে মশাই, আজকে। এই ঘণ্টাখানেক হবে! ডাকালুম—সাড়াই দিলেন না।'

'সেকী—আমি তো বাড়ি থেকে বেরোইনি।'

অবিনাশবাবু এবার হো হো করে হেসে উঠলেন।

'এ আবার কী ভিমরতি ধরল আপনার! অস্বীকার করছেন কেন? ওরকম করলে যে লোকে আরও বেশি সন্দেহ করবে। আপনার পাঁচ ফুট দু ইঞ্চি হাইট, ওই টাক—ওই দাড়ি—গিরিডি শহরে এ আর কার আছে বলুন!'

আমি যুগপৎ রাগ আর বিস্ময়ে কিছু বলতে পারলাম না! লোকটা কী? আমি মিথ্যেবাদী? আমি—ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু? আমার কিছু মূল্যবান ফরমুলা আমি কোনও কোনও অতিরিক্ত অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকের কাছে গোপন করেছি বটে কিন্তু উশ্রীর ধারে যাবার মতো সামান্য ঘটনা আমি অবিনাশবাবুর মতো নগণ্য লোকের কাছে গোপন করতে যাব কেন?

অবিনাশবাবু বললেন, 'শুধু আমি নয়। রামলোচন বাঁড়ুজ্যেও আপনাকে দেখেছেন, তবে সেটা উশ্রীর ধারে নয়—জজসাহেবের বাড়ির পেছনের আমবাগানে। আর সেটা আমার দেখার পরে। এইমাত্র শুনে আসছি। আপনি তাকেও জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।'

আমি চুপ করে রইলাম। ভদ্রলোক শুধু নিজে মিথ্যে কথা বলছেন না, অন্য আরেকজন প্রবীণ ব্যক্তিকেও মিথ্যেবাদী বানাচ্ছেন। এর কী কারণ হতে পারে তা আমি বুঝতে পারলাম না।

আমার চাকর প্রহ্লাদ অবিনাশবাবুর জন্য কফি নিয়ে এল। ভদ্রলোক ফস করে জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'হ্যাঁ হে পোল্লাদ—বলি, তোমার বাবু আজ সারা সকাল বাড়িতেই ছিলেন, না বেরিয়েছিলেন।'

প্রহ্লাদ বলল, 'কাল অত রাত অবধি লাবুটেরিতে খুট্‌খাট্ কইল্লেন, আর আজ আমনি সক্কালে বেইরে যাইবেন? বাবু বাড়িতেই ছিলেন।'

এখানে একটা কথা বলা দরকার—আমি কাল সকালের পর আদৌ আমার ল্যাবরেটরিতে যাইনি। বিনা কারণে আমি কখনও ল্যাবরেটরিতে যাই না। আমার সারাদিনের কাজ ছিল কনসেনট্রেশন অভ্যাস করা—এবং সে কাজটা আমি করি আমার

শোবার ঘরেই। রাত্রে নটার মধ্যে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—উঠেছি যথারীতি ভোর পাঁচটায়। অথচ প্রহ্লাদ বলে কিনা আমি ল্যাবরেটরিতে কাজ করেছি?

আমি প্রহ্লাদকে বললাম, 'আমি যখন কাজ করছিলাম, তখন তুমি আমাকে কফি দিয়েছিলে কি?'

'হ্যাঁ বাবু—দিয়েছিলাম যে! তুমি অন্ধকার ঘরে খুঁটুর খুঁটুর করছিলে—আমি—'

আমি প্রহ্লাদকে বাধা দিয়ে বললাম, 'অন্ধকার ঘর? তা হলে তুমি আমায় চিনলে কী করে?'

প্রহ্লাদ একগাল হেসে বলল, 'তা আর চিনব না বাবু! চাঁদের আলো ছিল যে। মাথা হেঁট করে বসেছিলে। মাথায় আলো পড়ে চকচক...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

অবিনাশবাবু একটা বিড়ি ধরিয়ে বললেন, 'সেই যে কী এক বায়স্কোপ দেখে-ছিলাম—একই মানুষ দু' ভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে—একই সময় এখানে ওখানে—আপনারও কি সেই দশা হল নাকি? তা কিছুই আশ্চর্য নয়। পইপই করে বলিছি ও সব গবেষণা ফবেষণার মধ্যে যাবেন না—ওতে ব্রেন অ্যাফেক্ট করে। গরিবের কথা বাসি হলে তবে ফলে কিনা!'

আরও আধঘণ্টা ছিলেন অবিনাশবাবু। বুঝতে পারছিলাম। একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটানোর ফাঁকে ফাঁকে ভদ্রলোক আমার দিকে আড় চোখে লক্ষ রাখছিলেন। আমি আর কোনও কথা বলতে পারিনি, কারণ আমার মাথার মধ্যে সব কেমন জানি গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছিল।

বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে রামলোচনবাবুর বাড়ির দিকে গেলাম। ভদ্রলোক তাঁর গেটের বাইরে বাঁধানো রকটাতে বসে সুরেনডাক্তারের সঙ্গে গল্প করছিলেন। আমায় দেখে বললেন, 'আপনি একটা হিয়ারিং এড ব্যবহার করুন। এত ডাকলুম সকালে, সাড়াই দিলেন না। কী খুঁজছিলেন মিত্তিরের আমবাগানে? কোনও আগাছাটাগাছা বুঝি?'

আমি একটু বোকার মতো হেসে আমতা আমতা করে আমার অন্যমনস্কতার একটা কাল্পনিক কারণ দিলাম। তারপর বিদায় নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে উশ্রীর ধারে গিয়ে বসলাম। সত্যিই কি আমার মতিভ্রম হয়েছে—মস্তিষ্কের বিকার ঘটেছে? এরকম ভুল তো এর আগে কখনও হয়নি। সাতাশ বছর হল গিরিডিতে আছি। নানারকম কঠিন, জটিল গবেষণায় তার অনেকটা সময় কেটেছে—কিন্তু তার ফলে কখনও আমার স্বাভাবিক আচরণের কোনও ব্যতিক্রম ঘটেছে—এরকম কথা তো কাউকে কোনওদিন বলতে শুনিনি। হঠাৎ আজ এ কী হল?

রাত্রে খাবার পর একবার ল্যাবরেটরিতে না গিয়ে পারলাম না।

নিও-স্পেকট্রোস্কোপটাকে যেমন রেখে গিয়েছিলাম, তেমনই আছে। জিনিসপত্র বইখাতা, অন্যান্য যন্ত্রপাতি কোনওটা এতটুকু এদিক ওদিক হয়নি!

এই ল্যাবরেটরিতে কি এসেছিলাম কাল রাত্রে? আর এসেছি অথচ টের পাইনি? অসম্ভব!

ঘরের বাতি নিভিয়ে দিলাম। দক্ষিণের জানালা দিয়ে চাঁদের আলো টেবিলের ওপর এসে পড়ল। মনে গভীর উদ্বেগ নিয়ে আমি জানালার দিকে এগিয়ে গেলাম।

জানালা দিয়ে আমার বাগান দেখা যাচ্ছে। এই বাগানে রোজ বিকালে রঙিন ছাতার তলায় আমার প্রিয় ডেকচেয়ারে আমি বসে থাকি।

ছাতা এখনও রয়েছে। তার তলায় চেয়ারও। সে চেয়ার খালি থাকার কথা—কিন্তু দেখলাম তাতে কে জানি বসে রয়েছে।

আমার বাড়িতে আমি, প্রহ্লাদ ও আমার বেড়াল নিউটন ছাড়া আর কেউ থাকে না। মাথা খারাপ না হলে প্রহ্লাদ কখনও ও চেয়ারে বসবে না।

যে বসে আছে সে বৃদ্ধ। তার মাথায় টাক, কানের দুপাশে সামান্য পাকা চুল, গোঁফ ও দাড়ি অপরিচ্ছন্ন ভাবে ছাঁটা। যদিও সে আমার দিকে পাশ করে বসে আছে এবং আমার দিকে ফিরে চাইছে না তাও বেশ বুঝতে পারলাম যে তার চেহারার সঙ্গে আমার চেহারার আশ্চর্য মিল।

এরকম অভিজ্ঞতা আর কারুর কখনও হয়েছে কি না জানি না। যমজ ভাইয়ের মধ্যে নিজের প্রতিরূপ দেখতে মানুষ অভ্যস্ত, কিন্তু আমার—যমজ কেন—কোনও ভাইই নেই! খুড়তুতো ভাই একটি আছেন—তিনি থাকেন বেরিলিতে—এবং তিনি লম্বায় ছফুট দুইঞ্চি। এ লোক তবে কে?

হঠাৎ মনে হল—শহরের কোনও ছেলেছোকরা আমার ছদ্মবেশ নিয়ে আমার সঙ্গে মস্করা করছে না তো?

তাই হবে। তা ছাড়া আর কিছুই নয়। বারগাণ্ডায় এক শখের থিয়েটারপার্টি আছে। তাদের দলের কেউ নিশ্চয় এই প্র্যাকটিক্যাল জোকের জন্য দায়ী।

অপরাধীকে হাতেনাতে ধরব বলে পা টিপে টিপে ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দা পেরিয়ে বৈঠকখানার দরজা দিয়ে সোজা বাগানের দিকে এগিয়ে গেলাম।

কিন্তু ব্যর্থ অভিযান। গিয়ে দেখি চেয়ার খালি। ক্যানভাসে হাত দিয়ে দেখি সেটা তখনও গরম রয়েছে। অর্থাৎ অল্পক্ষণ আগেই কেউ যে সে চেয়ারটায় বসেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু চারিদিকে চেয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই। জ্যোৎস্নার আলোতে আমার বাগানে গা ঢাকা দিয়ে থাকার কোনও উপায় নেই, কারণ একটি মাত্র গোলঞ্চ গাছের গুঁড়ির পিছনে ছাড়া লুকোবার কোনও জায়গা নেই।

তা হলে কি আমার দেখবার ভুল? কিন্তু অবিনাশবাবু, রামলোচনবাবু—এরা তবে কাকে দেখলেন!

শোবার ঘরে ফিরে এসে অনুভব করলাম আমার উদ্বেগ আরও দ্বিগুণ হয়ে গেছে। আজ রাত্রে ঘুমের ওষুধ না খেলে ঘুম হবে না।

১৪ই এপ্রিল

ডবল শঙ্কুর রহস্যের যে ভাবে সমাধান হল, তার তুলনীয় কোনও ঘটনা আমার জীবনে আর কখনও ঘটেনি।

গত দুদিন 'আমাকে' দেখতে পাওয়ার ভয়ে আমি ঘর থেকে বেরোইনি। যদি ভুল করে বা নিজের অজ্ঞাতসারে কখনও বেরিয়ে পড়ি, তাই প্রহ্লাদকে বলেছিলাম। আমার শোবার ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে তার গায়ের সঙ্গে একটা ভারী টেবিল লাগিয়ে দিতে।

সকাল বিকালের কফি, আর দুপুর ও রাত্রের খাবার প্রহ্লাদ নিজেই টেবিল সরিয়ে দরজা খুলে ঘরে এনে দিয়েছে, খাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে থেকেছে আর খাওয়া হলে পর দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে টেবিল ঠেলে দিয়ে গেছে।

তা সত্ত্বেও প্রহ্লাদ দুদিনই খবর এনেছে যে লোকে নাকি আমায় শহরের এখানে সেখানে দেখতে পেয়েছে। উশ্রীর আশেপাশেই বেশি। আর যাঁরা আমায় দেখেছেন তাঁদের সকলেরই ধারণা আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তাই আমি তাঁদের ডাকে সাড়া দিচ্ছি না। সুরেনডাক্তার নাকি কাল বিকালে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই আমায় পরীক্ষা করতে এসেছিলেন। প্রহ্লাদ বলে দিয়েছিল বাবু ঘুমোচ্ছেন, দেখা হবে না।

আজ আর ঘরে বন্দি থাকতে না পেরে প্রহ্লাদকে ডেকে টেবিল সরিয়ে একেবারে সটান ল্যাবরেটরিতে গিয়ে হাজির হলাম।

আমার চেয়ার, আমার টেবিল, আমার নতুন যন্ত্র, বৈদ্যুতিক তার, সলিউশনের পাত্র, খতাপত্র, সব যেমন ছিল তেমনই আছে।

খালি চেয়ারটা দেখে লোভ হল। গিয়ে বসলাম। তারপর হাত বাড়িয়ে হেলমেটটা নিয়ে মাথায় পারলাম। বোতলের মধ্যে সলিউশন ছিল, তার খানিকটা বিকারে ঢালিলাম। তারপর বার্নার জ্বালিয়ে বিকারটা আগুনের শিখার ওপর রাখলাম।

সলিউশন থেকে সবুজ ধোঁয়া উঠতে আরম্ভ করল।

হেলমেটটা মাথায় পরে বৈদ্যুতিক তার দুটো বিকারে চোবানো তামার পাতের সঙ্গে যোগ করে দিলাম। তারপর ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মাঝখানে দৃষ্টি রেখে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার হতভাগ্য নবাব সিরাজদ্দৌলার ধ্যান করতে করতে একেবারে তন্ময় হয়ে গেলাম।

ক্রমে কুণ্ডলীতে একটা নরকঙ্কালের আভাস দেখা গেল। সে কঙ্কাল স্পষ্ট হওয়ামাত্র বুঝতে পারলাম তার একটা বিশেষত্ব এই যে তার অস্তিত্ব কেবল মাথার
খুলি থেকে পাঁজর অবধি। পাঁজরের নীচে কিছু নেই।

আশ্চর্য। এরকম হল কেন?

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল। কঙ্কালের মাথার জরির কাজ করা পাগড়ি। তারপর তার দুই কানের লতিতে দুটো জ্বলজ্বলে হিরা।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল ছেলেবেলায় ইতিহাসের বইয়েতে সিরাজদ্দৌলার যত ছবি দেখেছি, তার সবই হল আবক্ষ প্রতিকৃতি। আমার মনে এতকাল তার এই ছবিটাই ছিল—তাই ভূত হয়েও সে এইভাবেই দেখা দিচ্ছে।

চোখের কোটরে সবেমাত্র একটা মণির আভাস পেতে শুরু করেছি, এমন সময় একটা অদ্ভুত অট্টহাস্যে আমার ধ্যান ভঙ্গ হল আর তার পরমুহূর্তেই ধোঁয়ার ভিতর থেকে সিরাজদ্দৌলার আবক্ষ কঙ্কাল অন্তর্হিত হল।

তারপর সবুজ ধোঁয়ার আবরণ ভেদ করে আমার টেবিলের দিকে এগিয়ে এল—একি আয়নায় আমারই প্রতিবিম্ব, না। অন্য কোনও মানুষ? মানুষে মানুষে এমন হুবহু সাদৃশ্য সম্ভব তা আমি জানতাম না।

কিন্তু আগন্তুকের কণ্ঠস্বরে প্রতিবিম্বের ধারণা অচিরেই মন থেকে দূর হল। আমার চোখের দিকে অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আগন্তুক বললেন,

'ত্রিলোকেশ্বর, তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তুমি আমার অনেক দিনের বাসনা চরিতার্থ করেছ।'

আমি কোনওমতে ঢোক গিলে বললাম, 'আপনি কে?'

আগন্তুক বললেন, 'বলছি। ধৈর্য ধরো। উশ্রীর ধারেই ছিল আমার সাধনার স্থান। গোলকবাবার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ষোলো বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে এখানে চলে আসি। একবার ধ্যানস্থ অবস্থায় প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টিতে ব্রহ্মতালুতে শিলার আঘাতে আমার মৃত্যু হয়।'

'মৃত্যু!'

'মৃত্যু। তারপর অনেকবার ইচ্ছা হয়েছে এখানে ফিরে আসি। কিন্তু আমার একার পক্ষে সম্ভব ছিল না সশরীরে অবতীর্ণ হওয়া। তোমার বিজ্ঞান ও আমার তন্ত্রের সংযোগে আজ সেটা সম্ভব হয়েছে। তুমি প্রথম দিন ধ্যানস্থ হবার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমি এসেছি। কিন্তু তখনই তোমাকে দেখা দিইনি, কারণ আমার অন্য কাজ ছিল। অকস্মাৎ মৃত্যুর ফলে আমার যোগসাধনার কিছু সরঞ্জামের কোনও ব্যবস্থা করে যেতে পারিনি। অথচ অনুপযুক্ত লোকের হাতে পড়লে অনিষ্টের সম্ভাবনা। তাই একদিন অনুসন্ধানের পর সেগুলি পুনরুদ্ধার করে আজ সকালে উশ্রীর জলে নিক্ষেপ করেছি। আর ভয় নেই।...'

'কিন্তু আপনি কে সেটা জানলে...'

'বলছি। আগে কাজের কথা। তুমি সব ম্লেচ্ছের ধ্যান করছ, তাদের প্রেতাত্মা জড়রূপ ধারণ করতে অক্ষম, কারণ, প্রথমতঃ আমার সাধনা তাদের অনায়ত্ত; দ্বিতীয়তঃ—তোমার সঙ্গে তাদের রক্তের সম্বন্ধ নেই।'

'রক্তের সম্বন্ধ? আপনার সঙ্গে কি আমার...'

'হ্যাঁ। আছে। আমি হলাম তোমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ঈশ্বর বটুকেশ্বর শঙ্কু। জন্ম ১০৫৬ সন, মৃত্যু ১১৩২ সন। এসো, তোমার করমর্দন করি।'

আমার অবিকল অবয়বধারী পূর্বপুরুষ তাঁর ডানহাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি সেটা ধরতেই একটা শিহরনের সঙ্গে অনুভব করলাম তার তীব্র, অস্বাভাবিক শৈত্য।

বটুকেশ্বর হেসে উঠলেন, 'ঠাণ্ডা লাগছে, না? তবে চলি।'

তারপর আমার হাত ছেড়ে দিয়ে একটা ছোট্ট লাফে বটুকেশ্বর ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর দেহ কঙ্কালে পরিণত হল। সে কঙ্কাল অদৃশ্য হবার আগে মাথা হেঁট করে দেখিয়ে দিল—ব্রহ্মতালুর জায়গায় একটা ফুটো।

জড়ভূতের সাক্ষাৎ পাওয়াতে অশরীরী ভূত সম্পর্কে আর বিশেষ কৌতূহল রইল না—তাই বটুকেশ্বর অন্তর্ধান হবার কিছু পরেই নিও-স্পেক্‌ট্রোস্কোপটা আলমারিতে তুলে রেখে দিলাম। সত্যি বলতে কী, ধ্যানের ব্যাপারে মানসিক পরিশ্রমটাও যেন একটু বেশি হয়ে পড়ছিল।

আমি বৈঠকখানায় বসে নিউটনকে নিয়ে একটু তামাসা করছি, এমন সময় অবিনাশবাবু এসে হাজির।

তাঁকে দেখেই বুঝলাম তিনি বেশ উদ্বিগ্ন!

সোফায় বসে মিনিটখানেক কথা না বলে মেঝের দিকে ভ্রূকুটি করে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'আমার ভাইপো শিবুকে চেনেন তো?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

অবিনাশবাবু বললেন, 'সে ছোকরার ছবি তোলার বাতিক আছে। তা কদিন থেকেই তো আপনাকে এখানে সেখানে দেখা যাচ্ছে, অথচ আপনি বলছেন বাড়ি থেকে বেরোননি, তাই —মানে, আপনাকে একটু জব্দ করার মতলবেই আর কী—শিবু সেদিন করেছে কী, ক্যামেরা নিয়ে উশ্রীর ধারে গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছে। তারপর যেই আপনাকে দেখেছে। অমনি খচ্ করে আপনার একটা স্ন্যাপ নিয়ে নিয়েছে।'

'বাঃ। এনেছেন সে ছবি।'

'আনব কী মশাই? শুধু বালি আর জল আর পাথর! অথচ ওই পাথরের ধারেই ছিলেন আপনি। কিন্তু ছবিতে নেই—ভ্যানিস!'

আমি একটু হেসে বললাম, 'আসলে কী জানেন অবিনাশবাবু? ওটা আমি ছিলাম না। ছিলেন আমার...পূর্বপুরুষের ভূত। আসুন, একটু কফি খান। প্রহ্লাদ!'

প্রথম প্রকাশ : আশ্চর্য!, অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৬৬
রায় পরিবারের অনুমতি নিয়ে পুনঃপ্রকাশিত হল।

সূচিপত্রে ফিরে যান

শমনের রঙ শাদা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ডাঃ ওয়েব আসেন নি?

নিরঞ্জন মানে ডাঃ নিরঞ্জন হালদার বেশ একটু অবাক হলেন। কিন্তু তিনি ত আমাকে ছ মাস আগে থেকে জানিয়ে রেখে দিয়েছিলেন যে এবার তিনি আসবেনই। ডাঃ হালদার বেশ একটু বিস্মিত হয়ে বক্তার দিকে তাকালেন।

বক্তা নেভিল সেমুর। ডাঃ ওয়েবেরই একজন শিষ্য ও প্রাচীন সহকারী।

ডাঃ হালদারের কথায় নেভিল অত্যন্ত গম্ভীর ও কেমন একটু বিরক্তভাবে মাথা নাড়লেন —না, তিনি এবারে আসছেন না।

কথা হচ্ছিল হায়দ্রাবাদের প্যালেস হোটেলের লাউঞ্জে বসে।

হায়দ্রাবাদে এবার জীবতাত্ত্বিকদের বিশ্ব-সম্মেলন হচ্ছে। তাতে বাইরে থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁদের বেশীর ভাগকেই এ হোটেলে রাখা হয়েছে।

ডাঃ নিরঞ্জন হালদার এসেছেন সাগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনিও জীবতত্ত্ব বিজ্ঞানী। বৃটিশ গায়নার ডাঃ ওয়েবের বিশেষ বন্ধু। এক সময়ে দুজনে একসঙ্গে প্রিন্সটনে পড়েছিলেন। দুজনে এখনো একই বিষয় নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন। একজন ভারতে, আর অন্য জন বৃটিশ হন্ডুরাস সরকারের বিশেষ নিমন্ত্রণে সেখানে একটি গবেষণাগারের ভার নিয়েছেন।

আসছেন না! আশ্চর্য!—ডাঃ হালদার তাঁর বিমূঢ়তাটা গোপন করলেন না—তিনি ত কথার খেলাপ করবার লোক নন। বিশেষ করে এই সম্মেলন সম্বন্ধে তাঁর আসার একটু বিশেষ আগ্রহ ছিল। ডিএনএ, আরএনএ নিয়ে গবেষণায় তাঁর সম্পূর্ণ নতুন একটা পরীক্ষা ফল তিনি এই সম্মেলনেই জানাবেন ঠিক করেছিলেন।

তাঁর গবেষণার সে নতুন থিওরীর কথা আমিই এখানে বলতে এসেছি।—একটু অধৈর্যের সঙ্গে বললেন নেভিল সেমুর।

আপনি বলবেন!—এবার গলার অপ্রসন্নতাটা অস্পষ্ট না রেখে বললেন ডাঃ হালদার—মাপ করবেন মিঃ সেমুর, কিন্তু আপনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য আর সহকারী হলেও আপনার বলা আর তাঁর বলা কি এক হয়!

কিন্তু তিনি বলতে পারছেন না বলেই আমাকে তাঁর কথা বলতে হচ্ছে—এ আলাপ শেষ করবার জন্যে নেভিল সেমুর যে ব্যস্ত তা তাঁর বলার ধরনেই বোঝা
গেল।

ডাঃ হালদার কিন্তু সে বিরক্তি আর অধৈর্য গ্রাহ্য না করেই বললেন—কিন্তু তিনি আসতে পারছেন না কেন, সেইটেই বুঝতে পারছি না।

ছ'মাস আগে তাঁর নতুন গবেষণার একটু আভাস দিয়ে তিনি নিশ্চিত এ সম্মেলনে আসবেন বলে আমায় জানিয়েছেন। তারপর এই ছ'মাসে আসার পক্ষে কোনো বাধা যদি

হয়ে থাকে তাহলে আমায় তা কি তিনি জানাতেন না?

তিনি কেন আপনাকে কিছু জানান নি তা ত আপনাকে বলতে পারব না ডাঃ হালদার! তাঁর মনের খবর বা আপনাদের বন্ধুত্বের গভীরতা আমাদের জানবার বিষয় নয়।—অত্যন্ত অভদ্রভাবে কথাগুলো বলতে বলতে দাঁড়িয়ে উঠে মিঃ সেমুর নিজের কামরার দিকে পা বাড়িয়ে বেশ রূঢ়ভাবেই বলে গেলেন—অত্যন্ত দুঃখিত ডাঃ হালদার। কালকের ভাষণটা সম্বন্ধে আমার কিছু জরুরী কাজ এখন করবার আছে।

ডাঃ হালদারের মুখ চোখ তখন অপমানে রাগে লাল হয়ে উঠেছে। খানিক গুম হয়ে বসে থেকে তিনি উঠে চলে এলেন।

ব্যাপারটার ওইখানেই সমাপ্তি কিন্তু হল না।

সেইদিনই রাত তখন প্রায় নটা। ডাইনিং হল থেকে ডিনার খেয়ে এসে নেভিল সেমুর চাবি দিয়ে নিজের কামরায় দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে একটা আলো সবে তখন জ্বালতে যাচ্ছেন। আলোটা জ্বেলে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেবেন এই ছিল তাঁর ইচ্ছে।

কিন্তু আলো জ্বালবার আগেই তাঁকে চমকে উঠতে হল। দরজাটা বন্ধ হওয়ার শব্দে চমকে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখলেন তাঁর বদলে আর কেউ সেটা বন্ধ করে ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে।

অন্ধকারে বেশ লম্বা চওড়া গোছের চেহারাটা দেখে আপনা থেকেই মুখ দিয়ে উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসাটা বেরিয়ে এল—কে?

আলোটা জ্বাললেই দেখতে পাবেন, কে।

গলাটা যেন সামান্য চেনা মনে হল সেমুরের। আলোটা জ্বালবার পরে চিনতে দেরী হল না।

গলার স্বর তাঁর তখন অত্যন্ত কঠিন আর ক্রুদ্ধ। বললেন—আপনি! কিন্তু এ ভাবে চোরের মতো আমার কামরায় ঢোকার মানে?

চোর নয়, বলুন ডাকাতের মতো; ডাঃ হালদার রূঢ় ভাবে কথাগুলো বলে পাশের সোফাটার দিকে আঙ্গুল দেখালেন—ওখানে বসবেন চলুন। বসে আমি যা
যা জানতে চাই সব প্রশ্নের জবাব দেবেন।

এতবড় আপনার স্পর্ধা! সেমুরের গলাটাই তখন নানা তীব্র আবেগ মিশে প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেছে—আপনি গায়ের জোরে জুলুম করে আমাকে দিয়ে কথা বলাবেন!

হ্যাঁ, দরকার হলে সে ভাবেও বলাব।—ডাঃ হালদার এক রকম বজ্রস্বরেই বললেন—আমার বন্ধু ডাঃ ওয়েব কেন হঠাৎ এ সম্মেলনে আসতে পারলেন না তার সঠিক কারণ আমি জানতে চাই।

সঠিক কারণ জানতে চান?—এবার নেভিল সেমুরের গলাটা শুধু রাগে বিদ্রূপেই যেন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল না—শুনুন তাহলে আসল কারণটা। আপনার বন্ধু ডাঃ ওয়েব বেলিজ ছেড়ে চলে গেছেন। কোথায় গেছেন কেউ তা জানে না।

মিথ্যা কথা!—চিৎকার করে উঠলেন ডাঃ হালদার—ডাঃ ওয়েব এ রকম কিছু করলে সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগতে সাড়া পড়ে যেত। এ খবর এমন করে চাপা থাকত না।

খবরটা ডাঃ ওয়েব সম্বন্ধে বলেই এমন করে চাপা দেওয়া হয়েছে মনে করুন না।—নেভিল সেমুরের গলায় বিদ্রূপ না অবজ্ঞা, না একটা যন্ত্রণা, এখন বোঝা শক্ত।

নিজে থেকেই এবার কাছের সোফাটায় গিয়ে বসে মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে সেমুর ধীরে ধীরে বললেন—ডাঃ ওয়েবের এভাবে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়া নানা দিক দিয়ে সন্দেহজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেই বেলিজের সরকারী রিসার্চ সেন্টারের কর্তারা এই ভাবে আরো কিছুদিন গোপনে তাঁর জন্যে সন্ধান চালিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুসংবাদই প্রচার করবেন বলে ঠিক করেছেন।

ডাঃ ওয়েব হঠাৎ রহস্যজনক ভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন, তাঁর এ রকম অন্তর্ধান নানা কারণে সন্দেহজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে—ডাঃ হালদার ক্ষুব্ধ অথচ বিমূঢ় গলায় সেমুরের কাছে শোনা অবিশ্বাস্য খবরগুলো পর পর উচ্চারণ করে বললেন,—আর তাই চাপা দেবার জন্যে ব্রিটিশ হণ্ডুরাসের বিশ্ববিখ্যাত সরকারী রিসার্চ সেন্টার ডাঃ ওয়েবের সম্মান বাঁচাতে তাঁর মৃত্যু সংবাদ রটাবে বলে ঠিক করেছে? কি অসম্ভব কথা আপনি বলছেন মিঃ সেমুর! কিসের জোরে বেলিজ-এর রিসার্চ সেন্টার ডাঃ ওয়েবের মৃত্যু হয়েছে বলে রটাবে? উঃ ওয়েব সত্যি মারা গেছেন তার প্রমাণ কি! ডাঃ ওয়েব যদি তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচারের পর ফিরে আসেন?

তা তিনি আসবেন না।—তাড়াতাড়ি এ প্রসঙ্গ শেষ করবার জন্যে, বোধহয় কেমন একটু অস্বাভাবিক গলায় মুখটা ফিরিয়ে রেখেই সেমুরের বললেন,—যে কলঙ্ক তাঁর নামে জমা হয়েছে তাতে বেঁচে থাকলেও ফিরে আসার সম্ভাবনা তাঁর
নেই। তাই...

কথাটা শেষ করা আর সেমুর-এর হল না। নিজেকে আর সামলাতে না পেরে সেমুরের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর দু কাঁধে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে ডাঃ হালদার গলা দিয়ে যেন আগুনের হল্কা বার করে বললেন,—সমস্ত মিথ্যা কথা! সমস্ত তোমার শয়তানী বুদ্ধির প্যাঁচ। ডাঃ ওয়েব আর ফিরে আসবেন না, এ বিষয়ে তোমার কোনো সন্দেহ নেই। তিনি ফিরে না এলে তোমার অনেক সুবিধে। তাঁর আশ্চর্য গবেষণায় তুমিই ছিলে একমাত্র সহকারী। তাঁর সমস্ত কাজের সুনাম এখন তুমি পেতে পারবে। তিনি যে ফিরবেন না সেকথা তাই তুমি নিশ্চিত করে জানো। জানো এই জন্যে যে তুমি,—তুমিই তাঁকে হত্যা করেছ।

ডাঃ হালদার প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে সেমুরকে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দেবার পর তিনি সোফার গায়ে যেন নেতিয়ে পড়লেন।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! এতক্ষণ ঝাঁকানি দেওয়ার মধ্যে বা তারপর এখন সেমুরের কোনো প্রতিরোধের চেষ্টা বা ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ নেই কেন?

তার বদলে তাঁর মুখটা, শরীরের নয়, ভেতরের কোনো মানসিক যন্ত্রণায় যেন অত্যন্ত করুণ কাতর, চোখ দুটোও যেন সজল।

সেই পীড়িত কাতর মুখটাই নিচু করে রেখে ধীরে ধীরে সেমুর বললেন,—আপনি ঠিকই বলেছেন ডাঃ হালদার। ডাঃ ওয়েবকে আমিই মেরেছি। আমিই তাঁর মৃত্যুর জন্যে দায়ী! কিন্তু যে দিকে চাই সেই অবিশ্বাস্য শ্বেত বিভীষিকার বাহিনী,—সেই রেশমের তালের মতো কোমল সাগরের ফেনার মতো শুভ্র অথচ বীভৎস অগুণতি মৃত্যু-দূত...

শিউরে উঠে স্তব্ধ হয়ে গেছেন সেমুর।

নেভিল সেমুরের কাছে সমস্ত বিবরণ তারপর শুনেছেন ডাঃ হালদার। শুনেছেন সেই রাত্রেই সেই অবিশ্বাস্য কাহিনী।

ডাঃ হালদার ছ'মাস আগে ডাঃ ওয়েবের চিঠি পেয়েছেন। কিন্তু ডাঃ ওয়েবের কয়েকটা অদ্ভুত ব্যাপার তাঁর শিষ্য ও সহকারী নেভিল সেমুর লক্ষ্য করতে শুরু করেছেন তারও অনেক আগে থেকে।

প্রায় দু বছর আগে থেকে ডাঃ ওয়েবকে কেমন একটু অতিমাত্রায় অস্থির মনে হত। তিনি আশ্চর্য এক গবেষণার ক্ষেত্রে একেবারে নতুন কিছু আবিষ্কারের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছে গেছেন বলে সেই উত্তেজনাতেই ওরকম অস্থির হয়েছে এই কথাই নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন সেমুর। কিন্তু মনে ঠিক শান্তি পান নি।

ডাঃ ওয়েবের গবেষণা অবশ্য যাকে বলে যুগান্তকারী। নোবেল পুরস্কার পাওয়া
ডাঃ খোরানার আবিষ্কারের রাস্তা ধরেই তিনি সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে আণবিক জীববিজ্ঞানের জগতে অসাধ্য সাধন করতে চলেছেন। প্রাণীদেহের জনন কোষে কিছু 'জীন'-এর কৃত্রিম 'মিউটেশনে' বা পরিব্যাপ্তি-সাধন-কৌশল তিনি প্রায় আয়ত্ত করে ফেলেছেন বলা যায়।

এ ধরনের কাজে তন্ময়তার বদলে অস্থিরতার লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া একটু যে অস্বাভাবিক নিজের কাছে তা অস্বীকার করতে পারেননি সেমুর।

ডাঃ ওয়েব-এর অস্থিরতাটাও একটু অদ্ভুত। এত বড় কাজের মধ্যেও মাঝে মাঝে তিনি হঠাৎ কয়েক দিনের জন্যে একেবারে ডুব দিতে শুরু করেছিলেন। ল্যারেটরিতে তাঁকে পাওয়া যেত না।বাড়িতেও নয়। কোথায় যে যেতেন কেউ জানতে পারত না।

এই ল্যাবরেটরি পালানো শুধু নয় তার সঙ্গে আরো এমন দু একটা ঘটনা ঘটতে লাগল যাতে সেমুর ডাঃ ওয়েবের মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে একটু চিন্তিত না হয়ে পারলেন না।

ডাঃ ওয়েবের নিজের স্বতন্ত্র পরীক্ষাগারের কয়েকটা অত্যন্ত মূল্যবান দুর্লভ যন্ত্রপাতি পরপর আশ্চর্যভাবে চুরি হয়ে গেল। এসব সূক্ষ্ম বিশেষ যন্ত্রপাতি ডাঃ ওয়েব নিজেই অনেক যত্নে তৈরি করিয়েছিলেন। ডাঃ ওয়েব আর নেভিল সেমুর ছাড়া আর কেউ সেগুলির খবরই রাখত না।

যন্ত্রগুলি উধাও হয়ে যাবার পর নেভিল সেমুর অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ডাঃ ওয়েবকে সে কথা জানান।

ডাঃ ওয়েব প্রথমটা চমকে ওঠেন। ওসব যন্ত্র ল্যাবরেটরি থেকে উধাও হয়ে যাওয়া অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার বলে রীতিমত উদ্বেগও দেখান। কিন্তু তার পরেই যেন সমস্ত ব্যাপারটা ভুলেই যান।

সবকিছু এমনি ভুলে যাওয়া তাঁর একটা রোগই হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন। ডাঃ ওয়েবের মর্যাদার খাতিরে নেভিল সেমুরকে তখনকার মতো এ যন্ত্র চুরির ঘটনাটা চাপা দিয়ে রাখতে হয়েছে রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক কমিটির কাছ থেকে। চাপা দিয়ে রাখতে হয়েছে আরো একটা ব্যাপারও।

ডাঃ ওয়েবের নিজস্ব গবেষণা বিভাগের সাধারণ খরচাপাতির জন্যে একটা আলাদা তহবিলের ব্যবস্থা আছে। ডাঃ ওয়েব নিজেই দরকার মতো তা ব্যবহার করেন। সেমুরকে শুধু তার হিসেবটা রাখতে হয় মাত্র। বেশ কিছুদিন ধরে ডাঃ ওয়েব সেমুরকে কোনো হিসেব কিন্তু দেন নি।

বাৎসরিক হিসেবপত্র দেখার সময় হয়ে এসেছে বলে সেমুর ওই তহবিলের খাতাপত্র ঠিক করে রাখার জন্য একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেও ডাঃ ওয়েবের মানসিক
অবস্থার কথা ভেবে যতদিন সম্ভব তাঁকে কিছু বলাটা মুলতুবিই রেখেছিলেন।

ডাঃ ওয়েবের মানসিক অবস্থা যে একেবারেই স্বাভাবিক নয়, তার বেশ স্পষ্ট আভাসই তখন সেমুর পেতে আরম্ভ করেছেন।

একদিন তিনি হঠাৎ অত্যন্ত ফ্যাকাশে মুখে সেমুরকে তাঁর ঘরে ডেকে বললেন,—জানো, আমার গবেষণা ওরা বন্ধ করে দেবে।

বন্ধ করে দেবে? সেমুর অবাক হয়ে বলেছিলেন,—বন্ধ করবে কেন? সেরকম কোনো নির্দেশ ওদের কাছ থেকে কি এসেছে?

আসে নি। তবে আসবে আমি জানি।—হাতের কাজটা তাঁর টেবিলের ড্রয়ারে ভরে রেখে ডাঃ ওয়েব কেমন একটু অপ্রকৃতিস্থের মতো তীব্র গলায় তারপর বলেছিলেন—আমার গবেষণা কিন্তু আমি চালাবই। পৃথিবীর কারো সাধ্য নেই—তা বন্ধ করে।

এর পরই হঠাৎ হেসে উঠে প্রসঙ্গটা বদলে ডাঃ ওয়েব তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছেন,—আচ্ছা নেভিল, খুব লম্বা ছুটি যদি পাও, কিরকম জায়গায় সে ছুটি কাটাতে তোমার ইচ্ছে করে বলো ত?

সেমুর যা হোক একটা উত্তর দিয়ে তখন ডাঃ ওয়েবের কাছে বিদায় নিয়েছিলেন কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা গভীর অস্বস্তিই তিনি তখন বোধ করছেন।

ডাঃ ওয়েব যে কাগজটা পড়তে পড়তে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন ও খানিক বাদে নিজের ড্রয়ারে সেটা তুলে রেখেছিলেন, সে কাগজটার নাম সেমুর তখন লক্ষ্য করতে ভোলেননি। পরে কাগজটার সেই সংখ্যা কিনে পড়ে ডাঃ ওয়েবের অস্থিরতার একটা কারণ অন্ততঃ তিনি বার করতে পেরেছিলেন।

কাগজটায় ডাঃ ওয়েব যে গবেষণা চালাচ্ছিলেন সেই জাতীয় আর একটি গবেষণার বিষয়ে একটা খবর ছিল। খবরটা এক দিক দিয়ে বিচলিত করবার মতো। যে বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে খবরটা বেরিয়েছিল তাঁর নাকি এক 'ভাইরাস্'-এর ভেতরকার ডিএনএ বদলাবার প্রক্রিয়াসার্থক করে তোলার আর খুব দেরী নেই।

তাঁর এ চেষ্টা সফল হলে হয়ত পৃথিবীর সমস্ত মানুষের পক্ষে সর্বনাশা কোনো 'ভাইরাস'-এর উদ্ভব হতে পারে ভয় করে বৈজ্ঞানিক মহল আর সরকারী তরফ থেকে তাঁকে এ গবেষণা বন্ধ করতে বলার প্রস্তাব হচ্ছে—এইটেই ছিল পত্রিকাটির খবর।

এই খবরটিতেই ডাঃ ওয়েব অত বিচলিত হয়েছেন বুঝে এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একটু আলাপ করার ইচ্ছে সেমুরের ছিল। কিন্তু সে সুযোগ আর তাঁর মেলেনি।

এই ঘটনার পর দিনই হঠাৎ ডাঃ ওয়েব একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন।
সে প্রায় মাস পাঁচেক আগের কথা।

তাঁর মানসিক অবস্থা ঠিক স্বাভাবিক না হলেও ডাঃ ওয়েব হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড করে বসতে পারেন আর কেউ ত নয়ই নেভিল সেমুরও তা ভাবতে পারেননি।

প্রথমে তাই তিনি কোনো দুর্বৃত্তদলের খর্পরে পড়েছেন এই কথাই ভেবেছে সবাই। কিন্তু পুলিশ আর পেশাদারী গোয়েন্দারা সে রকম কোনো হদিসই পায়নি।

ল্যাবরেটরির খরচাপত্রের হিসেবে গরমিল, সেখানকার দামী যন্ত্রপাতি চুরি যাওয়া, এসব ব্যাপার রিসার্চ সেন্টারের কর্তাদের কাছে আর চাপা থাকেনি এরপর।

ডাঃ ওয়েবের আগেকার সুনামের খাতিরে আর নেভিল সেমুরের অনুরোধে পরিচালক কমিটি শুধু এ খবরগুলো চাউর হতে দেননি। নেভিল সেমুরকে তাঁর গুরুর সন্ধান করবার সময় দিয়ে ফলাফলের জন্যে অপেক্ষা করেছেন।

সেমুর কিন্তু গোড়ায় সন্ধান পাওয়ার ব্যাপারে সব দিকেই সম্পূর্ণ বিফল হয়েছেন। সত্যি সত্যিই মানুষটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে বলে মনে হয়েছে তাঁর।

এমনি ভাবে ছমাস কাটবার পর কমিটি যখন নেভিল সেমুরের সঙ্গেই পরামর্শ করে, আর কিছুদিন নীরব থেকে সব দিক বাঁচাবার জন্যে ডাঃ ওয়েবের যে কোনো রকম অপঘাত-মৃত্যু ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত করেছেন তখনই ক্ষীণ দুর্বোধ সেই একটু হদিস যেন মিলল।

সখের রেডিও যন্ত্র বানিয়ে অজানা বেতার তরঙ্গ ধরা আর পাঠানো যাদের খেলা, তেমনি ক'জন 'হ্যাম' রেডিও-যন্ত্রী কয়েকদিন ধরে একটা অদ্ভুত বার্তা তাদের যন্ত্রে পাবার পর কয়েকটি খবরের কাগজে তার একটু বিবরণ বার করেছিলেন।

নেভিল সেমুরের নিজের মুখে তার পরের কাহিনীটুকু এই—

হ্যাম রেডিও-যন্ত্রীদের একজনের সেই একটা বিবরণ দৈবাৎ আমার চোখে পড়ে যায়। তার ভেতর ডাঃ ওয়েবের কোনো হদিস আছে এ কথা বিশ্বাস করা অবশ্য আমার পক্ষে খুবই শক্ত।

রেডিও-সংবাদটা এই—এনএএস, এনএএস, পিআর চৌত্রিশ, শীগগির এসো, সতেরো পয়েন্ট আঠারো এন, ছিয়াশি পয়েন্ট চল্লিশ ডব্লিউ। পিআর চৌত্রিশ, পিআর চৌত্রিশ।

এ সংবাদের দুটো টুকরো অংশ কিন্তু আমার খুব অদ্ভুত লাগে। একটা হ'ল, পিআর চৌত্রিশ, আর অন্যটা এনএএস, এনএএস বলে ডাক।

এই দুটির মধ্যে কোনো মূল্যবান ইঙ্গিত কি থাকতে পারে না?

পিআর চৌত্রিশ ইঙ্গিতটা বিশেষ করে আমায় ভাবিয়েছে। পিআর চৌত্রিশ মানে কি প্রোজেক্ট চৌত্রিশ? সেটা ডাঃ ওয়েবের এবারের গবেষণার ক্রমিক সংখ্যা। তাহলে এনএএস ডাকের মানে কি? এনএএস কি তাহলে আমি?

নিশ্চয়, নিশ্চয় তাই। আমি যে শুধু নেভিল সেমুর নয়, নেভিল আর্থার সেমুর যে আমার পুরো নাম, আর সংক্ষেপ করবার জন্যে মাঝখানের আর্থার অংশটা যে আমি বাদ দিয়েছি, একথা ডাঃ ওয়েব ছাড়া খুব কম লোকই জানে।

নিজের গবেষণা পরীক্ষায় সংখ্যা দিয়ে আমাকেই তাহলে ডাঃ ওয়েব যে ডাকছেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ আমার আর রইল না।

কিন্তু ডাকছেন কোথায়? বোঝাই ত যাচ্ছে যে সতেরো পয়েন্ট আঠারো এন আর ছিয়াশি পয়েন্ট চল্লিশ ডব্লিউ-এ। ওগুলো হল অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমার নির্দেশ। অক্ষাংশ হ'ল সতেরো পয়েন্ট আঠারো এন মানে নর্থ অর্থাৎ উত্তর আর দ্রাঘিমা হল ছিয়াশি পয়েন্ট চল্লিশ ডব্লিউ মানে ওয়েস্ট অর্থাৎ পশ্চিম।

জায়গাটার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাবার পর একমুহূর্ত আর দেরী করিনি।

বাইরের কাউকে কোনো কথা বলবার নয়। তা না হলে সরকারী ভৌগোলিক দপ্তর থেকে ওই অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমার নির্ভুল অবস্থানটা জেনে নিতে পারতাম।

তার বদলে সেটা নিজেই কষ্ট করে কষে নিয়ে একলা একটা হেলিকপ্টার ভাড়া করে সেইদিন বিকেলেই রওনা হয়ে গেছি। সঙ্গী হিসেবে নিয়েছি কোনো মানুষ নয়, আমার নিজের অ্যালসেশিয়ান কুকুরটিকে শুধু।

কি রকম বিপদে পড়ে ডাঃ ওয়েব ডাক দিয়েছেন তা'ত জানি না। তবে সে রকম দরকার হলে প্রাণ দিয়ে যোঝবার জন্যে আমার অ্যাসেশিয়ান ববের চেয়ে প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী আর কাউকে যে পাব না সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সমুদ্রের ধারের শহর বেলিজ। সেখান থেকে ঠিকানাটা বেশী দূরে নয়। অক্ষাংশ দ্রাঘিমা কষেই আমি বুঝেছিলাম জায়গাটা বেলিজের একটু দক্ষিণপূর্বে টার্নেফ দ্বীপটা ছাড়িয়ে লং কে নামে ছোট ছোট দ্বীপবিন্দুর একটা।

দুনিয়ায় এত জায়গা থাকতে ডাঃ ওয়েব কেন যে এই যমের অরুচি দ্বীপের বিন্দুতে গিয়ে উঠেছেন তা বোঝাই শক্ত।

দ্বীপ-বিন্দুতে নামতে গিয়েই তা অবশ্য বুঝলাম।

হেলিকপ্টারটা নামবার সময়েই দেখতে পেলাম জনমানবহীন দ্বীপটা সমুদ্রের বুকে কটা ঢিবি তোলা এক বিন্দু মরুভূমি বললেই হয়। এক দিকে একটা বড় টিনের চালা গোছের দেখে সেটা ডাঃ ওয়েবের বাসস্থান আর ল্যাবরেটরি বলে বুঝলাম। হেলি থেকে নেমে সেদিকে ববকে সঙ্গে নিয়ে যেতে যেতে ডাঃ ওয়েবের
এ রকম একটা দ্বীপে এসে ওঠবার কারণটা একেবারেই অস্পষ্ট রইল না।

ডাঃ ওয়েবের ভয় ছিল তাঁর গবেষণা হয়ত ওপরওয়ালাদের চাপে আর খবরের কাগজের আন্দোলনে তাঁকে বন্ধ করতে হবে। তাই তিনি একেবারে গোপন নিরিবিলি এমন একটি জায়গা খুঁজেছিলেন যেখানে কেউ তাঁর কাজে বাধা দিতে পারবে না। সেদিক দিয়ে এই দ্বীপের বিন্দুটি যে আদর্শ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বেলিজ-এ যখন থেকে তাঁর অস্থিরতা আমার চোখে পড়েছে সেই সময় থেকেই এই দ্বীপের গোপন আস্তানার তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই জন্যেই মাঝে মাঝে তিনি হঠাৎ কাজে কামাই করে উধাও হয়ে যেতেন। সেই জন্যেই ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি সরানো থেকে আরো অনেক অন্যায় করতেও তিনি পেছপা হননি।

কিন্তু এত সব করে উদ্দেশ্য সফল হবার পর এখন হঠাৎ এমন কি বিপদ তাঁর হল যাতে সাঙ্কেতিক ভাষায় হলেও রেডিও তরঙ্গে প্রায় আর্তনাদ করে আমায় ডেকে পাঠাতে হয়েছে?

দ্বীপটির চারিদিকে চেয়ে সে রকম কোন চিহ্নই পাচ্ছি না। চারদিকের শান্তিময় নিস্তব্ধতার মধ্যে দ্বীপ-ঘেরা সমুদ্রের ঢেউ-এর শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

আমার হেলিকপ্টারে দ্বীপে পৌঁছোবার পর ডাঃ ওয়েব আমাকে অভ্যর্থনা করতে আসেন নি এইটিই একমাত্র একটু অস্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তাতে ত তিনি অসুস্থ বা কোন রকমে আহত বলেই আসতে পারেন নি বলে বোঝা উচিত। এমন করে আমায় ডেকে পাঠাবার কারণও হয়ত তাই ছাড়া আর কিছু নয়।

টিনের চালাটার সামনের কামরায় ঢোকার পরই কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হল। এইটেই ডাঃ ওয়েব গবেষণা করবার ল্যাবরেটরি ঘর বলে বোঝা গেল। কিন্তু সমস্ত ঘরের ভেতরে যেন একটা ভূমিকম্প হয়ে গেছে। যন্ত্রপাতি জিনিসপত্র সব ভাঙাচোরা ওল্টানো। মেঝের ওপরে যেন কোনো উন্মাদের হাতের কুড়ুলে করাতে কাটা-চেরা কিছু কাঠের চিবোনো গোছের টুকরো।

কামরাটার ত' এই অবস্থা। ডঃ ওয়েব তাহলে কোথায়!

তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। কামরার ভেতরটা বেশ অন্ধকার। পকেট টর্চটা জ্বালিয়ে একটু ঘোরাতেই কামরায় একমাত্র অক্ষত ও খাড়া হয়ে থাকা স্টীলের ছোট টেবিলটার ওপর কালো কালিতে যেন আঙ্গুল দিয়েই ধ্যাবড়া করে লেখা নির্দেশটা পড়তে পারলাম!

নেভিল, এ লেখা পড়ছ মানে এসেছ। এখুনি কামরায় কোণের ছোটো সিন্দুকটা খুলে আমার গবেষণা আর আবিষ্কারের পুরো বিবরণের ফাইলটা বার করে নিয়ে পালাও। এক মুহূর্ত দেরী কোরো না—তারা এতক্ষণে না এসে থাকলে এল বলে।
আমার জন্যে ভেবো না। আমি লুকিয়ে থাকবার বৃথা চেষ্টা করলেও সব সাহায্যের বাইরে সব আশার অতীত হয়ে ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছি। যাও!

সিন্দুক খোলার নম্বর এল, এল, শূন্য সাত শূন্য এক শূন্য তিন।

এক মুহূর্ত আমি আর দেরী করিনি। কিন্তু সিন্দুকটা খোলায় গোলমাল হয়েছে। ডাঃ ওয়েবের লিখে রাখা নম্বর অনুসারে চাকতি ঘোরাতেও সিন্দুকের দরজা খোলে নি। আমি অস্থির হয়ে বারবার নম্বর ঘুরিয়েছি। কিছু হয়নি তাতেও।

তারপর মনে হয়েছে টেবিলের ওপরে লেখা নম্বর পড়তে কি আমার কোনো ভুল হয়েছে। ধ্যাবড়া কালিতে লেখা একটা সাত আসলে এক।

আবার নতুন করে নম্বরের চাকতি ঘোরাতে গিয়ে হঠাৎ চমকে উঠেছি।

পাহারায় থাকবার জন্যে আমার অ্যালসেশিয়ান ববকে কামরার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছিলাম।

হঠাৎ তার এ কি অদ্ভুত চিৎকার!

চিৎকারটা যেন রাগের গর্জন আর ভয়ের আর্তনাদে মেশানো!

উঠতে গিয়েও উঠলাম না। সিন্দুক খুলে ডাঃ ওয়েবের কাগজগুলো উদ্ধার না করলেই নয়! নম্বর ঘোরাতে আমার তখন ভুল হয়ে গেছে। জোর করে একাগ্র হয়ে আবার সিন্দুক খোলায় মন দিলাম।

আর তখনই সেই বীভৎস ভয়ঙ্কর বন্যা গায়ের ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কামরার ভেতরটা তখন রীতিমত অন্ধকার হয়ে গেছে। তারই ভেতর সমস্ত শরীরে কেমন কোমল রেশমী স্পর্শ আর অসংখ্য দংশনের তীব্র জ্বালা মেশানো অবিশ্বাস্য অনুভূতির সঙ্গে একটা অদ্ভুত ধবলতার আভাসই চোখে পড়ল।

বাইরে আবার ববের চিৎকারটা তখন আর গর্জন নয়, শুধু আর্তনাদ বলেই মনে হচ্ছে।

কেমন করে জানি না, কোন রকমে সিন্দুকটা খুলতে পেরে ভেতরের ছোট চামড়ায় ফোলিওটা বার করে নিয়ে সিন্দুক বন্ধ না করেই ছুটে বাইরে বার হলাম।

যেমন করে হোক হেলিকপ্টারে গিয়ে পৌঁছোনো ছাড়া আর রক্ষা পাবার কোনো উপায় নেই!

কিন্তু হেলি পর্যন্ত কি পৌঁছোতে পারব? ঢেউ-এর পরে ঢেউ হিংস্র বীভৎস ভয়ঙ্কর এক ধবলতার বন্যা আমার গায়ে আছড়ে পড়ছে। আত্মরক্ষা করে সে বন্যা ঠেলে অগ্রসর হওয়া প্রায় অসম্ভব। প্রাণপণে যুঝেও আমার বব তখন হার মেনেছে। রক্তাক্ত শরীরে হেলিকপ্টারটায় কোন রকমে পৌঁছোবার সময়েই এক লহমার দৃষ্টিতে দেখতে পেলাম শেষ করুণ একটা আর্তনাদের সঙ্গে সেই বন্যার মধ্যে বব একেবারে তলিয়ে গেল।

কোন রকমে হেলিতে উঠে আমি তখন সেটা চালাতে পেরেছি। আর কিছুই তখন আমার করার সাধ্য নেই।

হেলিকপ্টার নিয়ে বেলিজ-এ নির্বিঘ্নেই তারপর পৌঁছোলাম। ডাঃ ওয়েবের আশ্চর্য গবেষণার সমস্ত বিবরণও তখন আমার হাতে। যেমন করে হোক শেষ পর্যন্ত তা আমি উদ্ধার করেছি।

কিন্তু সেই জন্যেই তীব্র অনুশোচনায় তখন আমায় আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়েছে।

তাঁর কাগজ-পত্র উদ্ধারের আগে স্বয়ং ডাঃ ওয়েবকে খুঁজে ফিরিয়ে আনবার কেন আমি চেষ্টা করিনি। সিন্দুক খুলে তাঁর গবেষণার বিবরণ বার করতে যা সময় লেগেছে তার মধ্যে ডাঃ ওয়েবকে হয়ত খুঁজে বার করে আমার হেলিতে তুলে আনতেপারতাম।

পারি না পারি সেই চেষ্টাই আমার করা উচিত ছিল। তার বদলে ক্ষমাহীন নিবুর্দ্ধিতায় আমি আগে তাঁর গবেষণার বিবরণ উদ্ধার করতেই ব্যস্ত হয়েছি।

পরের দিন সকালেই ডাঃ ওয়েবের দ্বীপবিন্দুর ধবল বিভীষিকার সঙ্গে যোঝবার মতো অস্ত্র-শস্ত্র ও রাসায়নিক উপকরণ নিয়ে অন্য একটি হেলি ভাড়া করে সেই দ্বীপে আবার গিয়ে নেমেছি। দিনের আলোয় চারিদিক নিতান্ত শান্তিময়।

কিন্তু তখন বড় বেশ দেরী হয়ে গেছে।

আগের দিন বিকেলে হেলিকপ্টার যেখানে নামিয়েছিলাম তার কাছেই আমার ববের কঙ্কালটা শুধু পড়ে আছে। সে কঙ্কালটাও আস্ত নয়। তার মাংসটাংস সব ত বটেই তার হাড়গুলোও যেন কিসে চিবিয়ে খাবার চেষ্টা করছে।

ডাঃ ওয়েবের মৃতদেহ কিন্তু অক্ষত না হলেও সম্পূর্ণ আকারে পেয়েছি টিনের চালগুলির শেষপ্রান্তের একটি কুঠুরিতে স্টীলের এক টেবিলের ওপর।

কেন যে তাঁর শবদেহের আমার ববের দশা হয়নি তা সেই কুঠুরিতে ঢোকার পরই বোঝা গেছে।

কুঠুরিতে তীব্র এক রাসায়নিক গন্ধ। মৃত্যু নিশ্চিত জেনে তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে ডাঃ ওয়েব অতি উগ্র কোনো রাসায়নিক ওষুধ তাঁর সর্বাঙ্গে মেখে নিয়েছিলেন। হিংস্র-বিভীষিকায় ধবল বন্যা তাই তাঁর দেহকে স্পর্শ করতে পারে নি।

দ্বীপটির ওপর সর্বত্র ছোটবড় অসংখ্য ফাটল। তারই একটা ফাটল চওড়া করে খুঁড়ে নিয়ে মিঃ ওয়েবের শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করেছি।

দ্বীপের ফাটলগুলি দেখতে দেখতে আর একটা সন্দেহ যা মাথায় এসেছে, বেলিজে ফিরে যাবার পর তা সত্য বলে প্রমাণ করেছি।

প্রথম হেলিকপ্টার যে কোম্পানী থেকে ভাড়া করেছিলাম তাদের সম্পূর্ণ ভাড়া চুকিয়ে দিতে যাবার পর তারা ভাড়ার অতিরিক্ত কিছু ক্ষতিপূরণ চেয়েছে।

হেলিকপ্টারের চালকের সীটের তলায় নাকি বেশ কিছু রক্তের দাগ ছিল।

আর তা ছাড়া এটি কোথা থেকে জোটালেন?—বলে তাদের কর্মচারী যা আমাকে তুলে ধরে দেখিয়েছে, তা দেখবার পর উপরি ক্ষতিপূরণ দিতে আমি কিছুমাত্র আপত্তি করিনি।

যে জিনিসটি কর্মচারী আমায় দেখিয়েছিল তা একটি বিরাট আকারের মরা সাদা ইঁদুর। যে মোটা ব্লু জীন-এর প্যান্ট আমায় খানিকটা রক্ষা করেছে তারই ভেতর কেমন করে ঢুকে পড়ে আমার পা কামড়ে ধরেছিল। তারপর ওই অবস্থায় মারা গিয়ে 'হেলি'র মধ্যে পড়ে গিয়েছে।

হ্যাঁ ওই সাদা ইঁদুরই ডাঃ ওয়েবের গবেষণার উপাদান আর অভিশাপ।

ডঃ ওয়েব এক সম্পূর্ণ নতুন কৌশলে প্রাণীদেহের জননকোষের কিছু জীন-এর পরিব্যাপ্তি বা মিউটেশন ঘটাবার পদ্ধতি আবিষ্কার করে এই সাদা ইঁদুরদের ওপরেই তা প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর গবেষণা বাইরের চাপে বন্ধ হয়ে যেতে পারে ভয় করে তিনি লং কে-র এই দ্বীপবিন্দুতে গোপনে তাঁর পরীক্ষা চালানোর আয়োজন করেন। কিন্তু খোদায় ওপর খোদকারীর এ চেষ্টা সর্বনাশা হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে যায়।

এমনিতেই ইঁদুরদের বংশবৃদ্ধি অত্যন্ত বেশী। ডাঃ ওয়েবের পরীক্ষায় তাদের সে বংশবৃদ্ধি বহুগুণ ত হয়ে যায়ই, তারা হিংস্র ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে কিছুদিনের মধ্যেই।

তার ল্যাবরেটরির খাঁচা কেটে ভেঙে বেরিয়ে তারা দ্বীপের ফাটলগুলির মধ্যে আশ্রয় নেয়। তারপর কোন রহস্যময় কারণে নিশাচর হয়ে উঠে দিনের পর দিন ক্রমেই অগণন হয়ে উঠে দ্বীপের অন্য প্রাণীকে শেষ করে ল্যাবরেটরিতে পর্যন্ত হানা দিতে শুরু করে।

ডাঃ ওয়েব প্রথমে তাদের সামলাবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, তারপর উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বেতার ট্রান্সমিটারে তিনি আমাকে সাহায্যের জন্যে ডাকেন।

তাঁর গবেষণার কাগজগুলি উদ্ধার করা ছাড়া আমি তাঁকে কোন সাহায্যই কিন্তু করতে পারিনি। দ্বিতীয়বারের পরও আমি অবশ্য আরো কয়েকবার হেলিকপ্টারে ও দ্বীপবিন্দুতে গিয়েছি ও তীব্র তরল বিষ ঢেলে দ্বীপের ফাটলগুলির মূষিকবংশ নির্মূল করবার ব্যবস্থা করেছি। আমি কিছু না করলেও অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে খাদ্যের অভাবে নিজেদের মধ্যে মারামারি করেও মৃত্যুদূতেরা ধ্বংস হয়ে যেত।

শেষবার চলে আসবার সময়ে যে মোটর-বোটে ডাঃ ওয়েব ও দ্বীপে তাঁর

গবেষণার সাজ-সরঞ্জাম বয়ে নিয়ে গিয়ে উঠেছিলেন সেটিও আমি ডুবিয়ে দিয়ে এসেছি। তিনি জলে ডুবে মারা গেছেন রটনা করবার জন্যই এ কাজটা করতে হয়েছে।

ডাঃ ওয়েবের কাছে ঋণ আমার অনেক। আমি এ সম্মেলনে তাঁর নাম জানিয়েই তাঁর গবেষণার বিবরণ পড়ব বলে ঠিক করে এসেছি।

নেভিল সেমুর বিষন্ন মুখে তার কথা শেষ করবার পর ডাঃ হালদার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকেছেন।

তারপর ধীরে ধীরে তিনি বলেছেন,—আপনাকে একটা অনুরোধ আমি করতে চাই মিঃ সেমুর!

কি অনুরোধ?—বলে সেমুর একটু বিস্মিতভাবে ডাঃ হালদারের দিকে তাকিয়েছেন।

আমার অনুরোধ এই যে ডাঃ ওয়েবের গবেষণার এ বিবরণ এখানে পড়বেন না। এখানে নয় অন্য কোথাও নয়। এসব কাগজ আপনি নষ্ট করে ফেলুন। সৃষ্টি আর জীবনের কিছু রহস্য এখনো আমাদের জানবার বুঝি সময় আসেনি। তা জানতে গিয়ে কল্যাণের বদলে মানুষের সর্বনাশই আমরা ডেকে আনতে পারি।

কথাগুলো বলে ডাঃ হালদার মিনতির দৃষ্টিতে সেমুরের দিকে তাকিয়েছেন। সেমুর তাঁর অনুরোধ রেখেছেন। পরের দিন সম্মেলনে তাঁকে আর দেখা যায়নি। আকস্মিক এক পারিবারিক বিপদের অজুহাতে তিনি ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেছেন।

প্রথম প্রকাশ: ফ্যান্টাসটিক, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬

সূচিপত্রে ফিরে যান

বিদ্রূপ ব্রহ্মর ব্রহ্মাণ্ড

অদ্রীশ বর্ধন

এ গল্প যাকে নিয়ে তার শক্তি ছিল অনেক—অতিরিক্ত।

চেয়েচিন্তে একজন সেই শক্তির কিছুটা নিয়েছিল। প্রয়োজনের বেশি নিয়েছিল।

ঘাবড়াবেন না। গল্পের নাম করে রাজনীতির কচকচি আমি শোনাব না।

শক্তি যার ছিল, তার নাম বিদ্রূপ ব্রহ্ম। অপরজন তার ব্যাঙ্কার।

বিদ্রূপ ব্রহ্ম নামটি যেমন অদ্ভুত, লোকটিও তেমনি। বিদ্রূপ বৈজ্ঞানিক। থাকত ভারত মহাসাগরের একটা ছোট্ট দ্বীপে। একা।

গল্পের বৈজ্ঞানিকদের মতো বামনাবতার নয় বিদ্রূপ ব্রহ্ম। পাগলাটেও নয়। নিজের স্বার্থের জন্য সে কিছুই করত না। ব্যক্তিগত লাভের জন্য বিজ্ঞানকে সে হবি করেনি। বিদ্রূপ ব্রহ্ম কপট নয়, কুটিল নয়, মায়াবী নয়, কুহকী নয়; ধ্বংসের কল্পনা তার মগজের অতীত ছিল, যেমন ছিল বিনাশক চিন্তাধারা। বিদ্রূপ ব্রহ্ম নিয়মিত চুল কাটত, নখ কাটত, পরিষ্কার জামাকাপড় পরত এবং আর পাঁচটা সুস্থ মানুষের মতোই জীবনযাপন করত। বিদ্রূপ ব্রহ্মর মুখে ছিল ছেলেমানুষি ভাব; চাহনি ছিল মুনিঋষির দৃষ্টির মতো শুচিস্নিগ্ধ। মাথায় খাটো; তেলচুকচুকে নধরকান্তি চেহারা। বুদ্ধি-উজ্জ্বল মুখশ্রী, ধীমান কান্তি! জৈবরসায়ন বিদ্যা অর্থাৎ বায়োকেমিস্ট্রি ছিল ওর বিশেষ বিষয়। বিদ্রূপ ব্রহ্ম কেবল বিদ্রূপ ব্রহ্ম নামেই পরিচিত ছিল; নামের আগে 'ডক্টর' বা 'প্রফেসর' ছিল না। ঐ ভাবে কেউ ডাকতও না। বলত হয় 'বিদ্রূপবাবু' আর না হয় 'ব্রহ্মমশাই'।

সব মিলিয়ে মানুষটা একটু বিদঘুটে সন্দেহ নেই। স্কুল কলেজ ইউনির্ভাসিটির ধার ধারত না বিদ্রূপ ব্রহ্ম। গ্রাজুয়েট সে নয় কারণ কলেজে সে পড়েনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠও মাড়ায় নি। কেন? বিদ্রূপ ব্রহ্ম দেখেছিল, কলেজ-ইউনির্ভাসিটির শিক্ষাদানের ধারা অতিশয় মন্থর-গতি। শুধু তাই নয়, পড়াশুনা ব্যাপারটাকে যেন একটা বাঁধাধরা ছকের জিনিস মনে করা হয় সেখানে। প্রফেসররা যা পড়ান, তার সবটাই যে তাঁরা জানেন, এমন অদ্ভুত ধারণা কিছুতেই মাথায় আনতে পারত না বিদ্রূপ ব্রহ্ম।

পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রেও একই ধারণা পোষণ করত সে। শ্রাবণের ধারাবর্ষণের মতো ঝমাঝম প্রশ্ন করে যেত। প্রশ্নগুলো যে কতখানি গোলমেলে এবং যে কোন পণ্ডিত-শ্রোতাকেও ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট—তা বুঝেও বুঝতে চাইত না, কাজেই ক্ষ্যামা দিত না। বিদ্রূপ ব্রহ্ম ডারউইনকে বলত উদ্ভট-মস্তিষ্ক দার্শনিক, স্যার জগদীশকে বলত কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধকার, আর আইনস্টাইনকে বলত সায়ান্স-ফিকশ্যনের আধুনিক পৃষ্ঠপোষক। তার সব কথাই ছিল এরকম চিমটিকাটা, বুদ্ধি-ঘুলিয়ে দেওয়া। শুনতে শুনতে শ্রোতা বেচারী হাঁসফাঁস করত, দম আটকে আসত। অমুক লোকের অনেক জ্ঞান আছে, এ কথা একবার শুনলেই হল। অমনি সেখানে দৌড়ে যেত মেশিনগানের মতো প্রশ্ন বর্ষণ করে বেচারীর দম বন্ধ করার উপক্রম করত। শ্রোতার জ্ঞান যদি আগে

থেকে তার জানা থাকত, তাহলে একটাই প্রশ্নই জিজ্ঞেস করত বারবার—'কি করে জানলেন বলুন তো?' যে সব বিজ্ঞান মানব জাতির উন্নতির জন্য চেষ্টিত এবং বংশগতির নিয়ামক, বিশেষ করে সেই সব বিজ্ঞানের বিজ্ঞানীদের ধরে জেরা আর প্রশ্নবাণে বিপর্যস্ত করাই ছিল বিদ্রূপ ব্রহ্মর অতীব আনন্দের বিষয়। তাই কেউ তার সঙ্গ পছন্দ করত না। কেউ তার বন্ধু হতে চাইত না। কেউ তাকে চায়ের আড্ডায় ডাকত না। ব্রহ্ম বিনয়ী বটে, কিন্তু বৈঠকী নয়। তাই চালিয়াৎ না হয়েও নিঃসঙ্গ হল সে।

বিদ্রূপ ব্রহ্মর নিজের টাকা বলতে খুব সামান্যই ছিল। কুড়িয়ে বাড়িয়ে তাই দিয়ে দ্বীপটাকে লীজ নিল বিদ্রূপ। বানাল একটা ল্যাবরেটরী। আগেই বলেছি, বিদ্রূপ ব্রহ্ম বায়োকেমিস্ট অর্থাৎ জৈবরসায়নবিদ। শুধু জৈবরসায়ন নিয়ে পড়ে থাকা সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। তাই নিজের এখ্‌তিয়ার ছেড়ে নাক গলিয়েছিল বহুবিধ ব্যাপারে।

ভিটামিন বি-ওয়ানকে স্ফটিক আকারে তৈরি করার পদ্ধতি আবিষ্কার করার ব্যাপারটা অবশ্য ওর কাছে তেমন কিছুই নয়। এ পদ্ধতির ফলে টন হিসেবে ভিটামিন বি-ওয়ান তৈরি করা যায় এবং দেদার মুনাফা থাকে। যদিও টন হিসেবে এ ভিটামিন উৎপাদন করার কথা এখনও কেউ ভাবতেও পারে না। যাই হোক, সামান্য এই গবেষণার ফলে প্রচুর টাকা রোজগার করে ফেলল বিদ্রূপ ব্রহ্ম। সেই টাকা দিয়ে দ্বীপটা কিনেই ফেলল। আটশ লোক খাটিয়ে ছ'বিঘে জমির ওপর আরও বড় ল্যাবরেটরী তৈরি করল। বিস্তর যন্ত্রপাতি আনাল এবং কিছু নিজে বানিয়ে নিল।

মোচার শুঁয়ো থেকে এক রকম নিদারুণ শক্ত সুতো উদ্ভাবন করল বিদ্রূপ। সেই সুতো দিয়ে এমন এক দড়ি বানাল, যা দামে যেমন সস্তা তেমনি শক্ত। জাহাজ বাঁধা যায়, ছেঁড়ে না। এই দড়ি দিয়ে বেড়া তৈরি করে ল্যাবোরেটরী ঘিরল। এ দিকে দেখতে দেখতে পৃথিবী জুড়ে কলা উৎপাদনের ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠল
শুধু মোচার সুতো তৈরির জন্য।

দড়ি কত যে শক্ত তা যাচাই করে দেখানোর জন্য বিদ্রূপ ব্রহ্মর সেই প্রদর্শনীর ঘটনা নিশ্চয় আপনার মনে আছে। নায়গ্রা জলপ্রপাতের ওপরে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিল সে। দড়ির একটা খুঁট বাঁধা ছিল এ তীরে, অপর খুঁট ও তীরে। মাঝখান থেকে ঝুলছিল একটা দশ-টন লরী। ছেঁড়া তো দূরের কথা, যে ইস্পাতের আঁকশিটার নিচে লরীটা ঝুলছিল, তার ঘষা লেগে দড়িটার একটা শুঁয়োও উঠে যায় নি। এরপর থেকেই গুনটানা থেকে শুরু করে জাহাজ বাঁধা পর্যন্ত সব কাজে লেড পেন্সিলের মতো সরু দড়ির রেওয়াজ হয়েছে। একটা বড়-সড় কাটিমেই গুটিয়ে রাখা যায় দড়িটা। সামান্য এই আবিষ্কার থেকে দেদার পয়সা করে ফেলল বিদ্রূপ ব্রহ্ম। কিনল একটা সাইক্লোট্রন মেশিন।

এরপর টাকা গোনাটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কাজেই নোটের তাড়াগুলো আসত মোটামোটা বইয়ের আকারে। তা থেকে যৎসামান্য খরচ করত বিদ্রূপ ব্রহ্ম শুধু খাবার দাবার আর যন্ত্রপাতি কেনার জন্যে। কিন্তু কিছু দিন পরে এ সব খরচও বন্ধ হয়ে গেল।

ব্যাংকের টনক নড়ল। সীপ্লেনে লোক পাঠালো তারা বিদ্রূপ ব্রহ্ম এখনো বেঁচে আছে কি না দেখার জন্য। লোক গিয়ে দেখল বহাল তবিয়তে বেঁচে রয়েছে বিদ্রূপ ব্রহ্ম। দুদিন

পরে ফিরে এল ব্যাংক প্রতিনিধি। দ্বীপের কাণ্ড কারখানা দেখে তার নাকি আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে।

কারণ, বিদ্রূপ ব্রহ্ম শুধু বেঁচেই নেই, রাশি রাশি খাবার তৈরি করছে। সিনথেটিক খাবার। অর্থাৎ ক্ষেতখামারের খাবার নয়—ল্যাবরেটরীতে তৈরি। পদ্ধতিটা না কি আশ্চর্যজনকভাবে সরল। অথচ খাবারের উৎপাদন বিস্ময়করভাবে প্রচুর। প্রয়োজনের অতিরিক্ত!

রিপোর্ট পেয়েই চিঠি লিখল ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। বিদ্রূপ ব্রহ্ম কি বিনা ক্ষেতে খাবার উৎপাদনের গোপন কৌশলটা ব্যাংককে লীজ দেবেন?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল বিদ্রূপ। লিখল, খুশী মনেই দেবে। সেই সঙ্গে দিল ফরমুলাটা। পুনশ্চ দিয়ে লিখল, খবরটা বাইরের জগতে পাঠানোর কথা মনেই ছিল না বিদ্রূপের। এ ফরমুলা যে কারো কাজে আসতে পারে, এ ধারণা না কি ওর মাথায় আসে নি।

ভাবুন দিকি কাণ্ডটা! বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বৃহত্তম সমাজ বিপ্লবের সে পুরোধা, যার সামান্যতম খামখেয়ালের ফলে কারখানাকৃষির সূচনা—সেই মানুষটা কিনা চিঠি লিখলেন এ ফরমুলা যে কারও কাজে আসতে পারে তা জানা ছিল না। ঐতিহাসিক সেই চিঠিটা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সোনার ফ্রেম দিয়ে বাঁধিয়ে রেখেছে।

ফলে, আরও টাকা আসতে লাগল বিদ্রূপের ভাঁড়ারে। না। ভুল বললাম। টাকা জমতে লাগল ব্যাংকের কোষাগারে। টাকা নিয়ে কোনো ভাবনাই ছিল না তার।

ব্যাংক প্রতিনিধি ঘুরে যাওয়ার মাস আষ্টেক পরেই নাকি সত্যিকারের কিছু কাজ করেছিল বিদ্রূপ। সামান্য একজন বায়োকেমিস্ট বই কিছু তো নয়, তাও নামের আগে ডক্টর খেতাব নেই। অথচ তার আবিষ্কারের খানিকটা তালিকা শুনলেই মাথা ঘুরে যাবে। যেমন শুনুন :

অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে খাদ মিশিয়ে এমন একটা সংকর ধাতু যা কি না সেরা ইস্পাতের চাইতেও মজবুত অথচ পালকের মতো হাল্কা। কারখানা বা অট্টালিকার কাঠামো নির্মাণের ব্যাপারে না হলেই নয়।

একটা আজব কল ; নাম 'লাইট পাম্প'। 'লাইট পাম্পে'র থিওরীটি চিত্তাকর্ষক। বিদ্রূপ ব্রহ্মর মতে লাইট অর্থাৎ আলো নাকি এক ধরনের বস্তু। কাজেই তা পদার্থ আর তড়িৎচুম্বক সম্বন্ধীয় নিয়ম সূত্র মেনে চলতে বাধ্য। একটা ঘরে আলো আসার সব ফুটো বন্ধ করে দিন। আলো আসুক শুধু একটা উৎস থেকে। পাম্প থেকে কম্পমান চৌম্বক ক্ষেত্র চোঙার আকারে নিক্ষেপ করুন সেই আলোর ওপর। দেখবেন, আলো সেই চৌম্বক পথে সুড়সুড় করে বেঁকে নেমে আসবে। এবার আলোকে 'ব্রহ্ম লেন্সে'র মধ্যে দিয়ে যেতে দিন। 'ব্রহ্ম-লেন্স' আর কিছুই নয়—বলয়াকারে একটা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র। ব্যবস্থাটা হাইস্পীড ক্যামেরার সঙ্গে লাগানো থাকে। ওর ঠিক নিচেই থাকে 'লাইট-পাম্পে'র প্রাণকেন্দ্র—যা কিনা আলো শুষে নিতে মহাওস্তাদ—শতকরা ভাগই শুষে নেয়। প্রাণকেন্দ্র স্ফটিক আকারে নির্মিত। ফলে স্ফটিকের ভেতরকার অগণিত মসৃণ গাত্রে প্রতিফলিত হতে হতে অবশেষে স্ফটিকের ভেতরেই সে আলো 'হারিয়ে' যায়। কোন ঘরকে অন্ধকার করার পক্ষে এ যন্ত্রের

নাকি জুড়ি নেই। আমি মশাই বিজ্ঞান টিজ্ঞান বুঝি না। মোটামুটি জিনিসটা বোঝাতে চেষ্টা করলাম আমার আনাড়ি ভাষায়।

নলচের মধ্যে ক্লোরোফিল সংশ্লিষ্ট করা।

শব্দের চেয়ে আটগুণ বেশি বেগসম্পন্ন একটা এরোপ্লেন প্রপেলার।

এক ধরনের বেজায় সস্তা আঠা। পুরানো রঙের ওপর এই আঠা বুরুশ দিয়ে মাখাতে হয়। শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেলে কোণ ধরে টানলেই হল। কাপড়ের মতো পুরানো রঙ চড়চড় করে উঠে আসবে। এই আবিষ্কারের পর অবশ্য বিদ্রূপ ব্রহ্মর বন্ধু সংখ্যা হু-হু করে বেড়ে গিয়েছিল।

ইউরেনিয়াম আইসোটোপ ২৩৮-কে স্বয়ংচালিত পদ্ধতিতে পরমাণুতে বিভাজন করা—সেকেলে ইউ ২৩৫-এর চেয়ে যা কিনা ২০০ গুণ বেশি সম্পদশালী।

আপাতত এই পর্যন্তই থাক। সামান্য একজন বায়োকেমিস্টের পক্ষে এসব আবিষ্কার বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

বিদ্রূপ ব্রহ্ম নিজে কিন্তু জানত না তার শক্তির পরিমাণ। জানত না বিশ্বের সম্রাট হবার মতো বিপুল ক্ষমতা ছোট্ট ঐ দ্বীপে বসে সে জমিয়েছে একক সাধনার ফলে। জানত না কেননা এসব চিন্তা ওর মাথায় আসত না। নিজের পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়েই সে সন্তুষ্ট। বাকি দুনিয়া আদিম আর বর্বর অবস্থায় রয়ে গেল কিনা, তা নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। বিদ্রূপের সঙ্গে যোগাযোগ করার মাত্র একটা পথ ছিল। একটা রেডিওফোন। নিজের আবিষ্কার। যন্ত্রের অপরদিকটা ব্যাংকের ভল্টে তালাচাবি দেওয়া থাকত। একজনই জানত রেডিওফোনে কথা বলার কৌশল। ব্যাংকের চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যানের দেহতরঙ্গের সংস্পর্শে এলেই অসাধারণ রকমের সচেতন ট্রান্সমিটারটা সরব হয়ে উঠত। আর কারও দেহতরঙ্গে কাজ হত না।

চেয়ারম্যান ধুন্ধুমার সাহার সঙ্গে অলিখিত চুক্তি ছিল তার। দারুণ দরকার না হলে যেন বৈজ্ঞানিককে বিরক্ত করা না হয়। তার ধ্যানধারণার ফলশ্রুতিগুলোর পেটেন্ট হত ছদ্মনামে। চেয়ারম্যান সাহা ছাড়া আর কেউ জানত না সেই নাম। বিদ্রূপ নিজেও নয়। ও নিয়ে কোন মাথাব্যথাও ছিল না।

পরিণামে, সভ্যতার ঊষালোক থেকে আজ পর্যন্ত যত অগ্রগতি হয়েছে, তার বহুগুণ বেশি উন্নতি ঘটল অতি অল্প সময়ের মধ্যে। লাভ হল জাতির। লাভ হল বিশ্বের। সবচাইতে বেশি লাভ হল ব্যাংকের। দিনে দিনে বাড়তে লাগল, ফুলতে লাগল ব্যাংকের তহবিল। শুরু হল অন্যান্য ব্যাপারেও নাক গলানো। ফলে আরও টাকা আসতে লাগলো। আরও বেড়ে উঠতে লাগল ব্যাংক। আরও। আরও। কয়েক বছরের মধ্যেই বিদ্রূপ ব্রহ্মর বিবিধ হাতিয়ার কাজে লাগিয়ে দানবীয় আকার ধারণ করল ধুন্ধুমার ব্যাংক। ক্ষমতায় বিদ্রূপ ব্রহ্মর প্রায় সমান সমান হয়ে দাঁড়াল!

এবার একটু ধৈর্য ধরুন। মুষ্টিমেয় যে কজন ব্যক্তি বলত বিদ্রূপ ব্রহ্ম নাকি একটা জীবন্ত ধোঁকাবাজি, বলত বিজ্ঞানের দিকে মনীষার চমক দেখানো একা মানুষের পক্ষে অসম্ভব—তাদেরকে একটু ঘেঁটে দিই।

ধরেছেন ঠিক। বিদ্রূপ ব্রহ্ম জিনিয়াস সন্দেহ নেই। বিদ্রূপ ব্রহ্ম মানেই সূর্যের মতো একটা প্রচণ্ড প্রতিভা। গনগনে। জলন্ত।

কিন্তু এ প্রতিভা সৃষ্টিশীল নয়। ভেতরে ভেতরে বিদ্রূপ ব্রহ্ম ছাত্র। যা দেখেছে, যা জেনেছে, যা শিখেছে এক্সপেরিমেন্টের পর এক্সপেরিমেন্ট করে সেই সবই প্রয়োগ করেছে বিদ্রূপ ব্রহ্ম। ছোট্ট দ্বীপের নতুন ল্যাবোরেটরীতে কাজ শুরু করার সময়ে মনে মনে সে যে যুক্তি খাড়া করেছিল, তা এই :

"আমি যা কিছু জেনেছি, শিখেছি, তা অন্যের লেখা পড়ে, অন্যের কথা শুনে। এরা আবার এইসব তত্ত্ব লিখেছে, জেনেছে অন্যের লেখা পড়ে অন্যের কথা শুনে। এইভাবেই চলছে যুগযুগ ধরে।

ক্বচিৎ হয়তো নতুন কিছু জেনে ফেলে কেউ। নতুন আইডিয়াকে বেশ কৌশলে আর পাঁচজনের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। একজনকে তখন ছেঁকে ধরে কোটি-জন। যুগের ধারাই তাই।

কিন্তু এই ধারাকে যদি আমি টপকে যেতে পারি, তবেই অনেক কিছু জানা সম্ভব হবে। দুর্ঘটনা কবে ঘটবে, তার জন্য বসে থাকা দারুণ সময় সাপেক্ষ। আর, দুর্ঘটনা না ঘটলে মানুষের জ্ঞান বাড়বে না, আমারও জ্ঞান বাড়বে না।

যদি সময়কে মুঠোয় এনে ভবিষ্যতে পাড়ি জমানো যেত, তাহলে ভবিষ্যৎ তোলপাড় করে অনেক কিছু চিত্তাকর্ষক সম্পদ তুলে আনা যেত। কিন্তু সময় তো সে রকম নয়। সময়কে গুটিয়ে পেছনে হটানো যায় না, সামনে ঠেলা যায় না। সুতরাং যাই কোন পথে?

একটা পথ আছে। মানবজাতির বুদ্ধিবৃত্তির বিবর্তনকে দ্রুততগতি করে তোলা যায়। ঝড়ের বেগে ধীশক্তি যখন বিবর্তিত হয়ে চলবে, তখন হুঁশিয়ার হয়ে দেখতে হবে বিবর্তনের পথে কি-কি পাচ্ছি। কিন্তু এ পথ তেমন সুবিধের নয়। এতে খাটুনি অনেক। কারণ বুদ্ধিবৃত্তির এই প্রচণ্ড উন্নতির সময়ে মানুষের মনকে নিয়মানুবর্তিতার লাগাম দিয়ে টেনে রাখতে হবে। ফলে আমাকেও দৌড়োতে হবে তাদের সাথে। কিন্তু আমি তো তা পারব না। একক কোনো মানুষই পারবে না।

মনের ওপর আমার অনেক বোঝা। আমি নিজেকে তুরঙ্গ গতিতে ছোটাতে পারি না। অন্যের মনকেও পারি না। এর কোনো বিকল্প পথ কি নেই? নিশ্চয় আছে। কোথাও, কোনভাবে গুপ্ত রয়েছে এ হেঁয়ালীর সমাধান। থাকতেই হবে।"

সাধনার শুরুতে এই যুক্তির বনিয়াদ মনে মনে তৈরি করে নিয়েছিল বিদ্রূপ ব্রহ্ম। মানুষ নামক প্রজাতির উন্নতিসাধনের বিজ্ঞান নয়, লাইট পাম্প নয়, উদ্ভিদ বিজ্ঞান নয়, পরমাণু বিজ্ঞান নয়। বাস্তববাদী মানুষের কাছে হয়ত সমস্যাটা একটু আধ্যাত্মিক ধাঁচের, কিন্তু বিদ্রূপ ব্রহ্ম সূচ্যগ্র অনুসন্ধিৎসা নিয়ে আক্রমণ করল হেঁয়ালীটাকে। হাতিয়ার হল ওর বিশেষ মার্কামারা যুক্তিধারা। দিনের পর দিন উদ্‌ভ্রান্তের মতো চষে বেড়ালো দ্বীপের ও প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত; সামুদ্রিক গাংচিলের দিকে নিষ্ফল আক্রোশে নিক্ষেপ করল শামুক আর ঝিনুক; গজরাতে লাগল আপন মনে। তারপর এল সেই দিন যেদিন ল্যাবোরেটরীর দরজা বন্ধ করে সুগভীর চিন্তায় আত্মহারা হয়ে গেল বিদ্রূপ ব্রহ্ম। আর ঠিক তখনি ক্ষিপ্তের মতো শুরু করল এক কল্পনাতীত গবেষণা।

গবেষণা শুরু হল নিজের লাইনেই—বায়োকেমিস্ট্রিতে। সমগ্র প্রতিভা কেন্দ্রীভূত করল বিশেষত দুটি বিষয়ের ওপর—প্রজনন বিদ্যা আর জীবকুলের বিপাকের ওপর। যতই দিন যেতে লাগল, অনেক নতুন নতুন জ্ঞান উদিত হল তার মনে। কিন্তু শেষ নেই তার জ্ঞান তৃষ্ণার। তাই তার মূল হেঁয়ালীর সঙ্গে সংযোগরহিত বহু আশ্চর্য জ্ঞানকে অবহেলে জমিয়ে রাখল মগজের কোণে। যা জানতে চাইছে তা জানল খুব সামান্যই। কিন্তু এই সামান্য তত্ত্বজ্ঞানকেই সযত্নে জমাতে লাগল পূর্বলব্ধ জ্ঞান বা অনুমানের ওপর। ধীরে ধীরে অনেক কিছুই জানল বিদ্রূপ ব্রহ্ম—মনের ভাঁড়ারে সঞ্চিত রইল সব কিছু।

গোঁড়ামির লেশমাত্র ছিল না বিদ্রূপের মনে। বিদ্রূপ ব্রহ্মর বৈশিষ্ট্যই তাই। গবেষণার সময়ে মন তার সংস্কারমুক্ত। তাই পেয়ারাকে মটরশুঁটি দিয়ে গুণ করার মতো উদ্ভট অংক কষত। সমীকরণের ভারসাম্য বজায় রাখতে একদিকে বিয়োগ চিহ্ন এবং ওপর দিকে অনন্ত চিহ্ন বসিয়ে। ভুল হত। কিন্তু সে ভুল মাত্র একবারই হয়েছিল। পরে আর একবার হয়েছিল একটা প্রজাতি সম্পর্কে। মাইক্রোসকোপ নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক নাগাড়ে কাজ করত বিদ্রূপ ব্রহ্ম। করতে করতে দুঃস্বপ্ন দর্শন শুরু হল। অমূলপ্রত্যক্ষ বিভীষিকা। যেন ওর নিজের হৃদপিণ্ডই পাম্প করে মাইক্রোসকোপের মধ্যে দিয়ে রক্ত ঠেলে তুলে দিচ্ছে ওপরে। বাধ্য হয়ে দিন কয়েক সাধনায় বিরতি দিতে হল।

ঠেকে শেখা পদ্ধতি একদম পছন্দ করত না বিদ্রূপ। এ পদ্ধতি নাকি বড় পিছল পদ্ধতি—আছাড় খাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

তাই হাতে হাতে ফল পেল বিদ্রূপ ব্রহ্ম।

সাধনার সূত্র সম্বন্ধে নিজস্ব ধারণা খুবই স্পষ্ট ছিল বিদ্রূপের। যা কিছু সম্ভবপর, তার একটা নিয়ম আছে। এ নিয়মের একটা ফরমুলা বার করেছিল বিদ্রূপ। ফরমুলাটাকে এমন সহজ সরল করে এনেছিল যে কোন্ এক্সপেরিমেন্ট করা দরকার, আর কোনটা নাকচ করা দরকার, তা অংক কষেই বার করে ফেলত।

তাই মেঘাল, মণ্ডের মতো আঠাল, আধ-পাতলা বস্তুটা যখন নড়ে চড়ে উঠতে লাগল ওয়াচ-গ্লাসের ওপর, বিদ্রূপ ব্রহ্ম বুঝল ঠিক পথই ধরা হয়েছে। যখন বস্তুটা নিজে থেকেই খাবার খুঁজতে লাগল, বিদ্রূপ উত্তেজিত হত। যখন বস্তুটা দ্বিধাবিভক্ত হল, এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আবার দ্বিধাবিভক্ত ঘটল; এবং প্রতিটি স্বতন্ত্র অংশ বড় হতে হতে আবার দুভাগ হল, বিজয়োল্লাসে উল্লসিত হল বিদ্রূপ ব্রহ্ম।

কারণ, বিদ্রূপ ব্রহ্ম প্রাণ সৃষ্টি করেছে।

ধাইমা'র মতো মগজ-শিশুকে লালন পালন করতে লাগল বিদ্রূপ। ঘেমে নেয়ে, উদয়াস্ত পরিশ্রম করে নিজের হাতে তৈরি প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখল। নানারকম কম্পনের মধ্যে প্রাণসম্পন্ন জেলিগুলোকে ডুবিয়ে রাখার ব্যবস্থা করল। টিকা দিল, বিভিন্ন মাত্রার ওষুধ খাওয়াল, স্প্রে করে স্নান করাল। একবার যা করল, তাই থেকে শিখল পরের ধাপে কি করতে হবে। তাই বিভিন্ন কম্পন আধার, টিউব আর ইনকিউবেটরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল অ্যামিবার মতো কীটাণু। দ্রুত হতে দ্রুততর হল সৃষ্টির ধারা। এল চোখওলা জীব, স্নায়ুসহ কোষ। আনন্দে আটখানা হওয়ার দিন এল তার পরেই। বহুকোষসম্পন্ন একটা সত্যিকারের পা-ওলা প্রাণী সৃষ্টি করল বিদ্রূপ। এরপর কাজের গতি

কমে এলেও খেটেখুটে বানাল একটা উন্নততর জীব। জীবটার শুধু পা নেই, পাকস্থলীও আছে। বিদ্রূপের সেদিন আনন্দের সীমা পরিসীমা ছিল না। এরপর অবশ্য বিদঘুটে জীবটাকে অন্যান্য দেহযন্ত্র উপহার দিল বিদ্রূপ। প্রতিটি দেহযন্ত্রের নিজস্ব কাজ রইল। শুধু তাই নয়, বংশপরম্পরায় দেহযন্ত্রগুলি যাতে থাকে, সে ব্যবস্থাও করল বিদ্রূপ।

এরপরেই এল মেরুদণ্ডবিহীন জীবেরা। শাঁখ শামুকের দল। বিশ্বকর্মার মতো নিপুণ হতে ফুলকা বানিয়ে দিল বিদ্রূপ। ধীরে ধীরে সুষ্ঠু করে তুলল ফুলকাগুলো। তারপর একদিন একটা কিম্ভুতকিমাকার সৃষ্টিছাড়া জীব জলাধারের ঢালের ওপর কিলবিল করতে করতে ভেসে উঠল, কানকো নাড়তে নাড়তে শ্বাস নিতে লাগল খুব ধীরে ধীরে।

যেন এক নিমেষে গুঁড়িয়ে গেল বিদ্রূপ ব্রহ্ম। কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল দ্বীপের অপর প্রান্তে। পাগলের মতো মদ্যপান করে বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইল সারারাত।

মদের নেশা মিলিয়ে গেল পরের দিন ভোরে, বিক্ষিপ্তচিত্ত অনেকটা শান্ত হল। ল্যাবোরেটরীতে ফিরে এল বিদ্রূপ। কিন্তু ঘুমোতে পারল না। দিবারাত্র উন্মাদের মতো পরিশ্রম করে চলল—হেঁয়ালীর জট তাকে ছাড়াতেই হবে। শিব গড়তে গিয়ে বানর গড়া চলবে না।

তাই এবার একটা বিজ্ঞানসম্মত চোরা রাস্তা ধরল বিদ্রূপ। তারই অন্যতম কীর্তি—জীবকুলের বিপাককে দ্রুতগতি করে তোলার পথ ধরল। শরীরের যে ক্রিয়ার বলে দেহের সজীব পদার্থ রক্ত থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে—বিপাক নামক সেই ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করল। অ্যালকোহল, কোকা, মরফিন এবং ক্যানাবিস ইন্‌ডিকাকে বিশ্লেষণ করল বিদ্রূপ, উত্তেজক পদার্থগুলো নিষ্কষ করে নিয়ে বিশুদ্ধ রূপ দিল। রক্তের জমাট বাঁধার মূলে যে অক্সালিক অ্যাসিড ছাড়া আর কিছু নেই, এ তথ্যটা অনেক বিশ্লেষণের পর আবিষ্কার করেছিলেন এক বিজ্ঞানী। বিদ্রূপ ব্রহ্মও অনেক বিশ্লেষণ, অনেক পরীক্ষানিরীক্ষার পর আবিষ্কার করল কোন্ মৌল বস্তুটা মানুষের নৈতিক চরিত্রকে নীচু স্তরে নামিয়ে নিয়ে যায়। বিভিন্ন উত্তেজক আর নিদ্রাকর ওষুধের মধ্যে থেকে আলাদা করে ফেলল সেই মৌল বস্তুটি। এই কাণ্ড করতে গিয়ে আর এক কাণ্ড করে বসল বিদ্রূপ। নতুন একটা আবিষ্কার। একটা আশ্চর্য আরক। বিদ্রূপের নিজেরই ভয়ানক দরকার হয়ে পড়েছিল এই আরকের। ঘুম তাড়ানোর আরক। ঘুম একটা সময় নষ্ট করার শারীরিক ক্রিয়া। এ আরক পান করলে শরীরের ক্ষয়ক্ষতি আপনা থেকেই পূরণ হয়ে যায়—ঘুমের দরকার হয় না। এই বিস্ময়কর আবিষ্কারের পর থেকেই এক নাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করে চলল সে।

যে মৌলবস্তুটা আলাদা করেছিল বিদ্রূপ, কৃত্রিম উপায় তার বেশ কিছু বানিয়ে নিল সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায়। অনেকগুলো আজেবাজে উপাদান বাদ দিল কাজ করতে করতে। বিকিরণ আর কম্পনের মূলে যে সূত্র, সেই সূত্রের ভিত্তিতেই গবেষণা চালাল। বর্ণালীর শেষপ্রান্তের অবলোহিত রশ্মিকে শব্দতরঙ্গে কম্পমান একটা বাতাসভর্তি আধারের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে সমবর্তন করার পর আশ্চর্য ফল দেখা গেল। অতি লাল রশ্মিটা ক্ষুদে প্রাণীদের হৃদ্‌ঘাত বিশগুণ বাড়িয়ে তুলল। ক্ষিদে বাড়ল বিশগুণ, খেতেও লাগল বিশগুণ বেশি ; বড় হতে লাগল বিশগুণ বেশি বেগে, এবং মরতেও লাগল তাড়াতাড়ি।

বিদ্রূপ এবার এমন একটা ঘর তৈরি করল যার মধ্যে বাতাস যাতায়াতের পথ রইল না। সে ঘরের ওপরেই তৈরি হল আর একটা ঘর। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এক মাপ—কিন্তু উচ্চতায় কম। এই ঘরটাই হল ওর কন্ট্রোল চেম্বার।

নিচের বিরাট ঘরটাকে চারভাগে ভাগ করল সে। প্রতিটি অংশে চার রকমের তাপমাত্রা আর বায়ুমণ্ডল নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রইল কন্ট্রোল চেম্বারে। প্রতিটি অংশের ওপর রইল ক্ষুদে ক্রেন আর ভার তোলবার স্তম্ভ যন্ত্র। সংক্ষেপে, জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করার যাবতীয় আধুনিক মেশিন। ওপরের ঘর থেকে নিচের ঘরে আসার দরজাও ছিল। সে দরজা অবশ্য মেঝের সঙ্গে মিশোনো। দরজার ফাঁক দিয়ে যাতে বাতাস বেরোতে না পারে, তাই এয়ার লক লাগানো।

এরই মাঝে অন্য ল্যাবরেটরীতে একটা অদ্ভুত প্রাণীর সৃষ্টি করল বিদ্রূপ। সে প্রাণীর রক্ত উষ্ণ, চামড়া সাপের মতো, আর পা চারটে। জীবনচক্র আশ্চর্যরকমের দ্রুত। আয়ুষ্কাল মাত্র পনেরো দিনের।

প্রাণীটা ডিম্বজ। স্তন্যপায়ী। গর্ভধারণের মেয়াদ মাত্র ছ'ঘন্টা। তিন ঘণ্টাতেই সম্পূর্ণ হত ডিমে তা দেওয়া। চারদিনেই যৌনক্ষমতা অর্জন করত তরুণ তরুণীরা। মেয়েরা প্রত্যেকে ডিম পাড়ত চারটে। তা দেওয়ার পর বাচ্ছাগুলো বড় না হওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকত। পুরুষরা যৌনমিলনের দু-তিন ঘণ্টা পরেই মারা
যেত।

কিম্ভুতকিমাকার জীবগুলোকে যে কোনো পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার মতো করে গড়েছিল বিদ্রূপ। গেঁড়ি গুগলির মতো পুঁচকে হলে কি হবে, মস্তিষ্ক জিনিসটা কম ছিল না। লম্বায় খুব জোর তিন ইঞ্চি, উচ্চতায় দু'ইঞ্চি। সামনের থাবাদুটোয় তিনটে করে আঙুল। বুড়ো আঙুলে তিনটে সন্ধি। সে এক বিদিগিচ্ছিরি চেহারা।

প্রচুর অ্যামোনিয়া দিয়ে তৈরি বিশেষ বায়ুমণ্ডলে শ্বাস নিয়ে বাঁচতে শিখেছিল জীবগুলো। এই রকম চারটে সৃষ্টিছাড়া জীবের জন্ম হওয়ার পর বিদ্রূপ তাদের চারটে এয়ার টাইট ঘরে আলাদা আলাদা ভাবে বন্ধ করে রাখল।

এবার শুরু হল মূল গবেষণা। বায়ুমণ্ডল নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা মুঠোয় নিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত এক্সপেরিমেন্ট আরম্ভ করল বিদ্রূপ। তাপমাত্রা, অক্সিজেন আর আর্দ্রতা কখনো কমালো, কখনো বাড়াল। কখনো গাদা গাদা কার্বন ডাই অক্সাইড ছেড়ে মশা-মাছির মতো হাতে গড়া জীবদের হত্যা করল। যারা এই নিধনযজ্ঞের মধ্যে থেকেও টিকে গেল, তার পরবর্তী দু-তিন পুরুষের মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইডের আক্রমণ সহ্য করেও বেঁচে থাকার মতো শারীরিক বাধা তৈরি করে নিলে।

এই বাধা যাতে অঙ্কুর থেকেই বৃদ্ধি পায়, যাতে জীবগুলো যে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে থেকেও টিকে থাকতে পারে, তাই হামেশাই ডিমগুলোকে কখনো এ চেম্বারে, কখনো ও চেম্বারে রাখত বিদ্রূপ। ফলে, নিয়ন্ত্রিত বায়ুমণ্ডলের মধ্যে এবং সৃষ্টিকর্তার খেয়ালে অদ্ভুত শক্তি নিয়ে বিবর্তিত হতে লাগল জীবগুলো। বিবর্তন এগিয়ে চলল কল্পনাতীত দ্রুতগতিতে।

এই থেকেই বিদ্রূপ ব্রহ্ম মূল সমস্যার উত্তর পেল। বিদ্রূপের মন সাধারণ নয়, অসাধারণ। এই অসাধারণ মনে তার একটা অভিলাষই জেগেছিল। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে ত্বরান্বিত করে অনেক কিছুই জানতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। নিজেকেও প্রভঞ্জনের বেগে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। তাই একটা নতুন জাত তৈরি করল বিদ্রূপ। সাধারণ জাত নয়। এ জাত মানুষের চাইতে বহুগুণ বেগে বিবর্তিত হবে, মানুষের চাইতে বহুগুণ বেগে সভ্য হবে, উন্নত হবে, ধীমান হবে—অচিরেই মানুষের অতি-উন্নত সভ্যতাকেও অবহেলে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবে। এবং তখনি বিদ্রূপ ব্রহ্মর শিক্ষা শুরু হবে তাদের কাছে। তারই হাতে গড়া জীবদের কাছে।

নতুন এই জাতকে পুরোপুরি নিজের মুঠোয় রাখল বিদ্রূপ। কোনো দিন যাতে বেয়াড়াপনা করতে না পারে, তাই মরণ-ঘা দিয়ে শেখাল পৃথিবীর স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডল তাদের কাছে বিষবৎ। চার পুরুষ অন্তর হাতেনাতে এই শিক্ষা দিতে লাগল বিদ্রূপ। ফলে, সৃষ্টিকর্তাকে অষ্টরম্ভা দেখিয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করার কোন সম্ভাবনাই আর রইল না। ওদের সৃষ্টি হয়েছে যার ইচ্ছায় বাঁচতেও হবে তার ইচ্ছায়। পুরুষানুক্রমে তারা বেঁচে থাকবে, উন্নতি করবে এবং নিজেরা জ্বলে পুড়ে মরে শত শত এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে উপহার দিয়ে যাবে শতসহস্র বিচিত্র অজানিত তথ্য। মানুষের পক্ষে যা সম্ভব নয়, তাই সম্ভব হবে তাদের পক্ষে। অসম্ভব তাড়াতাড়ি শেষ হবে পরীক্ষার পালা, অবিশ্বাস্য বেগে বৃদ্ধি পাবে বিদ্রূপ ব্রহ্মর জ্ঞানভাণ্ডার। মানুষকে তারা অনায়াসেই টেক্কা মারবে, কেননা প্রতিভাধর বিদ্রূপ ব্রহ্ম তাদের পথপ্রদর্শক।

তাই যা কোনোদিন সম্ভব হয়নি, তা সম্ভব হল বিদ্রূপের বিজন দ্বীপের ল্যাবরেটরীতে। বিজ্ঞানকে জানতে মানুষ ছ'হাজার বছর সময় নিয়েছে; বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে সময় লেগেছে তিনশ বছর। কিন্তু বিদ্রূপের জীবকুল মাত্র দুশ দিনের মধ্যে মানুষের মনের নাগাল ধরে ফেলল। তারপর থেকেই লাফিয়ে এগিয়ে চলল ওদের সভ্যতা। অচিরেই বিদ্রূপ ব্রহ্মর কীর্তিকলাপের তুলনায় টম এডিসনের মতো বিরাট প্রতিভাও ম্লান হয়ে গেল।

বিদ্রূপ এই নতুন জাতের নাম দিল নিওটেরিকস্। ওদের জ্বালাতন করল নিত্য নব উপায়ে। শেখাল, তাদের বাঁচার অধিকার শুধু কাজের জন্য। এবং সে কাজ কেবল মাত্র বিদ্রূপ ব্রহ্মর জন্য।

বিদ্রূপ আবিষ্কার করত অনেকটা আদর্শের তাগিদে। অর্থাৎ অনেক কিছু সম্ভবপর সম্ভাবনা কল্পনা করত। কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্যে নিজেকে কিন্তু বিন্দুমাত্র খাটতে হত না।

উদাহরণ দেওয়া যাক। বিদ্রূপের মনে কৌতূহল দেখা গেল, বহুরন্ধ্র বস্তু দিয়ে মাথা গোঁজার মত আচ্ছাদন তৈরি করা কি সম্ভব? ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে নিওটোরিকসদের এই নিয়ে মাথা ঘামাতে হল। একটা ঘরে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি সৃষ্টি করল বিদ্রূপ। কোনো পুরুষে এরকম ঝড়বৃষ্টির সম্মুখীন হয়নি নিওটেরিকস্-রা! তাই বিদ্রূপ ইচ্ছে করেই একটা আচ্ছাদনের চাহিদা ওদের মধ্যে জাগ্রত করল। সেই সঙ্গে কিছু পাতলা ওয়াটারপ্রুফ বস্তু

এক কোণে গাদা করে রাখল। নিওটেরিক্সরা দ্রুত মাথা খাটিয়ে তাই দিয়ে মাথা গোঁজবার ঠাঁই বানিয়ে নিল।

তৎক্ষণাৎ কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা দিয়ে পলকা ছাউনিগুলো উড়িয়ে নিয়ে গেল বিদ্রূপ। নিওটেরিক্সরা চটপট আবার ছাউনি গড়ে নিলে এবার আরও মজবুতভাবে—যাতে যুগপৎ বাতাস আর বৃষ্টিকে ঠেকাতে পারে।

ধাঁ করে তাপমাত্রা নামিয়ে আনল বিদ্রূপ। এত তাড়াতাড়ি যে নিওটেরিক্সরা
সেই হিমবাতাসের সঙ্গে দেহের তাপমাত্রাকে সইয়ে নিতে পারল না। তাই তুরন্ত ছোট ছোট ধাতুর পাত্রে অঙ্গার রেখে ঘর গরম করে নিল।

বিদ্রূপ তাই দেখে চট করে তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিল। সাহারার মরুভূমির মতো গরম হলকা ছেড়ে দিল। কিছু নিওটেরিক্স গরম সইতে না পেরে হাঁসফাঁস করতে করতে অক্কা পেল। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই একটা চালাক ছেলে বুদ্ধি বাতলালো। ঝটপট আবিষ্কার করল গরম আটকানোর পন্থা। অনেকটা রবারের মতো তিন-স্তরের একটা নয়া বস্তু দিয়ে বাড়ী বানিয়ে নিল। তিনস্তরের মাঝের স্তরটির মধ্যে রইল লক্ষ লক্ষ পুঁচকে গহ্বর যার মধ্যেকার বাতাস বাইরের গরমকে শুষে নিল—ভেতরে যেতে দিল না। বিদ্রূপ ব্রহ্মর কল্পনা বাস্তব রূপ নিল। সফল হল এক্সপেরিমেন্ট।

বিদ্রূপের বিবিধ কৌশলের এই গেল দু একটা নমুনা। এই ভাবে নানা রকম কায়দায় নিওটেরিক্সদের রীতিমতো উন্নত, সুসভ্য জাতিতে পরিণত করল বিদ্রূপ। তাদের কৃষ্টি, তাদের সংস্কৃতির মান এত ওপরে উঠে গেল যে ধারণাও করা যায় না। একবার একটা অংশে অনাবৃষ্টি সৃষ্টি করল বিদ্রূপ, আরেক অংশে অতিবৃষ্টি। তারপর তুলে দিলে মাঝের পার্টিসন। ফলে, কুরুক্ষেত্রের লড়াই লেগে গেল দুদলে। আর দেখতে দেখতে যুদ্ধ সম্পর্কিত বহুবিধ তথ্যে ভরে উঠল বিদ্রূপের নোটবই। রকমারি অস্ত্র আর নতুন নতুন রণনীতির বিস্তারিত ব্যাখ্যায় একটা নয়, কয়েকটা নোটবই বোঝাই হয়ে গেল।

তারপর ধরুন সর্দির টিকা। আজ সারা পৃথিবী থেকে সর্দি জিনিসটা একদম মুছে গেছে কেন জানেন? বলা বাহুল্য বিদ্রূপের জন্য। নিওটেরিক্সরা অতি অল্প সময়ে সর্দির মোক্ষম টিকা আবিষ্কার করল। বিদ্রূপের নোটবইতে উঠে গেল ফরমুলাটা। তারপরেই একদিন শীতের রাতে ব্যাংক চেয়ারম্যান ধুন্ধুমার সাহা ফোন করল বিদ্রূপ ব্রহ্মকে। ভদ্রলোকের ঠাণ্ডা লেগে গলা বসে গেছিল। সর্দিতে নাক বুঁজে গেছিল। ফলে, রেডিও ফোনে ধুন্ধুমার সাহার ভাঙা-ভাঙা বিকট চিৎকার শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে গেল বিদ্রূপ। তক্ষুনি এক শিশি সর্দির টিকা পাঠিয়ে দিল ব্যাংকে। সেই সঙ্গে বলে দিল, এরকম যাচ্ছেতাই রকমের ধরা গলা নিয়ে যেন ভবিষ্যতে আর ফোন করা না হয়। ধুরন্ধর ধুন্ধুমার শিশিভর্তি আজব দাওয়াই বিশ্লেষণ করে ফরমুলাটা বার করে নিল। ফলে, বিদ্রূপ ব্রহ্মর তহবিল থুড়ি—ব্যাঙ্কের তহবিল আর এক দফা ফুলে উঠল।

প্রথম প্রথম নিওটেরিক্সদের যা যা দরকার, সবই দিত বিদ্রূপ। কিন্তু অচিরেই মৌলিক পদার্থ থেকে দরকার মতো জিনিস বানিয়ে নেওয়ার মতো ধীশক্তি ওদের মধ্যে জাগ্রত হল। তখন থেকে প্রতিটি অংশে কাঁচা মাল দেওয়া
শুরু করল বিদ্রূপ।

সত্যিকারের শক্ত অ্যালুমিনিয়াম তৈরির প্রক্রিয়া জানা গেল এই ভাবেঃ একটা অংশে বিশাল চোঙার মতো পিস্টন বসালো বিদ্রূপ। চার দেওয়াল জুড়ে সেই পিস্টন দিনে চার ইঞ্চি হিসেবে নিচের দিকে নামতে লাগল। পরিণাম যে কি সাংঘাতিক তা কল্পনা করা যায়। পিস্টন যখন মেঝে ছোঁবে তখন ঘরের প্রতিটি নিওটেরিক্সকে মেঝের সঙ্গে পিষে যেতে হবে।

নিওরেটিক্সরা বুদ্ধিমান জীব। তারা বুঝল, চটপট উপায় না বাতলালে মরণ সুনিশ্চিত। হাতের কাছে যতরকম শক্ত ধাতু পাওয়া যায়, তাই দিয়ে মৃত্যুকে ঠেকানোর চেষ্টা করল। কিন্তু বিদ্রূপ সে পথ মেরে রেখেছিল। আগে থেকেই ঘরের কোণে বেশ কিছু অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড আর কিছু মৌলিক পদার্থ ছড়িয়ে রেখেছিল। সেই সঙ্গে রেখেছিল প্রচুর বিদ্যুৎ শক্তি।

প্রথম প্রথম ডজন ডজন অ্যালুমিনিয়ামের থাম তৈরি করল নিওটেরিক্সরা। কিন্তু পিস্টনের চাপে যখন সে-সব থাম দুমড়ে তালগোল পাকিয়ে গেল, তখন সেগুলো গালিয়ে অন্য আকার দিল। তাতেও যখন পিস্টনের নিম্নগতি রোধ করা গেল না, তখন চটপট আরও শক্ত থাম বানিয়ে নিল। অবশেষে ঠেকানো গেল পিস্টনকে। বিদ্রূপ একটা থাম বার করে আনল। বিশ্লেষণ করল। পাওয়া গেল সুকঠিন অ্যালুমিনিয়াম। মলিবড্ ইস্পাতের চাইতেও কঠিন।

বিদ্রূপ ঠেকে শিখেছিল, নিওটেরিক্সরা অতি-উদ্ভাবনী হয়ে ওঠার আগেই নিজের শক্তিও খানিকটা বাড়িয়ে নেওয়া দরকার। অর্থাৎ যে শক্তি দিয়ে নিওটেরিক্সদের তাঁবেদার রাখা হয়েছে, সে শক্তিকে ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পেতে হবে। পারমাণবিক শক্তি দিয়ে অনেক কিছু করার সুযোগ ছিল। এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের কৌতূহলও ছিল তার। তা সত্ত্বেও অতি শক্তিমান ক্ষুদে বৈজ্ঞানিকদের ওপর ভরসা রাখতে পারে নি। যদ্দিন না হয়েল সাহেবের মতো পারমাণবিক শক্তিকে বাগে আনতে পরছে, তদ্দিন ও-পথ না মাড়ানোই শ্রেয়।

তাই, দারুণ আতংক সৃষ্টি করে নিওটেরিক্সদের শাসন করতে লাগল সে। যা তার অভিপ্রেত নয়, সে রকম কিছু করার লক্ষণ দেখা গেলেই নেমে আসত মৃত্যুদণ্ড। সে যা চাইছে, তার বাইরে গেলেই খতম করে দিত আদ্দেক জাতকে।

যেমন ধরুন, বিদ্রূপের ইচ্ছে নতুন ধরনের একটা যন্ত্র তৈরি করা। ফ্লাইহুইল স্টার্টার ছাড়াই চালু করা যাবে যন্ত্রটাকে। কিন্তু অতি বুদ্ধিমান কোনো নিওটেরিক্স তরুণ যদি সেই মালমশলা দিয়ে বাড়ীঘরদোর তৈরি করার মতলব আঁটে, সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলা হয় অর্ধেক বাসিন্দাদের।

ওদের একটা ভাষাও ছিল। লিখিত ভাষা। সে ভাষা অবশ্য বিদ্রূপের নিজের আবিষ্কৃত ভাষা। প্রতি ঘরের এক কোণে একটা কাঁচ-ঘর ছিল। ভেতরে ছিল টেলিটাইপ। টেলিটাইপ মারফৎ বিদ্রূপ যে নির্দেশই পাঠাক না কেন, তা মানতে হবে। অমোঘ সে নির্দেশ না মেনে নিস্তার ছিল না। তাই কাঁচ-ঘরটা নিওটেরিক্সদের কাছে মন্দির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। টেলিটাইপকে মনে করত দৈববাণীর যন্ত্র।

এই কায়দার পর বিদ্রূপের কাজ অনেক সহজ হয়ে উঠল। একটু বেচাল দেখলেই যেখানে নির্মম শাস্তির বিধান, সেখানে তার হুকুম টেলিটাইপে ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু হয়ে যেত। হুকুম যত অসম্ভবই হোক না কেন, তিন চার পুরুষের মধ্যে নিওটেরিক্সরা সে হুকুম তামিল করত এবং সমাধান বিদ্রূপ ব্রহ্মর হাতে তুলে দিত।

বিদ্রূপের অনেকগুলো হাইস্পীড টেলিস্কোপ লাগানো ক্যামেরা ছিল। এই ক্যামেরায় একদিন একটা ঘোষণাপত্রের ছবি উঠল। তরুণ নিওটেরিক গোষ্ঠীর হাতে হাতে বিলি হচ্ছিল ঘোষণা পত্রটা। ঘোষণার কিছু অংশ নিচে তুলে দিলাম। উদ্ধৃতিটা অবশ্য নিওটেরিক্সদের অত্যন্ত সহজ সরল ভাষা থেকে অনুবাদ করা।

"এ নির্দেশ আইনের নির্দেশ। প্রত্যেক নিওটেরিক্সকে এ নির্দেশ তামিল করতে হবে। অন্যথায় তাকে মৃত্যুদণ্ড পেতে হবে। জাতির স্বার্থে ব্যক্তি বিশেষকে এই চরম শাস্তি পেতেই হবে। ব্যক্তি বিশেষের আইন অমান্য মানেই সমগ্র জাতির ওপর চরম পিতার রুদ্ররোষ নেমে আসে। সুতরাং মৃত্যুদণ্ডই তার প্রাপ্য।

শব্দ যন্ত্রে যে হুকুম ফুটে উঠবে, জাতির সবাইকে সে হুকুম সর্ব্বাগ্রে তামিল করতে হবে।

শব্দ যন্ত্রে আদেশের আওতার বাইরে কিছু করা চলবে না। তাঁর বিনা আদেশে দেশের কোনো সম্পদ বা শক্তির অপচয় করা চলবে না। অন্যথা ঘটলেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

নতুন কোনো সমস্যা সম্পর্কে যা কিছু জানা যাবে, অথবা নতুন কোনো আইডিয়া বা এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল—কেউ নিজের স্বার্থে গোপন করতে পারবে না। গবেষণা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি জাতির সম্পত্তি।

এ নির্দেশ যে অমান্য করবে, দেশের সঙ্গে যে অসহযোগিতা করবে, কাজে যে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ না করবে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। এমন কি উপরোক্ত বেআইনী কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে তাকে মৃত্যুদণ্ড পেতে হবে।"

বিদ্রূপ ব্রহ্মর কড়া শাসনের এই হল ফল। ঘোষণাপত্র পড়ে বিদ্রূপ নিজেই অভিভূত হয়ে গেছিল। কারণ, এ আইন স্বতঃস্ফূর্ত। নিওটেরিক্সদের নিজেদের ধর্মবিশ্বাস, পরম পিতার প্রতি ভীতি ও শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে ঘোষণার প্রতি ছত্রে। সমগ্র জাতির কল্যাণ কামনায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তারা রচনা করেছে ধর্মসূত্র।

বিদ্রূপ ব্রহ্মর অভিলাষ অবশেষে এই ভাবেই পূর্ণ হল। দোতলায় ছোট্ট ঘরে ঘাড় গুঁজে এ টেলিস্কোপ থেকে সে টেলিস্কোপে ছুটত সে, কখনো হাইস্পীড ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবিগুলোকে ধীরগতি করে দেখত হাতে গড়া জীবকূলের কীর্তিকলাপ। দেখত, শিখত আর লিখে রাখত। অচিরেই এক প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন তথ্য সরবরাহ দুনিয়োর একছত্র অধিপতি হয়ে উঠল সে। সে-দুনিয়ার যাবতীয় কার্যকলাপ রইল নখদর্পণে।

বিশাল চৌকোনা সেই ভবনের মধ্যে মানুষের হাতে গড়া জীবকুলের সভ্যতা মানুষকে ছাড়িয়ে অনেক এগিয়ে গেল। চার অংশে পার্টিসন করা প্রকাণ্ড ঘরটার এক-একটা অংশের বিস্তার প্রায় দেড়বিঘে জমির উপর। কাজেই মোট ছ-বিঘে জমির ওপর গড়ে ওঠা সম্পূর্ণ নতুন জগতের বাসিন্দাদের কাছে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা হয়ে রইল বিদ্রূপ ব্রহ্ম।

চেয়ারম্যান ধুন্ধুমার সাহার মনের গতি একদিক দিয়ে বিদ্রূপ ব্রক্ষর মতোই। কোনো সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে খামোকা ঘুরিয়ে নাক দেখানোর পক্ষপাতী নয়। শর্টকাট করে ধুন্ধুমার সাহা। চটপট ভেবে নেয় কি করা উচিত। প্রতিবন্ধক নিয়ে মাথা ঘামায় না।

ব্যাংকের চেয়ারম্যান এইভাবেই হয়েছিল ধুন্ধুমার। ইতিহাস রচনা করেছিল। নির্মম কূটনীতির ইতিহাস! প্রতিবন্ধক ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, কাতারে কাতারে প্রতিপক্ষ অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাতে কী! ধুন্ধুমার যা চেয়েছে তা পেয়েছে।

চৌকস সেনাপতি যেমন শুধু স্রেফ গায়ের জোরে শত্রুকে ঘায়েল করে না, বুদ্ধি খাটায়। কাঁচি প্যাঁচ মেরে এমনভাবে অসহায় করে দেয় শত্রুকে যে আর জীবনে মাথা তুলতে হয় না! তা করতে গিয়ে দু'চারটে নিরীহ দর্শক অবশ্য সাবাড় হয়। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামালে চলে কী?

যেমন ধরুন না কেন, হংসরাজ নামে একটা লোকের তিনহাজার বিঘে জমি কিনে নিল ধুন্ধুমার। কিন্তু তবুও মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। কেন না, শুধু জমির মালিক হলেই তো হল না, জমিটাকে ভোগ করা চাই। অথচ হংসরাজ লোকটা একটা গোটা এয়ারপোর্টের মালিক। টাকার কুমীর। বাবাও বর্তমান। সুতরাং, প্রচুর শক্তি প্রয়োগ করেও যখন হংসরাজকে বিচলিত করা গেল না, তখন নিরুপায় ধুন্ধুমার অন্য পথ অবলম্বন করল। অর্থাৎ শহরের কেষ্টবিষ্ণুদের এন্তার টাকা খাইয়ে এয়ারপোর্টের ঠিক মাঝখান দিয়ে একটা নর্দমা খুঁড়িয়ে নিল। ফলে, লাটে উঠল এয়ারপোর্টের ব্যবসা! ধুন্ধুমার জানত, হংসরাজ সহজে ছাড়বে না। প্রতিশোধ নেবেই। তাই সে পথও বন্ধ করতে হল। অর্থাৎ হংসরাজ যে বাংকে টাকা রাখত, অনেক তদ্বির তদারক করে, মুড়ি মুড়কির মতো টাকা ছড়িয়ে, সে ব্যাংকে লালবাতি জ্বালাল। রাতারাতি রাস্তার ফকির হল হংসরাজ, পাগলা গারদে গেল এবং সেইখান থেকেই রওনা হল পরলোকে। ধুন্ধুমার সাহা তাই শুনে গোঁফে তা দিতে দিতে ভাবল, আহারে, কি চালই চেলেছিলাম! এক চালেই কিস্তিমাৎ—রাস্তা সাফ!

একদল লোক আছে যারা অর্থ আর ক্ষমতার পেছনে ধাওয়া করার সর্বনাশা লোভ জীবন গেলেও ছাড়তে পারে না। ধুন্ধুমার সাহা সেই জাতীয় ব্যক্তি। টাকা তার বিস্তর আছে, সেই সাথে আছে ক্ষমতা। দুটোই এসেছে ব্যাংক থেকে। কিন্তু তবুও তৃপ্তি নেই ধুন্ধুমারের। ধুন্ধুমারের কাছে টাকা যতখানি, বিদ্রূপের কাছে জ্ঞান ততখানি। ধুন্ধুমারের কাছে তার পিরামিডসদৃশ কারবার যতখানি, বিদ্রূপের কাছে নিওটেরিক্সরা ততখানি। প্রত্যেকেই নিজের নিজের প্রাইভেট দুনিয়া গড়ে নিয়েছে এবং মায়ায় জড়িয়ে পড়েছে। প্রত্যেকেই নিজের সেই প্রাইভেট দুনিয়াকে রেখেছে কেবল নিজের হুকুম তামিলের জন্য, আরো লাভের জন্য। দুজনের মধ্যে বিদ্রূপকে বেশি নিষ্ঠুর বলা যায়। কারণ সে নিওটেরিক্সদের পুরুষানুক্রমে জ্বালিয়ে মারত, এক মুহূর্তও তিষ্ঠোতে দিত না। সে তুলনায়, ধুন্ধুমার অতটা নির্দয় ছিল না। কারণ, ধুন্ধুমার বিলক্ষণ ধূর্ত। সে জানত, মানুষকে তোয়াজ করার মূল্য কতখানি। তোয়াজ না করে দীর্ঘদিন ঘরে লুঠ চালিয়ে যাওয়া কোনো লুঠেরার পক্ষেই সম্ভব নয়। যাকে লুঠ করতে হবে, তার মন যোগাতেও হবে। কাজটা কঠিন সন্দেহ নেই। উঁচুদরের আর্ট। কিন্তু একবার যদি এ আর্টে আর্টিস্ট হওয়া যায়, তাহলেই কেল্লাফতে।

ধুন্ধুমারের প্রধান ভয় ছিল বিদ্রূপকে নিয়ে। বিদ্রূপ যদি কোনোদিন বিশ্বঘটনাপ্রবাহ নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করে, তাহলেই ক্ষমতার নেশা কোকেনের নেশার মতো পেয়ে বসবে। বিদ্রূপের শক্তির তো সীমা নেই। এ তথ্য সারা বিশ্বে ধুন্ধুমার সাহা ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি জানে না—বিদ্রূপ ব্রহ্ম নিজেও জানে না নিজের শক্তির পরিমাণ। যে কোনো ইলেকশনে জিতে যাওয়া বিদ্রূপের কাছে বিছানায় শুয়ে পাশ ফেরার মতো সহজ ব্যাপার। কাজেই ধুন্ধুমারের প্রধান কাজ ছিল তখন বিদ্রূপের সঙ্গে রেডিওফোনে যোগাযোগ করা আর খোঁজ নেওয়া হাতে তার কোন কাজ আছে কি না। হাতের কাজ মানেই মাথার কাজ। মাথার কাজে বিদ্রূপকে ব্যাপৃত রাখা মানেই কয়েক হপ্তা নিশ্চিন্ত থাকা। তাই, মাঝে সাঝে এমন একটা বিদঘুটে সমস্যা নিয়ে বিদ্রূপকে চ্যালেঞ্জ করত ধুন্ধুমার যে ক্ষেপে গিয়ে তাই নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিত আত্মভোলা বৈজ্ঞানিক। এই কৌশলেই "লাইট পাম্পের" ফরমুলা জেনেছিল ধুন্ধুমার। অসম্ভব কল্পনা সফল হয়েছিল।

একদিন বিকেলে রেডিওফোনের সিগন্যাল শুনে গজ গজ করে উঠল বিদ্রূপ। সদ্য তোলা মুভি ফিল্মটার পর্দায় প্রক্ষেপণ বন্ধ করে এল পুরানো ল্যাবরেটরীতে। রেডিওফোনের সামনে গিয়ে সুইচ টিপতেই বন্ধ হল ক্যাঁ-ক্যাঁ শব্দটা।

"কি খবর?"

"হ্যালো, বিদ্রূপ নাকি?" বলল ধুন্ধুমার। "ব্যস্ত?"

"সামান্য," জবাব দিল বিদ্রূপ। মেজাজ তখন বিলকুল শরীফ। কারণ মুভি ক্যামেরায় তোলা ফিল্মে এইমাত্র দেখে এসেছে নিওটেরিক্সদের এক আশ্চর্য কীর্তি। স্রেফ গন্ধক থেকে সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় রবার বানিয়েছে কয়েকটা ছোঁড়া। খবরটা ধুন্ধুমারকে দিলে ভাল হত। কিন্তু প্রথম থেকেই যখন নিওটেরিক্স সম্পর্কে ওকে কিছু জানানো হয় নি, তখন কেঁচে গণ্ডুষ করে লাভ নেই।

ধুন্ধুমার বলল—"বিদ্রূপ, সেদিন ক্লাবে গুলতানি করতে করতে কতকগুলো আবোলতাবোল কথা শুনলাম।"

"কী কথা?"

"বলি দেশের খবর-টবর রাখো? যত 'পাওয়ার' এদেশে দরকার, তার তিরিশ পার্সেন্ট অ্যাটমিক, বাকীটা ডিজেল, ষ্টিম আর হাইড্রোইলেকট্রিক প্লান্ট থেকে আসছে জানো তো?"

"না তো।" কথাটা সত্যি। কারণ, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে শিশুর মতোই অজ্ঞ ছিল বিদ্রূপ।

"তবে শোনো। আলোচনা চলছিল নতুন পাওয়ার তৈরি করা যায় কি ভাবে। সে পাওয়ার অ্যাটমিক পাওয়ারের মতো প্রচণ্ড শক্তিশালী হবে, অথচ খরচ কম পড়বে। যেখানে খুশী নিয়ে যাওয়া যাবে। এমন কি ব্যাটারীর মতো দোকানে দোকানে বিক্রীও করা যাবে। বুঝেছো ব্যাপারটা? গাঁজার দমের একটা সীমা থাকা উচিত।"

"অসম্ভব কিছু নয়।"

"বলো কি হে?"

"চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

"খবর-টবর দিও।" বলে ট্রান্সমিটার বন্ধ করল ধুন্ধুমার। অন্তত ধুন্ধুমার তাই মনে করল। কেননা, ধোঁকা সুইচটা ধুন্ধুমারকে না জানিয়েই ট্রান্সমিটারের ভেতরে বানিয়ে রেখেছিল বিদ্রূপ। ট্রান্সমিটার চালু হত ধুন্ধুমারের দেহতরংগে, বন্ধ হত সামনে থেকে সরে গেলে। তাই, খট করে সুইচ বন্ধ করার শব্দ শোনার পরেই বিদ্রূপ শুনল বিড়বিড় করে বলছে ধুন্ধুমার—"সম্ভব যদি হয়, তাহলে আর আমায় পায় কে। সম্ভব নাও যদি হয়, নিরেট গর্দভটাকে আরো কিছুদিন দ্বীপে আটকে রাখা—"

চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ রেডিওফোনের দিকে তাকিয়ে রইল বিদ্রূপ। পাওয়ার-প্ল্যান্ট-টা যে ধুন্ধুমারের উর্বর মগজের কল্পনা, তা সরল মনে ভাবতেও পারল না। কিন্তু এইটুকু বুঝলো যে ধুন্ধুমারের মাথায় কিছু একটা ঘুরছে। ঘুরলো তো বয়ে গেল। অত ভেবে লাভ কী? কারও খেয়েদেয়ে কাজ নেই আসবে বিদ্রূপকে জ্বালাতে! বিদ্রাপ নিজেই যখন কারও সাতে পাঁচে নেই।

তাই, 'ধুত্তোর' বলে নিওটেরিক্সদের ভুবনে ফিরে গেল বিদ্রূপ ব্রহ্ম। মাথার মধ্যে গজ গজ করতে লাগল নতুন 'পাওয়ার' তৈরির আইডিয়া।

ঠিক এগারো দিন পরে বিদ্রূপ ব্রহ্ম ডাক দিল ধুন্ধুমার সাহাকে। রিসিভারে দু-একটা বাড়তি জিনিস লাগাতে বললে। তাহলেই নাকি শুধু বিদ্রূপের কথা নয়, তার লেখাও শূন্যপথে পাঠানো যাবে।

নির্দেশমত টুকিটাকি জিনিস লাগাবার পর খবর দেওয়া হল বিদ্রূপকে! এবং সেই প্রথম অনেকক্ষণ ধরে বকবক করল বিদ্রূপ।

বলল—"ধুন্ধুমার, সেদিন এমন একটা 'পাওয়ার' তৈরির কথা বলছিলে যা অ্যাটমিক পাওয়ারের মতো শক্তিশালী হবে অথচ দামে সস্তা হবে, যেখানে খুশী নিয়ে যাওয়া যাবে। তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"এইমাত্র একটা জেনারেটর বসালাম। ছোট্ট জেনারেটর। কিন্তু দারুণ ইন্টারেষ্টিং—অন্তত তোমার কাছে।"

"কী রকম?"

"ধুন্ধুমার, অবিশ্বাস্য রকমের শক্তি সৃষ্টির ক্ষমতা এ জেনারেটরের আছে। অ্যাটমিক পাওয়ার কিছুই নয় এ পাওয়ারের কাছে। এ শক্তি বেতার শক্তির মতোই শূন্যপথে ধাওয়া করে। জিনিসটা আসলে এক রকমের রশ্মি। সূক্ষ্ম কিন্তু ভারি সুন্দর। নাও, ধরো দিকি," বলে, একটা কাগজ ট্রান্সমিটারের নিচে ঢুকিয়ে দিল বিদ্রূপ। সঙ্গে সঙ্গে ধুন্ধুমারের রিসিভারে পৌঁছে গেল কাগজে আঁকা নক্সা। "পাওয়ার রিসিভারের নক্সা পাঠালাম। রেখে দিও। এবার শোনো। রশ্মিটা দারুণ সূক্ষ্ম, অথচ ভয়ানক তীব্র। যে দিকে পাঠানো যায়, সেই দিকেই ছোটে—অথচ দুহাজার মাইলের মধ্যে পাওয়ারের শতকরা এক ভাগের তিন হাজার ভাগের এক ভাগও নষ্ট হয় না। 'পাওয়ার' পদ্ধতি গড়াই হয়েছে সেইভাবে। অর্থাৎ রশ্মির এতটুকুর অপচয় ঘটলেই ট্রান্সমিটারে সিগন্যাল পৌঁছোয়। আপনা হতেই তখন 'পাওয়ার' উৎপাদন বেড়ে যায়। এ শক্তির সীমা একটা আছে নিশ্চয়, কিন্তু এখনো তার হদিশ আমি পাই নি। আমার যন্ত্রটা দেখতে ছোট বটে, কিন্তু এই ক্ষুদে যন্ত্র থেকেই আট

রকমের রশ্মি পাঠানো যায়। প্রতি রশ্মি পিছু প্রতি মিনিটে যে 'পাওয়ার' লাগে, পরিমাণে তা কমবেশি আট হাজার হর্সপাওয়ার। প্রত্যেকটা রশ্মি থেকে তুমি যা 'পাওয়ার' পাবে, তা দিয়ে বইয়ের পাতা ওলটানো থেকে আরম্ভ করে সুপার স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার প্লেন পর্যন্ত ওড়ানো যাবে। আরে থামো, থামো—এখনো শেষ হয় নি আমার। আগেই বলেছি, প্রত্যেক রশ্মি সিগন্যাল পাঠায় রিসিভার থেকে ট্রান্সমিটারে। ফলে, পাওয়ারের উৎপাদন কন্ট্রোল করা ছাড়াও আর একটা কাজ হয়। রশ্মিটা রিসিভারের সঙ্গে লেগে থাকে। একবার যোগাযোগ হলেই হল, রিসিভার যেখানে যাবে, রশ্মিও সেখানে যাবে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যে কোনো যন্ত্রযানকে তুমি কন্ট্রোল করতে পারবে এই রশ্মি দিয়ে। যে কোনো প্লান্টকে পাওয়ার সরবরাহ করতে পারবে ঘরে বসে। পছন্দ হয়?"

ধুন্ধুমার সাহা বিজ্ঞানী নয়, ব্যাঙ্কার। তাই হাতের উল্টো দিক দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল—"বাজে জিনিস তো কোনো দিন আমাকে দাও নি, বিদ্রূপ। তাই বলছিলাম, জিনিসটার খরচ কত?"

"প্রচুর," ঝটিতি জবাব দিল বিদ্রূপ "অ্যাটমিক প্লান্টে যা খরচ তাই। কিন্তু আর কোনো খরচ নেই। হাইটেনসন লাইন নেই, তার নেই, পাইপলাইন নেই। অর্থাৎ বাদবাকী খরচ শূন্য। রিসিভারের নক্সা তো পেয়েছো। তৈরি হলে দেখবে রেডিও সেটের মতো হাল্কা, ছোট্ট। ট্রান্সমিটারটা অবশ্য একটা জটিল ব্যাপার।"

"খুব চটপট কাজ সেরেছো দেখছি।"

"তা সেরেছি," সংক্ষেপে বলল বিদ্রূপ। বারোশো অতি উন্নত সুসভ্য প্রাণীর সারা জীবনের সাধনার ফল যে এই রশ্মি তা চেপে গেল। বলল "একটা মডেল ট্রান্সমিটার গড়েছি।"

ধুন্ধুমারের শিরদাঁড়া সিধে হয়ে গেল—"মডেল? পাওয়ার তৈরির মডেল? কত পাওয়ারের?"

"যাট হাজার হর্সপাওয়ারের সামান্য বেশি," খুশী-খুশী স্বর বিদ্রূপের।

'সর্বনাশ! মডেলই যদি এই হয় তো... বড় আকারের প্লান্টে তো... মাই গড! একখানা ট্রান্সমিটার দিয়েই—" সম্ভাবনাটা কল্পনা করে বাকরহিত হল ধুন্ধুমার। কিছুক্ষণ পরে শুধোলো—"জ্বালানি কী?"

"কিছু না। আমি এমন একটা শক্তির সন্ধান পেয়েছি, যার শেষ নেই, যা কল্পনা করা যায় না। এ শক্তি অসীম। তাই, প্রচণ্ড। এত প্রচণ্ড যে অপব্যবহার করা সম্ভব নয়। কারোর পক্ষেই নয়। তোমার পক্ষেও নয়।"

"কী? কী বললে?"

ভুরু তুললো বিদ্রূপ। ধুন্ধুমারের পেটে নিশ্চয় কিছু শয়তানি আছে। এই নিয়ে দুবার তার ইঙ্গিত পাওয়া গেল। তাই বিদ্রূপ ব্রহ্মর মতো সাদাসিধে মানুষ, সন্দেহ জিনিসটা যাকে মোটেই মানায় না, তাকেও হুঁশিয়ার হতে হল।

বলল—"যা বলেছি, তুমি শুনেছে। আমাকে বেশি বোঝাবার চেষ্টা কোরো না। এ শক্তি মহাজাগতিক শক্তি। এ শক্তি সৃষ্টির আদিতে ছিল। আছে, থাকবে। এ শক্তিই সূর্য তৈরি করে, অ্যাটম চূর্ণ করে। এই শক্তিই গড়ে ভাঙে। এই শক্তি সাইরাস অর্থাৎ লুব্ধক নক্ষত্রের

সঙ্গীদেরও ধ্বংস করেছে। এ শক্তি নিয়ে ছেলেখেলা করা যায় না। এ শক্তির সঙ্গে চালাকি চলে না।”

“আমি চালাকি করি না, ছেলেখেলা করি না—” বিমূঢ় কণ্ঠ ধুন্ধুমারের।

“উদাহরণ দিচ্ছি, শুনে নাও। ধরো, দুটো কাঠিকে ডগায় ডগায় ঠেকিয়ে ঠেলছো। যতক্ষণ ঠেলাটা এক লাইনে হচ্ছে, কিছুই হবে না। কিন্তু জোড়ের জায়গায় আঙুল দিয়ে কেউ ঠেলা দিলেই বিপর্যয় ঘটছে। অর্থাৎ দুটো সমান শক্তি মুখোমুখি থেকে ভারসাম্য বজায় রাখছে। তৃতীয় শক্তিটা পরিমাণে নগণ্য হলেও কাজ করছে জোড়ের মুখে—সমকোণে। তখন দুটো শক্তিই এক সঙ্গে মিশে যাচ্ছে তৃতীয় শক্তির সঙ্গে। ফলে, যে প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব ঘটছে, তাইতেই তোমার আঙুলে গাঁটে গাঁটে ঠোকাঠুকি লাগছে। ধুন্ধুমার, এ ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র চলছে এই সমান শক্তির খেলা। ভারসাম্য আছে বলেই প্রলয় ঘটছে না। ভারসাম্য নষ্ট করার রহস্য যে জেনেছে, প্রলয় সৃষ্টি করার কৌশল সে জেনেছে। সে কৌশলও আমি জেনেছি।”

“তাই নাকি,” পুরো চার সেকেণ্ড লাগল ধুন্ধুমারের একটা ঢোঁক গিলতে। তারপর বলল—“কৌশল জেনে আমার দরকার নেই ব্রহ্ম, আমার দরকার একটা ফুল-সাইজ ট্রান্সমিটার।”

রেডিওফোনে বিদ্রূপের খুক-খুক হাসি শোনো গেল—“তোমার উচ্চাশার শেষ নেই দেখছি। এখানে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। চার পাঁচ হাজার টন ওজনের অ্যাপারেটাস তৈরি আমার একা হাতে সম্ভব নয়।”

“আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচশ ইঞ্জিনীয়ার আর কুলি পাঠাচ্ছি।”

“না, পাঠাবে না। কেন বিরক্ত করছো আমায়? আমি একা আছি, কিন্তু শান্তিতে আছি। আমার শান্তি নষ্ট কোরো না।”

“বোকামো কোরো না, বিদ্রূপ তোমাকে আমি টাকা দেব, মাইনে দেব—”

“কত টাকা তোমার আছে, ধুন্ধুমার?” বলেই খট করে সুইচ টিপে রেডিওফোন বন্ধ করে দিল বিদ্রূপ। এ সুইচে কাজ হল। বিচ্ছিন্ন হল যোগাযোগ।

তেলেবেগুলে জ্বলে উঠল ধুন্ধুমার। কিছুক্ষণ ষাঁড়ের মতো চেঁচাল ফোনে,
তারপর ঠেস দিয়ে দাঁড়াল সিগন্যাল বোতামে। দ্বীপে দাঁড়িয়ে বিদ্রূপ শুনল ক্যাঁ-কোঁ সিগন্যালধ্বনি। কিন্তু ফিরে তাকালো না। গেল প্রোজেকসন রুমে। ফিল্মের বাকীটুকু এবার দেখতে হবে।

মনটা তাবশ্য খুঁত খুঁত করতে লাগল একটা কারণে। রিসিভারের নক্সাটা পৌঁছে গেছে ধুন্ধুমারের হাতে। নিওটেরিক্সদের এই মডেল ট্রান্সমিটার দিয়ে যে কোনো আকাশযান কি স্থলযানকে পাওয়ার সাপ্লাই করা যেত। মন্দ হত না জিনিসটা। কিন্তু ধুন্ধুমারের মতিগতি ভাল নয়। মরুক গে! নক্সাটা যে কোনো রেডিও ইঞ্জিনীয়ার দেখে বুঝাবে, রিসিভারও বানাবে। কিন্তু ট্রান্সমিটার না থাকলে কোনো কাজেই লাগবে না। রিসিভারকে চালু করতে গেলে দরকার রশ্মি। সে রশ্মি ধুন্ধুমারকে দেওয়া হবে না।

হায়রে, বিদ্রূপ ব্রহ্ম! ধুন্ধুমার সাহাকে তুমি তখনও চিনতে পারো নি!

বিদ্রূপ ব্রহ্মর এক একটা দিন মানেই অফুরন্ত জ্ঞান সঞ্চয়ের এক একটি ইতিহাস।

ঘুম কাকে বলে, তা ভুলে গিয়েছিল বিদ্রূপ। নিওটেরিক্সরাও জানত না ঘুম মানে কি? ঘড়ি ধরে পাঁচ ঘণ্টা অন্তর উদর পূজা করত বিদ্রূপ, বারো ঘণ্টা অন্তর ঠিক আধঘণ্টা ধরে খানিকটা ব্যায়াম করত। সময়ের হিসেব রাখত না—কারণ সময় জিনিসটা অর্থহীন হয়ে গেছিল ওর কাছে। তারিখ কি বছর জানবার দরকার হলে ধুন্ধুমারকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যায়। কিন্তু দরকার কী? সময়ের হিসেব রেখে লাভ কিছু নেই। তাই মাথাও ঘামাত না।

নিওটেরিক্সদের চোখে চোখে রাখাই ছিল ওর দিবারাত্রর কাজ। মাঝে মাঝে তারই ফাঁকে ওদের জন্য নতুন নতুন সমস্যা ভেবে নিত। আপাতত বিদ্রূপের মাথায় ঘুরছে আত্মরক্ষার চিন্তা। ধুন্ধুমারের সঙ্গে কথা কাটাকাটির পর থেকেই ভাবনাটা কিলবিল করছে মাথায়। নিওটেরিক্সরা এক ধরনের আধা-বৈদ্যুতিক কম্পন-ক্ষেত্র নিয়ে উঠে পড়ে গবেষণা করছে। অদৃশ্য একটা দেওয়াল—ব্যস, আর কিছু না। কিন্তু জীবন্ত প্রাণী সে দেওয়াল স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হবে। আইডিয়াটা খারাপ নয়।

ওপরের ঘরে টেলিস্কোপে চোখ রেখে এই সব কথাই ভাবছিল বিদ্রূপ। ক্ষুদে প্রাণীগুলো অবিশ্বাস্য তৎপরতায় গবেষণা এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এই বেলা খেয়ে আসা দরকার। আড়মোড়া ভেঙে সিধে হয়ে দাঁড়াল বিদ্রূপ।

খাবার কথা মনে হলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায় বিদ্রূপের। কন্ট্রোলরুম ছেড়ে বেরোতে মন চায় না। দুমুঠো খাওয়ার জন্যে বারবার পুরানো ল্যাবোরেটরীতে যাওয়া এক ঝকমারি ব্যাপার। প্রতিবার তাই কন্ট্রোলরুম ছেড়ে বেরোনোর সময়ে যতটা বিরক্তি থাকে মনের মধ্যে, ফেরবার সময়ে থাকে ততটা আশা আর আনন্দ।

জানি এর মধ্যে নতুন কি আবিষ্কার করে ফেলল নিওটেরিক্সরা। বাইরে এসে দাঁড়াল বিদ্রূপ। কালো বিন্দুটা তখনি চোখে পড়ল। একটা মোটরবোট। দ্বীপ থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে জল কেটে এগিয়ে আসছে দ্বীপের দিকেই। আসছে মূল ভূখণ্ড থেকে। দু পাশে জলের ফেনা পাখীর ডানার মতো ছড়িয়ে পড়ছে।

দুই চোখে অপরিসীম বিরক্তি নিয়ে মোটর বোটটার দিকে তাকিয়ে রইল বিদ্রূপ। বিরক্তির কারণও আছে। অনেক দিন আগে কয়েকটা পণ্ডিতমূর্খ বোট নিয়ে দ্বীপে এসেছিল। আবোল তাবোল প্রশ্ন করে জ্বালিয়ে মেরেছিল বিদ্রূপকে। ফলে, স্নায়ুর অস্থিরতা কাটিয়ে উঠতে বেশ কয়েকটা দিন নষ্ট হয়েছিল।

মোটর বোটটা দেখে বিদ্রূপের তাই নতুন করে মনে হল, মানুষ জাতটাকে ও ঘৃণা করে। অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। তাই মানুষের সঙ্গ ওর কাছে এমন বিষতুল্য।

মনটা খিঁচড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও দুটো অস্বস্তির কাঁটা খচ খচ করতে লাগল মনের মধ্যে। ল্যাবোরেটরীটাকে ফোর্স-ফিল্ড দিয়ে ঘিরে ফেলার ব্যবস্থা না করলেই নয়। অদৃশ্য একটা প্রাচীর দিয়ে ল্যাবোরেটরীকে সুরক্ষিত করে বাইরে একটা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দিলেই হল। বিজ্ঞপ্তিতে লেখাই থাকবে, এগোলেই মরণ।

অস্বস্তির আর একটা কাঁটা হল ধুন্ধুমারকে নিয়ে। রেডিও ফোনে লোকটার সঙ্গে কথা বলার পর থেকেই মনের অনাবিল শান্তি হারিয়েছে বিদ্রূপ। মাত্র দুদিন আগেই ধুন্ধুমার একটা পাওয়ার প্লান্ট বসাতে চেয়েছে নির্জন এই দ্বীপে—কী ভয়ংকর প্রস্তাব।

পুরানো ল্যাবোরেটরীতে বিদ্রূপ ঢুকতেই বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়াল ধুন্ধুমার।

পলকহীন চোখে দুজনে তাকিয়ে রইল দুজনের দিকে। থমথমে নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করে কারো দিক থেকেই বাক্য স্ফূর্তি ঘটল না।

অনেক বছর পরে ধুন্ধুমারকে দেখল বিদ্রূপ। দেখে খুশী হল কি মুখ দেখে বোঝা গেল না। তবে শিরশির করে উঠল পৃষ্ঠবংশ। ভয়, অস্বস্তি, বিষাদে বিকল হল স্বরকক্ষ।

কান এঁটো করা হাসি হাসল ধুন্ধুমার।

বলল—"বাঃ, বেড়ে আছো দেখছি।"

উত্তর দিল না বিদ্রূপ। ধুন্ধুমার অগত্যা বেঞ্চিতে বসল।

বলল—"কষ্ট করে তোমাকে আর জিজ্ঞেস করতে হবে না। আমিই বলছি। দু ঘণ্টা আগে একটা ছোট্ট বোটে পৌঁছেছি আমি। এইটুকু আসতেই হাড়মাস আলাদা হয়ে গেছে। এখনও গা-বমি-বমি করছে। আসলে তোমাকে চমকে দেব ঠিক করেই চুপিসাড়ে এসেছি। শেষের দু মাইল আমার দুই চেলা দাঁড় টেনেছে। ও রকম হাঁ করে দেখছো কী? বলি, আত্মরক্ষার কোনো ব্যবস্থা করেছো, না আগেই মতোই রিসার্চ নিয়ে মেতে আছো? হুট করে কেউ যদি এসে পড়ে?"

"কার অত মাথাব্যথা?" অস্ফুট স্বরে বলল বিদ্রূপ। ধুন্ধুমার বড় চেঁচিয়ে কথা বলছে। অন্তত সাধক বিদ্রূপের কানে তাই মনে হল। ছোট্ট ঘর। কিন্তু এমনভাবে চেঁচাচ্ছে যে বিদ্রূপের মাথার মধ্যেও ছুঁচফোটার মতো যন্ত্রণা জাগিয়ে তুলছে।

ধুত্তোর! ধুন্ধুমারকে আমল না দিয়ে খাবার সাজানোর দিকে মন দিল বিদ্রূপ।

ব্যাঙ্কার বলল—"মাথাব্যথা আমার।" বলে হীরক-খচিত একটা চুরুটকেস বার করল —"স্মোক করতে পারি?"

"আজ্ঞে না," তীক্ষ্ণ কণ্ঠ বিদ্রূপের।

অসভ্যের মতো হেসে উঠল ধুন্ধুমার। সিগার-কেসটা পকেটে রেখে বলল—"পাওয়ার স্টেশনটা এই দ্বীপেই তৈরি করতে চাই।"

"রেডিও ফোন কি খারাপ হয়েছে?"

"না, হয় নি। কিন্তু সামনা সামনি কথা বলার সুবিধে আছে। ফট করে সুইচ অফ করে তাড়াতে পারবে না। পাওয়ার স্টেশন নিয়ে ভেবেছো?"

"নতুন করে ভাবার দরকার হয় নি। কারণ, আমার মত পালটায় নি।"

"মাঝে মাঝে বড় ছেলেমানুষ হয়ে যাও। একটু মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবো। দেশের, দশের জন্যে চিন্তা করো।"

"আমি কারো জন্যে ভাবি না। আমি শুধু একা থাকতে চাই।"

"কিন্তু—"

"এ দ্বীপে ষ্টেশন বানাতে চাইছ কেন?"

"জায়গাটা খাসা বলে। এ দ্বীপ তোমার নিজস্ব। কাজেই কাকপক্ষীকে না জানিয়ে চুপিসাড়ে কাজ শুরু করা যাবে। ভেতরে ভেতরে পুরোপুরি তৈরি হয়ে প্লান্ট নিয়ে হাজির হওয়া যাবে মার্কেটে। হই-হই পড়ে যাবে। চমকে দেওয়া যাবে। ভালো দর পাওয়া যাবে। বুঝেছো?"

"বুঝেছি। কিন্তু আমাকে জ্বালিও না।"

"কে জ্বালাচ্ছে তোমাকে এখান থেকে দেড় মাইল দূরে দ্বীপের উত্তর প্রান্তে প্লান্ট বসাবো। ভালো কথা, পাওয়ার ট্রান্সমিটারের মডেলটা কই?"

বিদ্রূপের মুখ ভর্তি তখন সিনথেটিক খাবার। তাই কথা না বলে অঙ্গুলি সংকেতে দেখিয়ে দিল একটা ছোট টেবিলের দিকে। টেবিলের উপর বসানো ছিল একটা অদ্ভুত যন্ত্র। লম্বায়, চওড়ায়, উচ্চতায় প্রায় চারফুট। প্লাস্টিক, ইস্পাত আর ক্ষুদে ক্ষুদে তারের রকমারি জটিল পাক। বিচিত্র দর্শন, ঝকমকে, সূক্ষ্ম।

উঠে দাঁড়াল ধুন্ধুমার। টেবিলের কাজে গিয়ে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইল মডেলটার দিকে।

তারপর, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বললে—"কাজ দেয় তো? না, খেলনা মডেল? পরে দেখা যাবে 'খন। বিদ্রূপ, সাফ কথা বালি শোনো। এ দ্বীপে পাওয়ার ষ্টেশন আমাকে গড়তেই হবে। ঘটোৎকচ! কুম্ভকর্ণ!"

সঙ্গে সঙ্গে দুজন মানুষ-দৈত্যের আবির্ভাব ঘটল ঘরের মধ্যে। দুজনেই যেন দুটো মাংসের চলন্ত পাহাড়। ঘাড়ে গর্দানে তফাৎ নেই। আবলুষ কাঠের মতো মিশমিশে রং। করমচার মতো রাঙা চোখ। ঠোঁটের কোণে খুনে হাসি। হাতে ঝুলছে নিকষ রিভলভার।

ফ্যালফ্যাল করে মূর্তিমান দুই উৎপাতের দিকে তাকিয়ে রইল বিদ্রূপ।

ধুন্ধুমার বলল—"ঘাবড়াও মাৎ, এরা মাটি খুঁড়ে বেরোয় নি। ঘাপটি মেরে দেখছিল তোমার দৌড়। বিদ্রূপ, এরা দুজনেই আমার হুকুমের দাস। যা বলব, তাই শুনবে। আধ ঘন্টার মধ্যেই আর একটা দল পৌঁছোচ্ছে। সে দলে আছে ইঞ্জিনীয়ার আর কনট্রাক্টর। দ্বীপের উত্তর দিকটা জরীপ করে পাওয়ার প্লান্ট বসানো হবে। খেয়াল রেখো, তোমার ভবিষ্যৎ শুধু আমার হাতে নয়, এই দুজন যার হাতেও নির্ভর করছে। কাজেই, সাফ বলো, তোমার সহযোগিতা পাবে কি না। তুমি বাঁচো কি মরো, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। মডেলটার নকল বানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা আমার ইঞ্জিনীয়ারদের আছে।"

বিদ্রূপ চুপ করে রইল। মিশমিশে দৈত্য দুটো আবির্ভূত হওয়ার সময় থেকেই চিবোনো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এখন সম্বিৎ ফিরে আসতেই কোঁৎ করে গিলে ফেলল মুখের গ্রাস। কিন্তু কথা বলল না।

নৈঃশব্দ্য।

দরজার কাছে গিয়ে ধুন্ধুমার বলল—"ঘটোৎকচ, মডেলটা কাঁধে করে নিয়ে যেতে পারবে?"

ঘটোৎকচ নামধারী মাংসের পাহাড় হাতের রিভলভার পকেটে রাখল। দু হাতে মডেলটা তুলে নিয়ে ঘাড় কাৎ করে বলল, পারবে।

ধুন্ধুমার বললে—"সমুদ্রের ধারে নিয়ে যাও। ইঞ্জিনীয়ারদের বোট এলে চীফ ইঞ্জিনীয়ারকে বলবে এই মডেল মতো প্লান্ট তৈরি হবে।" দ্বিরুক্তি না করে ঘটোৎকচ বেরিয়ে যেতেই বিদ্রূপের দিকে ফিরে বলল—"রাগারাগি করে লাভ নেই। ভয়ানক গোঁয়ার তুমি। আমিও নিরুপায়। তবে হ্যাঁ, তোমাকে আর ঘাঁটাচ্ছি না। তোমার ত্রিসীমানায় কেউ আসবে না—সে কথা দিচ্ছি। তাই বলে যেন নিজেকে কেষ্টবিষ্ণু মনে কোরো না।

বেআক্কেলি করলেই মার খাবে। আমার কাজে বাধা দিয়েছো কি মরেছো। তোমার মতো ছোটখাট এক-আধটা জান খতম করতে আমি দ্বিধা করবো না। তোমার জীবনের চেয়ে আমার কাজ বড়।”

অবরুদ্ধ কণ্ঠে বিদ্রূপ শুধু বলল-“দূর হও।” এর বেশি আর কিছু বলতে পারল না। কারণ, ব্রহ্মতালুতে দুটো ধমনী ফুলে উঠেছিল। সেইসঙ্গে প্রচণ্ড দপদপানি। কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না।

“তা হচ্ছি। যাবার আগে বলে যাই, একটা কথা। তুমি একটা পয়লা নম্বরের বিচ্ছু,” জ্ঞান-পাগল বিদ্রূপ ব্রহ্মকে এতাবধি এ নামে কেউ সম্বোধন করেনি। “দ্বীপ উড়িয়ে দেওয়ার ফন্দী নিশ্চয় মাথায় আছে তোমার। সম্ভাবনাটা আমার মাথাতেও এসেছে। কিন্তু তুমি যতবড় কিছুই হও না কেন, আমি যদি তুমি হতাম, তাহলে ও পথ মাড়াতাম না। নিরিবিলি থাকতে চাও—পাবে। প্রতিদানে আমাকে নিরিবিলি থাকতে দিতে হবে। আমি এখানে যে কদিন আছি, তার মধ্যে যদি উল্টোপাল্টা কিছু করে ফ্যালো, তাহলে জেনো বোমা ফেলে দ্বীপটাকে পাউডার করার একটা প্ল্যান আমার আছে। এ জন্যে লোক মোতায়েন করেই আমি এসেছি। তবে হ্যাঁ, সে লোক হয়ত শেষ পর্যন্ত বোমা ফেলার বদলে নিজেই বোমা খেয়ে বসল। তুমি সব করতে পার। তাই বিকল্প ব্যবস্থাও আছে। গভর্ণমেন্ট যাতে অবিলম্বে তোমাকে ছাতু বানায়, সে আয়োজনও সম্পূর্ণ করেছি। আশা করি, অত নোংরামি তোমার সইবে না। কাজেই সাবধানে থেকো। একা মানুষের পক্ষে লড়ালড়ির একটা সীমা আছে তো। তারপর ধরো আমি দেশে ফিরে গেলাম। তুমিও গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে নষ্টামি শুরু করলে। প্লান্টের বারোটা বাজালে। ওহে বিদ্রূপ ব্রহ্ম, তাহলেও জেনো তুমি রেহাই পাবে না। বেয়াদবি করলেই মারা পড়বে। সুতরাং, সাধু সাবধান।”

বলে, হেলে দুলে বেরিয়ে গেল ব্যাঙ্কার। পেছন পেছন রিভলভার দুলিয়ে গেল কৃষ্ণকায় গরিলা।

অনেকক্ষণ পাথরের মতো বসে রইল বিদ্রূপ। খেতে ভুলে গেল। আঙুল নাড়তেও ভুলে গেল। মনে হল যেন একটা গ্রানাইট মূর্তি।

বিদ্রূপ ভয় পেয়েছে। নিদারুণ ভয়। জীবন বিপন্ন হয়েছে বলে নয়, দ্বীপের নির্জনতা রইল না বলে। সেই সঙ্গে বিদ্রূপ ব্রহ্মর ব্রহ্মাণ্ডও বুঝি আর গোপন রইল না। এই ভয়টাই অবশ করে তুলল ওর দেহমন। ধুন্ধুমারের আবির্ভাব এবং কশাইয়ের মতো কথাবার্তা ওর অনভ্যস্ত মনকে প্রচণ্ড ঘা দিয়েছে। মারাত্মক ঘা। তাই বিহ্বল হয়ে গেছে বিদ্রূপ। ব্যবসা ও বোঝে না। লোক খাটানোর কায়দা জানে না। বাকচাতুরীর ধার ধারে না। মানুষ সংসর্গ এড়িয়েছে, পালিয়ে বেড়িয়েছে, নির্জনতা খুঁজেছে। তাই মানুষ কাছে এসে দাঁড়াতেই ভয়ার্ত শিশুর মতো অসহায়
বোধ করল বিদ্রূপ ব্রহ্ম।

অনেক... অনেকক্ষণ পরে মাথা ঠাণ্ডা হল বিদ্রূপের। উঠে দাঁড়াল। পাওয়ার প্লান্ট চালু হয়ে গেলে কি হবে ভাবতেই শিউরে উঠল। গভর্ণমেন্ট তো নাক গলাবেই। ধুন্ধুমার নিজে

গভর্ণমেন্ট হয়ে যেতে পারে। এ প্লান্ট তো সাধারণ প্লান্ট নয়। শক্তির অকল্পনীয় উৎস। অনন্ত, অপরিমেয়।

ঘাড় হেঁট করে নিজের দুনিয়ায় ফিরে গেল বিদ্রূপ। যে দুনিয়ায় বিদ্রূপ স্বয়ং ভগবান, যে দুনিয়ায় তার ভাবনা বোঝার জীব আছে, সমস্যা সমাধান করার প্রতিভা আছে, বিপদে বুদ্ধি দেওয়ার শক্তি আছে—নিওটেরিকস্‌দের ক্ষুদে ব্রহ্মাণ্ডে গিয়ে আবার কাজে তন্ময় হয়ে গেল বিদ্রূপ ব্রহ্ম।

সপ্তাহ ফুরোনোর আগেই রেডিওফোনে ধুন্ধুমারকে ডাক দিল বিদ্রূপ। ধুন্ধুমার বিলক্ষণ বিস্মিত হল। কেননা, দু দিন দ্বীপে থাকার সময়ে টিকি দেখা যায়নি বিদ্রূপের। অনেকটা কাজ এগিয়ে গেছে। জাহাজভর্তি কুলি আর মালমসলা এসে পৌঁছতেই চলে এসেছে ধুন্ধুমার। অবশ্য রেডিও মারফৎ যোগাযোগ রয়েছে চীফ ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে। চীফ ইঞ্জিনীয়ার ঘটকর্পর লোকটা খারাপ নয়। কিন্তু মডেল দেখে বেচারীর আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল। কি করতে হবে বোঝেনি—শুধু জানত মালিকের হুকুম মতো মডেলটাকে হুবহু নকল করতে হবে। নেহাৎ ব্যাংকের টাকার সীমা নেই, নইলে এই সব বড় বড় বিদ্যেদিগগজদের আর খুনে গুণ্ডাদের ভাড়া করে আনা কোনমতেই সম্ভব হত না।

প্রথমে মডেলটা দেখেই ঘটকর্পর শুধু নাচতে বাকি রেখেছিল। চোখ দুটো শামুকের চোখের মত ঠেলে বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছিল। প্রবল ইচ্ছে হয়েছিল বন্ধুবান্ধবকে বিশ্বের এই বিস্ময় সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ সংবাদ পরিবেশন করার। কিন্তু দ্বীপে রেডিওসেট ছিল মাত্র একটি। তাও বেতারে বাঁধা ছিল ধুন্ধুমারের ব্যাংকস্থিত প্রাইভেট অফিসের রেডিওর সঙ্গে। দ্বীপে আর দ্বিতীয় ট্রান্সমিটার রাখার হুকুম ছিল না। ধুন্ধুমার কড়া ফতোয়া জারি করেছিল, রেডিও ট্রান্সমিটার দেখলেই যেন গুঁড়িয়ে ফেলা হয়। হুকুম তামিল করার জন্যে দেদার পাহারাদার মোতায়েন করেছিল। দুজন কর্মীর পেছনে একজন করে দাগী খুনে সবসময়ে ঘুরত। এই ব্যবস্থা টের পাওয়ার পরেই বুদ্ধিমান ঘটকর্পর বুঝেছিল, ধুন্ধুমার তাকে কয়েদ করেছে দ্বীপে। রাগও হয়েছিল। কিন্তু সে রাগ দুর্বাসার রাগ। যখন মনে পড়ল, কয়েদ হওয়ার মাসিক মাইনে নগদ এক লক্ষ টাকা, তখন থেকেই রাগ জল হয়ে গেল। তবে দুজন কুলি আর একজন ইঞ্জিনীয়ার ঘটকর্পরের মতো দার্শনিক হতে পারে নি। দ্বীপে পৌঁছোনোর দিন দুয়েক পরেই বিদ্রোহী হয়েছিল। ফলে রাতারাতি তিনজনেই যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল। গভীর রাতে অবশ্য পরপর পাঁচবার পিস্তল-নির্ঘোষ শোনা গেছিল। কিন্তু পরের দিন সকালে তা নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করেনি। নতুন ঝামেলাও হয় নি।

বিদ্রূপের গলা শুনে অবাক হলেও কথায় সুরে তা প্রকাশ করল না ধুন্ধুমার। গা-জ্বালানো হাসি হেসে শুধোল—“বৎস! কি করতে পারি তোমার জন্যে?”

“শ্রাদ্ধ!” ঠাণ্ডা গলায় বলল বিদ্রূপ। স্বর শুনে মনে হল না ঠাট্টা করছে। রাগ, দ্বেষ, অভিমানের চিহ্নমাত্র ছিল না সে স্বরে। বলল—“তোমার চেলাচামুণ্ডাদের সাবধান করে দাও। আমার আস্তানার পঞ্চাশ গজ উত্তরে যে সাদা দাগটা টেনেছি দ্বীপের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত তা পেরোনোর চেষ্টা করলেই মারা পড়বে।”

“সাবধান করবো কেন? ওদেরকে তো বলাই আছে তোমার ছায়াও মাড়াবে না।”

“সাধু। এবার সাবধান করে দাও। ল্যাবোরেটরী ঘিরে ইলেকট্রিক ফিল্ড বসিয়েছি। যে ছোঁবে, সে মরবে। খামোকা খুন করতে চাই না বলেই জানিয়ে রাখলাম।”

“ভালোই করেছ। কিন্তু এত কাণ্ডর দরকার ছিল না। তোমার মতো ছুঁচোর গর্তে নাক গলানোর মতো প্রবৃত্তি—”

থেমে গেল ধুন্ধুমার। কেননা সুইচ অফ করে দিয়েছে বিদ্রূপ। মিছিমিছি ডাকাডাকি না করে ঘটকর্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করল ধুন্ধুমার। বলে দিল, সাদা দাগের কাছে যেন কেউ না যায়। ঘটকর্পর সব শুনল। পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারল না। কিন্তু কথা দিল, লোকজনকে এখুনি সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে। ধুন্ধুমার মনে মনে ভাবল, ঘটকর্পর লোকটা বাস্তবিকই মন্দ নয়। সেই সঙ্গে মনটা একটু খারাপ হল। কেননা, প্লান্ট বসানো শেষ হলে নরবলির যে ফর্দটা বানিয়ে রেখেছে ধুন্ধুমার, তার প্রথমেই রয়েছে ঘটকর্পরের নাম।

কিন্তু সমস্যা তো বিদ্রূপকে নিয়ে। নিছক আত্মরক্ষার খাতিরে হাতিয়ার বানাক, ক্ষতি নেই। আত্মরক্ষা ছাড়াও যেদিন আক্রমণের কথা ভাবতে বসবে, সেদিন ও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। প্লান্টটা মানে মানে শেষ করতে পারলে হয়। তারপর বিদ্রূপকে একহাত নেওয়া যাবে’খন। ধুন্ধুমার একটা নীতিতে বিশ্বাসী। অত্যন্ত সহজ নীতি। তাঁবেদার নয় অথচ জিনিয়স—এমনি কোন অসাধারণ ব্যক্তিকে ধারে কাছে বরদাস্ত করে না ধুন্ধুমার। করাটা সাংঘাতিক বিপজ্জনক। বিদ্রূপ যদ্দিন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, তদ্দিন পাওয়ার ট্রান্সমিটার আর ধুন্ধুমারের আকাশচুম্বী উচ্চাশা নিরাপদ।

দ্বীপের উত্তরে এলাহি কাণ্ডকারখানা শুরু হবার পর মাত্র একবারই আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে ছিল বিদ্রূপ। তাও অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পর। কাজ বাগানোর কৌশল ও জানে না। এ ব্যাপারে নেহাতই আনাড়ি। তাই একদিন রেডিওফোনে ডাক দিল ধুন্ধুমারকে। বলল, এই যে বিরাট ব্যাপারটা হচ্ছে, এটা তো একটু তদারক করা দরকার। ট্রান্সমিটারে যদি সামান্য ভুল থেকে যায় তাহলে সৃষ্টি রসাতলেও যেতে পারে। তাই কাজ মোটামুটি শেষ হয়ে গেলে বিদ্রূপ দেখে আসুক না কেন? তবে হ্যাঁ, তদারকির সময়ে ওকে কেউ যদি খতম করে দেয়, তাহলে ফাইনাল রিপোর্ট আর কোন দিনই পৌঁছোবে না ধুন্ধুমারের কাছে। কাজেই যাতে বিনা আঁচড়ে আস্তানায় ফিরে আসতে পারে বিদ্রূপ সে ব্যবস্থা করতে হবে।

রাজী হল ধুন্ধুমার। বিদ্রূপ সুইচ টিপে ইলেকট্রিক ফিল্ড তুলে নিল। রওনা হল দ্বীপের উত্তরে।

প্লান্ট দেখে তো কুল কুল করে ঘাম দিতে লাগল বিদ্রূপের বুকের মধ্যে যেন দুরমুশ পড়তে লাগল। মুষল পেটানো চলল মাথার মধ্যেও। একী সৃষ্টি করেছে নিওটেরিক্সরা? চারফুটের পুঁচকে মডেলটা শত শত গুণ বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। চার ফুট মডেলের মধ্যে যে সব তারের আর কয়েলের জটিলতা ছিল তার প্রতিটি অতিকায় আকারে দেখানো হয়েছে। নিওটেরিক্সদের সূক্ষ্মতা মানুষের হাতে দানবীয় অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রায় তিনশ ফুট উঁচু একটা বিরাট ইস্পাতের মধ্যে ঠাসা রয়েছে চোখ ধাঁধানো মাথাঘোরানো যন্ত্রপাতির জটিলতা। চূড়ায় রয়েছে একটা বল। পালিশ করা চকচকে

সোনালী ধাতুর তৈরি। এই হল পাওয়ার ট্রান্সমিটারের অ্যান্তেনা। এইখান থেকেই বিচ্ছুরিত হবে হাজার হাজার সূক্ষ্ম, নিরেট, আতীব্র রশ্মিরেখা। শক্তি-রশ্মি। যে কোনো দূরত্বে অবস্থিত হাজার হাজার রিসিভার দিয়ে ধরে নেওয়া যাবে সেই রশ্মি। রিসিভারগুলোও নাকি তৈরি হয়ে গেছে। ঘটকর্পর ওদিকের খবর বিশেষ রাখে না, তাই বিস্তারিত বলতে পারল না বিদ্রূপকে। বিশাল ট্রান্সমিটারের প্রতিটি অংশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল বিদ্রূপ। সব শেষে ঘটকর্পরের দু হাত জড়িয়ে ধরল।

বলল—"আমি কিন্তু এ জিনিস এখানে গড়তে চাইনি। এখনও চাই না। তা সত্ত্বেও বলব, যা দেখলাম, তা ভোলবার নয়।"

"যিনি এর স্রষ্টা, তাঁকেও ভোলবার নয়।"

মুখ লাল হয়ে গেল বিদ্রূপের। অস্ফুট কণ্ঠে বললে—"আমি... আমি না... আমি এর স্রষ্টা নই। স্রষ্টা যারা তাদের দেখতে চান তো—আচ্ছা, আসি।" মুখ ফসকে আরো কিছু বেরিয়ে যাবার আগেই চম্পট দিল বিদ্রূপ।

পেছন থেকে একজন স্টেনগানধারী প্রহরী তাগ করতে করতে বলল—"দোব না কি শেষ করে?"

হাতের ঝাপটায় স্টেনের নল নামিয়ে দিল ঘটকর্পর। বলল—"না, না, না।" তারপর কিছুক্ষণ মাথা চুলকালো। আপন মনেই বলল—"আশ্চর্য! এই লোকটাই তাহলে দ্বীপের রহস্য, একে নিয়েই যত আতংক। কিন্তু দেখে তো মনে হল না? এরকম খাসা মানুষ তো লাখে একটা মেলে না!"

সর্বশেষ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে দিল্লী শহর মাটির সাথে মিশে যায়। লাভের তুলনায় ক্ষতির পরিমাণ অতি সামান্য। কেননা, এই শেষ যুদ্ধের পরেই দুই দেশ মিলে এক হয়ে যায়। গড়ে ওঠে পুরানো ভারতবর্ষ।

নয়াদিল্লীর ধ্বংসস্তুপের ওপর তৈরি হয় নতুন রাজধানী—নব-মগধ। প্রেসিডেন্ট মহাপদ্ম নবরত্ন ক্যাবিনেট নিয়ে প্রচণ্ড দাপটে দেশ শাসন করতে থাকেন।

নব-মগধের সরকারী ভবন বৃত্তাকার একটি কক্ষে বসে রয়েছে প্রেসিডেন্ট মহাপদ্ম, স্থল, জল ও আকাশ বাহিনীর তিন সেনাধ্যক্ষ, এবং একজন নাগরিক। প্রেসিডেন্টের টেবিলের তলায় রয়েছে একটা লুকোনো ডিকটাফোন। চারজনের মধ্যে যা-যা কথা হচ্ছে, তার প্রতিটি শব্দ ধরা পড়ছে ডিকটাফোনে। হাজার মাইল দূরে একটা রেডিও রিসিভারের ওপর হুমড়ি খেয়ে বসে রয়েছে ধুন্ধুমার। নাগরিকের পকেটে লুকোনো দেশলাইয়ের বাক্সের মতো ক্ষুদে ট্রান্সমিটার মারফৎ সব কথাই চলে আসছে রেডিও রিসিভারে। কান খাড়া করে তাই শুনছে ধুন্ধুমার।

তিন সেনাধ্যক্ষের একজন কথা বলছিল।

"মিষ্টার প্রেসিডেন্ট, জিনিসটা সম্পর্কে এই ভদ্রলোক যা-যা 'অসম্ভব দাবী' করছেন, তার প্রতিটি সত্য। খাঁটি সত্য। প্রত্যেকটি দাবী উনি প্রমাণ করেছেন আমাদের সামনে।"

জুল জুল করে নাগরিক ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট মহাপদ্ম। পরক্ষণেই সেনাধ্যক্ষের দিকে ফিরে বললেন—"প্রমাণের নমুনা শুনি।"

খাকী রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল আরেকজন সেনাধ্যক্ষ। বলল—“বিশ্বাস করা না করা আপনার অভিরুচি। কিন্তু এর মধ্যে মিথ্যে নেই। নন্দিকেশ্বর বাবুর হাতে এই যে সুটকেশটা দেখছেন, এর

মধ্যে আছে ডজন তিন চার ছোট ছোট... ইয়ে... বোমা—”

“উহুঁ, ওর নাম বোমা নয়।” আলপিন দিয়ে দাঁত খুঁটতে বলল নন্দিকশ্বের নামধারী নাগরিক।

“তা ঠিক। এ জিনিস বোমা নামের অযোগ্য। কেননা, নন্দিকেশ্বরবাবু দুটো ‘ইয়ে’ নেহাইয়ের ওপর রেখে কামারের হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়েছেন, কিছু হয় নি। আরও দুটোকে ইলেকট্রিক চুল্লীর মধ্যে ফেলে দিয়েছেন, ফাটে নি। একবাক্স দেশলাইয়ের মতো ফস করে জ্বলে গেছে। একটাকে মাঠে ফেলে দূর থেকে গুলি করা হয়েছে—কিসসু হয় নি।” বলে, আবার ঘাম মুছতে মুছতে তৃতীয় সেনাধ্যক্ষের দিকে তাকাল বক্তা।

তৃতীয় জন শুরু করল—“প্রমাণ পাওয়া আরম্ভ হল তারপর থেকেই থর মরুভূমিতে একটা ‘ইয়ে’ ফেলে জেট প্লেনে উঠে গেলাম তিরিশ হাজার ফুট ওপরে। সেখান থেকে কলকাঠি নাড়লেন নন্দিকেশ্বরবাবু। মুঠোর মত এতটুকু একটা ডিটোনেটর দিয়ে ‘ইয়ে’-টাকে ফাটিয়ে দিলেন। এরকম বিস্ফোরণ আমি জীবনে দেখি নি। চার মাইল জমি লাফিয়ে উঠে এল আমাদের দিকে। বিস্ফোরণের ধাক্কা কয়েক শ মাইল দূরে আপনার কাছেও পৌঁচেছে নিশ্চয়।”

“তা পৌঁচেছে,” বললেন প্রেসিডেন্ট। “পৃথিবীর উল্টোদিকের সিসমোগ্রাফেও ভূকম্পন পৌঁচেছে।”

“আধমাইল গভীর গর্ত হয়ে গেছে থর মরুভূমিতে। ইচ্ছে করলে নন্দিকেশ্বরবাবু ঘরে বসেই একটা গোটা শহর উড়িয়ে দিতে পারেন!”

“আরও আছে,” বলে উঠল আরেকজন সেনাধ্যক্ষ। “নন্দিকেশ্বরবাবুর মোটরেও এমনি একটা পুঁচকে প্লান্ট বসানো আছে। মোটরে জ্বালানির কোন ট্যাঙ্কই নেই। ইঞ্জিন জাতীয় কিছুই নেই। শুধু আছে একটা পাওয়ার প্লান্ট। লম্বায় চওড়ায় ছ’ইঞ্চি। উচ্চতাতেও তাই। কিন্তু ওই পুঁচকে জিনিসটার শক্তি যে কি সাংঘাতিক, তা না দেখলে আপনার বিশ্বাস হবে না। আমাদের আর্মি ট্যাঙ্ক মোটরটাকে টেনে রাখতে পারেনি। উল্টে মোটরটাই ট্যাঙ্ককে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেছে!”

“আরও আছে,” তৃতীয় সেনাধ্যক্ষ বলল উত্তেজিতভাবে। “খাজাঞ্চিখানার মত একটা নকল ট্রেজারী ভল্টে নন্দিকেশ্বরবাবু ‘ইয়ে’ রেখেছিলেন। ভল্টের এক-একটা দেওয়াল বিশ ফুট পুরু কনক্রিটের। একশ’গজ দূরে থেকে ‘ইয়ে’-টাকে কন্ট্রোল করলেন নন্দিকেশ্বরবাবু। ফলে বোমার মত ফেটে গেল আস্ত ভল্টটা। না, না, ঠিক বিস্ফোরণ বলা যায় না... মনে হল, যেন একটা অবিশ্বাস্য রকমের প্রচণ্ড শক্তি ভেতর থেকে ফুলতে ফুলতে চার দেওয়ালকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এল। দেওয়াল চৌচির হয়ে গেল, পাউডার হয়ে গেল। ষ্টীলের খাঁচাগুলো ঝাঁটার কাঠির মত ফালিফালি হয়ে গেল। ফুঁ দিতে যেটুকু সময় লাগে, সমস্ত ঘটনাটা ঘটল তার মধ্যে। এই কাণ্ডর পর নন্দিকেশ্বরবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। ‘ইয়ে’গুলো যে সাধারণ কিছু নয়, তা আমরা টের

পেয়েছি। কিন্তু ইনি বলছেন, এ ছাড়াও নাকি ওঁর আরও কি বলার আছে। বিশেষ কথা। আপনার সামনে ছাড়া বলা যায় না।”

কালো মেঘের মত থমথমে মুখ তুললেন প্রেসিডেন্ট মহাপদ্ম। বললেন—“বলুন, কি বলবেন, নন্দিকেশ্বরবাবু।”

উঠে দাঁড়াল নন্দিকেশ্বর। সুটকেশ খুলে বার করল একটা লালচে বাক্স। অনেকটা কম্বলের মত রোঁয়া ওঠা বস্তু দিয়ে মোড়া। হাল্কা। লম্বায় আট ইঞ্চি। চওড়ায় আট ইঞ্চি। উচ্চতায় আট ইঞ্চি।

দেখেই বাকি চারজনে সরে বসল। মুখ দেখেই বোঝা গেল, নাভার্সনেস।

নন্দিকেশ্বর বললে—“মিস্টার প্রেসিডেন্ট, সবই শুনলেন। অথচ, এখনও কিছু শোনেননি। এঁরা তিনজনে যা দেখেছেন, তা কিছুই নয়। যেমন ধরুন কত সূক্ষ্মভাবে যে এ জিনিস কন্ট্রোল করা যায়, সে বিষয়ে আপনি কিছুই জানেন না। আমি দেখাচ্ছি।” বলে, একপাশের একটা পুঁচকে বোতাম টিপে দিয়ে চৌকোনা বস্তুটাকে রাখল প্রেসিডেন্টের টেবিলে।

“একটা কথা আপনারা বার বার জিজ্ঞেস করেছেন। জানতে চেয়েছেন, এ আবিষ্কার আমার না, অন্য কারুর। দ্বিতীয়টাই সত্যি। আমি একজনের প্রতিনিধি। আরও শুনুন, এ জিনিস এই মুহূর্তে যিনি কন্ট্রোল করছেন তিনি কিন্তু বসে রয়েছেন এখান থেকে হাজার মাইল দূরে। একে ফাটানোর ক্ষমতা এখন একমাত্র তাঁর হাতেই রয়েছে,” বলে সুটকেশ থেকে সিগারেট লাইটারের মত একটা জিনিস বার করে রাখল টেবিলে। এক পাশের একটা পিন টিপে দিয়ে বললে—“ডিটোনেটর চালু করে দিলাম। এখন বিস্ফোরণ রোধ করা না করা একজনের মর্জির ওপরেই নির্ভর করছে। প্লেন থেকে আপনারা যে রকম দেখেছিলেন, ঠিক সেইরকমভাবে গোটা রাজধানীটা গুঁড়ো হয়ে যাবে এখন থেকে ঠিক চার ঘণ্টা পরে।” বলে পিছিয়ে এল নন্দিকেশ্বর। হাত বাড়িয়ে ডিটোনেটরের একটা ক্ষুদে সুইট টিপে দিয়ে বললে—“যদি এর তিন ফুটের মধ্যে কেউ আসে, অথবা, আমি ছাড়া আর কেউ ঘর ছেড়ে বেরোনোর চেষ্টা করেন, তাহলেও বিস্ফোরণ ঘটবে। চার ঘণ্টা বসে থাকতে হবে না। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর কেউ যদি আমার গায়ে হাত দেয় তাহলেও জানবেন সঙ্গে সঙ্গে উড়ে যাবে আপনাদের সাধের নবমগধ। গুলি করে মারবেন? গুলি আমার গায়ে লাগার তিন সেকেণ্ডের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটবে—রুখতে পারবেন না।”

সেনাবাহিনীর তিন অফিসার—বোবা হয়ে বসে রইল। একজন শুধু খাকী রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছতে লাগল। বাকি দুজন মনে হল যেন কেষ্টনগরের মাটির পুতুল।

মোলায়েম গলায় শুধোলেন প্রেসিডেন্ট—“কিন্তু কেন?”

“বলছি। আমি যাঁর প্রতিনিধি বিশেষ কারণে তিনি আড়ালে থাকতে চান,
তিনি চান, আপনি তাঁর হুকুম তামিল করুন। তাঁর পছন্দমত ক্যাবিনেট মেম্বার নির্বাচন করতে হবে। তাঁর খুশীমত আপনার ক্ষমতা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। এই গোপন চুক্তির বিষয় কিন্তু আমরা ছাড়া আর কেউ জানবে না। পাবলিক তো নয়ই, এমন কি কোনো পলিটিক্যাল পার্টিও নয়। এই প্রস্তাবে যদি রাজী থাকেন, আপনাদের ভাষায় বোমা নামে এই বস্তুটা ফাটবে না। শুধু এই একটাই নয়। সারাদেশে এরকম

হাজার হাজার 'বোমা' ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে—সেগুলোও ফাটবে না। চেহারা দেখলে ধরতে পারবেন না। কাছে গেলেও বুঝতে পারবেন না। বুঝবেন তখনি, যখন অবাধ্য হবেন। চুক্তিভঙ্গ হলেই একে একে ফাটতে থাকবে 'বোমাগুলো এক একটা শহর উড়ে যাবে। চার মাইলের মধ্যে যা কিছু থাকবে, ছাতু হয়ে যাবে।

"এখন থেকে ঠিক তিন ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিট পরে, মানে, কাঁটায় কাঁটায় সাতটার সময়ে 'বিবিধ ভারতী'র কমার্শিয়াল রেডিও প্রোগ্রাম আছে। ঘোষককে বলবেন, সময় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে 'রাজী' শব্দটা বলতে। কেউ বুঝবে না—শুধু এই বাক্স বোমা যিনি কন্ট্রোল করছেন তিনি ছাড়া। আমার পাছু নেওয়ার চেষ্টা করবেন না। লাভ নেই। কেননা, যাঁর হুকুমে এখানে এসেছি, তাঁর সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। যোগাযোগও হবে না। আর কিছু বলার নেই। নমস্কার।"

পাকা রিপ্রেজেনটেটিভের মতোই খটাৎ করে সুটকেশ বন্ধ করল নন্দিকেশ্বর। ওজন করা হাসি হেসে গটগট করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। চার দিকপাল কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ বসে রইল। ভয়ার্ত দৃষ্টি রইল লালচে রঙের রোঁয়া-ওঠা ভয়ংকর বাক্সটার ওপর।

মিনিটখানেক পরে প্রেসিডেন্ট বললেন—"হুমকিটা সত্যি না মিথ্যে? কি মনে হয় আপনাদের?"।

"সত্যি," তিনজনেই বলল একসাথে। টেলিফোন রিসিভারের দিকে হাত বাড়ালেন প্রেসিডেন্ট মহাপদ্ম। যেন একটা রুদ্ধশ্বাস নাটক। নাটকের প্রতিটি সংলাপ আড়ি পেতে শুল ধুন্ধুমার সাহা। হাজার মাইল দূরে ব্যাংকের ভল্টে মস্ত টেবিলে বসে শুনল সব। কিন্তু জানতেও পারল না চোরের ওপর বাটপারি হয়ে গেল। অর্থাৎ আরও এক ব্যক্তি আড়ি পেতে শুনল গোপন চুক্তির প্রস্তাব।

ধুন্ধুমারের পাশেই ছোট্ট টুলের ওপর বসানো বিদ্রূপের রেডিওফোন আপনা হতেই চালু হয়ে গিয়েছিল। বহু দূরে দ্বীপে বসে বিদ্রূপ তাই ভাবল, ভাগ্যিস অটোমেটিক ব্যবস্থাটা আবিষ্কার করেছিলাম। নইলে তো এই সাংঘাতিক কাণ্ড জানতেও পারতাম না।

সকাল থেকেই ধুন্ধুমারকে ডাকবার ইচ্ছে ছিল বিদ্রূপের। কিন্তু কিছুতেই
মনস্থির করে উঠতে পারছিল না। ইঞ্জিনীয়ার ঘটকর্পর ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে খুশী হয়েছে বিদ্রূপ। লোকটার ব্যক্তিত্ব আছে। মনে দাগ রেখে যায়। শুধু তাই নয়। বয়স অল্প হলে কি হবে, ঘটকর্পর খাঁটি বৈজ্ঞানিক। কাজ নিয়ে তার যে সাধনা বিদ্রূপ দেখে এসেছে, তা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই জীবনে এই প্রথম ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে আবার দেখা হওয়ায় আশায় উন্মুখ হয়েছিল বিদ্রূপ। ভাবছিল, কি করে আরও কিছুক্ষণ কথা বলা যায় ঘটকর্পরের সঙ্গে। কিন্তু ওকে ল্যাবোরেটরীতে আনলে বিপদ আছে। ধুন্ধুমার যখনি জানবে বিদ্রূপের সঙ্গে বেশি মাখামাখি করছে ইঞ্জিনিয়ার, ধরে নেবে দল পাকাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ বেচারীকে প্রাণে মেরে দেবে। বিদ্রূপ নিজেও যদি প্লান্টে যায় দেখা করতে, হয়তো গুলি খেয়েই পরলোকে যেতে হবে।

সারাদিন এই নিয়ে মনের সঙ্গে লড়াই করল বিদ্রূপ। শেষকালে মরিয়া হয়ে ঠিক করল, কপালে যা থাকে থাকুক, ধুন্ধুমারকে ডাকা যাক। ভাগ্য ভাল বিদ্রূপের, সিগন্যাল না

দিয়েই রিসিভার চালু করেছিল। দপ করে জ্বলে উঠেছিল লাল আলো। অর্থাৎ ধুন্ধুমারের ট্রান্সমিটারও চালু হয়েছে।

ফলে, হাজার হাজার মাইল দূরে প্রেসিডেন্টের চেম্বারে যা-যা ঘটল, সব কিছুই রোমাঞ্চিত কলেবরে শুনল বিদ্রূপ। বুঝল, সর্বনাশ হয়ে গেছে। হতভাগা ধুন্ধুমারের মাইনে করা ইঞ্জিনীয়াররা. ক্ষুদে ক্ষুদে আধারের মধ্যে পাওয়ার রিসিভার বসিয়েছে। এক-আধটা নয়; হাজার হাজার; হয়ত লাখ খানেকও নিরীহদর্শন রিসিভারগুলোর নিজস্ব কোন শক্তি নেই। ওদের শক্তি রয়েছে এই দ্বীপে। দানবীয় ট্রান্সমিটার থেকে শক্তি আহরণ করে প্রলয় সৃষ্টি করেছে থর মরুভূমিতে। বেতারে কোটি কোটি হর্স পাওয়ার শক্তি বিচ্ছুরণ করে চলেছে ট্রান্সমিটার। কল্পনাতীত সেই শক্তির কিছুটা অথবা পুরোটা গ্রহণ করার ক্ষমতা এই হাজার হাজার রিসিভারের মধ্যে রয়েছে।

বিষম আতংকে থর থর করে কাপতে লাগল বিদ্রূপ ব্রহ্ম। বোবার মতো দাঁড়িয়ে রইল রিসিভারের সামনে। করবার কিছু নেই। পাওয়ার প্লান্ট ধ্বংস করার একটা উপায় হয়ত উদ্ভাবন করা যেতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে গভর্ণমেন্ট হানা দেবে দ্বীপে। নিওটেরিক্সদের রহস্য আর রহস্য থাকবে না।

রিসিভারে আর একটা শব্দ শোনা গেল। কমার্সিয়াল রেডিও প্রোগ্রাম। কিছুক্ষণ যন্ত্রসংগীতের পর ঘোষকের ভরাট স্বর। বিখ্যাত এক ঘড়ির বিজ্ঞাপনের পর কিছুক্ষণ বিরতি। তারপর :

"আকাশবাণী, বিবিধ ভারতীর এই কমার্সিয়াল প্রোগ্রাম প্রচারিত হচ্ছে নব-মগধ স্টেশন থেকে।"

এরপর তিন সেকেণ্ড নৈঃশব্দ্য। অসহ্য উৎকণ্ঠা।

"এখন আমাদের ঘড়িতে... ইয়ে... রাজী...। এখন আমাদের ঘড়িতে ঠিক সাতটা বাজে।"

পরক্ষণেই শোনা গেল একটা শেয়ালের মতো খ্যাঁক খ্যাঁক হাসি। মানুষ পাগল হয়ে গেলে এমনি হাসি হাসে। ধুন্ধুমার যে একরম অর্ধোন্মাদের মতো হাসতে পারে, স্বকর্ণে শুনেও বিদ্রূপ যেন তা বিশ্বাস করতে পারছিল না। ফোনে কড় কড় শব্দ শোনো গেল। ধুন্ধুমার বলছে?

"শস্ত্রপাণি? অল ক্লিয়ার। এবার বেরিয়ে পড়ো। পুরো স্কোয়াড্রন নেবে। দ্বীপের যেখানে বলেছিলাম, যেখানে বোমা ফেলবে। খবরদার, প্লান্টের যেন ক্ষতি না হয়। বাদবাকি সব কিছু ধুলো করে দেবে। চটপট কাজ সারবে। কাজ শেষ হলেই ফিরে আসবে।"

নিদারুণ আতংকে মৃগীরুগীর মতো ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বিদ্রূপ। কম্পাউণ্ড পেরিয়ে বায়ুবেগে দৌড়োলো কন্ট্রোল চেম্বারের দিকে। প্লান্ট থেকে সওয়া মাইল দূরে ইঞ্জিনীয়ার আর কুলিদের ছাউনি। পাঁচশ নিরীহ লোক মরতে চলেছে। কারণ ওদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। বিদ্রূপেরও প্রয়োজন ফুরিয়েছে ধুন্ধুমারের কাছে।

এখন এ দ্বীপে একমাত্র নিরাপদ জায়গা হল প্লান্ট। প্রাণে বাঁচবার একমাত্র আশ্রয়। নিওটেরিকস্‌দেরও বাঁচাতে হবে। যেভাবেই হোক। এক-এক লাফে তিন চারটে ধাপ

টপকে কন্ট্রোল চেম্বারে পৌঁছোলো বিদ্রূপ। সামনেই যে টেলিটাইপ পড়লো, হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার ওপর। খটাখট শব্দে হুকুম পাঠালো—"একটা দুর্ভেদ্য ঢাল চাই। জরুরী!"

নিওটেরিকস্‌দের ভাষায় আদেশটা ফুটে উঠল ওদের মন্দিরে। কি যে লিখল বিদ্রূপ, তা ও নিজেই বুঝল না। দুর্ভেদ্য ঢাল বলতে যে কি বোঝায়, মানস চক্ষে তা দেখবার ফুরসৎও পেল না। আত্মরক্ষার তাগিদে যা বলবার তা বলেই বেগে বেরিয়ে এল বাইরে। নিওটেরিকস্‌রা নিজেরা প্রাণে বাঁচুক। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে লাগল প্ল্যান্টের দিকে—সাদা দাগের মারণ গণ্ডীর ওপরেই এসে পড়ল একটা পা।

ঠিক মশার মতো দেখতে নটা উড়োজাহাজের একটা স্কোয়াড্রন নিঃশব্দে বেরিয়ে এল পর্বতকন্দর থেকে। নিঃশব্দে ছুটে এসে নিঃশব্দে উঠে পড়ল আকাশে। ইঞ্জিন নেই—তাই কোনো শব্দ শোনা গেল না। মশা-প্লেনের মধ্যে শক্তির উৎস বলতে ছিল একটা ছ ইঞ্চি মাপের চৌকোনা বাক্স। দ্বীপে থেকে আকাশপথে পাঠানো শক্তি-রশ্মি আহরণ করে এই পুঁচকে বাক্সটাই শব্দের চেয়ে বেশি গতিবেগে প্লেনকে উড়িয়ে নিয়ে চলল দ্বীপের দিকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই
নিচে দ্বীপ দেখা গেল। মাইক্রোফোনের সামনে হুকুম দিল স্কোয়াড্রন-লীডার।

"আগে ব্যারাক। তারপর দক্ষিণ দিক।"

দ্বীপের ঠিক মাঝখানে একটা টিলার ওপর একা দাঁড়িয়ে ছিল ঘটকর্পর। হাতে একটা ক্যামেরা। দ্বীপ থেকে মুক্তি অসম্ভব জেনেও ছবি তোলার হবি ছাড়তে পারেনি। ছবি মানে নৈসর্গিক দৃশ্য নয়। বিভিন্ন কোণ থেকে তোলা প্ল্যান্টের বিভিন্ন রকমের ছবির গাদা বানিয়ে ফেলেছিল ঘটকর্পর। শব্দহীন বিমানের আবির্ভাব প্রথমে খেয়াল হয় নি। টনক নড়ল তখনি যখন এক ঝাঁকে বোমা এসে পড়ল ব্যারাকের ওপর। ইঁটকাঠ রক্ত মেদ মজ্জা মাংসর পিণ্ড সৃষ্টি করে দক্ষিণে উড়ে গেল নটা বিমান।

স্তম্ভিতের মতো পঁড়িয়ে রইল ঘটকর্পর। ত্রাস বিস্ফোরিত চোখে দেখল নটা অতিকায় মশার মতো বিমান পর পর আরও দুবার গোঁৎ খেয়ে উঠে পড়ল—দুঝাঁক বোমার বিস্ফোরণে থর থর করে কাঁপতে লাগল ছোট্ট দ্বীপ।

বোমাবর্ষণের ক্ষেত্র ক্রমশ দক্ষিণ দিকে সরে যাচ্ছে। তৃতীয় গোঁৎ দেখেই ঘটকর্পর বুঝল ওদের মতলব কী। কিন্তু কি করবে ও? করার কিছু নেই। তবুও টিলা থেকে দৌড়ে নেমে ছুটতে লাগল বিদ্রূপের আস্তানার দিকে। বেশি দূর যেতে হল না। একটা মোড় ঘুরতেই মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটল খর্বাকার বায়োকেমিস্টের সঙ্গে।

উত্তেজনায় পরিশ্রমে আতংকে অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল বিদ্রূপ। কোনো মানুষকে এভাবে পালটে যেতে কোনো দিন দেখে নি ঘটকর্পর। ফ্যাকাশে মুখে, বিস্ফোরিত চোখে, থর থর কম্পমান দেহে সে কী আকুলতা!

যেন মূর্তিমান বিহ্বলতা চোখের সামনে দেখল ঘটকর্পর। বোমা বিস্ফোরণের কর্ণবধিরকারী নির্ঘোষ ছাপিয়ে শোনা গেল বিদ্রূপের আর্ত চীৎকারঃ

"ধুন্ধুমার! ধুন্ধুমারের বিমান! খুন করবে সবাইকে!"

"প্লান্‌টের কি হবে?" নিরক্ত মুখ ঘটকর্পরের।

"প্লান্টে বোমা পড়বে না। কিন্তু আমার ল্যাবোরেটরীর কি হবে... বেঘোরে মারা পড়বে লক্ষ লক্ষ প্রাণী... কি করি... কোথায় যাই?"

"মিথ্যে ভাবছেন! আর সময় নেই।"

"না, না, এখনও সময় আছে। আসুন... হয় তো এখনো বাঁচাতে পারবো...!" বলেই তীরবেগে দৌড়োলো দক্ষিণ দিকে।

পেছনে লেগে রইল ঘটকর্পর। দূর থেকে ছুটন্ত বিদ্রূপের ক্ষুদে ক্ষুদে পা দুটো দেখে মনে হল যেন বিমানের প্রপেলার ঘুরছে। এমন সময়ে আর একবার গোঁৎ খেল গোটা স্কোয়াড্রনটা। আর এক ঝাঁক বোমা ফেলে সাঁ করে উঠে গেল। বোমাগুলো এসে পড়ল ঠিক সেইখানে যেখানে কয়েক মিনিট আগে মুখোমুখি ধাক্কা খেয়েছে দুই বিজ্ঞানী।

বনের মধ্যে থেকে বেরোতেই এক হ্যাঁচকায় বিদ্রূপের হাত ধরে মাঠের ওপর ফেলে দিল ঘটকর্পর। বিদ্রূপ আছড়ে পড়ল সাদা দাগের ঠিক ছফুট দুরে।

"এ কী... মানে কী...?"

"পাগল হলেন না কি? আর এগোলেই তো ইলেকট্রিক ফিল্ড! নিজের অস্ত্রে নিজেই মরতে চান?"

"ইলেকট্রিক ফিল্ড? কিন্তু একটু আগেই তো এখান দিয়ে গেছি আমি। দাঁড়ান, দাঁড়ান," পাগলের মতো ঘাসের মধ্যে কি যেন খুঁজতে লাগল বিদ্রূপ। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা মস্ত গঙ্গাফড়িং পাকড়াও করে দৌড়ে গেল সাদা দাগের কাছে। ছুঁড়ে দিল মারণ গণ্ডীর ওপর দিয়ে। ঘাসের ওপর নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল গঙ্গাফড়িং। | "দেখলেন তো? মরে গেছে" বলল ঘটকর্পর।

"না, মরে নি! ঐ দেখুন লাফাচ্ছে! আসুন, আসুন। ব্যাপার বুঝছি। নিওটেরিকস্‌রা ছাড়া ও ফিল্ড তুলে নেওয়ার ক্ষমতা আর কারো নেই। ফিল্ড তো আমি বানাই নি—ওরা বানিয়েছে।"

"কি বললেন? নিও—"

"পরে শুনবেন," বলেই জ্যামুক্ত তীরের মতো বাঁই বাঁই করে ছুটতে লাগল বিদ্রূপ।

হাঁপাতে হাঁপাতে, ধড়ফড় করতে করতে, লম্বা লম্বা লাফে সিঁড়ি টপকে দুই ক্ষিপ্ত মূর্তি ঢুকল নিওটেরিকস্‌দের কন্ট্রোলরুমে। একটা টেলিস্কোপের ওপর ঝুঁকে পড়ল বিদ্রূপ এবং পরক্ষণেই বিপুল উল্লাসে হেসে উঠল হা হা করে—"পেরেছে! ওরা পেরেছে!"

"কারা?"

"আমার ছোট বন্ধুরা! আমার নিওটেরিকস্‌রা! দুর্ভেদ্য ঢাল ওরা বানিয়ে ফেলেছে! নিজের চেখেই তো দেখে এলেন, ফোর্স ফিল্‌ডও আটকে গেছে এই ঢালের কাছে! ভেতর থেকে কম্পন বেরোতে পারছে না। এই তো এখনও চালু রয়েছে ওদের জেনারেটর... ঢাল ক্রমশঃ ওপরে উঠছে! বেঁচে গেল! ওরা বেঁচে গেল! ওদের রক্ষা কবচ ওরা নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছে।" আনন্দে ঋষিপ্রতিম বিদ্রূপ ব্রহ্ম এবার হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল।

আর, দুই চোখে সীমাহীন অনুকম্পা নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে হতাশভাবে মাথা নাড়তে লাগল ঘটকর্পর। বলল সহানুভূতির সুরে—"তাতো বটেই—আপনার ছোট্ট বন্ধুরা এখন নিশ্চিন্ত। কিন্তু আমরা নই," বলার সঙ্গে সঙ্গে মেঝে কেঁপে উঠল—

শোনা গেল বোমা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ!

চোখ বন্ধ করে রইল ঘটকর্পর। সামলে নিল নিজেকে। অবশেষে উদগ্র কৌতূহলের কাছে ভয় হার মানল। বাইনাকুলার টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে উঁকি দিল নিচের জগতে। কিন্তু ধূসর ধাতুর ঢালু চাদর ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। এরকম পরিপূর্ণ ধূসরতা এর আগে দেখেনি ঘটকর্পর। নিবিড়। প্রশমিত। কোমল নয়, কড়া নয়। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মাথা ঘোরে। চোখ তুলল ঘটকর্পর।

দেখল, টেলিটাইপের চাবির ওপর ঝড়ের বেগে আঙুল চালিয়ে যাচ্ছে বিদ্রূপ। উদ্বেগ থর-থর চোখে তাকিয়ে আছে হলদে রঙের শূন্য ফিতেটার দিকে।

"একী হল! খবর পাঠাতে পারছি না কেন?" গুঙিয়ে উঠল বিদ্রূপ। "কেন এরকম গোলমাল হচ্ছে? কেন? কেন?—আর, তাই তো বটে!"

"কী হল?"

"ঢাল... ওদের ঢাল... পুরোপুরি দুর্ভেদ্য! টেলিটাইপের খবর তাই ওদের কাছে পৌঁচোচ্ছে না... আটকে যাচ্ছে ঢালে... পৌঁছোলে ওদের বলতাম ঢাল দিয়ে গোটা দ্বীপটাকে ঢেকে দিতে! ওরা সব পারে—ওদের অসাধ্য কিছু নেই।"

"ভয়ের চোটে পাগল হয়ে গেল লোকটা! বেচারা!" স্বগতোক্তি করল ঘটকর্পর।

আচম্বিতে নেচে উঠল টেলিটাইপ। দ্রুতছন্দে খটাখট শব্দে খবর আসছে। ঝাঁপ দিল বিদ্রূপ—দুহাত বাড়িয়ে যেন জাপটে ধরল হলদে ফিতের খবর। মেশিনের মধ্যে থেকে ফিতে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যেতে লাগল উচ্চৈঃস্বরে। ঘটকর্পর দেখল বটে, কিন্তু হরফগুলো চিনতে পারল না। এ রকম কিম্ভূতকিমাকার হরফ সে জীবনে দেখেনি।

বিদ্রূপ তখন থেমে থেমে পড়ছে—"পরমপিতা, রুষ্ট হবেন না, দয়া করুন; আমাদের কথা শুনে তারপর শাস্তি দিন। আপনি যে পর্দা বানাতে হুকুম দিয়েছিলেন, আপনার হুকুম ছাড়াই সেই পর্দা সরিয়ে নিয়েছি। হে সর্বশক্তিমান! আমাদের দয়া করুন। আমরা দিশেহারা হয়ে গেছি। যে পর্দা আমরা বানিয়েছি, তা পুরোপুরি দুর্ভেদ্য। ফলে, শব্দযন্ত্রে আপনার বাণী আসাও বন্ধ হয়ে গেছিল। নিওটেরিকস্‌দের সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে এ কাণ্ড কখনো ঘটেনি আপনার বাণী আপনার আদেশনামা ছাড়া আমরা জীবন ধারণ করি নি। আমাদের ক্ষমা করুন। সদয় হোন। আপনার নির্দেশের প্রতীক্ষায় আমরা ছটফট করছি।"

বিদ্রূপের দশ আঙুল নৃত্য করে উঠল টেলিটাইপের চাবির ওপর। রুদ্ধশ্বাসে ঘটকর্পরকে বলল—"যান... একবার দেখুন... চোখ দিন টেলিস্কোপে!"

মাথার ওপর অবধারিত মৃত্যুর গুঞ্জনধ্বনি উপেক্ষা করে টেলিস্কোপে চোখ দিল ঘটকর্পর।

দেখল এক আশ্চর্য দুনিয়া। দেখল, জমি। রূপকথার মতো। চাষ আবাদ চলছে যে জমিতে। দেখল, লোকজনের বসতি, কারখানা এবং জীবন্ত প্রাণী। অবিশ্বাস্য তৎপরতায় নড়ছে সেখানকার সব কিছু। বাসিন্দাদের পলকের জন্যও ভালোভাবে দেখতে পেল না—দেখল শুধু গোলাপী সাদাটে রঙের বিস্তর দ্রুতসঞ্চরমান রেখা—অসম্ভব বেগে ছুটোছুটি করছে বাসিন্দারা। বোবা বিস্ময়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো পুরো একমিনিট সেই ফ্যানটাসটিক জগতের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ঘটকর্পর। আচম্বিতে পেছনে একটা শব্দ

শুনতেই সম্বিৎ ফিরল। ফিরে দেখে, বিদ্রূপ। সহর্ষে হাত কচলাছে। পরমানন্দে মাড়ি বার করে হাসছে।

“হুকুম তামিল হয়ে গেল, শুনছেন তো?”

ঘটকর্পর কিন্তু কিছুই শুনতে পেল না। না আছে বোমারু বিমানের বাতাস কাটার শন শন শব্দ, না আছে বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ, না আছে নৈসর্গিক দুনিয়ার কাকলি। চারদিক নিথর নিস্তব্ধ।

এবং তখনি দারুণ চমকে উঠল ঘটকর্পর। মৃত্যুপুরীর মতো এমন নীরবতা কেন? দৌড়ে গেল জানলার কাছে। একটু আগেই যেখানে প্রদোষের ম্লান আভা ছিল এখন সেখানে নিবিড় তমিস্রা। গোধুলির পরিবর্তে রজনী।

—“এ কী ব্যাপার?”

ছেলেমানুষের মতো খিল খিল করে হাসতে লাগল বিদ্রূপ।

“দেখলেন তো নিওটেরিকস্‌দের কীর্তি? ঐ তো নিচের তলায় রয়েছে ওরা। আমার বন্ধু। ওরাই তো দুর্ভেদ্য ঢাল দিয়ে ঢেকে দিল গোটা দ্বীপটা। আমরা নিরাপদ। সবাই!”

বিস্ময় বিহ্বল ঘটকর্পর তখন ঝুড়ি ঝুড়ি প্রশ্ন নিক্ষেপ করে নাস্তানাবুদ করার উপক্রম করল বিদ্রূপকে। আর আনন্দে আটখানা হয়ে নিচের তলার মহাশক্তিশালী জাতির পূর্ণ বিবরণ ধীরে ধীরে তুলে ধরতে লাগল বিদ্রূপ ব্রহ্ম।

দুর্ভেদ্য খোলসে মোড়া দ্বীপের বাইরে পিলে চমকানো ঘটনা ঘটতে লাগল। আচমকা নটা এরোপ্লেনের শক্তি ফুরিয়ে গেল। একে একে আছড়ে পড়ল ধূসর খোলসের ওপর—গড়াতে গড়াতে সমুদ্রে পড়ে তলিয়ে গেল। যে পাইলটরা ককপিট থেকে জীবিত অবস্থায় বেরোতে পারল, তারাও তেলতেলে মসৃণ খোলসের ওপর দিয়ে পিছলে গিয়ে পড়ল সাগরে। আর উঠল না।

ভারতবর্ষের এক শহরে আচম্বিতে বিকল হয়ে গেল একটা অদ্ভুত মোটর।

মোটরে বসে ঠক ঠক করে কঁপতে লাগল নন্দিকেশ্বর নামে এক ব্যক্তি। কাঁপুনি আর ভয়ার্ত চোখ দেখে সাহস করে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল গভর্ণমেন্টের সেপাই শান্ত্রী। প্রাণ হাতে নিয়ে কয়েকজন এগিয়ে এল আরও কাছে—কারণ যে কোনো মুহূর্তেই মহাপ্রলয় সৃষ্টি করতে পারে মর্কটসদৃশ নন্দিকেশ্বর। কিন্তু কিছুই হল না।

নব-মগধের একটি বিশাল কক্ষে উৎকণ্ঠার শেষ সীমায় পৌঁছে ক্ষেপে গেল এক উচ্চপদস্থ আর্মি অফিসার। ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে উঠল চিলের মতো—“আর পারিনা! যা হয় হোক!” বলেই ধেয়ে গেল প্রেসিডেন্টের টেবিলের দিকে, খপ করে লালচে রঙের রোঁয়া-ওঠা বাক্সটা তুলে নিয়ে মারল এক আছাড়; পরক্ষণেই ভারী জুতো পরে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল বাক্সর ওপর। দেখতে দেখতে টুকরো টুকরো হয়ে গেল পলকা বাক্সটা।

দিন কয়েকের মধ্যে ব্যাঙ্কের ভল্ট থেকে ভগ্নহৃদয় এক বৃদ্ধকে নিয়ে যাওয়া হল পাগলাগারদে। এক হপ্তা পরে সেখানেই মারা গেল বৃদ্ধ।

ঢালটা কিন্তু বাস্তবিকই দুর্ভেদ্য; পুরোপুরি দুষ্প্রবেশ্য। পাওয়ার প্লান্টে আঁচড়টিও পড়েনি। তাই সমানে শক্তি-রশ্মি বিচ্ছুরিত হতে লাগল প্লান্ট থেকে। কিন্তু রশ্মি বেরোতে পারল

না; তাই তার শক্তিতে শক্তিমান যাবতীয় মেশিন বিকল হয়ে গেল। অবিশ্বাস্য এই কাহিনী জনসাধারণ কোনোদিন জানল না। অবশ্য বেশ কয়েক বছর নৌবাহিনীর তৎপরতা বেজায় বৃদ্ধি পেল একদা যেথায় দ্বীপটি ছিল, তার আশপাশে। লোকে বলে নাকি নৌবাহিনী কামান ছোঁড়া প্র্যাকটিশ করার একটা জায়গা আবিষ্কার করেছিল সেখানে। সমুদ্রে ওপর যেন ধূসর ধাতুর একটা উপুড় করা বাটি। বিশাল তার আকার। বিস্ময়কর তার ধূসরতা। ভারী ভারী কামান দেগেও নাকি বাটিটাতে টোল খাওয়ানো যায় নি। ইস্পাত-গলান আগুন দিয়েও পিচ্ছিল জিনিসটাকে তাতানো যায় নি। শেষকালে অ্যাটম বোমার মহড়াও চলেছে—কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে এক ইঞ্চিও ডোবানো যায় নি উপুড় করা সেই বিশাল বাটিকে।

বিদ্রূপ আর ঘটকর্পর ইচ্ছে করেই রেখে দিয়েছিল ঢালটা। গবেষণা আর নিওটেরিকস্ নিয়ে দুজনেই পরম সুখে দিন যাপন করছিল। কামান গর্জন কানে আসে নি, পারমাণবিক বিস্ফোরণ টের পায় নি কারণ ঢালটা সত্যি সত্যিই দুর্ভেদ্য। হাতের কাছে মালমশলা যা ছিল, তাই দিয়ে দরকার মতো সিনথেটিক খাবার, আলো আর বাতাস তৈরি করে নিত। কারও ধার ধারত না। বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও ব্যারাকের তিনজন কুলি জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে ছিল তিন দিন। তারপর থেকেই দ্বীপের মধ্যে মানুষ নামক প্রাণী বলতে রইল শুধু দুজন। বিদ্রূপ আর ঘটকর্পর।

এ সব অনেক দিন আগেকার কথা। বিদ্রূপ আর ঘটকর্পর আজও বেঁচে থাকলেও থাকতে পারে, মারা গেলেও যেতে পারে। তাদের মরা বাঁচাটা বড় কথা নয়, তার চেয়ে বড় কথা হল, বিশাল ধূসর খোলসটার ওপর নজর রাখা দরকার। মানুষ মরে, কিন্তু জাতি বেঁচে থাকে। অগণিত বংশানুক্রমের পর একদিন ধারণাতীতভাবে এগিয়ে যাবে নিওটেরিকস্‌রা। সেই দিন ওরা দুর্ভেদ্য খোলস নামিয়ে পা বাড়াবে দ্বীপের বাইরে।

সে দিনের কথা মনে করে আমি শিউরে উঠছি।

প্রথম প্রকাশ : আশ্চর্য!, অগাস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮
বিদেশী ছায়ায়
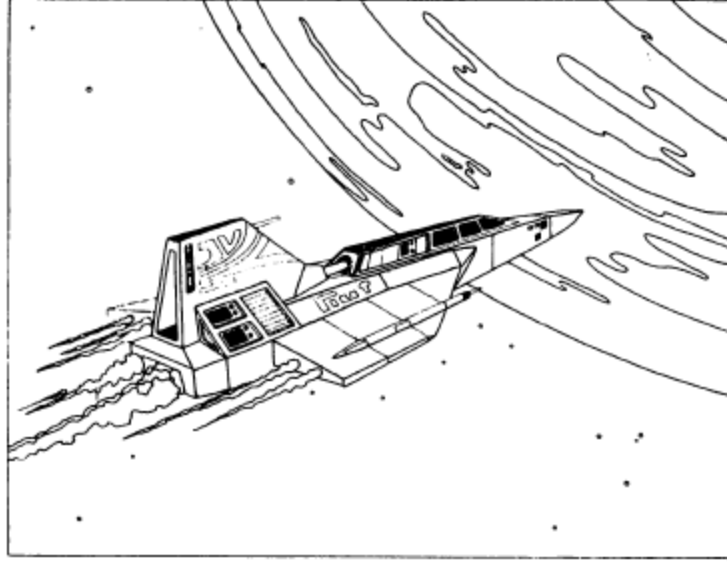
সূচিপত্রে ফিরে যান

মন্দাবতীর জঙ্গলে

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

দেশ ভ্রমণের বাতিক আমার কবে থেকে শুরু হয়েছিল তা এখন বলা কঠিন, তবে এটুকু বলতে পারি ভারতবর্ষের এমন অনেক জায়গায় আমার যাবার সুযোগ হয়েছে যা সাধারণ ট্যুরিস্টদের হয় না। এর কারণ, বেড়াতে গেলে কোথায় উঠব, কোথায় খাব, ঘুরবার জন্য গাড়ি জুটবে কিনা, দরকারের সময় গাইড মিলবে কিনা এ সব নিয়ে আমি কখনও মাথা ঘামাই নি। বিলাসবহুল বড় বড় শহর বা ঐতিহাসিক জায়গার চাইতে লোকচক্ষুর আড়ালে প্রকৃতির বুকে যে সব আশ্চর্য সৌন্দর্য এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার প্রতিই আমার আকর্ষণটা বেশি। এজন্য এমন অনেক অজ-পাড়াগাঁয়ে অজানা-অচেনা বনজঙ্গলে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি যার নামও কেউ কখনও শোনেনি। আসল কথা, ছুটি পেলেই আমি লোটাকম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি; সব সময় যে কোন নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থান ঠিক করা থাকে তাও নয়। কিন্তু তাতে আমার ভ্রমণে কোন অসুবিধা হয় না।

এবার কিন্তু একটা নির্দিষ্ট জায়গায় যাব বলেই বেরিয়েছিলাম। আর, ঠিক একা রওনা হইনি, আমার সঙ্গী ছিল আমার বাল্য বন্ধু কপিল। কপিলই একদিন খবর দিল তার কোন্ এক পিসতুত দাদা মধ্যপ্রদেশের কোন্ এক জঙ্গলে ফরেস্ট অফিসার হয়ে চলে গেছেন। ভদ্রলোক বিয়ে টিয়ে করেন নি, একা একাই থাকেন। মাঝে মাঝে এই নিঃসঙ্গ জীবন যখন ভালো লাগে না তখন আত্মীয়স্বজনদের কাউকে দিন কয়েক তাঁর ওখানে কাটিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু ঐ বন্য পরিবেশের কথা শুনে কেউ বড় একটা যেতে চায় না। কপিলকেও লিখেছিলেন। সেও একা একা যাবার ভরসা পাচ্ছিল না। হঠাৎ আমার কথা মনে পড়ায় আমার কাছে এসে প্রস্তাব করেছিল, আমি গেলে সেও একবার যেতে পারে।

আমার কাছে বলা বাহুল্য, এ এক অভাবিত প্রস্তাব। কাজেই আমি যে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যাব এ কথাও বোধ হয় বলার দরকার করে না। কপিলকে বললাম, 'আজই লিখে দে, আমরা যাচ্ছি। মালপত্র সঙ্গে বেশি নেবার দরকার নেই। যত হাল্কা হয় ঘোরার পক্ষে ততই ভালো। পিঠে একটা বড় দেখে ন্যাপ্সাক, তার মধ্যেই বাতাসপোরা বিছানা-বালিস আর ২-৪টে জামা কাপড় ভরে নিলেই চলবে। আর হাতে একটা অ্যাটাচি কেসে এটা ওটা দরকারী খুঁটিনাটি জিনিস।
ব্যাস এই যথেষ্ট।'

যথা সময়ে আমরা দু'বন্ধু মন্দাবতীর জঙ্গলে এসে হাজির হলাম। যেমনটা ভেবেছিলাম তার চাইতে এটি অনেক দুর্গম জায়গা। দণ্ডকারণ্য পার হয়ে আরও বহুদূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে এক ফরেস্ট বাংলোয় ডেরা বেঁধেছেন কপিলের দাদা ভগীরথবাবু। কপিল অবশ্য তাঁকে রাঙাদা বলে ডাকে, আমিও সেই সুবাদে তাকে রাঙাদা বলেই বলব। রাঙাদা অবশ্য আমাদের জন্য একটা ট্রাক পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সেই ট্রাকে করে শতাধিক কিলোমিটার

পথ পার হয়ে গায়ে দস্তুর মতো ব্যথা ধরে গেল। আমার তবু অভ্যাস আছে, কপিল একেবারে যেন নেতিয়ে পড়ল। কিন্তু বাংলোয় পৌঁছে দু'জনেই চমকে উঠলাম।

ভারতের বহু জায়গা ঘুরেছি আমি, প্রকৃতির সমারোহও কম দেখি নি। কিন্তু এ যেন একটা আলাদা জগৎ। পাশ দিয়ে কুলু কুলু করে বয়ে চলেছে একটা নদী। এরই নাম মন্দাবতী, আর এরই নাম থেকে এখানকার অরণ্যের নাম হয়েছে মন্দাবতীর জঙ্গল বা অরণ্য। নদীতে জল বেশি নেই, কিন্তু স্রোত প্রবল। জলের মধ্যে এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে বড় বড় পাথরের চাঁই। নদীর জল তার ওপর আছড়ে পড়ে কোথাও ছড়িয়ে পড়ছে ফোয়ারার মতো আবার কোথাও বা সৃষ্টি করছে ছোট ছোট জলপ্রপাত। নদীর ওপারেই গহন অরণ্য। বিরাট বিরাট বনস্পতি ঘেঁষা ঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে জায়গাটাকে প্রায় দুর্ভেদ্য করে রেখেছে।

রাঙাদা বললেন, 'আগে একটু জলটল খেয়ে জিরিয়ে নাও, তারপর বরঞ্চ একটু বেড়িয়ে আসা যাবে। সঙ্গে থাপাকে নেব, ও বন্দুক নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে যাবে। জাতে নেপালী তো। একসময়ে লড়াইতেও গিয়েছিল। বন্দুক চালাতেও খুব ওস্তাদ। তবে এখানে ও জিনিসটার বড় একটা দরকার হয় না।'

'কি রকম?'আমি প্রশ্ন না করে পারলাম না।

রাঙাদা বললেন, 'প্রায় ৮/৯ মাস তো এখানে আছি। কোনদিন কোনও হিংস্র জন্তু চোখে পড়ে নি। কি কারণে ওরা এ জঙ্গল ত্যাগ করেছে ভেবে পাই না। একটু সামনেই দেখবে একটা জায়গায় কেমন খাদের মতো একটা গর্ত হয়েছে, যেখানে নদীর জল এসে জমে থাকে, চট্ করে বেরিয়ে যায় না। এখানকার যত বুনো জানোয়ার, সন্ধ্যা হলেই তারা একে একে ওখানে আসে জল খেতে। নানা জাতের হরিণ, বনগরু, শেয়ালটেয়াল তো আসেই, বানরও কম আসে না। ও জায়গাটায় বানরের খুব আনোগোনা দেখেছি। ছোট-বড় নানা জাতের বাঁদর যাদের সবগুলোর নাম আমি জানি না। কিন্তু রোজই ওরা আসে। হাতিটাতি দূরের কথা, বাঘটাগ কিংবা ভালুকটালুক থাকলে নিশ্চয়ই তাদেরও দু'একটার দেখা পাওয়া যেত, আর অন্য জানোয়ারগুলোও সতর্ক হত, কিন্তু সে রকম এখনও দেখিনি। তাই মনে হয় তেমন হিংস্র জন্তু এখানে নেই বললেই চলে। একবার শুধু একটা বুনোশুয়োর দেখেছিলাম। কিন্তু দলে ভারি থাকায় অন্য জানোয়ারগুলো তাকে তেমন তোয়াক্কা করেনি।'

রাঙাদার কথায় ভরসা পেয়ে সেদিনই আমরা তাঁর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। অবশ্য থাপা বন্দুক নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে ছিল। যতই নিরাপদ মনে হোক, জঙ্গল জঙ্গলই। কখন কোন্ দিক্ থেকে বিপদ এসে পড়ে কে বলতে পারে?

কিন্তু দিন কয়েক বেড়িয়েই আমাদের ভয় একদম ভেঙ্গে গেল। শেষে আমি কপিলকে নিয়ে অনেক সময় নিজেরাই বেরিয়ে পড়তাম, রাঙাদা বা থাপার ভরসায় না থেকে। অত বড় আর এত গহন বন আমি এর আগে আর কখনও দেখিনি। তাই যাবার সময় ভালো করে নিশানা রেখে রেখে চলতে হত পথ হারাবার ভয়ে। রাঙাদা অবশ্য প্রায়ই সাবধান করে দিতেন।

অনেক নতুন নতুন গাছ। সেগুন গাছ খুব বেশি। শাল, পিয়াল, শিশু এসব গাছও কম নয়। তা ছাড়া বিরাট বিরাট ঝুরি নামানো বট, অশ্বথ, পাকুড় কী নেই? বুনো আম, বুনো জাম, আরও কত নাম-না জানা বুনো দলের গাছও চোখে পড়ত। শুধু তাইই নয়। নানা রকম জীবজন্তু-ও যখন তখন সামনে দিয়ে দৌড়ে চলে যেত। বিশেষ করে হরিণ আর বানর।

রাঙাদার কাছে একদিন শুনলাম এহেন গভীর জঙ্গলে এখনও কিছু কিছু জংলী মানুষও নাকি বাস করে। তারা লোকালয়ে বড় একটা আসতে চায় না। দু'একজন নৃতত্ত্ববিদ্ ওদের সম্বন্ধে খোঁজ নেবার চেষ্টা করেন নি এমন নয়। কিন্তু খুব যে বেশি তথ্য যোগাড় করতে পেরেছেন এমন মনে হয় না। তবে এটুকু জানা গেছে যে জংলী হলেও এরা খুব নিরীহ জাতের মানুষ, কিছুটা ভীতুও বলা চলে। চাষবাসেরও ধার ধারে না। বুনো ফলমূল, কন্দ জাতীয় খাবার এখানে অঢেল পাওয়া যায়। তাই খেয়েই এদের দিন চলে। তবে সুযোগ পেলে পাখিটাখি বা হরিণটরিণও যে ধরে খেতে ছাড়ে না এমন নয়।

সেদিন কপিলকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম, আর বলতে কি বনের মধ্যে একটু বেশি দূরেই ঢুকেপড়েছিলাম। হঠাৎ মনে হল গাছের এক ডাল থেকে আর এক ডালে একটা অদ্ভুত জন্তু চলে গেল। জন্তুটার মুখ দেখে মানুষ বলেই প্রথমটা মনে হয়েছিল, কিন্তু একটু পরেই দেখলাম পেছনে লম্বা লেজ রয়েছে আর পা দিয়ে গাছের ডাল যে ভাবে আঁকড়ে ধরে চলে গেল তাতে বাঁদর জাতীয় জীব ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না ওকে।

কী হতে পারে জন্তুটা? এর নামও তো কোন দিন শুনি নি!

বাংলোয় ফিরে এসে রাঙাদাকে খবরটা দিতেই তিনি তো হতবাক্। 'বলিস
কি রে, এতদিন এখানে আছি, ও রকম কোন জন্তু তো কোন দিন দেখি নি। বলছিস বাঁদরের মতো পা, বাঁদরের মতো লেজ, কিন্তু মুখটা ঠিক মানুষের মতো। এ যে তাজ্জব ব্যাপার। মিসিং লিঙ্ক নাকি?'

এরপর আমাদের ঝোঁক চাপল যে করে হোক জন্তুটাকে খুঁজে বার করতে হবে। জঙ্গলের ভিতর অনেকটা ঢুকতে হবে ঠিকই, কিন্তু আমি তো আগেই বলেছি, যখনই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকি উপযুক্ত নিশানা রেখে যাই যাতে পথ হারাবার ভয় না থাকে। কাজেই ঐ ভাবেই আবার সেই জঙ্গলের গভীরে গিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করলাম।

কিন্তু না, গোটা কয়েক বনমোরগ আর হরিণ ছাড়া কিচ্ছু চোখে পড়ল না। কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। একবার যখন চোখে পড়েছে তখন আর একবার তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। আমার চোখে দৃষ্টিবিভ্রম হলেও কপিলের চোখেও কি তাই হবে? কাজেই যা দেখেছি নিশ্চয়ই ভুল দেখিনি।

পরদিন আবার বেরুলাম। কিন্তু সেদিনও হতাশ হয়ে ফিরতে হল।

এইভাবে পর পর দিন চারেক কাটাবার পর কপিল যখন হতাশ হয়ে অনুসন্ধান বন্ধ করবার প্রস্তাব করল, তখন আমার রোখ আরও চেপে গেল। বললাম, 'তুই যাস না যাস, আমি একাই যাব।'

রাঙাদাও সায় দিয়ে বললেন, 'না না, সত্যি যখন ও রকম অদ্ভুত একটা জানোয়ার চোখে পড়েছে বলছ তখন ভালো করে খুঁজে দেখা দরকার বই কি! আজ আমার একটু

কাজ আছে, কাল সবাই একসঙ্গে বেরুব। থাপাকেও নিয়ে যাব। একটু সাবধান হওয়া ভালো।'

গভীর জঙ্গল ভেদ করে চলেছি। আগে আগে বন্দুক হাতে থাপা, তার পেছনে আমি আর কপিল, রাঙাদা চলেছেন সবার পিছে। সকলেরই চোখে সতর্ক দৃষ্টি। দেখতে দেখতে জঙ্গল আরও ঘন হয়ে এল। এবার আর পথ করে যাওয়া সহজ নয়। রাঙাদার হাতে একটা মস্ত ভোজালির মতো অস্ত্র। দরকার মতো এগিয়ে এসে তিনি গাছের ডাল কেটে কেটে পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছেন। কিন্তু তবু যতই এগোচ্ছি ততই মনে হচ্ছে আর বোধ হয় এগোনো যাবে না। রাঙাদা এখানকার ফরেস্ট অফিসার, তাঁর অন্ততঃ তল্লাটের নাড়ী নক্ষত্র জানা উচিত ছিল। কিন্তু না, তিনিও জানতেন না যে বন এত দূর পর্যন্ত চলে এসেছে আর এত ঘন হয়ে। বনরক্ষীরা কখনও এদিককার কোন হদিস দেয়নি। তারাও হয়তো ভেবেছিল ওদিকে এমন আর কিছু নেই যা সরকারের দিক দিয়ে ভালো করে সার্ভে করা দরকার। রাঙাদার আগে তাঁর জায়গায় যিনি ছিলেন তিনি এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। এ সব দিকে নজর দেওয়ার চাইতে কোন জায়গায় মহুয়া গাছ আছে তার থেকে ভালো মদ পাওয়া যেতে পারে সেই সব দিকেই নাকি তাঁর উৎসাহ ছিল বেশি।

'এ সব জায়গায় হিংস্র প্রাণী থাকাও অসম্ভব নয়' আমি মন্তব্য করলাম। রাঙাদা উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ, সম্ভব তো সব কিছুই ; তবে কথা হচ্ছে হিংস্র প্রাণীদেরও তো প্রয়োজনীয় খাদ্য থাকা দরকার। অর্থাৎ তাদের সঙ্গে কিছু দুর্বলতর প্রাণীও না থাকলে বেচারারা তো না খেয়েই মারা যাবে।'

রাঙাদার কথা শেষ হতে না হতে হঠাৎ কাছের একটা গাছের ওপর থেকে কিচ্ কিচ্ শব্দ শোনা গেল। তাকিয়ে দেখি চার পাঁচটা বাঁদর অবাক চোখে আমাদের দেখছে। বোধ হয় ও রাজ্যে আমাদের মতো বিচিত্র প্রাণী ওরা আগে দেখে নি বলেই ওদের কৌতূহল। কপিলকে একটু ঠেলা দিতেই সে বলল, 'হ্যাঁ আমিও দেখেছি। ঠিক সেদিনকার মতোই লম্বা লেজ, তেমনি পায়ের গড়ন, মুখখানা তো বাঁদরের মতোই মনে হচ্ছে, মানুষের সঙ্গে কোন মিল আছে বলে তে মনে হচ্ছে না।'

রাঙাদাও লক্ষ্য করলেন, 'হ্যাঁ, এ জাতের বাঁদর এখানকার জঙ্গলে মাঝে মাঝে দেখা যায়। খুব বড় বড় চেহারা হয় এদের। ধাড়ি হনুমানের চেয়েও বড়। কিন্তু এগুলি এপ্ নয়, বাঁদরই। কি রকম লম্বা লেজ দেখছ না? এপ্ যাকে তোমরা বল বনমানুষ, তাদের তো আর লেজ হয় না, অবশ্য উল্লুকেরও লেজ নেই।'

বলতে বলতে আমরা আর একটু এগিয়ে এসেছিলাম। এবার দেখা গেল বানরের সংখ্যা যত কম মনে করেছিলাম ততটা কম না, প্রায় সব কটা বড় বড় গাছেই দু-চারটে বসে আছে। আমাদের দেখে কিচ্ কিচ্ শব্দ করে এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফিয়ে পড়ছিল ওরা। লাফাবার সময় পায়ের আঙুল দিয়ে অনায়াসে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরতেও কোন অসুবিধা হচ্ছিল না ওদের। 'একটা ফটো নেওয়া দরকার।' বলে রাঙাদা তাঁর ক্যামেরাটা বার করলেন আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অনেক দূর থেকে কে যেন ইংরেজীতে চেঁচিয়ে উঠল,'ডোন্ট ডিস্টার্ব দেম, ডোন্ট ডিস্টার্ব।' ওদের বিরক্ত কর না।

তাজ্জব কাণ্ড! এখানে আবার ইংরেজীতে কথা বলে কে? আর এই সংরক্ষিত বনে রাঙাদার অজ্ঞাতে কোন লোক, শিক্ষিত নিশ্চয়ই, এল কী করে? তবে কি কোন শিকারী লুকিয়ে শিকার করতে এসেছে? শিকারী হলে তার আবার মায়া কেন এত? নাঃ ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে। থাপা এবার বন্দুক উঁচিয়ে ধরে তাড়াতাড়ি শব্দস্থল লক্ষ্য করে যতটা সম্ভব দ্রুত পায়ে এগোতে লাগল। আমরাও সমান তাল রেখে তাকে অনুসরণ করলাম। এবারে আবার এক অবাক কাণ্ড। ঘন জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা জায়গা ছোট্ট একটা টিলার মতো উঁচু হয়ে আছে। তার আশপাশে কোন জঙ্গল নেই, থাকলেও কেউ তা কেটে পরিষ্কার করে নিয়েছে। সেই টিলার ওপর ছোট্ট একটা কাঠের বাড়ি, মাথায় ঢালু চাল। দেখলেই বোঝা যায় বুনোদের তৈরি নয়, দস্তুর মতো পাকা হাতের তৈরি। ঘরে বাতাস চলাচলের জন্য বড় বড় জানালা বসানো, তাতে কাঠের গরাদ আঁটা। আর, তার চেয়েও আশ্চর্য সেই জানালায় পর্দা ঝুলছে, ফুর ফুর করে উড়ছে হাওয়ায়।

আমরা কাছাকাছি যেতেই দেখলাম ঘরের সামনেকার ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে শার্ট আর ট্রাউজার পরা একটা লোক হাত-পা নেড়ে অনুরূপ পোশাক পরা কয়েকটি লোককে কি যেন বোঝাচ্ছেন। চেহারা দেখে বোঝা গেল এঁরা সকলেই বিদেশী এবং শ্বেতাঙ্গ। অবশ্য কোন দেশের লোক তা গোড়ায় ঠাহর করা গেল না।

এবার থাপাকে পাশে নিয়ে রাঙাদা এগিয়ে গেলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, তিনি এখানকার বনবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্তা, তাঁর অজ্ঞাতে এখানে ঘরবাড়ি তৈরি করে আপনারা কারা এখানে বসতি বসিয়েছেন?

ইতিমধ্যে আমাদের সাড়া পেয়ে ঘরের ভিতর থেকে আরও ২-৩ জন বেরিয়ে এলেন। এঁরা স্ত্রীলোক, এবং পোশাক দেখে মনে হল এঁরা নার্সের কাজ করেন।

রাঙাদার পরিচয় পেয়ে দলপতি সাহেবটি হ্যান্ডশেক্ করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। তারপর একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে বললেন, 'আমরা বিদেশী, ইয়োরোপ থেকে বন্য প্রাণী নিয়ে রিসার্চ করবার জন্য এখানে এসেছি। বনবিভাগের সব নিয়মকানুন হয়তো জানি না, তবে আমাদের কাছে ভারত সরকারের অনুমতিপত্র আছে। কোনও বদ্ মৎলব নিয়ে আসি নি।'

রাঙাদা পদোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, 'সে কি! এখানে রিসার্চ করতে এসেছেন, জঙ্গল কেটে ঘরদোর বানিয়েছেন, অথচ সবচেয়ে গোড়ায় যা করা উচিত ছিল ফরেস্ট অফিসারকে জানানো, তাই করেন নি! কিসের রিসার্চ করছেন আপনারা? কোথা দিয়ে ঢুকলেন এই ঘন জঙ্গলে?

তাঁর কথা শেষ হতে না হতে মাথায় ওপর একটা গুরু গুরু আওয়াজ শোনা গেল। সবাই বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল ওপর থেকে একটা হেলিকপ্টার ধীরে ধীরে নেমে আসছে! হেলিকপটার নামবার জন্য যেটুক সমতল ভূমি দরকার, ঘরটির পাশে তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে!

রাঙাদা ঠোঁট কামড়ে বললেন, 'ও বুঝেছি। তবে—'

সাহেবও বোধ হয় একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, বললেন, 'অন্য কিছু ভাববেন না। উই আর ফ্রেন্ডস্। লেট্স হ্যাভ এ কাপ্ অভ টি,তারপর আলাপ করব।'

সাহেবের রকমসকম দেখে আমরা তাজ্জব বনে গেছি। একটা অকর্ম যে সে করেছে তাতে ভুল নেই, কিন্তু সেজন্য কোন লজ্জা বা অনুশোচনা হচ্ছে বলে তো মনে হয় না! চালচলন দিব্যি স্বাভাবিক।

বারান্দায় চেয়ার টেবিল পাতাই ছিল, আমরা ইতস্ততঃ করতে করতে যেন নিজেদের অজ্ঞাতসারেই গিয়ে সেখানে বসে পড়লাম। ভিতর থেকে টুংটাং পেয়ালার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। পরক্ষণেই দরজার ফাক দিয়ে কে যেন উঁকি দিল। সাহেব তাকে সরে যেতে ইশারা করলে সে বোধ হয় তা বুঝতে পারল না। আবার এসে উঁকি দিল কৌতূহলের সঙ্গে। এবার আর আমার চিনতে কোন ভুল হল না। সেই লম্বা লোক, সেই লম্বা আঙুলওয়ালা পা আর খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফওলা মানুষের মত মুখ। এ সেই আশ্চর্য জীব, যেটিকে সেদিন আমি আর কপিল অকস্মাৎ গাছের ওপর আবিষ্কার করেছিলাম।

সাহেবের সঙ্গে রাঙাদার অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল। জানা গেল সাহেবটির নাম ডক্টর ভিলহেল্‌ম্ স্মিট্। বাড়ি ভিয়েনা। পেশায় ডাক্তার এবং বিখ্যাত অস্ত্র চিকিৎসক। গ্রাফ্‌টিং নিয়ে দীর্ঘদিন রিসার্চ করছিলেন এবং এ ব্যাপারে আশ্চর্য সাফল্যও দেখিয়েছেন। কারও কান বা নাক বা হাত পা কেটে গেলে অপরের শরীর থেকে তা কেটে নিয়ে বেমালুম জুড়ে দেওয়া তাঁর কাছে কিছুই না। ইদানীং তিনি গ্রাফটিং করে এক জানোয়ারের সঙ্গে অন্য জানোয়ারের আধাআধি জুড়ে দিতেও সক্ষম হয়েছেন। প্রথম এক টিকটিকির গায়ে অন্য টিকটিকির কাটা গা জুড়ে কাজ শুরু করেন। তাতে সাফল্য লাভ করার পর আর একটু বড় জানোয়ার নিয়ে পরীক্ষা চালান। এই ভাবে গিনিপিগের সঙ্গে খরগোসের, মেঠো ইঁদুরের সঙ্গে বেড়ালের, এমন কি কুকুরের সঙ্গে ভেড়ার শরীর জুড়ে দিয়ে অসাধ্য সাধন করেছেন। অবশ্য ঐসব কাজ সম্পন্ন করতে তাঁকে দীর্ঘ সময় বিচ্ছিন্ন দেহগুলোকে কৃত্রিম উপায়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয়েছিল। আর এ কাজ একবারেও সম্ভব হয় নি। প্রতিক্ষেত্রেই বিশ ত্রিশটি করে জীবকে তাঁর এই রিসার্চ-এর জন্য প্রাণ দিয়ে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি খোদার ওপর এই খোদকারিতে সাফল্যই লাভ করেছিলেন।

এর পর তাঁর এক বিচিত্র সাধ হল। এবার পরীক্ষা চালাবেন মানুষের ওপর। মানুষের দেহের সঙ্গে অন্য কোন প্রাণীর, মানুষের সঙ্গে চেহারায় যার খানিকটা মিল আছে এমন কোন প্রাণীর দেহাংশ জোড়া লাগিয়ে নতুন সংকর প্রাণী তৈরি করা যায় কিনা তাই দেখবেন পরখ করে। কিন্তু ইয়োরোপের মতো সভ্য দেশে বসে তে আর একাজ চালানো যায় না। কে আসবে তাঁর কাছে এই পরীক্ষার উপাদান হতে? তাই তিনি ঠিক করলেন এমন কোন জায়গায় গিয়ে তাঁর পরীক্ষা চালাবেন যেখানে এমন জংলী মানুষ বাস করে যাকে অন্যেরা মানুষ বলেই মনে করে না। অর্থাৎ যেখানে মানুষের প্রাণের কোনই মূল্য নেই।

কোথায় পাবেন সে রকম জংলী মানুষ? প্রথমেই তাঁর আফ্রিকার কথা মনে হয়েছিল। আফ্রিকার লোকেরা এখন ধীরে ধীরে সভ্য হতে শুরু করলেও এখনও সেখানে বনে জঙ্গলে এমন অনেক মানুষ বাস করে যারা নামেই মানুষ, সভ্য জগতের সঙ্গে এখনও তাদের কোন যোগাযোগ ঘটেনি। এই রকম একটা জায়গা হচ্ছে কঙ্গো দেশ। অর্থাৎ কঙ্গোর অরণ্য। প্রথমে সদলবলে সেখানেই চলে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু গিয়ে দেখলেন,

ব্যাপারটা যত সহজ ভেবেছিলেন ততটা সহজ নয়। ওখানকার জঙ্গলে লোকগুলো অসভ্য হতে পারে, কিন্তু ততোধিক হিংস্র। আশপাশের অন্য প্রাণীরাও। তারপর জায়গাটা এত অস্বাস্থ্যকর যে ঐ আবহাওয়ায় মানুষ হয় নি এমন লোকের পক্ষে ওখানে প্রাণ নিয়ে টিকে থাকাই দুষ্কর। তবু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পর পর নিজের বিশ্বস্ত সহকারীদের মধ্যে তিন তিনজনকে খুইয়ে তাঁকে কাজ অসমাপ্ত রেখেই সেখান থেকে পালিয়ে আসতে হয়।

কিন্তু জেদ তাঁর অলঙ্ঘ্য। যা করবেন মনে করেছেন তা করবেনই। খোঁজ খোঁজ করতে করতে শেষে তাঁর এক নৃতত্ত্ববিদ্ বন্ধুর কাছে খবর পেলেন ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশে এখনও এমন ২-১ টা গহন অরণ্য আছে যেখানে কোন কোন জাতের জংলী মানুষ লোক চক্ষুর আড়ালে থেকে শুধু নিজেদের সমাজের গণ্ডীর মধ্যেই বাস করে। শুধু তাই নয়, ঐ অঞ্চলের কাছাকাছি এক রকম বড় জাতের বানরও দেখতে পাওয়া যায় যারা আকৃতিতে বড় হলেও স্বভাবে ভারী নিরীহ। ব্যাস, স্মিট সাহেব তাঁর প্রোগ্রাম স্থির করে ফেললেন।

তারপর কি করে ভালোমানুষ সেজে বেড়াবার নাম করে ভারতে এসে শেষে নিজস্ব হেলিকপ্টারে তিনি এই জঙ্গলটি আবিষ্কার করেন এবং সঙ্গীসাথী এনে সেখানে জঙ্গল সাফ করে কাঠটাঠ কেটে ঘরদোর বানিয়ে, যন্ত্রপাতি বসিয়ে তথাকথিত রিসার্চ এর সাজসরঞ্জাম, মায় অপারেশন থিয়েটার সমেত পুরো একটি গবেষণাগার তৈরি করে ফেললেন, সে এক বিরাট কাহিনী। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তিনি ঐ জংলী মানুষদের আস্তানা খুঁজে বার করে, তাদের উপহার-টুপহার দিয়ে প্রলুব্ধ করে কিংবা অন্য কোন পর্যায়ে পোষ মানিয়ে, তাদেরই একজনের দেহে অস্ত্রোপচার করে তার দেহের নীচের দিকটায় ঐ বড় জাতের বানরের দেহাংশ গ্রাফটিং করে জুড়ে দিতে সমর্থ হলেন। অবশ্য এই পরীক্ষার জন্য কতজন জংলীমানুষ আর বানরকে প্রাণ দিতে হয়েছিল তার কোন হিসেব পাওয়া যায়নি, তিনিও বলেন নি। তবে এটা ঠিক, কাজটা করা হয়েছিল গোপনে এবং অনেক দিন ধরে, সম্ভবতঃ রাঙাদা এখানে আসবার বহুআগে। তবে ঐ ভারত সরকারের অনুমতি পত্রটত্র সব বাজে কথা, ভাঁওতা ছাড়া কিছু নয়। রাঙাদা ভালোমানুষ বলে
ওগুলো দেখতে চাননি। চাইলে সাহেব খুবই মুশকিলে পড়তেন সন্দেহ নেই।

আমরা সেদিনকার মতো ফিরে এলাম। আমার আর বেশিদিন অপেক্ষা করার মতো ছুটি ছিল না, কপিলেরও না। রাঙাদা এর পর কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন কিংবা নেবেন বলে ঠিক করেছিলেন তা এখনও জানতে পারি নি। তবে স্মিট সাহেব দুনিয়ার চোখে যত বড় অপরাধই করে থাকুন, তিনি যে সার্জারি ইতিহাসে একটা অকল্পনীয় নজির রেখে গেলেন তা স্বীকার না করে উপায় নেই। এ যেন সুকুমার রায়ের কল্পনার সেই হাঁস আর সজারু মিলে হাঁস জারুর সৃষ্টি। কিংবা, আরও ভালো করে বললে, সেই গাইবাবুর গল্প। গল্পটা যারা শোনে নি তাদের না হয় বলে দিচ্ছি।

একবার এক কেরানীবাবু আর একটা গরু একসঙ্গে রেললাইন পার হতে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে। সেখানে একজন ওস্তাদ ডাক্তার ছিলেন যিনি কাটা দেহ জুড়ে দিয়ে লোকদের বাঁচিয়ে দিতে পারতেন। এক্ষেত্রেও ওদের বাঁচিয়ে দিলেন। কিন্তু তাড়াতাড়িতে একটা ভুল হয়ে গেল। কেরাণীবাবুর ওপরের দিকটার সঙ্গে গরুর নিচের দিকটা জোড়া হল, তেমনি

গরুরও নিচের দিকটাও হল কেরাণীবাবুর নিচের দিকটার সঙ্গে যুক্ত। কেরাণীবাবু ঐ নতুন চেহারায় রূপান্তরিত হওয়ায় তার নাম হয়ে গেল, “গাইবাবু”। শুধু এখানেই গল্পের শেষ নয়। সেই থেকে কেরাণীবাবু খুর পায়ে খুটখুট করতে রোজ অফিসে যেতেন আর বিকেলে বাড়ী ফিরে দু’সের করে দুধ দিতেন।

প্রথম প্রকাশ: ফ্যানট্যাসটিক, অগাস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৮২

সূচিপত্রে ফিরে যান

শিলাকান্থ

ডক্টর দিলীপ রায়চৌধুরী

এ জায়গাটা আমার ভারী ভাল লাগে। সমুদ্র যেন কবে আপন খেয়ালে এই পাহাড়ে ঘেরা নির্জন খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। তারপর আর বেরোতে পারে নি, জোয়ারের সময় দুই পাহাড়ের মাঝখানে ঐ সিংহদুয়ারের মতো পথ দিয়ে হু হু করে জল ছুটে আসে। তারপর নিষ্ফল আক্রোশে সারাদিন পাথরের গায়ে মাথা খুঁড়ে মরে।

জাহাজ কোম্পানীর লোকেদের বুদ্ধি আছে। বন্দর অনেকটা দূরে। তবুও এই অঞ্চলের বিশেষ আকর্ষণের দিকে লক্ষ্য রেখে সাগরের মুখোমখি একটা টিলার উপর সুন্দর বিদেশী কায়দায় হোটেল বানিয়েছে। বর্ষাকাল ছাড়া বাকী আট-ন মাস হোটেলটা লোকে গিজ্ গিজ্ করে। জাহাজের যাত্রীরা ছাড়াও দূর-দূরান্তর থেকে লোকের ছুটি কাটাবার জন্য এখানে আসে। বিশেষতঃ অক্টোবর থেকে জানুয়ারী এখানে ঠাঁই মেলাই মুস্কিল।

অফিসের কাজে এ অঞ্চলে এলেই আমি এখানেই উঠি, শহরের ভেতর গরমে পচবার চাইতে এ ঢের ভাল। সঙ্গে অপিসের জীপখানা যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ দূরের পথ আর গায়ে লাগে না। উপকূলে ছড়ানো কফি ও রাবার প্লান্টেশানেই আমার কাজ। এক একদিনে পঞ্চাশ কি একশো মাইল দূরে আসি। তারপর সন্ধ্যায় হোটেলের পোর্টিকোতে যখন পা ছড়িয়ে নিম্বুপানি হাতে নিয়ে বসি, দূরে মাঝ সমুদ্রের জাহাজের আলোগুলো একে একে জ্বলে ওঠে।

সেবারে ঠিক করেছিলাম অফিসের কাজ শেষ করে দিন সাতেক ছুটি নিয়ে এই হোটেলটায় কাটাবো। অনেকদিনের এক গাদা লেখার কাজ জমে রয়েছে। কোলকাতায় আড্ডার নেশায় হয়েই ওঠে না। সেপ্টেম্বর মাস—কোলকাতায় কাজের চাপ কম, স্নেহপ্রবণ ম্যানেজার এক কথাতেই রাজী হয়ে গেলেন।

সবে বর্ষা শেষ হয়েছে, আবহাওয়া ভারী চমৎকার, সমুদ্রে চান করেও আরাম। রোদ্দুরে হাত-পা ছড়িয়ে বসে থাকলেও গা পুড়ে যায় না। দিন কাটছে বেশ, হোটেলের লবিতে বসে সারা সকাল কলম কামড়াচ্ছি। এক লাইন লেখা বার করে কার সাধ্য, কোনও রকমে আর মিনিট পনেরো কুড়ি কাটিয়ে দিতে পারলেই লাঞ্চ, তারপর খেয়ে-দেয়ে দিব্যি তোফা এক ঘুম।

হঠাৎ মনে হল হন্ হন্ করে যেন এক পরিচিত ভদ্রলোক পাশ দিয়ে ডাইনিং হলের দিকে বেরিয়ে গেলেন। মিনিট পাঁচেক বাদেই সন্দেহ ভঞ্জন হল। ঠিক ধরেছি, হলের এক প্রান্তে একটি ছোট টেবিলে আপন মনে খেয়ে চলেছেন আমাদের অতি পরিচিত অধ্যাপক সুশোভনবাবু।

কি ব্যাপার, এখানে কি মনে করে স্যার! আমার দিকে না তাকিয়েই উনি বললেন—কেন, সমুদ্র, কি আমাদের টানতে পারে না নাকি। কলেজ জীবন সে কবেকার কথা, আমাদের ছোট কলেজে পড়াতেন বলে ভুলেই গিয়েছিলাম সুশোভনবাবু একজন উচ্চ

শিক্ষিত ম্যারিন বাইওলজিষ্ট। দেশ স্বাধীন হবার ক'বছর বাদেই সরকারী সামুদ্রিক জীব বিজ্ঞানের দপ্তরে যোগ দেওয়ার পর উনি আমেরিকার ম্যাসাচুসেটসের উড্‌স হল ল্যাবরেটরীতে কাজ করে বেশ নামও করেছিলেন। এখন আন্তজাতিক সংস্থার চেষ্টায় সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে যে সব গবেষণা চলছে, সুশোভনবাবু তার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত।

সময় কাটাবার এ রকম একজন অভাবিত সঙ্গী পেয়ে ভীষণ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম। ভারতীয় নৌবাহিনীর চন্দ্রশেখর জাহাজখানাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ভারত মহাসাগরের উপকূলে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজের জন্য। সুশোভনবাবু সেই গবেষক গোষ্ঠীর প্রধান। সারাটা দিন জাহাজেই কাটান, কেবল খাওয়ার জন্য কিছুক্ষণ ফেরেন। কখনো সখনো দূরের পাড়ি হলে জাহাজেই কদিন কাটে।

সন্ধ্যার পর একা একা হোটেলের লবিতে বসে কোলকাতার প্লেনে সদ্য আমদানী ষ্টেটসম্যান কাগজখানায় চোখ বুলিয়ে দেখছি এমন সময় সুশোভনবাবু এলেন। চান-টান করে মেজাজ বেশ শরীফ মনে হচ্ছে।

মাফ কোরো সঞ্জয়, সকালে তাড়াহুড়োয় তোমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলা হয়ে ওঠে নি। কিছু মনে করোনি ত?

না স্যার, আমি বুঝতেই পেরেছিলাম, কিন্তু আমি কেবল ভাবছি কোথায় সেই ল্যাবরেটরী আর কোথায় জাহাজের ডেক? এ জীবন আপনার কেমন লাগছে স্যার?

কোনোদিন পাহাড়ে চড়েছ সঞ্জয়? উঁচু পাহাড়ে চড়ার যে উত্তেজনা মহাসাগরের তলায় ব্যাথিস্ফিয়ারে নেমে যাওয়া তার চেয়ে কম উত্তেজক নয়।

আস্তে আস্তে গল্প জমে গেল, সুশোভনবাবু অদ্ভুত বলতে পারেন।

সমুদ্রের রৌদ্রালোকিত উপর তলার এবং একেবারে নীচেকার পাহাড় ও উপত্যকার মাঝখানেই মহাসাগরের সবচেয়ে অজানা অংশ। এই গভীর অন্ধকার রহস্যময় সাম্রাজ্যের সঠিক খবর সংগ্রহ করাই এই শতাব্দীর ওশিওনোগ্রাফারদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে এই রহস্যভেদ করার কাজে আমাদের
ক্ষমতা কতটুকু! ডুবুরীরা অক্সিজেন সিলিণ্ডার নিয়ে ৩০০ ফুট পর্যন্ত যেতে পারে। বিশেষ হেলমেট ও রাবারের পোশাক পরে মেরে-কেটে আরও কিছুটা নিরন্ধ্র অন্ধকারের রাজ্যে যেতে গেলে ব্যাথিস্ফিয়ার ছাড়া গতি নেই। প্রায় ত্রিশ বছর আগে দুজন আমেরিকান প্রায় আধ মাইল পর্যন্ত ব্যাথিস্ফিয়ারে নামতে পেরেছিলেন। তার চেয়ে উন্নত ধরনের ষ্টিল স্ফিয়ার এখন তৈরি হয়েছে যাতে আরও তলায় যাওয়া যায়।

...আচ্ছা এক কাজ করা যাক। তুমি কাল আমার সঙ্গে চলো না, আমাদের জাহাজটা দেখে আসবে। ব্যাথিস্ফিয়ার ছাড়া আমাদের আরও ইন্টারেষ্টিং যন্ত্রপাতি আছে। সমুদ্রতলের জন্য উন্নত ধরনের কামেরা, প্রতিধ্বনি যন্ত্র, অ্যাসকানিয়া গ্রাফ সমুদ্রের গ্রাভিমিটার—যা দিয়ে কিনা সমুদ্রের তলাকার মাধ্যাকর্ষণের তারতম্য বুঝতে পারি—এই সব নানা কিছু। কাল সকালেই চলো কেমন? রাত হয়ে গেছে, চলো খেয়ে নেওয়া যাক।

ভীষণ উৎসাহিত হয়ে পড়লাম, এ যে মেঘ না চাইতে জল। এর চেয়ে ছুটি কাটাবার ভাল সুযোগ আর কি হতে পারে। চুলোয় যাক লেখা। উত্তেজনায় রাত্তিরে ঘুম এলো না।

সকাল এখানে দেখবার মতো, পাহাড়ের ওদিকটা দিয়েই আমাদের ঘুরে যেতে হবে।

ওঁদের জাহাজটা হার্বার থেকে প্রায় মাইল দশেক দূরে নোঙর করা হয়েছে। সমুদ্রের কোল ঘেঁষে অপূর্ব মসৃণ পথ। ডাইনে সমুদ্রের দিকে যতদূর নজর যায় দু একটা সী গাল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। খালি একপাশে একটি আলোকস্তম্ভ সকালের কাঁচা রোদে চিক্ চিক্ করেছে।

'চন্দ্রশেখর' জাহাজের কাছাকাছি আসতেই সুশোভনবাবু নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন: তোমাকে যে নিয়ে যাচ্ছি সঞ্জয়, এটা সম্পূর্ণআমার নিজের দায়িত্বে। ওখানে আমার এ্যাসিষ্টান্ট অমরেশ তোমার সহপাঠী ছিল, সে ছাড়া আর কেউ তোমাকে চেনে না। সরকারী ঝামেলা এড়াতে তোমাকে সদ্য আমেরিকা প্রত্যাগত ডঃ বোস বলে পরিচয় দেবো। ওদের কাছে তুমি একজন নাম করা বৈজ্ঞানিক বলেই প্রতিভাত হবে।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে অনেকটা উঠতে হল। জাহাজের ডেকে দু একজন সাধারণ খালাসী ঘষা মাজা করছে, এছাড়া প্রাণের আর বিশেষ সাড়া নেই। কেবিনের মধ্যে ঢুকে দেখি কে একজন কানে হেডফোন লাগিয়ে কি শুনছে এবং তাকে ঘিরে প্রায় জনা দশ পনেরো চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে। ভীড়ের মধ্যে অমরেশকে চিনতে কষ্ট হল না। সে আমাকে বিশেষ লক্ষ্য না করে সুশোভনবাবুর দিকে
এগিয়ে এল, তার গলায় ঈষৎ উত্তেজনার আভাস।

স্যার, কি এক অদ্ভুত আওয়াজ আসছে হাইড্রোফোন মারফৎ! কখনো মনে হচ্ছে ক্রুদ্ধ পশুর গর্জন, কখনো মনে হচ্ছে বাঁশ ঝাড়ে আগুন লেগেছে—কাঁচা বাঁশ ফাটার আওয়াজ!

সুশোভনবাবু একটু বিরক্ত হয়ে বললেন: এখানে এত ভীড় কেন? তোমরা সকলে যে যার কাজে যাও। গোয়েল, প্লিজ, হেডফোনটা আমাকে দাও।

আস্তে আস্তে কেবিনটা খালি হয়ে গেল। সুশোভনবাবু হেডফোন কানে দিয়ে চিন্তিত মুখে মাঝে মাঝে কি যেন নোট করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ বাদে হেডফোনটা নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলেন: অমরেশ, যেখানে হাইড্রোফোনটা রয়েছে তার গভীরতা কত হবে?

স্যার, পঞ্চাশ ফ্যাদমের বেশী হবে না।

মাত্র! ভাবিয়ে তুললে ত, আওয়াজটা কোনো বড়-সড়ো সামুদ্রিক জীবের হলে আমরা আগে জানতে পারতুম, কারণ একোসাউন্ডিং-এ তাহলে দুটো প্রতিধ্বনি আসতো। আচ্ছা ও জায়গাটার টোপোগ্রাফি আমরা কি জানি?

স্যার, ঐ টোপোগ্রাফিকাল ম্যাপটা আমরা কালকেই শেষ করেছি। যেখানে জাহাজটা আছে সেটা মহাদেশের ঢালু অংশের প্রান্তে। এরপর অগভীর অংশটা খুবই এবড়ো-খেবড়ো, অবশ্য পঞ্চাশ কিলোমিটার এগোলে এটা মসৃণ হয়ে এসেছে।

আমি বিস্মিত হয়ে ওদের ম্যাপটা দেখছিলাম, ভীষণ খেটেছে বলতে হবে। উপকূল থেকে পাঁচশো কিলোমিটার পর্যন্ত সমুদ্রতলের খুঁটিনাটি অনেক কিছু জেনে ফেলেছে। কোথায় কি ধরনের সেডিমেন্ট আছে, সেডিমেন্টের তলায় কি ধরনের পাথর সবই এক ঝলকে বোঝা যায়।

ঘণ্টা দু-তিন কাটতেই বুঝলাম সুশোভনবাবু আমার অস্তিত্ব বেমালুম ভুলে গেছেন। সেই যে কখন একবার কফি খেতে খেতে দু-একজনের কাছে আমাকে ডঃ বোস বলে

পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তারপর একেবারে নিজের কেবিনে। আমিও বিশেষ ঘাঁটাতে সাহস পাচ্ছি না।

জাহাজের ডেকে অবশ্য বিশেষ খারাপ লাগবার কথা নয়। একটা ডেক চেয়ারে বসে উপভোগ করছি সমুদ্রের হাওয়া। দূরে কয়েকটা জেলে ডিঙিতে নুলিয়ারা জাল ফেলে মাছ ধরছে।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম দূরের একটি ডিঙিতে যেন কিসের একটা উত্তেজনা। একটি নুলিয়া তার পাশের সঙ্গীকে নিয়ে যেন কি এক অজানা ভয়ে বিপর্যস্ত। পাশের কেবিনে গোয়েল ছিল। ওর সঙ্গে ইতিমধ্যেই আমার আলাপ হয়ে গিয়েছিল।

ওকে বললাম, গোয়েল, প্লিজ, বাইনোকুলারটা একবার দেবে।

বাইনোকুলার লাগিয়ে দেখি ইতিমধ্যে নুলিয়ার হাত নেড়ে ওদের আশপাশের বেশ কিছু সঙ্গী সাথীদের জড়ো করেছে। সবাই মিলে উপুড় হয়ে নৌকোর খোলের মধ্যে কি যেন দেখছে।

কৌতূহল আর রাখতে পারলুম না। ডেকে লাইফ বোটের অভাব নেই। নাবিক-লস্কর নিতান্ত কম নয়, সোজা গিয়ে সুশোভনবাবুকে বললাম : স্যার, চুপচাপ বসে আছি, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে দুজন লোক নিয়ে একটা নৌকোয় কিছুক্ষণ ঘুরে আসি।

সুশোভবাবু অন্যমনস্কভাবে বললেন : সে তো ভালই, কিন্তু বেশী দূরে যেও না। আর একটা কথা। চারটের আগেই ফিরে এসো, কারণ তোমার সঙ্গে হোটেলে ফিরে গিয়ে আমাকে কয়েকটা ট্রান্স-কন্টিনেন্টাল টেলিফোন করতে হবে।

জেলেদের নৌকোটাকে ধরতে কুড়ি মিনিটের বেশী সময় লাগলো না। সমুদ্র যেন শান্ত হ্রদ। মাল্লারা ওদের ভাষা জানে। সরকারী জাহাজ থেকে দেখতে এসেছে শুনে ওরা সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়ালো। যা দেখলাম, অবশ্য তা কোনদিন কল্পনাও করিনি।

একটা অবিশ্বাস্য মাছ—না জন্তুও বলা যায়। প্রায় পাঁচ ফুটের মতো লম্বা হবে; বিচিত্র ধরনের উজ্জ্বল নীল আঁশ, এক অস্বাভাবিক বিরাট মাথা, পাখা, লেজ, সব জড়িয়ে যেন প্রাগৈতিহাসিক কাহিনীর পৃষ্ঠা থেকে নেমে এসেছে। দেখলে গা শিরশির করে।

মাল্লাদের বললাম : ওদের বুঝিয়ে দাও গভর্মেন্ট এ মাছ কিনে নেবে। এ রকম হিংস্র জীব এদের কাছে থাকা ঠিক নয়। মাছটা তখনও অল্প নড়ছে। ওটাকে জাল মুড়ি দিয়ে লাইফ বোটে তুলতে চারজন লোক হিমসিম। জাহাজের উপরে তুলতে বেগ পেতে হল না। ভাগ্যে ছোট ক্রেনের বন্দোবস্ত ছিল। ইতিমধ্যে ডেকে এক উৎসুক ভীড়। কখন কে যেন সুশোভনবাবুকে খবর দিয়েছে। তিনি ভীড় সরিয়ে এসে থমকে দাঁড়ালেন, যেন ভূত দেখেছেন। অস্ফুট স্বর তাঁর মুখ দিয়ে বেরোলো : মাই গড, শিলাকান্থ! ছ'কোটি বছর আগে এদের যে ফুরিয়ে যাবার কথা!

সকলে প্রায় পাঁচ মিনিট বিস্ময়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্থাণু, হঠাৎ সুশোভনবাবুর গলার আওয়াজে সম্বিৎ ফিরলো।

শিগগির, এখনো বেঁচে আছে, আর কয়েক মিনিটের মধ্যে হয়ত মারা যাবে। তার আগে নিয়ে চল জাহাজের একোয়ারিয়ামে।

এ জাহাজে যে এত সুন্দর একটা একোয়ারিয়াম আছে কে জানতো। জলের

তাপ প্রয়োজনানুযায়ী বাড়ানো কমানো যায়। এই অদ্ভুত জীবটার প্রয়োজন মতো পরিবেশ সৃষ্টি করতে খুব বেশী সময় লাগলো না। যখন আবার স্বাভাবিক ভাবে মাছটা চলাফেরা করতে লাগলো, বেশ কয়েক জোড়া উৎসুক চোখ ওর দিকে সে সময়ে নিবদ্ধ। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি, একোয়ারিয়ামের মধ্যে একটা ছোট হাইড্রোফোন লাগানো। সুশোভনবাবুর কানে হেডফোন এবং মুখের চেহারায় যেন কোন এক দুরূহ সমস্যা সমাধানের আনন্দের চিহ্ন।

হোটেলে ফিরে যাওয়া আর হল না। সারা বিকেল সারা রাত ধরে ওঁরা শিলাকান্থ সম্পর্কে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন। মেটাবলিজম্, রেসপিরেসন রেট আরও কতও কি সব জৈব রাসায়নিক ব্যাপার। সে রাতে কারোরই ভাল করে ঘুমানো হল না! ভোরবেলায় দেখি বিরাট তোড়জোড় চলেছে। যে জায়গায় হাইড্রোফোন মারফৎ ঐ সব বিচিত্র আওয়াজ আসছিল সেখানে ব্যাথিস্ফিয়ার নামিয়ে দেখা হবে। কি করে যে ঐ ব্যাথিস্ফিয়ারে যাত্রী হওয়া যায় তাই ভাবতে ভাবতে আস্তে আস্তে সুশোভাবাবুর কেবিনের দিকে গেলাম।

কেবিনের দরজা ভেজানো ছিলো। নক্ করতেই আওয়াজ এলো : কাম ইন, ওঃ তুমি, দেখতো কি কাণ্ড! ছুটিতে বেড়াতে এসে তুমি কিসের মধ্যে পড়ে গেলে। যাই হোক ডক্টর বোস, জাহাজের প্রত্যেকটি কর্মীর কাছে তুমি এখন একজন অত্যন্ত নাম করা লোক, তোমার অনুসন্ধিৎসায় আমরা বিবর্তনের একটা হারানো সূত্র খুঁজে পেয়েছি।

আমি একটু লজ্জিত হয়ে পড়লাম : সে কি কথা স্যার? আমি আবার কি করলুম?

এটাকে চিনতে পারা তো খুব সহজ কথা নয়।

সেটা ঠিকই, যদিও পৃথিবীর বহু মিউজিয়মে শিলাকান্থের ফসিল সংগৃহীত হয়েছে, আগে কেবলমাত্র দুবার সজীব প্রাণীর দেখা পাওয়া গেছে।

প্রথম ১৯৩৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে। সেবারে যে জেলের দল এই জীবটিকে ধরেছিল বিজ্ঞানীরা জানবার আগেই তারা ওটাকে কেটেকুটে শেষ করে ফেলে। তারপর ১৯৫২ সালে মাদাগাস্কারের কাছে যেটিকে পাওয়া যায় তার সম্পর্কেও পুরো গবেষণা হয়নি।

আমরা জানি ফসিল হিসাবে অন্ততঃ ছ'কোটি বছর আগে এরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু অন্ততঃ ত্রিশ কোটি বছর আগে যে এদের পূর্ব পুরুষরা প্রাগৈতিহাসিক সমুদ্রে বিচরণ করতে এ কথা জোর করে বলা যায়। সেই দিক থেকে এরা ডিনোসরসের চেয়েও বয়সে বড়!

শিলাকান্থ কথাটার অর্থ হল ফাঁপা মেরুদণ্ড। এই জাতের মাছ থেকেই সব রকমের মেরুদণ্ডী জীব—খেচর, ভূচর, উভচর উদ্ভূত হয়েছে, একথা আমরা একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবো। লক্ষ্য করে দেখেছো ওটার পাখনাগুলো ঠিক অন্য মাছের পাখনার মতো নয়, বরং কতকটা হাঁসের পায়ের মতো। যেন এখন উঠে আসবে ডাঙায়। অগভীর জলে ওদের পাওয়া গেলে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

আমার প্রশ্ন হল, এই যে একেকটা শিলাকান্থ ধরা পড়ছে এদের সত্যিকার বাসস্থল কোথায়? সমুদ্রের এত উপরতলাকার বাসিন্দা ওরা নয়। সেটা ওদের গায়ের আঁশের রং, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ধরন-ধারণ দেখলে বোঝা যায়...

...কিন্তু এখন আমাকে থামতে হবে। আমাদের ব্যাথিস্ফিয়ারে নামবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তা বেশ তো, তুমিও চল না।

বাইরে বেরিয়ে দেখি, শিলাকান্থের গল্পে এত তন্ময় হয়েছিলাম যে বুঝতে পারি নি জাহাজ নোঙর তুলে কতদূরে চলে এসেছে। ফেনায় ফেনা সাগর জাহাজের প্রোপেলারের ঘায়ে, গাং চিলের ভীড় করেছে খাবারের লোভে লোভে জাহাজের গায়ে।

কতদূর এসে যে জাহাজের গতি মন্থর হল তা বলতে পারি না। সূর্য তখন প্রায় মাথার ওপরে। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ।

ব্যাথিস্ফিয়ারের ভেতরকার বন্দোবস্ত ভারী চমৎকার। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, বসবার আসন পুরু গদি মোড়া। টেলিফোন, লেখার ডেস্ক, একপাশে সবই ব্যবস্থা আছে। প্রথমে সিঁড়ি বেয়ে ঢুকে গেল অমরেশ। ভেতর থেকে সিগন্যাল দেওয়ার পর সুশোভনবাবু, আমি ও রহমান বলে আরেকটি এ্যাসিষ্টান্ট একে একে ঢুকলাম। শুনতে পেলাম প্রেসারাইজড্ ঢাকনাটা ওরা বাইরে থেকে সশব্দে বন্ধ করে দিলো। এরপর ভেতরে এয়ার কন্ডিশনারের ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকের মতো আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যে উইঞ্চ-লিফটে ব্যাথিস্ফিয়ারে আমরা নামতে আরম্ভ করলাম।

দেখি হাত ঘড়িতে তখন প্রায় বেলা বারোটা। সুশোভনবাবু আগে একবার বলেছিলেন চারটের আগে উপরে উঠে ওঁকে আজ রাত্তিরের মধ্যেই হোটেলে ফিরতে হবে। আস্তে আস্তে ব্যাথিস্ফিয়ারের জানলায় সূর্যের আলো মিলিয়ে গেল। তবুও দেখি এক তীব্র লাল আভা জেগে রয়েছে। এখানে ওখানে দু-একটা সামুদ্রিক মাছ; কখনো বা ভাসমান শ্যাওলা। তারপর হঠাৎ কোন যাদুমন্ত্রে যেন সেই লাল আভা অদৃশ্য হল। পাশে মিটারে দেখি নেমেছি মাত্র দুশো ফিট। বাইরে এখন নীল সবুজে মেশানো যেন গাঢ় শীতল এক ভয়ের রাজ্য। ব্যাথিস্ফিয়ারের তীব্র আলোয় কখনো মাছের ঝুঁকি ত্রস্ত দ্রুতগতিতে এদিক থেকে ওদিকে চলে যায়। কত রকমের মাছ—কোনটা কাচের মতো স্বচ্ছ, এক্স-রে ছবির মতো অশরীরী। আবার কোনটার হাঙ্গরের মতো ধারালো দাঁত।

—ঐ যে ওগুলো এরোওয়ার্ম, তার পাশেরগুলো কম্বজেলী, সুশোভবাবু বলে যেতে লাগলেন। আমাদের দৃষ্টি যেন চুম্বকের মতো জানালায় আঁটা।

মনে শৈশবের অনেক প্রশ্ন চুপিসাড়ে যেন মাথা চাড়া দিতে লাগলো: মাছ কি করে গভীর সমুদ্রের তলায় অত চাপ সহ্য করে বেঁচে থাকে? এক একবার ভাবি সুশোভাবাবুকে জিজ্ঞেস করবো কিন্তু সাহস পাই না। উনি একেবারে নিমগ্ন হয়ে গেছেন।

সহসা এ্যালার্ম ঘণ্টার ঝন্ ঝন্ আওয়াজে আমরা সকলেই সচকিত হয়ে পড়লাম। কি ব্যাপার! কোনো ডুবো পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগলো নাকি। তাই বা কি করে হয়। অমবেশ তো সর্বক্ষণ রেডারের সামনে বসে কন্‌ট্রোল করছে এবং ওপরে গোয়েলকে নির্দেশ দিচ্ছে। এদিকে এমার্জেন্সী ল্যাম্পটা দপ্ দপ্ করে কি যেন জানাতে চাইছে।

—কুইক, অমরেশ, গোয়েলকে বলো আমাদের সাউথ-ওয়েষ্টে সরিয়ে নিতে আমরা নিশ্চয়ই কোনো বড় মাছের সঙ্গে সংঘর্ষে পড়েছি। এটা পাহাড়ের সংঘর্ষের চেয়ে অনেক বেশী বিপজ্জনক হতে পারে, কারণ অনেক মাছের লেজের ঝাপটায় পুরু ইস্পাতের পাতও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।

সুশোভনবাবুর ধারণা নির্ভুল। কয়েক মিটার সরে যেতেই সার্চ লাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেলাম সেই বিচিত্র উজ্জ্বল নীলমাছ—

শিলাকান্থ! অকস্মাৎ ধাক্কা লাগায় চোখ থমথমে ক্রুদ্ধ।

দেখুন স্যার, ওটা কোন একটা গহ্বর থেকে বেরিয়েছিল। দ্রুত সেইখানে ঢুকে যাচ্ছে! —অমরেশ প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো।

ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে গহ্বরের মধ্যে ঢুকছে সেটা একটা ডুবো আগ্নেয়গিরির গহ্বর। কবে কোন সুদূর অতীতে এই আগুন পাহাড়ের আগুন নিভে গিয়েছিল কে জানে! সার্চ লাইটের তীব্র আলোয় দেখা গেল যে গহ্বরের মুখটা যথেষ্ট বড়। প্রায় কুড়ি ফুট ব্যাসের এক বৃত্ত। শিলাকান্থটা মিলিয়ে যাবার পর সূচীভেদ্য অন্ধকারে আর কোনও প্রাণের সাড়া নেই।

অনেকক্ষণ আমরা নিস্তব্ধ হয়ে কাটালাম। আমাদের সকলের মধ্যেই প্রশ্ন—গহ্বরের মধ্যে আমরা... তাকিয়ে দেখি সুশোভনবাবু গভীর চিন্তামগ্ন। অবশেষে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে উনি বললেন: আমাদের নীচে নামতে হবে। রিস্ক কিছুটা আছে কিন্তু নাটকের শেষ দৃশ্য দেখতে হলে এছাড়া আর উপায় কি? কিছু না জানিয়ে গোয়েলকে খুব শান্তভাবে গাইড করো অমরেশ।

গহ্বরের মুখ বরাবর বাথিস্ফিয়ার ধীরে ধীরে নামতে শুরু করলো, ২৫০০ ফুট... ২৭০০ ফুট... কিছুদূর এগোনোর পর অন্ধকার যেন তরল হল। কোথা থেকে যেন আলো আসছে। অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ছোট গাছপালায় ভর্তি পাহাড়। কিন্তু সে গাছপালা পৃথিবীর কোনো পরিচিত চৌহদ্দির নয়। পাহারাগুলো ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সেগুলো গ্রানাইটের নয়, যেন প্রবালে পূর্ণ। আরও বোঝা যায় সেখানে অসংখ্য স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো তারামাছ লেগে রয়েছে। তাদের দেহ থেকে বিচ্ছুরিত আলো কেমন এক আলো-আঁধারি ভৌতিক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। প্রবাল ও অন্যান্য সামুদ্রিক গাছপালা দেখলে মনে হয় সমুদ্র এখানে খুব ঠাণ্ডা নয়।

সুশোভনবাবু হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বলতে আরম্ভ করলেন: একি! আমরা একেবারে প্রাগৈতিহাসিক পরিবেশে এসে পড়েছি। ঐ তো দ্যাখো, কাঁকড়ার মতো ওগুলো ক্রাষ্টাসিয়া গ্রানটোলাইট আরও কত কি? রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আমরা তখন দেখছি চোখের সামনে দিয়ে সিনেমার ছবির মতো সরে যাচ্ছে অসংখ্য অচেনা সামুদ্রিক প্রাণী। কোনটার পুরু আঁশ, কোনটা বুকে হাঁটা চিংড়ির মতো সাঁতারু কপালের মাঝখানে একটা বিরাট ভয়াল চোখ। সমুদ্রের উপরতলায় যা ভাবা যায় নি, বোঝা যায় নি সেই সব অবিশ্বাস্য জীব!

অমরেশ, লক্ষ্য করো সমস্ত প্রাণীগুলো যেন পুবদিকে চলেছে কোন এক অন্তঃশীলা স্রোতে ভর করে। জলের টেম্পারেচারটা একবার দেখ তো। অমরেশ অনেকক্ষণ মন দিয়ে কি সব মিটার যেন দেখল, তারপর চেঁচিয়ে উঠলো—গুড হেভেনস্ স্যার! সত্তর ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড! আর নামাটা কি...

ওর মুখের কথা মুখেই হয়ে গেল। দিগন্তে কোথায় যেন একসঙ্গে একশোটা বাজ পড়লো। কি হয়েছে কিছু বোঝবার আগেই চারদিকে যেন প্রচণ্ড আলোড়ন। প্রাথমিক বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে দেখি আমরা সকলেই ব্যাথিস্ফিয়ারের চারিদিকে ছিটকে পড়েছি। মাথাটা

কেমন ঝিম্‌ঝিম্ করছে... মনে হচ্ছে ব্যাথিস্ফিয়ারের ইস্পাতের দরজায় বিরাট এক গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে, সেখান দিয়ে জল ঢুকছে কুলকুল করে। ক্রমে সেই জল যেন আমার মাথা বেয়ে জামার মধ্যে ঢুকছে... হাত দিয়ে দেখি জল নয় রক্ত! পড়ে গিয়ে দেখি ধাক্কায় কেটে গিয়েছে। সেই চেতন-অর্ধচেতন অবস্থার মধ্যে দেখলাম সমুদ্রের তলা থেকে বিস্ফোরণের বেগে উঠে আসছে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো উৎক্ষিপ্ত মাটি, পাথর। পাহাড়ের প্রান্ত থেকে ভয়ার্ত চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে যেন এনসাইক্লোপিডিয়ায় দেখা প্রাগৈতিহাসিক ছবির জীবন্ত প্রতিমূর্তি: ইক্‌থাইওসর! হাড়ের খাঁচায় ঢাকা চোখ, তেকোণা ধারালো দাঁত অস্পষ্ট আলোয় ইস্পাতের ফলকের মতো চক্‌চক্ করছে, বীভৎস লম্বা গলা ও পাখনাওয়ালা সামুদ্রিক সরীসৃপ—প্লেসিওসর... সেই প্রবাল পাহাড় খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়ছে! যেন কোন আহত দানবের অসংখ্য ক্ষতস্থান দিয়ে রক্তপ্রবাহের মতো সেই পাহাড়ের বিদীর্ণ জায়গাগুলো দিয়ে বেরিয়ে আসছে গরম আগুনের মতো লাভা স্রোত...

মনে হল বর্ষার নদীতে চান করতে নেমেছি। প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে, আমার নাক, কান ও মুখ দিয়ে প্রমত্ত বেগে জল ঢুকছে। ভেসে থাকতে পারছি না। আমি ডুবছি, চোখ খোলবার চেষ্টা করলেই ঘোলা জলে সবকিছু মুছে অন্ধকার করে দিচ্ছে। অবসাদে সমস্ত শরীর শিথিল... ঘুমে সমস্ত শরীর ভেঙে পড়ছে দীর্ঘ, ক্লান্ত দিনের শেষে ঘু... ম...

তারপর কখন চোখ খুলেছি জানি না। দেখি একটা খোলা জানালার পাশে শুয়ে আছি। বাতাসে জানালার পর্দাটা অল্প অল্প দুলছে। একটি ছোট টিপয়ে ফুলদানীতে সুন্দর ফুল সাজানো। পরিষ্কার ইংরাজীতে শাসনের সুরে নারীকণ্ঠে কে যেন বলছে:

এখন কিন্তু মোটেই ওঠার চেষ্টা করবেন না, শরীর আপনার ভীষণ দুর্বল।

মাথায় আমার পুরু ব্যাণ্ডেজ, কোনো এক তীব্র ওযুধের গন্ধে সমস্ত ঘর ভরে আছে।

কোথায়? কোথায় আমি?

এটা হার্বার হস্‌পিটাল।

সংক্ষেপে আমাকে আশ্বস্ত করে মেয়েটি চলে গেল। বোধ করি কঠিন নার্স হবে। কিছুক্ষণ বাদেই নার্সটি ফিরে এলো। সঙ্গে সুশোভনবাবু ও অমরেশ।

এই যে সঞ্জয়! এখন কি রকম বোধ করছো, বাপরে তুমি যা ভাবিয়ে তুলেছিলে। তোমার ছাড়া আমাদের কারো আঘাতই গুরুতর হয় নি।

অমরেশের কপালে ছোট একটা প্লাষ্টার লাগলো। ও বললে: ভাগ্যিস বিদ্যুৎ আমাদের আচ্ছন্ন মস্তিষ্কের চেয়ে দ্রুত কাজ করে তাই, আমাদের বিপদের সঙ্কেত কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে গোয়েলের কাছে পৌঁছে যায়। আমার হাতে সব সময় একটা কর্ড নিয়ে এমার্জেন্সী এলার্মটা বাঁধা থাকতো, পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওপরে খবরগেছে।

হাসপাতালে কদিন কাটিয়ে হোটেলে ফিরেই কোলকাতা যাবার গোছগাছ আরম্ভ করেছি। কাল সকালের প্লেনেই যাবো। সেদিন রাত্রে 'চন্দ্রশেখর' জাহাজে সব অফিসারদের খেতে বলেছি। খাওয়াদাওয়ার পর আমাদের প্রিয় পোর্টিকোতে বসে কফি খাচ্ছি সকলে মিলে। রাত্রি দশটার পর হোটেল এখন নির্জন হয়ে গেছে। আমরা ছাড়া কেউ বোধ হয় জেগে নেই।

সুশোভনবাবুকে জিগ্যেস করলামঃ স্যার সমুদ্রের এ কাহিনী কাকেই বা বলবো, কেই বা বিশ্বাস করবে। তবুও নিজের মনটাকে পরিষ্কার করবার জন্য একটা প্রশ্ন করি: যা আমরা দেখেছি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি? বিবর্তনের রাস্তায় কোটি কোটি বছর আগেকার প্রাণীদের ওভাবে টিকে থাকবার উপায় কি?

দুঃখের কথা সঞ্জয়, একটা ডুবন্ত আগ্নেয়গিরির আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতে ওরা ধ্বংস হয়ে গেল। এমন কি আমাদের ক্যামেরার ছবিগুলো পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেল—নইলে আমাদের এই তথ্য পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজে এক দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি করতো। প্রায় একশো বছর আগে ইংল্যান্ড থেকে 'চ্যালেঞ্জার' জাহাজে চড়ে বিজ্ঞানী দল গভীর সমুদ্রের তলায় যে প্রাণের সাড়া আছে তার প্রমাণ স্বরূপ নানা জাতের বিদঘুটে মাছ সংগ্রহ করেন। তার মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক কিছু বিশেষ ছিল না, যদিচ যা তাঁরা এনেছিলেন মানুষের চোখে তা অতি অদ্ভুত ঠেকেছিল অর্থাৎ পরিচিত চৌহদ্দির কিছুই নয়।

আমার মনে হয় সমুদ্রের গভীরে প্রাণীদের বসবাস সময়ের হিসাবে অপেক্ষাকৃত আধুনিক। অগভীর জলে যাদের জন্ম সমুদ্রের তলায় খাপ খাইয়ে নেওয়া তাদের পক্ষে কঠিন। শীতল অন্ধকার আবর্তে অত গভীর চাপে প্রাণী বাঁচে কি করে? অবশ্য আস্তে আস্তে সইয়ে নিয়ে কিছু মাছ সমুদ্রের তলায় বাস করছে বটে কিন্তু তাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য।

অন্যদিকে এমন যদি হয় যে সমুদ্রতলে অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত ও নিম্নচাপের একটা এলাকা অনেকদিন ধরে বজায় রয়ে গিয়েছে, যে সব সামুদ্রিক প্রাণীরা সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে তার সন্ধান পেয়েছিল তারা সেখানে গিয়ে বংশ পরম্পরায় টিকে থাকতে পারে। ঐ যে ডুবন্ত আগ্নেয়গিরির মধ্যে আমরা ঢুকেছিলাম ঐ এলাকাটা এমনি একটা জায়গা। তবে আমরা বাইরে থেকে বুঝতে পারি নি যে ওর সমস্ত অংশ এখনও সম্পূর্ণ মৃত নয়। অথবা এমনও হতে পারে যে আমরা সমুদ্রতলে এক বিরাট ভূমিকম্পের মধ্যে পড়েছিলাম।

স্যার, ওখানকার জল কি করে অত উত্তপ্ত হল? সত্তর ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

এই দ্যাখে... তোমরা তো জানোই যে সমুদ্র এক অতিকায় ইঞ্জিনের মতো। নিরক্ষরেখার কাছ থেকে গরম জল আভ্যন্তরীণ স্রোতে চলে আসছে উত্তর মেরুর দিকে। তারই স্থান ছেড়ে দিতে উত্তরের ঠাণ্ডা জল তলা থেকে উপরে উঠে আসছে। তবে খুব সম্ভব ভূমিকম্পে পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে কিছু সুপারহীটেড জল এসে ওর সঙ্গে মিশেছে তাই অত গরম হয়ে পড়ছিল।

—স্যার, এ রকম জায়গা কি আরো থাকতে পারে?

—হয়তো খুব কমই আছে। সমুদ্রের গভীর অংশ সম্বন্ধে আমরা এত কম
জানি যে আছে কি নেই বলে দেবে কে। কোটি কোটি বছর আগে সমুদ্রের উপর তলার যে সব বাসিন্দারা ধ্বংস হয়ে গেছে তার সামান্য দু-একটি হয়তো এখনও সমুদ্রের নীচে টিকে থাকবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

আমাদের গল্পের প্রবাহে হঠাৎ বাধা পড়লো। পেকেজ ডেস্ক ক্লার্কটি এসে সুশোভনবাবুকে খবর দিলে আমেরিকার সঙ্গে টেলিফোনে সংযোগ করা গেছে, উনি উঠে গেলেন।

হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে আরব সমুদ্রের ওপার থেকে। আমাদের কারো মুখে আর কোনও কথা নেই। প্রত্যেকেই যেন এই নির্জন বিশ্রামের মুহূর্তগুলো তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছি।

গুড নিউজ অমরেশ! ম্যাসাচুসেটস থেকে প্রফেসর হ্যাগষ্ট্রম পরশুর মধ্যেই এসে পড়ছেন। ওঁরা শিলাকান্থ সম্বন্ধে ভীষণ উত্তেজিত। এখন ওটাকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। ওটা থেকে যা খবর আমরা পাবো তার মূল্য অসীম।

অনেক রাত হয়ে গেছে সঞ্জয়, তোমাকে তো আবার ভোরে উঠে প্লেন ধরতে হবে। অল দি ক্রেডিট গোজ টু ইউ—ইয়েস মাই বয়।

সুশোভনবাবু, অমরেশ সবাই করমর্দন করে বিদায় নিলো। আমি চিত্রার্পিতের মতো বসে রইলাম। আজ রাতে আর কি ঘুম আসবে?

প্রথম প্রকাশ : আশ্চর্য!, অগাস্ট, ১৯৬৪

ক্ষণজন্মা লেখকের প্রথম কল্পবিজ্ঞান গল্প। প্রেমেন্দ্র মিত্র পছন্দ করে সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

সূচিপত্রে ফিরে যান

ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ

অজিতকৃষ্ণ বসু

লেডি মিলিসেণ্ট পিণ্টার্ক, বন্ধুমহলে যিনি সুন্দরী মিলিসেণ্ট নামেই পরিচিত, তাঁর শৌখিন নিভৃত কক্ষে একা আরামকেদারায় বসে ছিলেন। সে কক্ষের সবগুলো চেয়ার আর সোফাই নরম; বিজলী বাতিও আবরণ দিয়ে মৃদু করা; তাঁর পাশে একটি ছোট টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে ছিল একটি ঘাগরা পরা বড় পুতুল। দেওয়াল গুলো ঢাকা ছিল জলরঙের ছবি দিয়ে, প্রত্যেকটি ছবিতে নাম স্বাক্ষর করা 'মিলিসেণ্ট'। ছবিগুলি আলপ্‌স্‌ পাহাড়, ভূমধ্য সাগরের ইতালীয় উপকূল, গ্রীসের দ্বীপপুঞ্জ, এবং টেনেরিফ দ্বীপের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যের। আরেকটি জল রঙের ছবি ছিল তাঁর হাতে, তিনি সেটিকে খুব যত্ন করে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। অবশেষে তিনি পুতুলটির দিকে হাত বাড়িয়ে একটি বোতাম টিপলেন। পুতুলটির মাঝখানে ফাঁক হয়ে গেল, দেখা গেল ভেতরে রয়েছে একটি টেলিফোন। তিনি রিসিভারটি তুলে নিলেন। সেই তোলার ভঙ্গিতে তাঁর স্বভাবসুলভ মাধুর্য ফুটে উঠলেও তাতে একটু যেন উত্তেজনার ভাব দেখা যাচ্ছিল, যা থেকে মনে হচ্ছিল তিনি এইমাত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তিনি একটি নম্বর চাইলেন, এবং সেটি পেয়েই বললেন, 'আমি স্যার বালবাসের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

স্যার বালবাস ফুটিগার সারা পৃথিবীতে খ্যাত ছিলেন 'ডেলি লাইটনিং' নামক দৈনিক কাগজটির সম্পাদকরূপে। শাসনভার যে রাজনৈতিক দলের হাতেই থাকুক না কেন, তিনি সর্বদাই আমাদের দেশের ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম বলে পরিগণিত হতেন। জনসাধারণ থেকে তাঁকে আড়াল করে রাখতে একজন সেক্রেটারি এবং ছয় জন সেক্রেটারির সেক্রেটারি। খুব অল্প লোকই তাঁকে ফোনে ডাকতে সাহস পেতেন, এবং এই খুব অল্পদের ভেতরও একটি অতি ক্ষুদ্র অংশই ফোনে তাঁর কাছে পৌঁছতে পারতেন। নিশাযোগে তিনি যে কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতেন, তা এত মূল্যবান যে তিনি কোনো রকমের ব্যাঘাত চাইতেন না। পাঠকদের শান্তিভঙ্গ করবার নানা রকম পরিকল্পনা উদ্ভাবনে মাথা খাটাবার সময় তিনি নিজের শান্তির কোনো রকম ব্যাঘাত ঘটতে দেবেন না, এই ছিল তাঁর নীতি। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্যে গড়া এই বেষ্টনী সত্ত্বেও তিনি লেডি মিলিসেণ্টের ডাকে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন।

বললেন, 'কি খবর, লেডি মিলিসেণ্ট?'

'সব কিছু তৈরি।' বলে লেডি মিলিসেণ্ট রিসিভার রেখে দিলেন।

দুই

এই ছোট্ট কয়েকটি কথার আগে রয়েছে অনেক প্রস্তুতির ইতিহাস। সুন্দর মিলিসেণ্টের স্বামী স্যার থিওফিলাস পিণ্টার্ক ছিলেন অর্থনৈতিক জগতের নেতৃস্থানীয়দের একজন, অসামান্য ধনী, কিন্তু তাঁর দুঃখ ছিল পৃথিবীতে এখনো তাঁর সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী রয়ে গেছে,

যাঁদের ওপর আধিপত্য করতে পারলে তিনি খুশি হতেন। তখনো এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা তাঁর সঙ্গে সমানে-সমানে দাঁড়াতে পারতেন, এবং টাকার লড়াইতে তাঁদের কেউ-কেউ হয়তো জিতেও যেতে পারতেন। তাঁর চরিত্রটি ছিল নেপোলিয়নের মতো; তিনি খুঁজতেন এমন উপায় যার দ্বারা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদিত এবং প্রশ্নাতীত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তিনি বুঝেছিলেন যে অর্থের শক্তিই বর্তমান পৃথিবীতে একমাত্র বড় শক্তি নয়, এবং ভেবে দেখেছিলেন আরো তিনটি মহাশক্তি রয়েছে, যথাঃ সংবাদপত্র, বিজ্ঞাপন, এবং —যদিও তাঁর সমপেশাধারীরা এর শক্তিকে প্রায়ই ছোট করে দেখেন—বিজ্ঞান। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, বিজয়ী হতে হলে ঘটাতে হবে এই চারটি শক্তির সমবায়; এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি চারজনের একটি গুপ্ত গোষ্ঠী গঠন করলেন।

এই গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান হলেন তিনি নিজে। ক্ষমতায় এবং মর্যাদায় তাঁর পরই হলেন স্যার বালবাস ফ্রুটিগার, যাঁর নীতি ছিলঃ 'জনসাধারণ যা চায় তাঁদের তাই দাও।' তাঁর খবরের কাগজগুলো সবই এই নীতি অনুসারে পরিচালিত হত। এই গোষ্ঠীর তিন নম্বর সদস্য হলেন বিজ্ঞাপন-জগতের একচ্ছত্র অধিপতি স্যার পাবলিয়াস হার্পার। যারা সাময়িক হলেও বাধ্যতামূলক আলস্যে লিফটে ওঠানামা করত, তারা ভাবত আর কিছু করবার থাকে না বলে তারা যাদের বিজ্ঞাপন পড়ে সেই বিজ্ঞাপনদাতারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু তাঁদের এ ধারণা ছিল ভুল। সমস্ত বিজ্ঞাপন এসে জমা হত একটি কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে, এবং সেখান থেকে কোন বিজ্ঞাপন কোথায় যাবে তা ঠিক করে দিতেন স্যার পাবলিয়াস হার্পার। তাঁর যদি ইচ্ছা হত, আপনার তৈরি দাঁতের মাজন বিজ্ঞাপিত হবে, তাহলে তা বিজ্ঞাপিত হত; যদি তাঁর ইচ্ছা না হয় তাহলে তা যতই ভালো হোক না কেন, অজানাই থেকে যেত। ব্যবহারের বিভিন্ন জিনিস সুপারিশ করার বদলে যাঁরা তৈরি করার মতো বোকামি করতেন, তাঁদের সৌভাগ্যবান করা বা পথে বসাবার ক্ষমতা ছিল তাঁর হাতের মুঠোয়। স্যার বালবাসের প্রতি স্যার পাবলিয়াসের এক ধরনের করুণা মিশ্রিত ঘৃণা ছিল। তাঁর ধারণা ছিল স্যার বলবাসের নীতিটি অত্যন্ত বেশী রকম বিনীত, যো হুকুম ধরনের। স্যার পাবলিয়াসের নীতি ছিলঃ 'তুমি যা দিতে পার, জনসাধারণকে দিয়ে তাই চাওয়াও।' এই ব্যাপারে তিনি বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছিলেন। অনেক অতি বাজে শ্রেণীর মদ অতি প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হত কারণ তিনি যখন সাধারণকে বলতেন যে এই মদগুলো উপাদেয়, তাঁর কথা অবিশ্বাস করবার মতো সাহস হত না সাধারণ মানুষের। যেখানে হোটেলগুলো নোংরা, যাত্রীনিবাসগুলো মলিন এবং সমুদ্রও পূর্ণ জোয়ারের সময় ছাড়া সর্বদাই কর্দমাক্ত, সমুদ্র উপকূলের এ হেন জায়গাগুলিও স্যার পাবলিয়াসের কার্যকলাপের ফলে ওজোন, উত্তাল সমুদ্র এবং অতলান্তিকের স্বাস্থ্যপ্রদ বাতাসের জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠল। সাধারণ নির্বাচনের সময়ে রাজনৈতিক দলগুলো এঁর প্রতিষ্ঠানের কর্মিদের উদ্ভাবনী প্রতিভার শরণ নিতেন; কমিউনিষ্ট ছাড়া অন্য যে কোন দল তার দাবীমতো দাম দিতে পারলেই এই প্রতিভার সহায়তা পেতেন। দুনিয়ার হালচাল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্যার পাবলিয়াসের সহায়তা ছাড়া কোনো প্রচার-অভিযান শুরু করবার কথা স্বপ্নেও ভাবতেন না।

সাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচার অভিযানে স্যার বালবাস এবং স্যার পাবলিয়াস পরস্পরের সঙ্গে প্রায়ই যুক্ত থাকলেও চেহারায় ছিলেন দুজনে দুজনের বিপরীত। দুজনেই নিজেদের বেশ তোয়াজে রাখতেন, দুজনেই ছিলেন শৌখিন জীবনবিলাসী। কিন্তু স্যার বালবাসের প্রফুল্ল, স্নিগ্ধ, চেহারাতেই তা ফুটে উঠত আর স্যার পাবলিয়াস ছিলেন একটু রোগা এবং রুক্ষ চেহারার। স্যার পাবলিয়াসের পরিচয় জানা না থাকলে তাঁকে দেখে মনে হতে পারত তিনি অতীন্দ্রিয় দিব্যদৃষ্টির জন্য একাগ্র সাধনা করছেন। কোনো আহার্য বা পানীয় জিনিসের বিজ্ঞাপনে তাঁর চেহারার ছবি ব্যবহার করা যেত না। যাই হোক, প্রায়ই যখন এঁরা দুজন এক সঙ্গে খানা খেতেন কোন নতুন বিজয়ের পরিকল্পনা বা নীতি পরিবর্তনের জন্য পরামর্শ করবার উদ্দেশ্যে, তাঁরা আশ্চর্য রকমে একমত হয়ে যেতেন। একে অন্যের মনের গতিবিধি বেশ ভালোই বুঝতেন; দুজনেই বুঝতেন এঁদের একের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করতে অপরের সহায়তার প্রয়োজন। স্যার পাবলিয়াস বুঝিয়ে দিতেন স্যার বালবাস একটি ছবির কাছে কতটা ঋণী। ছবিটিতে সুন্দর চেহারায় সুসজ্জিত একদল যুবক-যুবতী, প্রত্যেকের হাতে একখণ্ড 'ডেলি লাইটনিং' পত্রিকা, অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে একজন অপরিণত মস্তিষ্ক লোকের দিকে, যে 'ডেলি লাইটনিং' পড়ে না। ছবিটি দেখা যেত রাস্তার ধারে সবগুলো বড়-বড় বিজ্ঞাপনের জায়গায়। স্যার পাবলিয়াসের কথার পাল্টা জবাবে স্যার বালবাস বলতেন, 'তা বটে। কিন্তু কানাডার জঙ্গলগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ কর্তৃত্ব দখল করবার জন্য আমার কাগজগুলোতে যে বিরাট আন্দোলন চালিয়েছিলাম, তা না চালালে আজ আপনি কোথায় থাকতেন? কাগজ না মিললে আপনি কোথায় থাকতেন, আর আমি যদি আমাদের অতলান্তিকের ওপরের সেই মহা উপনিবেশটিতে সেই মোক্ষম নীতিটি চালিয়ে না যেতাম, তাহলে কাগজ আপনার মিলতই বা কি করে?' আহারের শেষ পর্ব পর্যন্ত তাঁদের দুজনের ভেতর এই ধরনের প্রীতিপূর্ণ কথার লড়াই চলত; তারপর তাঁরা দুজনেই গুরুগম্ভীর হয়েও যেতেন। তাঁদের পারস্পরিক সহযোগিতাও আরো জোরালো এবং সৃজনশীল হয়ে উঠত।

তাঁদের গুপ্ত গোষ্ঠীর চার নম্বর সদস্য পেনড্রেক মার্কল্ ছিলেন অন্য তিন জন থেকে একটু আলাদা ধরনের। তাঁকে গোষ্ঠীতে নেওয়া উচিত হবে কিনা সে বিষয়ে স্যার বালবাস এবং স্যার পাবলিয়াসের মনে কিছুটা সন্দেহ ছিল কিন্তু তাঁদের সেই সন্দেহের আপত্তি বাতিল করে দিয়েছিলেন স্যার থিওফিলাস। এঁদের সন্দেহ কিন্তু অযৌক্তিক ছিল না। প্রথমতঃ অন্যান্য তিন জনের মতো পেনড্রেক মার্কল্ নাইট হবার সম্মান লাভ করেন নি, অর্থাৎ 'স্যার' হননি। এছাড়াও তাঁর সম্পর্কে আরো গুরুতর আপত্তি ছিল। তাঁর ঔজ্জ্বল্য আছে একথা কেউই অস্বীকার করতেন না, কিন্তু কিছু কিছু বিচক্ষণ ব্যক্তি সন্দেহ করতেন, তিনি অপ্রকৃতিস্থ, তাঁর মাথার ঠিক নেই। তাঁর নাম কোন কোম্পানীর প্রসপেকটাসে ছাপা হলে সে কোম্পানীর শেয়ার বিক্রির পক্ষে সহায়ক হত না। স্যার থিওফিলাস কিন্তু তাঁকে জোর করেই গোষ্ঠীতে নেওয়ালেন দুটি কারণে: অদ্ভুত ধরনের আবিষ্কারে তাঁর মস্তিষ্কের উর্বরতা ছিল অসামান্য, এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মতো তাঁর মনে মনে কোনো রকম নৈতিক খুঁতখুঁতে বাতিকের বালাই ছিল না।

মানুষ জাতটার ওপর তাঁর একটা আক্রোশের ভাব ছিল। যারা তাঁর ইতিহাস জানতেন তাঁরা এর কারণ বুঝতেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন নন-কনফর্মিষ্ট অর্থাৎ প্রচলিত ধর্মপ্রণালী থেকে ভিন্ন প্রণালীতে বিশ্বাসী ধর্মযাজক; তাঁর ধর্মনিষ্ঠা ছিল অসাধারণ! তিনি বালক পেনড্রেককে শোনাতেন এলিশার শাপের ফলে ভালুকদের হাতে পড়ে কতকগুলো শিশু টুকরো টুকরো হয়ে মরল সেই কাহিনী, তাঁকে বোঝাতেন এলিশা ঠিকই করেছিল। সব রকমেই তিনি ছিলেন অতীত যুগের এক জীবন্ত স্মরণচিহ্ন। বিশ্রাম দিবসের প্রতি সম্ভ্রম এবং বাইবেলের প্রতিটি শব্দের আক্ষরিক ব্যাখ্যায় দ্বিধাহীন বিশ্বাস তাঁর গৃহের সমস্ত কথাবার্থার মধ্যে ফুটে উঠত। বালক বয়েসেই পেনড্রেক বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছিলেন। একদিন হঠাৎ সম্ভাব্য ফলাফল চিন্তা না করে তিনি তাঁর বাবাকে প্রশ্ন করে ফেলেছিলেন খরগোশ রোমন্থন করে একথা বিশ্বাস না করলে খাঁটি খ্রিস্টান হওয়া অসম্ভব কিনা। ফলে বাবার হাতে তিনি এমন বেদম মার খেয়েছিলেন যে এক সপ্তাহ তিনি বসতে পারেন নি। এই ধরনের সতর্ক শাসনের আওতায় বেড়ে উঠেও তিনি রাজি হলেন না তাঁর বাবার ইচ্ছা অনুযায়ী নন কনফর্মিষ্ট ধর্মযাজক হতে। স্কলারশিপ পেয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করলেন উচ্চতম সম্মানসহ। তাঁর প্রথম গবেষণার ফলটি চুরি করে তাঁর অধ্যাপক তারই দৌলতে রয়েল সোসাইটির একটি পদক পেলেন। তিনি যখন নালিশ জানাতে গেলেন, কেউ তাঁকে বিশ্বাস করলেন না, সবাই ভেবে নিলেন তিনি একটি অসভ্য চাষা। প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে তিনি হলেন সন্দেহভাজন। এই অভিজ্ঞতার ফলে তিনি হয়ে উঠলেন তিক্তহৃদয় মানবিদ্বেষী। এরপর থেকে তিনি হুঁশিয়ার হলেন কেউ যেন আর তাঁর কোন আবিষ্কার চুরি করে নিতে না পারে। পেটেন্ট সম্পর্কে গোপন লেনদেনের অনেক কদর্য কাহিনী শোনা গেল কিন্তু প্রমাণিত হল না। কাহিনীতে-কাহিনীতে অমিলও ছিল, এবং কাহিনীগুলোর মূলে কতটা সত্য ছিল তা কেউ জানতেন না। যাই হোক, অবশেষে তিনি যথেষ্ট টাকার মালিক হয়ে একটি নিজস্ব ল্যাবরেটরি করলেন, তাতে কোন সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে তিনি ঢুকতে দিতেন না। ক্রমে তাঁর কৃতিত্ব অনেকের অনিচ্ছাকে ব্যর্থ করে স্বীকৃতি আদায় করে নিল। শেষকালে সরকারের তরফ থেকে তাঁকে অনুরোধ করা হল তিনি যেন রোগজীবাণুর সাহায্যে যুদ্ধের উন্নততর পদ্ধতির আবিষ্কারে তাঁর প্রতিভা নিয়োগ করেন। তাঁর জবাব হল—সবারই কাছে সে জবাব অত্যন্ত অদ্ভুত বলে মনে হল—তিনি রোগজীবাণুতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। অনেকেই সন্দেহ করলেন তাঁর অমন জবাবের আসল কারণ হচ্ছে তিনি ঘৃণা করেন শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজের প্রতিটি শক্তিকে,—প্রধানমন্ত্রী থেকে অতি সাধারণ পাহারাওয়ালা পর্যন্ত।

বিজ্ঞান জগতে প্রত্যেকেই তাঁকে অপছন্দ করতেন কিন্তু তাঁকে আক্রমণ করতে কেউ সাহস পেতেন না, কারণ তর্কের দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাঁর ক্ষমতা ছিল অসাধারণ এবং নির্মম, যার দ্বারা প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি প্রতিপক্ষকে বোকা বানাতে সক্ষম হতেন। সারা পৃথিবীতে তিনি মাত্র একটি জিনিস ভালবাসতেন, সেটি হল তাঁর নিজস্ব ল্যাবরেটরি। দুর্ভাগ্যবশতঃ এর যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জামে তাঁর খরচ গেল মাত্রা ছাড়িয়ে। ফলে ঋণ শুধতে তাঁর ল্যাবরেটরি বিক্রি করতে হবে, এমনি পরিস্থিতিতে স্যার থিওফিলাস এসে প্রস্তাব করলেন

ঐ বিপদ থেকে তিনি পেনড্রেককে রক্ষা করবেন, তার বদলে পেনড্রেক চতুর্থ সদস্য হয়ে গুপ্ত গোষ্ঠীকে সাহায্য করবেন।

গোষ্ঠীর প্রথম বৈঠকে স্যার থিওফিলাস বুঝিয়ে বললেন তিনি মনে-মনে কি ভেবে রেখেছেন, এবং তাঁর আশাগুলোকে কিভাবে বাস্তবে রূপায়িত করা যাবে সে বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন। তিনি বললেন, মিলিতভাবে কাজ করলে সারা পৃথিবীর ওপর আধিপত্য স্থাপন করা তাঁদের চার জনের পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব হবে। শুধু পৃথিবীর এ অংশ বা সে অংশ নয়, শুধু পশ্চিম ইউরোপ অথবা পশ্চিম ইউরোপ আর আমেরিকা ও নয়, সেই সঙ্গে লৌহ-যবনিকার ও ধারের পৃথিবীর ওপরও। বিজ্ঞভাবে তাঁদের দক্ষতা এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করলে কোন কিছুই তাঁদের প্রতিরোধ করতে পারবে না।

তিনি তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় বললেন, 'আমাদের দরকার শুধু একটি সত্যিকারের লাভজনক পরিকল্পনা। এটি জোগানো হবে মার্কল্-এর কাজ। ভালো একটি পরিকল্পনা পেলে তাকে কার্যকরী করবার জন্য টাকা জোগাব আমি, তার বিজ্ঞাপন করবেন হার্পার, এবং এ পরিকল্পনার যারা বিরোধিতা করবে তাদের বিরুদ্ধে জনমতকে ক্ষেপিয়ে তুলবেন। মার্কল্-এর সম্ভবতঃ কিছুটা সময় লাগবে। সুতরাং আমি প্রস্তাব করছি আমাদের এ বৈঠক এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখা হোক। আমি নিশ্চিত জানি এই সময়ের শেষে আমাদের সমাজনিয়ন্তা, চারটি শক্তির অন্যতম রূপে বিজ্ঞান তার নিজের দাবী প্রমাণ করবে।'

এই বলে মার্কল্কে অভিবাদন জানিয়ে তিনি সভা ভেঙে দিলেন। এক সপ্তাহ বাদে তাঁরা যখন আবার মিলিত হলেন তখন মার্কল্-এর দিকে তাকিয়ে স্যার থিওফিলাস হেসে বললেন, 'কি হে মার্কল্? বিজ্ঞান কি বলে?' মার্কল্ গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলতে শুরু করলেনঃ

'স্যার থিওফিলাস, স্যার বালবাস, স্যার পাবলিয়াস! সারা গত সপ্তাহ ধরে আমি আমার সেরা চিন্তা—আমার সেরা চিন্তা যে খুবই ভালো, সে আশ্বাস আপনাদের দিতে পারি —গত সপ্তাহের বৈঠকে যে ধরনের পরিকল্পনার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল তাতেই আমি নিয়োগ করেছিলাম। নানা ধরনের ভাবনা আমার মনে ভিড় করে আসছিল আর বাতিল হয়ে যাচ্ছিল। নিউক্লিয়ার শক্তির নানা বিভীষিকার কথা শুনতে-শুনতে জনগণ হদ্দ হয়ে গেছে; আমি ভেবে দেখলাম এ বিষয়টাই হয়ে গেছে ভয়ানক সেকেলে, একঘেয়ে। তাছাড়া এ হচ্ছে এমন একটা বিষয় যাতে বিভিন্ন দেশের সরকারী বাধার সম্মুখীন হব। এর পরই আমি চিন্তা করলাম জীবাণুতত্ত্বের সাহায্যে কি করা যেতে পারে। আমি ভাবলাম সমস্ত রাষ্ট্রের প্রধানদের জলাতঙ্ক রোগ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাতে আমাদের কি লাভ হবে সেটা খুব স্পষ্ট নয়, তাছাড়া তাঁদের মধ্যে একজন তার রোগে নির্ণীত হবার আগেই আমাদের একজনকে কামড়ে বসতে পারে। তারপর অবশ্য একটা পরিকল্পনা ছিল যে পৃথিবীর এমন একটি উপগ্রহ তৈরি হবে, যেটা তিন দিনে একবার করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে। তাতে একটি ঘড়ি যন্ত্রে এমনভাবে ঠিক করে দম দেওয়া থাকবে যে উপগ্রহটি যখন রাশিয়ার ক্রেমলিন প্রাসাদের পাশ দিয়ে যাবে তখনই তার ওপর গুলি চালাবে। কিন্তু এ হল বিভিন্ন দেশের সরকারের ব্যাপার। আমাদের থাকতে হবে এসব লড়াই ঝগড়ার ঊর্ধ্বে। পুব আর পশ্চিমের ঝগড়ায় আমরা কোনো দিকেই যোগ দেব না। এটা আমাদের

নিশ্চিত করতে হবে যে যাই ঘটুক না কেন আমরাই যেন থাকি সবার ওপর। সেজন্যই এমন সব পরিকল্পনাই বাতিল করে দিলাম যাতে আমাদের নিরপেক্ষতা বজায় থাকে না।

'একটা পরিকল্পনা আমি আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই যাতে, আমার মনে হয়, অন্যান্য পরিকল্পনার দোষত্রুটিগুলো অনুপস্থিত। সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে জনসাধারণ ইন্‌ফ্রা-রেড ফোটোগ্রাফি সম্বন্ধে শুনেছে। জনসাধারণ অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে যেমন অজ্ঞ, এ বিষয়েও তেমনি। তাঁদের এই অভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে আমরা লাভবান হব না কেন, তার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ আমি দেখছি না। আমার প্রস্তাব হচ্ছে আমরা একটি যন্ত্র আবিষ্কার করব, তার নাম হবে "ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ" ; আমরা জনসাধারণকে বোঝাব যে এই যন্ত্রটিতে ইনফ্রা-রেড রশ্মির সাহায্যে এমন সব জিনিসের ফোটোগ্রাফ উঠবে যা অন্য কোনো উপায়েই দৃশ্য নয়। যন্ত্রটি হবে অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং খুব সতর্কভাবে ব্যবহৃত না হলে সহজেই বিকল হয়ে যাবার মতো। যাদের ওপর আমাদের কর্তৃত্ব চলে না তাদের হাতে পড়লেই যন্ত্রটি বিকল হয়ে যাবে, এ বিষয়ে আমরা যত্নবান হব। ঐ যন্ত্রটি দিয়ে কি দেখা যাবে তা আমরাই ঠিক করে দেব, এবং আমার মনে হয় আমাদের মিলিত প্রচেষ্টার ফলে অবস্থা এমন দাঁড়াবে, যে এই যন্ত্রের চোখে যা ধরা পড়ছে বলে আমরা প্রচার করব, সারা পৃথিবীর লোক তাই বিশ্বাস করবে। আপনারা যদি আমার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তাহলে আমি যন্ত্রটি তৈরি করবার ভার নেব, কিন্তু কিভাব এটিকে কাজে লাগাবেন সেটা ঠিক করবেন স্যার বালবাস এবং স্যার পাবলিয়াস।'

এঁরা দুজনেই পেনড্রেক মার্কল্-এর কথাটা বেশ মন দিয়ে শুনেছিলেন। দুজনেই এঁর মতলবগুলি বেশ উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, দুজনেই দেখেছিলেন এ পরিকল্পনায় রয়েছে তাঁদের দক্ষতা কাজে লাগাবার অসামান্য সম্ভাবনা।

স্যার বালবাস বললেন, 'এ যন্ত্রটি কি প্রকাশ করবে তা আমি জানি। যন্ত্রটি প্রকাশ করবে মঙ্গলগ্রহ থেকে এমন ভয়ঙ্কর প্রাণীদের এই পৃথিবীর ওপর গুপ্ত আক্রমণ অভিযান, আমাদের যন্ত্র না থাকলে যাদের অদৃশ্য সেনাবাহিনীর জয়লাভ নিশ্চিত। আমি আমার সবগুলো খবরের কাগজে এই ভীষণ বিপদ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলব। তাদের ভেতর লক্ষ লক্ষ লোক এই যন্ত্র কিনবে। স্যার থিওফিলাস এর ফলে যে অর্থসম্পদের মালিক হবেন অত অর্থ কোনো একজনের হাতে কখনো সঞ্চিত হয়নি। আমার খবরের কাগজ অন্য সব কাগজের চাইতে বেশি বিক্রি হবে, এবং এমন দিন শীগগিরই আসবে যখন আমার কাগজ ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোনো কাগজই থাকবে না। এ অভিযানে বন্ধুবর পাবলিয়াসও কিছু কম যাবেন না। তিনি প্রত্যেকটি বড় বিজ্ঞাপনের জায়গা ঢেকে দেবেন সেই ভয়ঙ্কর জীবগুলোর ছবি দিয়ে, ছবির তলায় লেখা থাকবেঃ "আপনি কি এদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে সবকিছু হারাতে চান?" এ ছাড়াও সবগুলো বড় রাস্তার ধারে ধারে, ষ্টেশনে এবং আরো যেসব জায়গায় লোকেরা এ ধরনের জিনিসের দিকে তাকিয়ে দেখবার অবসর পাবে সেখানে তিনি ব্যবস্থা করবেন বিরাট বিরাট হরফে বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়ে দিতে, যাতে বলা হবেঃ "পৃথিবীর অধিবাসিবৃন্দ! তোমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এসেছে। জেগে ওঠ তোমরা লক্ষ লক্ষ লক্ষ মানুষ। এই মহাজাগতিক বিপদে ভীত

হয়ো না। সাহসেরই জয় হবে, যেমন হয়ে এসেছে আদিমানব আদমের সময় থেকে। একটা ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ কিনে প্রস্তুত হও।”

এইখানে স্যার থিওফিলাস একটু বাধা দিলেন।

তিনি বললেন, ‘পরিকল্পনাটি ভালো। এতে এখন একটি জিনিস বাকি রইল, সেটি হচ্ছে মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দার এমন একটি ভয়ঙ্কর ছবি, যা দেখে সত্যি-সত্যি আতঙ্ক উপস্থিত হয়। আপনারা সবাই লেডি মিলিসেণ্টকে জানেন, কিন্তু শুধু তাঁর কমনীয় গুণাবলীর সঙ্গেই আপনারা পরিচিত। তাঁর স্বামীরূপে আমি তাঁর কল্পনার এমন কতকগুলো বৈচিত্র্যের কথা জানতে পেরেছি যা অধিকাংশ লোকেরই অজ্ঞাত। আপনারা জানেন জলরঙের ছবি আঁকতে তিনি সুপটু। তিনি মঙ্গলগ্রহবাসীর একটা জলরঙ ছবি আঁকুন, এবং তাঁর ছবির ফোটোগ্রাফ ভিত্তি করেই আমাদের অভিযান চালু হোক।’

অন্য সবাইকে প্রথমে একটু সন্দিহান দেখা গেল। লেডি মিলিসেণ্টকে তাঁরা দেখেছিলেন একজন কোমল স্বভাবের, হয়তো বা স্বল্পবুদ্ধি মহিলা-রূপে, এমন একটি ভয়ঙ্কর অভিনে অংশগ্রহণ করবার মতো মানুষ বলে তাঁকে ভাবতে পারেন নি। কিছুক্ষণ বিতর্কের পর ঠিক হল তাঁকে চেষ্টা করে দেখতে দেওয়া হবে, এবং তাঁর আঁকা ছবি মিঃ মার্কল্ যথেষ্ট ভয়ঙ্কর বলে মনে করলে পর স্যার বালবাসকে জানানো হবে যে অভিযান শুরু করবার জন্য সব কিছু তৈরি।

এই মহা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক থেকে বাড়ি ফিরে স্যার থিওফিলাস সুন্দরী মিলিসেণ্টকে বোঝাতে বসলেন তিনি কি চান। তিনি এই অভিযানের বিশদ বিবরণ তাঁর কাছে তুলে ধরলেন না, কারণ লোককে বিশ্বাস করে কোনো গোপন কথা বলতে নেই এই নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি শুধু বললেন কতকগুলো ভয়ঙ্কর চেহারার কাল্পনিক জীবের ছবি তিনি চান; ছবিগুলো তিনি ব্যবসায়ে যেভাবে কাজে লাগাবেন তা মিলিসেণ্টের পক্ষে বুঝতে পারা শক্ত হবে।

লেডি মিলিসেণ্ট ছিলেন বয়সে স্যার থিওফিলাসের চাইতে অনেক ছোট। পড়তি অবস্থার একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে তিনি। তাঁর বাবা, একজন দরিদ্র দশায় পতিত আর্ল, ছিলেন রানী এলিজাবেথের যুগের একটি পল্লী ভবনের মালিক। এই ভবনটির প্রতি গভীর আকর্ষণ তিনি পুরুষানুক্রমে পেয়েছিলেন। পূর্বপুরুষদের এই ভিটা তিনি কোনো ধনী আর্জেন্টিনাবাসীর কাছে বেচে ফেলতে বাধ্য হবেন, অবস্থা অনেকটা এই রকম দাঁড়িয়েছিল, এবং এই সম্ভাবনা ভেবে ভেবে ধীরে ধীরে তাঁর মন ভেঙ্গে যাচ্ছিল। মিলিসেণ্ট তাঁর বাবাকে অত্যন্ত গভীরভাবে ভালবাসতেন, তিনি স্থির করলেন তাঁর বাবার জীবনের বাকি দিনগুলো যাতে বেশ শান্তিতে কাটে, সেই উদ্দেশ্যে নিজের চোখ ধাঁধানো রূপ কাজে লাগাবেন। পুরুষমাত্রেই রূপে মুগ্ধ হত। এই মুগ্ধ ভক্তদের ভেতর স্যার থিওফিলাস ছিলেন সেরা ধনী, মিলিসেণ্ট তাই তাঁকেই বেছে নিলেন। এই বেছে নেওয়ার শর্ত হল স্যার থিওফিলাস এমন ব্যবস্থা করে দেবেন যাতে মিলিসেণ্টের বাবা সবরকম আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকেন। মিলিসেণ্ট স্যার থিওফিলাসকে অপছন্দ করতেন না, কারণ স্যার থিওফিলাস তাঁকে দেখতেন সশ্রদ্ধ ভালোবাসার দৃষ্টিতে এবং তাঁর যে কোন খেয়াল মেটাতেন; কিন্তু স্যার থিওফিলাসকে ভালবাসেন নি মিলিসেট। সত্যি কথা বলতে কি,

তখন পর্যন্ত কোনো পুরুষই তাঁর হৃদয়ে দোলা দেয়নি। স্যার থিওফিলাসের কাছ থেকে তিনি যা পেয়েছিলেন বা পেতেন, তার বিনিময়ে তিনি যখনই সম্ভব তার আদেশ মানা কর্তব্য বলে মনে করতেন।

একটি ভয়ঙ্কর জীবের জলরঙা ছবি এঁকে দেবার অনুরোধটা তাঁর একটু যেন কেমন-কেমন মনে হল, কিন্তু তিনি স্যার থিওফিলাসের এমন অনেক কাণ্ড কারখানা দেখে-দেখে অভ্যস্ত, যার মানে তিনি কিছুই বুঝতে পারেন নি, এবং তাঁর ব্যবসা-সংক্রান্ত পরিকল্পনাগুলি বুঝবার জন্যেও তাঁর মাথাব্যথা ছিল না। মিলিসেণ্ট সুতরাং কাজে লেগে গেলেন। স্যার থিওফিলাস তাঁকে এই পর্যন্ত বলেছিলেন যে "ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ" নামক যন্ত্রের সাহায্যে কি দেখতে পাওয়া যাবে তাই দেখবার জন্য ঐ ছবিটি দরকার। কয়েকবার চেষ্টা করেও যখন কোনো ছবি নিজেরই পছন্দ হল না, মিলিসেট তখন একটি জীবের ছবি আঁকলেন, যার দেহ অনেকটা গোবরে পোকার মতো, কিন্তু উচ্চতা ছ ফুট, সাতটি পা লোমে ভরা, মুখ মানুষের মতো, মাথাভরা টাক, দৃষ্টি কটমটে, আর দাঁতগুলো বিশ্রী হাসির ভঙ্গিতে বার করা। দুটি ছবি আঁকলেন তিনি। প্রথমটিতে আঁকলেন একটি লোক ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে এই জীবটিকে দেখছে; দ্বিতীয়টিতে আঁকলেন ঐ লোকটি ভীষণ ভয় পেয়ে এই যন্ত্রটিকে হাত থেকে ফেলে দিয়েছে, এবং লোকটি তাকে দেখে ফেলেছে বুঝতে পেরে সেই ভয়ঙ্কর জীবটি তার সাত নম্বর পায়ের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বাকি ছটি লোমশ পা দিয়ে জড়িয়ে ধরে লোকটির শ্বাসরোধ করে ফেলেছে। স্যার থিওফিলাসের আদেশে এই ছবি দুটি তিনি মিঃ মার্কল্‌কে দেখালেন। মিঃ মার্কল্‌ ছবিটিকে প্রয়োজনের উপযোগী বলে গ্রহণ করলেন এবং তিনি বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গেই লেডি মিলিসেণ্ট টেলিফোনে স্যার বালবাসকে সেই গুরুত্বপূর্ণ খবরটি জানিয়ে দিলেন।

তিন

স্যার বালবাসের কাছে এই খবরটি যেইমাত্র পৌঁছাল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের গুপ্ত গোষ্ঠীর পরিচালনাধীন বিরাট ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ শুরু হয়ে গেল। স্যার থিওফিলাস পৃথিবীর সর্বত্র অসংখ্য কারখানায় ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ যন্ত্রটির উৎপাদন শুরু করিয়ে দিলেন। যন্ত্রটি ছোট, তাতে অনেকগুলো চাকা ঘর্ঘর আওয়াজ করত, কিন্তু ঐ যন্ত্রের সাহায্যে প্রকৃতপক্ষে কোন কিছুই দেখা যেত না। স্যার বালবাস বিজ্ঞানের বিস্ময় সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ দিয়ে তাঁর খবরের কাগজগুলো ভরে ফেললেন, প্রত্যেকটি প্রবন্ধে ইঙ্গিত রইল ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ সম্পর্কে। এদের কতকগুলো প্রবন্ধে বিজ্ঞানজগতের কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি বিজ্ঞানের কিছু কিছু খাঁটি তথ্য পরিবেশন করলেন; অন্য প্রবন্ধগুলোতে ছিল কল্পনার বিস্তার। স্যার পাবলিয়াস প্রাচীরপত্রে সর্বত্র বাণী ছড়ালেন: 'ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ আসিতেছে! পৃথিবীর অদৃশ্য বিস্ময় প্রত্যক্ষ করুন!' এবং ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ কি? ফ্রটিগারের সংবাদপত্রগুলি আপনাকে বলিয়া দিবে। বিচিত্র জ্ঞানলাভের এই সুযোগ হারাইবেন না।

যথেষ্টসংখ্যক ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ তৈরি হয়ে যাবার পর লেডি মিলিসেণ্ট এ খবর প্রচার করে দিলেন যে একটি ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে তিনি তাঁর শোবার

ঘরের মেঝের ওপর এই বিভীষিকার চলাফেরা দেখতে পেয়েছেন। স্যার বালবাসের পরিচালনাধীন সবগুলি কাগজের প্রতিনিধি এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। ব্যাপারটা এমনই নাটকীয় উত্তেজনাপূর্ণ যে অন্যান্য কাগজের প্রতিনিধিরাও না এসে পারলেন না। স্বামীর পরামর্শমত তিনি ঠেকে ঠেকে, মহা আতঙ্কগ্রস্ততার ভান করে ঠিক সেই ভাবের কথাই বললেন গোষ্ঠীর পরিকল্পনার পক্ষে যা সহায়ক। জনগণের ওপর প্রভাবশালী কয়েকজন চিন্তানায়কদের কাছে একটি করে ইনফ্রা রেডিওস্কোপ দেওয়া হল; স্যার থিওফিলাস তাঁর গুপ্তচরদের কাছে খবর পেয়েছিলেন এঁরা অত্যন্ত আর্থিক অসুবিধায় আছেন। এঁদের প্রত্যেককে এক হাজার পাউন্ড দেবার প্রস্তাব জানানো হল এই শর্তে যে, তিনি বলবেন তিনি এই ভয়ঙ্কর জীবদেব একটিকে এই যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে পেয়েছেন। স্যার পাবলিয়াসের বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লেডি মিলিসেন্টের আঁকা ছবি দুটি সর্বত্র প্রকাশিত হল, সেই সঙ্গে বাণীঃ 'আপনার ইনফ্রা-রেডিওস্কোপটি হাত হইতে ফেলিয়া দিবেন না। এই যন্ত্র প্রকাশ করে, রক্ষাও করে।'

ফলে অচিরেই বহু হাজার ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ বিক্রি হল এবং সারা পৃথিবীময় আতঙ্কের সৃষ্টি হল। পেনড্রেক মার্কল্ একটি নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করলেন; যন্ত্রটি শুধু তাঁর নিজস্ব ল্যাবরেটরিতেই পাওয়া যেত। এই নতুন যন্ত্রটি প্রমাণ করে দিল এই অদ্ভুত জীবগুলি এসেছে মঙ্গলগ্রহ থেকে। অন্যান্য বিজ্ঞানীরা মার্কল্-এর বিপুল খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন, এবং তাঁর এই ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে অতি সাহসী একজন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলেন যাতে এই জীবদের মনের কথা ধরা পড়ে। তিনি প্রচার করলেন এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি আবিষ্কার করেছেন যে মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দারা মানবজাতিকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত করে দেবার যে পরিকল্পনা করেছে, এরা হচ্ছে তারই অগ্রণী বাহিনী।

প্রথম দিকে যাঁরা যন্ত্রটি কিনেছিলেন তাঁরা প্রথম প্রথম নালিশ করেছিলেন যে এই যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তাঁরা কিছুই দেখতে পাননি, কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের মন্তব্যগুলো স্যার বালবাসের পরিচালিত কোনো কাগজেই ছাপা হয় নি। খুব শীগগিরই সারা পৃথিবীময় এই আতঙ্ক এমন গভীর হয়ে উঠল যে, কোনো ব্যাক্তি মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দাদের উপস্থিতি তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়নি বললেই ধরে নেওয়া হতে লাগল তিনি বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী, এবং মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দাদের দলে। এই ধরনের কয়েক হাজার দেশদ্রোহী উত্তেজিত জনগণের হাতে নিদারুণভাবে লাঞ্ছিত এবং অত্যাচারিত হবার পর বাকি সবাই ভাবলেন মুখ বুজে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এর ব্যতিক্রম ছিলেন মাত্র কয়েকজন, তাঁদের সবাইকে গৃহে অন্তরীণ হতে হল। আতঙ্ক তখন চারিদিকে এমন ভাবে ছেয়ে গেল যে, আগে যাঁদের নিরীহ বলে মনে করা হত তাঁদের অনেকেই গভীর সন্দেহভাজন হয়ে উঠলেন। অসতর্ক মুহূর্তে কেউ রাতের আকাশে মঙ্গলগ্রহের সৌন্দর্যের প্রশংসা করলেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সন্দেহ করা হত। যেসব জ্যোতির্বিদ মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে বিশেষভাবে চর্চা করেছিলেন তাঁদের সবাইকে অন্তরীণ করা হল। তাঁদের ভেতরে যাঁরা মঙ্গলগ্রহে জীবন নেই বলে মত প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের দীর্ঘ-
মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

যাই হোক, কিছু কিছু লোক ছিলেন যাঁরা আতঙ্কের এই হিড়িকের প্রথম দিকে মঙ্গলগ্রহের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। আবিসিনিয়ার সম্রাট ঘোষণা করলেন যে ছবিটি যত্ন করে পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে মঙ্গলগ্রহবাসী চেহারার দিক দিয়ে জুডা'র সিংহের খুবই কাছাকাছি, সুতরাং নিশ্চয়ই ভাল, খারাপ নয়। তিব্বতীয়রা বললেন, প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠ করে দেখা যাচ্ছে মঙ্গলগ্রহ থেকে আবির্ভূত আগন্তুক একজন বোধিসত্ত্ব, অবতীর্ণ হয়েছেন বিধর্মী চীনাদের কবল থেকে তাঁদের মুক্ত করতে। পেরুদেশের ইণ্ডিয়ানরা আবার নতুন করে সূর্যের উপাসনার প্রবর্তন করলেন এবং বুঝিয়ে দিলেন মঙ্গলগ্রহ যখন সূর্যেরই আলোকে উজ্জ্বল, তখন মঙ্গলগ্রহকেও শ্রদ্ধা করতে হবে। যখন মন্তব্য করা হল মঙ্গলগ্রহবাসীরা হত্যাকাণ্ড চালাতে পারে তাঁরা বললেন সূর্য-উপাসনায় তো সর্বদাই নরবলি চালু ছিল, সুতরাং খাঁটি সূর্য ভক্তদের এতে অসন্তুষ্টির কারণ ঘটবে না। নৈরাজ্যবাদীরা যুক্তি দেখিয়ে বললেন, মঙ্গলগ্রহীরা সমস্ত শাসন ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করবে, সুতরাং স্বর্ণযুগ এরাই আনবে। শান্তিবাদীরা বললেন এদের সম্মুখীন হতে হবে হৃদয়ে প্রেম নিয়ে; প্রেম যদি যথেষ্ট জোরালো হয় তাহলে সেই প্রেমের জোরেই ওদের মুখের ঐ বিশ্রী ভঙ্গিটা দূর হয়ে যাবে।

এই কয়টি বিভিন্ন দলের লোকেরা যে-যে জায়গায় সংখ্যায় ভারি ছিলেন সেখানে অল্প কিছু দিনের জন্য নিরাপদ রইলেন। কিন্তু তাঁদের দুরবস্থা শুরু হল যখন কমিউনিষ্ট জগৎকে মঙ্গলগ্রহ বিরোধী অভিযানের অন্তর্ভুক্ত করা হল। গুপ্ত গোষ্ঠী বেশ দক্ষতার সঙ্গে এটি সম্ভব করলেন। এঁরা প্রথমে ধরলেন পাশ্চাত্য জগতের কয়েকজন বিজ্ঞানীকে, যারা সোভিয়েট সরকারের প্রতি বন্ধুভাব পোষণ করেন। বলে জানা ছিল। তাঁদের কাছে এঁরা খোলাখুলি বললেন এই অভিযানটি কিভাবে পরিচালিত হয়েছে; বুঝিয়ে বললেন মঙ্গলগ্রহবাসীদের ভয়ের ভিত্তিতে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের ঐক্য স্থাপিত হতে পারে। এঁরা এই কমিউনিজমে বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিকদের এও বিশ্বাস করাতে সক্ষম হলে যে প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে লড়াই লাগলে প্রাচ্যের পরাজিত হবার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে, সুতরাং তৃতীয় মহাযুদ্ধ নিবারণের যে কোনো উপায়কেই কমিউনিষ্টদের সাহায্য করা উচিত। এঁরা এও বুঝিয়ে দিলেন যে মঙ্গলগ্রহবাসীদের সম্পর্কে ভীতি তাহলেই প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে মিলন ঘটাতে পারবে যদি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য প্রত্যেক দেশের শাসন কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করেন যে মঙ্গল গ্রহবাসীরা পৃথিবী আক্রমণ করবে। কমিউনিজমে বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিকবৃন্দ এঁদের এই যুক্তিগুলো শুনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হতে বাধ্য হলেন। কারণ এঁরা ছিলেন বাস্তববাদী, এবং এর চাইতে জীবন্ত বাস্তব আর কি হতে পারে? তাছাড়া দ্বান্দ্বিক জড়বাদ যা দাবি করে, এ হয়তো ঠিক সেই সমন্বয়। সুতরাং তারা রাজী হয়ে কথা দিলেন পুরো ব্যাপারটাই যে ধাপ্পা এ সত্যটা তারা সোভিয়েট সরকারের কাছে প্রকাশ করবেন না। সোভিয়েট সরকারকে তার আপন স্বার্থেই তাঁরা ঘৃণ্য পুঁজিপতিদের দ্বারা তাঁদের পুঁজিবাদী স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করে সাজানো এই মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে দেবেন, যেহেতু এতে শেষ পর্যন্ত প্রকারান্তরে মানবজাতির মঙ্গলই হবে, কারণ যথাকালে যখন এই ধাপ্পার রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে তখন তার ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার ফলে সারা পৃথিবী ঝুঁকে পড়বে মস্কোর দিকে। এই যুক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে তাঁরা মস্কোকে জানিয়ে দিলেন মানবজাতির

আসন্ন ধ্বংসের সম্ভাবনা, এবং মনে করিয়ে দিলেন যে আক্রমণকারী মঙ্গলগ্রহবাসীরা যে কমিউনিষ্ট, এমন কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই। তাঁদের এই বিবৃতির ওপর নির্ভর করে কিছুকাল ইতস্ততঃ করে মস্কো সরকার মঙ্গলগ্রহবিরোধী অভিযানে পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

তখন থেকে আবিসিনিয়া, তিব্বত এবং পেরু নিবাসীরা, নৈরাজ্যবাদীরা এবং শান্তিবাদীরা আর স্বস্তির অবকাশ পেলেন না। এঁদের কতক নিহত ছিলেন, কতকের ওপর চাপানো হল বাধ্যতামূলক শ্রমের বোঝা, কতক তাঁদের পূর্বমত পরিত্যাগ করলেন, এবং অল্প দিনের ভেতরই পৃথিবীর কোথাও মঙ্গলগ্রহ-বিরোধী অভিযানের প্রকাশ্য প্রতিবাদ করবার কেউ রইল না।

কিন্তু সাধারণের মনে ভয় শুধু মঙ্গলগ্রহবাসীদের সম্পর্কেই সীমিত রইল না। ভয় জেগে রইল তাদের নিজেদের ভেতর। বিশ্বাসঘাতকদের সম্পর্কেও। প্রচার এবং প্রোপাগান্ডা সংগঠনের জন্য যুক্ত জাতিসংঘের একটি সম্মেলন আহ্বান করা হল। অন্যান্য গ্রহের বাসিন্দা থেকে পৃথিবীর বাসিন্দাদের আলাদা করে বোঝাবার জন্য একটি বিশেষ শব্দের প্রয়োজন অনুভূত হল। 'পার্থিব' শব্দটি জুৎসই মনে হল না। 'মর্তীয়' শব্দটিও যথেষ্ট বলে মনে হল না, কারণ শব্দটির বিপরীতার্থক শব্দ হচ্ছে 'স্বর্গীয়'। 'জাগতিক'ও সুবিধাজনক বিবেচিত হল না। অবশেষে বহু আলোচনার পর—এ আলোচনায় সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখালেন দক্ষিণ আমেরিকার বাসিন্দারা—'টেলুরীয়', শব্দটি অধিকাংশের সম্মতিক্রমে গৃহীত হল। যুক্ত জাতি সংঘ তখন একটি কমিটি নিযুক্ত করলেন অ-টেলুরীয় কার্যাবলী দমনের জন্য; এই কমিটি সারা পৃথিবী জুড়ে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করল। এও স্থির হল যে যুক্ত জাতি সংঘের বৈঠক বারো মাসই চলু থাকবে একজন স্থায়ী প্রধানের নেতৃত্বাধীনে যতদিন এই সংকট বজায় থাকে। প্রবীণ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞদের ভেতর থেকে বেছে একজন সভাপতি নিযুক্ত করা হল। তিনি বিপুল মর্যাদা এবং বিরাট অভিজ্ঞতার অধিকারী, দলাদলির লড়াই থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, এবং গত দুটি বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতার দৌলতে তিনি আরো ভয়ঙ্কর আসন্ন যুদ্ধের জন্যে বেশ ভালোভাবেই তৈরি ছিলেন। তিনি কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় বললেন :

'বন্ধুগণ, পৃথিবীবাসিগণ, টেলুরীয়গণ, যাঁরা আজ আগেকার যে কোন সময়ের চাইতে অনেক বেশি একতাবদ্ধ, আজ আমি এই মহা গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে আপনাদের সম্বোধন করে কিছু বলতে চাইছি, আগেকার মতো বিশ্বশান্তির বিষয়ে নয়, তার চাইতে অনেক বেশি জরুরী, অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। বিষয়টি হচ্ছে এই পৃথিবীর বুকে আমাদের মানবজাতির অস্তিত্ব, মানবিক মূল্যবোধ, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা বজায় রাখা। আমি বলতে চাই আমাদের মানবজীবন রক্ষা করতে হবে মহাশূন্য পথে ভেসে আসা এক জানি-না-কিসের এবং কি ধরনের ভীষণ আক্রমণ থেকে, যে সম্বন্ধে আমাদের খুলে দিয়েছে আমাদের সেই বিজ্ঞানীদের বিস্ময়কর দক্ষতা, যাঁরা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন ইনফ্রা-রেডিয়েশনের সাহায্যে কি দেখতে পাওয়া যায়, তাঁরা আমাদের দৃষ্টিগোচর করে দিয়েছেন সেই অদ্ভুত ঘৃণ্য এবং ভয়ঙ্কর জীবগুলিকে যারা আমাদেরই বাড়ীর মেঝের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু এই অত্যাশ্চর্য যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া এদের একেবারেই দেখতে

পাওয়া যায় না; এরা শুধু আমাদের বাড়ীর ভেতর ঘুরেই বেড়ায় না, আমাদের ভেতর অনেক দূষিত জিনিস সংক্রামিত করে দেয়। আমাদের চিন্তা পর্যন্ত দূষিত করে যার ফলে আমাদের নৈতিক জীবনের ভিত্তিই যাবে ধ্বংস হয়ে, এবং আমরা নেমে যাব পশুর স্তরে নয়—কারণ আমাদের পশুরাও আর যাই হোক, টেলুরীয়—আমরা নেমে যাব মঙ্গলগ্রহবাসীদের স্তরে এবং এর চাইতে খারাপ আর কি হতে পারে? এই যে পৃথিবীকে আমরা সবাই ভালোবাসি, এর কোন ভাষাতেই 'মঙ্গলগ্রহী'র চাইতে নীচ, জঘন্য শব্দ নেই। আমি আজ আপনাদের সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়ান এই মহাসংগ্রামে। এ সংগ্রামই আমাদের পৃথিবীর যা কিছু মূল্যবান তাকে রক্ষা করবে সেই বিদেশী বিকট জীবগুলোর গুপ্তকৌশলপূর্ণ অপমানজনক আক্রমণ থেকে, যাদের সম্পর্কে আমরা শুধু বলতে পারি যে তারা যেখান থেকে এসেছে সেখানই তাদের ফিরে যাওয়া উচিত।'

এই বলে তিনি বসে পড়লেন। তারপর পুরো পাঁচ মিনিট হাততালির আওয়াজে আর কিছুই শুনতে পাওয়া গেল না। এরপর বক্তৃতা দিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি। তিনি বললেন :

'পৃথিবীর সহ-নাগরিকগণ, সাধারণের প্রতি কর্তব্যের খাতিরে যাঁরা বাধ্য হয়েছেন সেই জঘন্য গ্রহটি সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে, যার কুবুদ্ধি প্রণোদিত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য আমরা সমবেত হয়েছি, তারাই জানেন ঐ গ্রহটির উপরিভাগে অদ্ভুত কতকগুলো সোজা দাগ আছে, যেগুলোকে জ্যোতির্বিদরা খাল বলে জানেন। যে-কোন অর্থনীতির ছাত্রের কাছে এটা নিশ্চয় জলের মতো পরিষ্কার যে, এই খালগুলো সামগ্রিক শাসনের ফল। সর্বগ্রাসী সামগ্রিক শাসন চালু না থাকলে মঙ্গলগ্রহে অতগুলো খাল তৈরি হতে পারত না। সুতরাং আমাদের অধিকার আছে, উচ্চতম বিজ্ঞানের প্রমাণ অনুসারে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি এই আক্রমণকারীরা শুধু আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকেই গ্রাস করবে না, আরো ধ্বংস করে ফেলবে সেই জীবনধারা যা আমাদের পূর্বপুরুষেরা চালু করে গেছেন প্রায় দুশো বছর আগে। সেই জীবনধারাই এতদিন আমাদের বেঁধে রেখেছে ঐক্যবন্ধনে। মনে হচ্ছে সেই ঐক্য ধ্বংস করে দিতেই এগিয়ে আসছে একটি শক্তি, যে শক্তির নাম উল্লেখ করা এ সময়ে সুবুদ্ধির কাজ হবে না। হতে পারে মহাবিশ্বের জীবনের বিবর্তনে মানুষ একটা অস্থায়ী স্তর মাত্র, কিন্তু একটি নিয়ম আছে যা মহাবিশ্ব সর্বদাই মানবে, একটি ঐশ্বরিক নিয়ম, সে নিয়মটি হচ্ছে কর্মপ্রচেষ্টার স্বাধীনতা, যে অমর ঐতিহ্য পাশ্চাত্যই দিয়েছে মানুষকে। যে লাল গ্রহটি এখন আমাদের মহা অকল্যাণ করতে উদ্যত তাতে এই কর্মচেষ্টার স্বাধীনতা বহু আগেই লোপ পেয়েছে নিশ্চয়, কারণ সেখানে যে খালগুলো আমরা দেখতে পাই সেগুলো কালকের জিনিস নয়। শুধু মানুষের নামে নয়, কর্মপ্রচেষ্টার স্বাধীনতার নামেও আমি এই সভাকে আহ্বান জানাচ্ছি তার শ্রেষ্ঠ দান দিতে, সকল দুঃখ স্বীকার করে, এতটুকু কার্পণ্য না করে, স্বার্থের কথা মোটেই চিন্তা করে নিশ্চিত আশা বুকে নিয়ে আমি এই আবেদন জানাচ্ছি এখানে সম্মিলিত অন্য যে-যে জাতির প্রতিনিধি রয়েছেন তাঁদের সকলের কাছে।'

ঐক্যের বাণী যে শুধু পাশ্চাত্যের তরফ থেকেই ধ্বনিত হল তা নয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি বসে পড়বার পরেই ভাষণ দিতে উঠলেন সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিনিধি মিঃ গ্রোলোভস্কি। তিনি বললেন :

'সময় এসেছে সংগ্রাম করবার, বক্তৃতা দেবার নয়। আমি যদি বক্তৃতা দিই, তাহলে এইমাত্র যে ভাষণ আমরা শুনলাম তার অনেক জিনিসই উড়িয়ে দিতে পারি। জ্যোতির্বিদ্যা হচ্ছে রাশিয়ার বিদ্যা। অন্যান্য দেশের অল্প কিছু লোক এ বিষয়ে একটু-আধটু চর্চা করেছে বটে, কিন্তু সোভিয়েট পণ্ডিতেরা দেখিয়ে দিয়েছেন তাদের জ্ঞান কত ফাঁপা, পরের থেকে ধার করা। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে যার নাম মুখে আনতেও আমার ঘৃণা হয় সেই জঘন্য গ্রহের খালগুলো সম্বন্ধে যে কথা বলা হল। মহান জ্যোতির্বিদ লুক্‌প্‌স্কি চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করেছেন যে ঐ খালগুলো তৈরি হয়েছে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়, এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে প্রতিযোগিতার ফলে। কিন্তু এসব আলোচনার সময় এখন নয়। এখন হচ্ছে কাজের সময়। তারপর যখন বাইরের এই আক্রমণ প্রতিহত হয়ে ফিরে যাবে, তখন দেখা যাবে সমস্ত পৃথিবী এক হয়ে গেছে, এবং যুদ্ধের প্রচণ্ড আলোড়নের মধ্য দিয়ে আমাদের ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক অনিবার্যভাবে সামগ্রিক শাসন হয়েছে বিশ্বব্যাপী।'

এ সময়ে অনেকের মনে ভয় হল বৃহৎ শক্তিগুলোর ভেতর এই নব-লব্ধ ঐক্য এই ধরনের বির্তকের ধাক্কায় টিকবে না। ভারত, প্যারাগুয়ে এবং আইসল্যাণ্ড এই অশান্ত পরিস্থিতিকে শান্ত করলেন; অবশেষে অ্যানজোরার গণতন্ত্রের প্রতিনিধির মিষ্টি কথায় সভার সদস্যেরা মুখের চেহারায় যে ঐক্য এবং সম্প্রীতির ঔজ্জ্বল্য নিয়ে বিদায় নিলেন, তার মূলে ছিল পরস্পরের ভাবাবেগ সম্বন্ধে অজ্ঞতা। সভা ভাঙবার আগে সমবেতভাবে ঘোষিত হল বিশ্বশান্তি এবং এই গ্রহের সমস্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের সেনাদলের একীকরণ। এই আশা পোষণ করা হল যে এই একীকরণের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত হয়তো মঙ্গলগ্রহীদের প্রধান আক্রমণ শুরু হবে না। কিন্তু তার আগে সমস্ত প্রস্তুতি এবং সম্প্রীতি সত্ত্বেও, বাইরে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের ভাব দেখালেও, ভেতরে-ভেতরে ভয় জেগে রইল সবার মনেই—এ ভয় থেকে মুক্ত রইলেন শুধু সেই গোষ্ঠীর কয়েকজন, এবং তাঁদের সহযোগীরা।

চার

এই ব্যাপক উত্তেজনা এবং আতঙ্কের পরিস্থিতিতেও কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে কারও-কারও মনে সন্দেহ ছিল, কিন্তু প্রকাশ্যে মুখ খোলা নিরাপদ হবে না বুঝে তাঁরা মুখ বুজে থাকতেন। রাষ্ট্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষের সদস্যরা জানতেন তাঁরা নিজেরা কখনো এই মঙ্গলগ্রহের ভীষণ জীব দেখেননি, তাদের প্রাইভেট সেক্রেটারিরাও জানতেন তাঁরাও কখনো দেখেন নি, কিন্তু চারিদিকে আতঙ্ক যখন চরমে উঠেছে তখন এঁরা কেউ তা প্রকাশ্যে স্বীকার করতে সাহস পেলেন না, কারণ অবিশ্বাসের মনোভাব প্রকাশ করলেই গদি হারাবার ভয় তো ছিলই, তার ওপর ক্ষিপ্ত জনতার হাতে প্রাণ হারাবারও ভয় ছিল। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে স্যার থিওফিলাস, স্যার বালবাস এবং স্যার পাবলিয়াসের প্রতিদ্বন্দ্বীরা স্বাভাবিক কারণেই এঁদের অসামান্য সাফল্যে ঈর্ষা বোধ করলেন, এবং মনে মনে এই ইচ্ছা পোষণ করতে লাগলেন যে কোন উপায়ে সম্ভব হলেই এদের টেনে নামাবো। আগে

সংবাদপত্র-জগতে 'ডেলি থাণ্ডার'ও প্রায় 'ডেলি লাইটনিং'-এর মতোই প্রভাবশালী ছিল, কিন্তু এই আতঙ্ক প্রচার অভিযানের উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে 'ডেলি থাণ্ডার'-এর আওয়াজ চাপা পড়ে গেল। সম্পাদক রাগে দাঁত কড়মড় করলেন, কিন্তু বুদ্ধিমান লোক তিনি, সুযোগের অপেক্ষায় ধৈর্য ধরে রইলেন। তিনি জানতেন জনতার হুজুগ যতক্ষণ জোরালো থাকে ততক্ষণ তার বিরোধিতা করে লাভ হয় না। যে বৈজ্ঞানিকরা পেনড্রেক মার্কল্‌কে অপছন্দ এবং অবিশ্বাস করতেন, তারা যখন দেখলেন তাঁকে নিয়ে এমন করা হচ্ছে যেন তিনি সর্বকালের সেরা বৈজ্ঞানিক, তখন স্বাভাবিক কারণেই তাদের মাথা গরম হয়ে উঠল। তাঁদের অনেকেই ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ যন্ত্রটি খুলে দেখেছিলেন এ একটি লোক-ঠকানো ধাপ্পাবাজি, কিন্তু নিজেদের চামড়া বাঁচাবার খাতিরেই তারা ভাবলেন এ বিষয়ে নীরব থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তাঁদের ভেতর শুধু একজন যুবক সুবুদ্ধির ধার ধারলেন না। এঁর নাম টমাস শভেলপেনি। অনেক ইংরেজ পাড়ায় লোকে তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখত, তার কারণ তাঁর পিতামহ ছিলেন শিমেলফোনগ নামে একজন জার্মান যিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে নাম বদল করে নিয়েছিলেন। টমাস শভেলপেনি ছিলেন একজন শান্তস্বভাব ছাত্র, বড় বড় ব্যাপারে অনভ্যস্ত, রাজনীতি এবং অর্থনীতি দুই বিষয়েই সমান অজ্ঞ; এবং কেবলমাত্র পদার্থবিজ্ঞানে সুদক্ষ। ইনফ্রা-রেডিওস্কোপ কেনবার পয়সা তাঁর ছিল না, কাজেই যন্ত্রটি যে ভুয়ো তা তিনি নিজে দেখে জানবার সুযোগ পেলেন না। যারা জেনেছিলেন তাঁরা ব্যাপারটা গোপন রাখতেন, এমনকি একসঙ্গে মদ্যপানের অন্তরঙ্গ পরিবেশেও এ ব্যাপারে মুখ খুলতেন না। কিন্তু বিভিন্ন লোকের মুখে তিনি তাদের দেখার যে বিভিন্ন রকমের বর্ণনা শুনলেন সেগুলোর ভেতর তিনি কতকগুলো অদ্ভুত অসঙ্গতি লক্ষ্য করলেন। এই অসঙ্গতি থেকেই তাঁর বৈজ্ঞানিক মনে কতকগুলো সন্দেহের উদয় হল, কিন্তু তাঁর সরল বুদ্ধিতে তিনি ভেবে পেলেন না এ ধরনের রূপকথার সৃষ্টি করে কার কি লাভ হবে।

নিজে তিনি আদর্শ এবং সংযত চরিত্রের লোক হলেও এমন একটি বন্ধুকে তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং অন্তর্দৃষ্টির জন্য মূল্যবান মনে করতেন যে, স্বভাবচরিত্রের দিক দিয়ে তাঁর মতো সৎ-স্বভাব ছাত্রের বন্ধু রূপে মনোনীত হবার যোগ্য ছিল না। ওই বন্ধুটির নাম ছিল ভেরিটি হগ-পকাস। ভেরিটি প্রায় সর্বদাই নেশাগ্রস্ত থাকত, এবং সাধারণ পানশালার বাইরে তাকে বড় একটা দেখা যেত না। লণ্ডন শহরের একটা অত্যন্ত বাজে বস্তিতে তার একটিমাত্র শোবার ঘর ছিল, সেই ঘরে সে রাত্রে ঘুমুত, কিন্তু এ কথাটা সে কাউকে জানতে দিত না। সাংবাদিকতার আশ্চর্য প্রতিভা ছিল তার, এবং যখনই টাকার টানাটানির দরুন মদ্যপানে বন্ধ রেখে প্রকৃতিস্থ থাকতে হত, তখনই সে বাধ্য হয়ে এমন দুর্দান্ত কৌতুকরসে ভরা প্রবন্ধাদি লিখে ঐ ধরনের লেখা যে সব কাগজে ছাপা হত তাতে পাঠিয়ে দিত যে, তারা ঐ লেখাগুলো না ছেপে পারত না। একটু উঁচু শ্রেণীর কাগজগুলোতে অবশ্য তার লেখা জায়গা পেত না, কারণ ধাপ্পাবাঝি বা ভণ্ডামিকে সে ছেড়ে কথা কইত না। রাজনীতি-জগতের নিচুতলার সব খবরই তার জানা ছিল, কিন্তু তার এই জানাকে কি করে নিজের পক্ষে লাভজনক করা যায়, সেটা তার জানা ছিল না। পর-পর অনেক চাকরিই সে পেয়েছিল, কিন্তু একটিও রাখতে পারেনি। প্রতিবারই তার মনিবরা টের

পেয়েছিলেন তারা গোপন রাখতে চান এমন অনেক অসুবিধাজনক গুপ্তকথা সে জানতে পেরেছে, এবং টের পেয়েই তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বুদ্ধির অভাবেই হোক, বা কিছুটা নীতিজ্ঞান অবশিষ্ট থাকার জন্যই হোক, গোপন কথা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে এদের বা অপর কারও কাছ থেকে একটি কানাকড়িও আদায় করবার চেষ্টা সে কখনো করেনি। তার জানা গুপ্ত কথা নিজের লাভের জন্য ব্যবহার না করে সে সস্তা মদের আড্ডায় যে-কোনো সদ্য পরিচিত লোকের সঙ্গে পান করতে করতে সেগুলো একটু একটু করে ছাড়ত।

ধাঁধায় পড়ে শভেলপনি এরই সঙ্গে পরামর্শ করলেন। বললেন, ‘আমার মনে হচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটাই ধাপ্পাবাজি, কিন্তু বুঝতে পারছি না এই ধাপ্পার পদ্ধতিটা কি, আর উদ্দেশ্যই বা কি। লোকে কি-কি জিনিস গোপন রাখতে চায় এ বিষয়ে তো তোমার জ্ঞান প্রচুর। কি ব্যাপার চলেছে, তুমি হয়তো আমাকে তা বুঝতে সাহায্য করতে পারবে।’

হগ-পাকাস ব্যঙ্গমিশ্রিত তাচ্ছিল্যের চোখে লক্ষ্য করে আসছিল কি করে জনসাধারণের আতঙ্কের হিড়িক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্যার থিওফিলাসের ঐশ্বর্যও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শভেলপেনির কথা শুনে সে খুশি হয়ে উঠল। বলল, ঠিক তোমাকেই আমার দরকার। ব্যাপারটা আগাগোড়া ধাপ্পা, এতে আমার কোনই সন্দেহ নেই, কিন্তু মনে রেখো ও কথা বলা নিরাপদ নয়। তুমি বিজ্ঞান যতটা জানো আর আমি রাজনীতির যতটুকু জানি, তাই মিলিয়ে আমরা হয়তো এ রহস্য ভেদ করতে পারব। কিন্তু যেহেতু কথা বলা বিপজ্জনক, এবং পেয়ালায় চুমুক দিলেই আমার মুখে খই ফোটা শুরু হয়ে যায়, তোমার দরকার হবে আমাকে তোমার ঘরে তালাবন্ধ করে রাখা। তা, তুমি যদি ঘরে আমার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে মদ রেখে দাও তাহলে আমার এই অস্থায়ী কারাবাস আমি সহজেই সয়ে নিতে পারব।

প্রস্তাবটা শভেলপেনির মনঃপূত হল, কিন্তু তাঁর পকেটের অবস্থা ভালো ছিল না। হগ-পকাসকে হয়তো বেশ কিছুদিন রাখতে হবে, তার এতদিনের মদ তিনি জোগাবেন কি করে? যাই হোক, হগ পকাস বরাবরই যে সমাজের নিচু তলায় ছিল তা নয়; এককালে লেডি মিলিসেন্টের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল, দুজনেরই যখন বাল্যকাল। দশ বছর বয়সে লেডি মিলিসেন্টের কি কি গুণ ছিল, সে সম্বন্ধে একটি বেশ জাঁকালো প্রবন্ধ লিখে সে একটি ফ্যাশন সম্পর্কিত সাময়িক পত্রে ভালো দামে বিক্রি করল। ভেবে দেখা গেল এই টাকার সঙ্গে স্কুলের শিক্ষকরূপে শভেলপেনির বেতন যোগ করে যে টাকা হবে, তা থেকেই এই কিছুদিনের মদের খরচ চলে যাবে।

তখন থেকেই হগ-পকাস বেশ বিধিবদ্ধভাবে অনুসন্ধান কার্যে লেগে গেল। অভিযানটা যে ‘ডেলি লাইটনিং’ থেকেই শুরু হয়েছিল সেটা তো পরিষ্কার বোঝাই গেল। নানা জনের নানা খবর হগ পকাসের নখদর্পণে; সে জানত ‘ডেলি লাইটনিং’-এর সঙ্গে স্যার থিওফিলাসের নিবিড় সম্পর্কের কথা। এও সবারই জানা ছিল যে লেডি মিলিসেন্টই সর্বপ্রথম একজন মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দাকে দেখেছিলেন, এবং এ ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক অংশটুকু প্রধানতঃ মার্কল্-এরই অবদান। ব্যাপারটা কি ভাবে ঘটেছে তার একটা মোটামুটি কাঠামো অস্পষ্টভাবে গড়ে উঠল হগ-পকাসের উর্বর মস্তিষ্কে, কিন্তু তার মনে হল এ

বিষয়ে যারা জানেন তাঁদের কোনো এক জনের মুখ থেকে কথা বার করতে না পারলে আরো স্পষ্টভাবে কিছু জানা যাবে না। হগ-পকাস শভেলপেনিকে পরামর্শ দিল লেডি মিলিসেন্টের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করতে, কারণ প্রথম ফোটোগ্রাফটি তাঁরই তোলা, সুতরাং পরিষ্কার বোঝা যায় ব্যাপারটির সঙ্গে প্রথম থেকেই তিনি জড়িত। হগ-পকাস এই ব্যাপারটির যেরূপ নানারকম অদ্ভুত সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দিল, তা শভেলপেনি পুরোপুরি বিশ্বাস করলেন না, কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক মন বলে দিল অনুসন্ধান শুরু করবার সেরা উপায় হবে, হগ-পকাসের কথামতো, একবার লেডি মিলিসেন্টের সঙ্গে দেখা করা। তিনি তাঁকে খুব যত্ন করে একটি চিঠি লিখলেন, তাতে বললেন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তিনি তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী। তাঁকে বিস্মিত করে লেডি মিলিসেন্ট রাজি হয়ে একটা তারিখ এবং সময়ের নির্দেশ দিয়ে দিলেন। শভেলপেনি চুল পোশাক ব্রাশ করলেন এবং নিজেকে অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন করে নিলেন। এভাবে তৈরি হয়ে তিনি রওনা হয়ে গেলেন সেই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারে।

পাঁচ

পরিচারিকা তাঁকে নিয়ে গেল লেডি মিলিসেন্টের নিভৃত কক্ষে, যেখানে আগেকার মতোই তিনি রয়েছেন তাঁর আরাম-কেদারায় গাত্র এলিয়ে, তাঁর পাশের ছোট্ট টেবিলটার ওপর রয়েছে তাঁর সেই পুতুল টেলিফোন।

লেডি মিলিসেন্ট বললেন, 'মিঃ শভেলপেনি, আপনার চিঠি পেয়ে আমি বিস্মিত হয়ে ভেবেছিলাম এমন কি বিষয় থাকতে পারে যা নিয়ে আপনি আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান? আমি বরাবর জেনে এসেছি আপনি একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী; আমি একজন অস্থিরচিত্ত মহিলা, ধনী স্বামী ছাড়া আমার উল্লেখযোগ্য আর কিছু নেই। কিন্তু আপনার চিঠি পাওয়ার পর আমি আপনার অবস্থা এবং কর্মজীবন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার জন্য কিছুটা শ্রম স্বীকার করেছি। আমার মনে হয় না আপনি টাকার জন্য আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

এই বলে তিনি মনোমুগ্ধকর হাসি হাসলেন। শভেলপেনির আগে কখনো এমন কোন নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি যিনি একাধারে ধনী এবং সুন্দরী। এঁকে দেখে তাঁর মনে যে অপ্রত্যাশিত ভাবাবেগের উদয় হল তার ফলে তিনি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করলেন। নিজেকে মনে-মনে বললেন, 'বাপু হে, তুমি এখানে ভাবাবেগে মত্ত হতে আসোনি, এসেছ একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের ব্যাপারে।' প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি জবাব দিলেন।

'লেডি মিলিসেন্ট, অন্যান্য মানুষদের মতো আপনিও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন মঙ্গলগ্রহীদের আক্রমণের আশঙ্কায় সমগ্র মানবজাতির চিত্তে কি এক অদ্ভুত আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। আমি যা জানতে পেরেছি তা যদি ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে এই মঙ্গলগ্রহীদের একজনকে আপনিই সর্বপ্রথম দেখেছিলেন। আমার যা বলবার আছে তা বলতে আমার খুব কঠিন লাগছে, তবু তা বলা কর্তব্য মনে করছি। সযত্নে অনুসন্ধানের ফলে আমার মনে সন্দেহ জেগেছে আপনি অথবা অপর কেউ এই ভয়ঙ্কর জীবদের একটিকেও দেখেছেন কিনা, এবং ইনফ্রা-রেডিওস্কোপের সাহায্যে সত্যিই কিছু দেখতে পাওয়া যায় কিনা। আমার

অনুসন্ধান যদি ভ্রান্ত হয়ে না থাকে, তাহলে আমি এই মীমাংসায় উপনীত হতে বাধ্য হচ্ছি যে একটা বিরাট ধাপ্পাবাজির আপনি একজন প্রথম উদ্যোক্তা। আমি বিস্মিত হব না যদি আমার একথা শোনবার পর আপনি আপনার সম্মুখ থেকে আমাকে বলপ্রয়োগে অপসারিত করান এবং আপনার ভৃত্যদের আদেশ দেন যেন আমাকে আর কখনো আপনার বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া না হয়। ওই ধরনের প্রতিক্রিয়া খুবই স্বাভাবিক হত, যদি আপনি নির্দোষ হতেন, এবং আরো বেশী স্বাভাবিক হত যদি আপনি দোষী হতেন। কিন্তু যদি এমন কিছু সম্ভব থেকে থাকে যা আমার চিন্তায় আসেনি, আপনার মতো একজন সুন্দরীকে যাতে দোয়ী করতে না হয়, এমন যদি কোনো উপায় থাকে, —আপনার হাসি দেখে আপনাকে খুব ভদ্র বলে মনে হচ্ছে—যদি বিজ্ঞানকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে আমার যে সংস্কার আপনার সপক্ষে রায় দিচ্ছে তাকেই আমি বিশ্বাস করে নিতে পারি, তাহলে আপনাকে আমি মিনতি জানাচ্ছি, আমার প্রাণের শান্তির জন্য আপনি সম্পূর্ণ সত্য আমাকে জানতে দিন।'

সন্দেহাতীত সরলতা, এবং মিলিসেন্টের দিকে হৃদয় ঝুঁকলেও তাকে তোষামোদ করতে অনিচ্ছা—শভেলপেনির এই দুটি গুণ লেডি মিলিসেন্টকে যেমন অভিভূত করল, যেমনি অভিভূত তাঁকে তাঁর পরিচিতদের মধ্যে কেউ কখনো করে নি। স্যার থিওফিলাসাকে বিয়ে করবার জন্য পিতাকে ছেড়ে আসবার পর এই তিনি সর্বপ্রথম সত্যিকারের সহজ সরল অকপট মানুষের সংস্পর্শে এলেন। স্যার থিওফিলাসের বিরাট ভবনে প্রবেশ করার পর থেকেই তিনি যে কৃত্রিম জীবন যাপনের চেষ্টা করে আসছিলেন, তা তাঁর অসত্য হয়ে উঠেছিল। মিথ্যা, ষড়যন্ত্র এবং হৃদয়হীন ক্ষমতার জগৎ তিনি আর সইতে পারছেন না বলে তাঁর মনে হচ্ছিল।

তিনি বললেন, 'মিঃ শভেলপেনি, কিভাবে আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দেব? আমার স্বামীর প্রতি আমার একটি কর্তব্য আছে, মানবজাতির প্রতি কর্তব্য আছে, সত্যের প্রতি কর্তব্য আছে। এই তিনটির অন্ততঃ একটির প্রতি আমাকে মিথ্যাচরণ করতেই হবে। কোনটির প্রতি আমার কর্তব্য সবচেয়ে বেশি, কি করে আমি তা ঠিক করব?'

শভেলপেনি বললেন, 'লেডি মিলিসেন্ট, আপনি আমার মনে আশা এবং কৌতূহল দুই সমানভাবে জাগিয়ে তুলেছেন। আপনার পরিবেশ দেখে বুঝতে পারছি আপনি কৃত্রিম জীবন যাপন করেন, কিন্তু তবু, যদি আমি ভুল করে না থাকি, তাহলে আপনার ভেতর এমন একটি জিনিস আছে যা কৃত্রিম নয়, যা অকপট এবং সরল, যার সাহায্যে পারিপার্শ্বিক নোংরামি থেকে আপনি এখনো মুক্তি পেতে পারেন। আপনাকে কাতর অনুরোধ জানাচ্ছি সব কথা আপনি খুলে বলুন। সত্যের পবিত্র-করা আগুনে পুড়ে আপনার আত্মা দোষমুক্ত হোক।

লেডি মিলিসেন্ট এক মুহূর্ত নীরব রইলেন। তারপর তিনি দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন :

'হ্যাঁ, আমি কথা বলব। বড় বেশি দিন আমি নীরব রয়েছি। অচিন্তনীয় অকল্যাণে আমি গা ঢেলে দিয়েছিলাম, কি করছি তা না বুঝে। তারপর একদিন বুঝলাম, তখন মনে হল বড় বেশি দেরী হয়ে গেছে, আর কোনো আশা নেই। কিন্তু আপনি আমাকে নতুন আশা দিয়েছেন ; হয়তো এখনো খুব বেশি দেরী হয়ে যায় নি, হয়তো এখনো কিছু বাঁচানো

যেতে পারে এবং আর কিছু যদি বাঁচাতে না পারি তো অন্ততঃ আমার সেই সততা ফিরে পাব, যা বাবাকে দুঃখ থেকে বাঁচার জন্য আমি বেচে দিয়েছিলাম।

'স্যার থিওফিলাস যখন মধু-ঝরা কণ্ঠে, দাম্পত্য জীবনে স্বভাবতঃ আমার মন রাখবার জন্য যেভাবে খোসামোদ করে কথা বলতেন তার চাইতেও বেশি খোসামুদে সুরে কথা বলে আমাকে ঐকান্তিক অনুরোধ জানালেন আমার শিল্প প্রতিভা কাজে লাগিয়ে একটি অদ্ভুত জীব তৈরি করতে, তখন ভবিষ্যৎ নাটকীয় ঘটনাবলীর সূত্রপাতের সেই মুহূর্তে, আমি জানতাম না কি ভীষণ উদ্দেশ্যে আমার আঁকা এই ছবিটির প্রয়োজন। আমি অনুরোধটি রক্ষা করলাম। আমি অদ্ভুত জীবটির ছবি আঁকলাম। আমি এই ভীষণ জীবটিকে দেখেছি বলে প্রচারিত হতে দিলাম, কিন্তু তখন জানতাম না কি নীচ উদ্দেশ্যে আমার স্বামী —হায় এখনো তাঁকে ঐ নামেই ডাকতে হবে—আমাকে তাতে রাজি করালেন। ক্রমে ক্রমে যতোই তাঁর অদ্ভুত অভিযানটির রূপ ফুটে উঠেছে, ততোই বিবেকের তাড়না আমি বেশি করে অনুভব করেছি। প্রতি রাত্রে আমি নতজানু হয়ে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছি, কিন্তু আমি জানি স্যার থিওফিলাস যে বিলাস বৈভবে আমায় ঘিরে রাখতে ভালোবাসেন আমি যতদিন তার ভেতর থাকব, ততদিন ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করবেন না। এ সমস্ত ত্যাগ করে যেতে রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমার আত্মা মালিনমুক্ত হবে না। আপনার এই আগমন উটের পিঠে শেষ খড়ের কাজ করেছে। আপনি এসে সরল সহজভাবে সত্যের আবাহন করে আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন আমার কি করা উচিত। আমি আপনাকে সব বলব। আপনি জানতে পারবেন আপনি যে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা কইছেন, সে কত নীচ। আমার অপরাধের সামান্যতম অংশও আমি আপনার কাছে গোপন করব না। এবং সব কিছুই যখন আমার খুলে বলা হয়ে যাবে, তখন হয়তো যে নোংরা অপবিত্রতা আমাকে আক্রমণ করেছে তা থেকে মুক্ত হয়ে আবার আমি নিজেকে নির্মল বোধ করব।'

লেডি মিলিসেণ্ট এই বলে তারপর শভেলপেনিকে সব কথা খুলে বললেন। বলবার সময় তিনি শ্রোতার মুখে যে নিদারুণ আতঙ্কের অভিব্যক্তি দেখবেন বলে ভেবেছিলেন, তার বদলে দেখলেন তাঁর দুচোখে ফুটে উঠেছে সপ্রশংস মুগ্ধতার ভাব। এর আগে শভেলপেনি হৃদয়ে কখনো প্রেমভাব অনুভব করেননি, এইবার করলেন। শ্রীমতীর যখন সব কথা বলা হয়ে গেল, শভেলপেনি তাঁকে বুকে টেনে নিলেন, শ্রীমতীও ধরা দিলেন তাঁর বাহুবন্ধনে।

'আঃ, মিলিসেণ্ট!' বললেন শভেলপেনি, 'মানুষের জীবন কি জটিল, কি ভয়ঙ্কর! হগ-পকাস আমাকে যা-যা বলেছে সব সত্যি, কিন্তু তবু এই হীন ব্যাপারের উৎসমূলেই আমি পেয়েছি তোমাকে, যে তুমি এখনো মনের গহনে অনুভব করতে পারছ সত্যের পবিত্র অগ্নিশিখা। এখন যখন তুমি নিজের সর্বনাশ করেও সব কথা স্বীকার করেছ, তোমার মধ্যে আমি পেয়েছি একজন কমরেড, একজন আত্মার, যেমনটি এই পৃথিবীতে কোথাও আছে বলে আমি আশা করিনি। কিন্তু এই অদ্ভুত জট-পাকানো অবস্থায় কি করা উচিত, তা আমি এখনো ঠিক করতে পারছি না। এবিষয়ে আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। তারপর ফিরে এসে আমি তোমাকে আমার সিদ্ধান্ত জানাব।

আপন আবাসে তখন ফিরে গেলেন শভেলপেনি, যখন তাঁর মোহাচ্ছন্ন অবস্থা, ঠিক অনুভব করছেন বা কি চিন্তা করছেন কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারছেন না। হগ-পকাস তখন বিছানায় শুয়ে মদের নেশায় চুর হয়ে নাক ডাকাচ্ছে। এই লোকটার ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য শুনতে তাঁর ইচ্ছা হল না; মিলিসেণ্ট সম্পর্কে তাঁর মনে যে অনুভূতির উদয় হয়েছিল তার সঙ্গে এর দৃষ্টিভঙ্গির সামঞ্জস্য ছিল না। মিলিসেণ্টের রূপমুগ্ধ শভেলপেনি মিলিসেণ্টকে দোষী ভাবতে পারলেন না। তিনি হগ-পকাসের বিছানার ধারে এক বোতল হুইস্কি আর একটা গ্লাস রেখে দিলেন; তিনি জানতেন আগামী চব্বিশ ঘণ্টার ভেতরে এই ব্যক্তিটি যদি এক মুহূর্তের জন্যে জেগেও ওঠে, তাহলে সামনে মদ দেখে সে লোভ সামলাতে পারবে না এবং তার ফলে আবার ডুবে যাবে আত্মবিস্মৃতির তলায়। এভাবে বিনা ব্যাঘাতে চব্বিশ ঘণ্টা কাটাবার পাকা ব্যবস্থা করে তিনি গ্যাসের আগুনের ধারে চেয়ারের ওপর বসে পড়লেন এবং মন স্থির করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য, এবং ব্যক্তিগত কর্তব্য, দু'রকম কর্তব্য নিধারণ করাই শক্ত হয়ে উঠল। যাঁরা এই ষড়যন্ত্রটি তৈরি করেছিলেন তারা সবাই দুষ্ট লোক; তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত হীন, এবং তাঁদের কাজের ফলে মানবজাতির ভালো হবে না মন্দ হবে তা নিয়ে তাঁরা আদৌ মাথা ঘামান নি। ব্যক্তিগত লাভ এবং ব্যক্তিগত ক্ষমতাই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য। মিথ্যা, প্রতারণা এবং সন্ত্রাসসৃষ্টি ছিল তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়। তিনি কি নীরব থেকে নিজেকে এই জঘন্য ব্যাপারের অংশীদার করবেন? যদি তা না করেন, যদি মিলিসেণ্টকে রাজি করান প্রকাশ্যে সবকিছু স্বীকার করতে, যা তিনি পারবেন বলে জানতেন, তাহলে মিলিসেণ্টের অবস্থা কি হবে? তাঁর স্বামী তাঁকে কি করবেন? সারা পৃথিবীময় যাঁরা তাঁর কথায় বিশ্বাস করে বোকা বনেছেন, তারা তাঁকে কি করবেন? কল্পনার চোখে শভেলপেনি দেখলেন সুন্দরী মিলিসেণ্ট ধুলোয় লুটোচ্ছে, পিষ্ট হচ্ছেন অনেক মানুষের পায়ের তলায়, বর্বর জনতা তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলছে। এ দৃশ্য তাঁর অসহ্য মনে হল, তবু তিনি ভাবলেন তাদের কথাবার্তার সময় মহত্ত্বের যে স্ফুলিঙ্গ তাঁর ভেতর তিনি জেগে উঠতে দেখেছিলেন তাকে নতুন করে নেভানো চলবে না, লাভজনক মিথ্যার নরম বিছানায় শুয়ে জীবন কাটাবেন না মহীয়সী মিলিসেণ্ট।

অতএব তাঁর মন ঘুরে গেল এর বিকল্প সম্ভাবনার দিকে। স্যার থিওফিলাস এবং তাঁর সহযোগীদের কি জয়গৌরব লাভ করতে দেওয়া হবে? এর স্বপক্ষে একাধিক জোরালো যুক্তি ছিল। এই ষড়যন্ত্রটির জন্ম হবার আগে পুবে পশ্চিমে লড়াই আসন্ন হয়ে উঠেছিল, অনেকের মনে হয়েছিল মানুষ জাতটা ব্যর্থ আক্রোশে নিজেই নিজের বিলুপ্তি ঘটাবে। কিন্তু এখন একটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক বিপদের আশঙ্কায় প্রকৃত বিপদটা আর নেই।

রাশিয়ার ক্রেমলিন আর যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউস, মঙ্গলগ্রহীদের প্রতি ঘৃণায় মিলিত হয়ে, প্রিয় বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর সৈন্যদলগুলিকে এখনো যুদ্ধের জন্য একত্রিত করা যায়, কিন্তু এখন তারা একত্রিত এমন শত্রুর বিরুদ্ধে যে শত্রুর অস্তিত্ব নেই, এবং এক তাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলোও যে ক্ষতি করবার জন্যে তৈরি তা করতে পারবেন না। 'সম্ভবতঃ' ও তিনি ভাবতে লাগলেন, 'মিথ্যার সাহায্যেই মানুষকে বাঁচার মতো বাঁচতে উদ্বুদ্ধ করা যায়। মানুষের প্রবৃত্তিগুলোই এই রকম যে সত্য চিরদিনই বিপজ্জনক থাকবে।

সত্যের অনুগত হয়ে আমি বোধ হয় ভুলই করেছি। আমার চাইতে বোধহয় স্যার থিওফিলাসই বেশি বুদ্ধিমান। আমার প্রিয়া মিলিসেণ্টকে তার সর্বনাশের দিকে এগিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে বোধহয় বোকামি হবে।’

তারপর তাঁর চিন্তার গতি আবার অন্য দিকে ঘুরে গেল। আগে হোক পরে হোক, তিনি ভাবলেন, এই প্রতারণা ধরা পড়বে। যাঁরা আমার মতো সত্যানুসন্ধানী, তাঁদের দ্বারা না হলে পরে যাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বার্থ স্যার থিওফিলাসের স্বার্থের মতোই কুটিল এবং ক্রুর, তাঁদের দ্বারা এই ধাপ্পাবাজি আবিষ্কৃত এবং প্রকাশিত হবেই। এই লোকেরা এই প্রতারণার রহস্য উন্মোচন করে ফেলতে পারলে সেটা কিভাবে কাজে লাগাবেন? স্যার থিওফিলাসের মিথ্যাগুলো যে টেলুরীয়দের মধ্যে সম্প্রীতির সৃষ্টি করেছে তার বিরুদ্ধে এঁরা তার সাহায্যে ঘৃণা বাড়িয়ে তুলবেন। গোটা যড়যন্ত্রের মুখোশ যখন আগে হোক পরে হোক খুলে পড়বেই, তখন ঈর্ষা এবং প্রতিযোগিতার তরফ থেকে না হয়ে সত্যের মহান আদর্শের নামেই সেটা হওয়া ভালো নয় কি? কিন্তু এসব বিষয়ে বিচার করবার আমি কে? আমি তো ভগবান নই। ভবিষ্যৎ আমি জানতে পারি না। ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঢাকা। যে দিকেই তাকাই, যে দিকেই দেখি আতঙ্ক। বুঝতে পারিনা দুষ্ট লোকদের পৃথিবীর ধ্বংস সাধন করতে সহায়তা করা উচিত। এই বিষম দোটানায় পড়েছি আমি ; এর সমাধান আমার পক্ষে অসম্ভব।

চব্বিশ ঘণ্টা তিনি ঠায় বসে রইলেন তাঁর চেয়ারে, নাওয়া খাওয়া ভুলে, দুললেন নানা বিপরীত ভাবনার দোলায়। চব্বিশ ঘণ্টার পরে এল লেডি মিলিসেণ্টের সঙ্গে আবার দেখা করবার পূর্ব নির্ধারিত সময়, শ্রান্ত এবং আড়ষ্টভাবে তিনি উঠে দাঁড়ালেন ; একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তারপর গুরুগম্ভীরভাবে পা ফেলে
ফেলে অগ্রসর হলেন শ্রীমতীর ভবনের দিকে।

গিয়ে দেখলেন লেডি মিলিসেণ্টও তাঁরই মতো ভেঙে পড়েছেন। তিনিও মানসিক দ্বন্দ্বে ছিন্ন ভিন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু পৃথিবীর চাইতে তিনি বেশি ভাবছিলেন তাঁর স্বামীর, এবং তাঁর নতুন প্রেমপাত্র টমাসের কথা। রাজনৈতিক চিন্তা করার অভ্যাস তাঁর ছিল না। তাঁর জগৎ গড়ে উঠেছিল এমন ব্যক্তিদের নিয়ে যাদের কার্যকলাপের ফলাফল ছিল তাঁর চেতনার সীমার বাইরে ; এই ফলাফলগুলি তিনি বুঝবার আশা করতেন না। তিনি বুঝতেন শুধু তাঁর ব্যক্তিগত জগতের গণ্ডীর ভেতরকার নরনারীদের মানবিক সুখ-দুঃখের কথা। এই চব্বিশ ঘণ্টা ধরে তিনি ভেবেছেন শুধু টমাসের স্বার্থলেশহীন গুণাবলীর কথা, আর দুঃখবোধ করেছেন স্যার থিওফিলাসের ফাঁদে ধরা পড়বার আগে এহেন চরিত্রের কোন মানুষের সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য কেন তাঁর হয়নি। এতগুলো ঘণ্টার উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষার দুঃসহতা ভোলবার জন্য তিনি স্মৃতির সাহায্যে টমাসের একটি ছোট ছবি এঁকে সেটিকে একটি লকেটের ভেতর পুরে রেখেছিলেন। এই লকেটে আগে, জীবনের আরো হালকা সময়ে, তিনি তাঁর স্বামীর ছবি পুরে রাখতেন। এই লকেট তিনি গলার হারের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিলেন। উৎকণ্ঠা যখন অসহ্য হয়ে উঠল, তিনি তখন একটু শান্তি পাবার জন্য তাকিয়ে রইলেন টমাস শভেলপেনির ছবির দিকে, যে টমাসকে প্রেমাস্পদ বলবার জন্য তাঁর প্রাণ ব্যাকুল।

অবশেষে শভেলপেনি এলেন তাঁর কাছে, কিন্তু তখন তাঁর পদক্ষেপে নেই সজীবতা, চোখে নেই উজ্জ্বল দৃষ্টি, কণ্ঠস্বরে নেই উচ্ছল প্রাণশক্তির স্পন্দন। বিষণ্ণভাবে ধীরে ধীরে তিনি নিজের একহাতে শ্রীমতীর একটি হাত তুলে নিলেন। অন্য হাতে পকেট থেকে একটি বড়ি তুলে নিয়েই তাড়াতাড়ি গিলে ফেললেন।

তিনি বললেন, 'মিলিসেন্ট, আমি এই যে বড়িটি গিলে ফেললাম এর ফলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার মৃত্যু হবে। আমি কোনটা বেছে নেব কিছুতেই বুঝতে পারছি না। বয়স যখন কম ছিল তখন আমার ছিল অনেক আশা, অনেক উচ্চ আশা। তখন ভাবতাম জীবন উৎসর্গ করতে পারব সত্য এবং মানবজাতির সেবায়। হায়, তখন জানতে পারি নি যে তা হবার নয়। আমি কি সত্যের সেবা করে মানবজাতিকে ধ্বংস হতে দেব, না মানবজাতির সেবা করে সত্যকে ধূলায় পদদলিত হতে দেব? সে কথা ভাবতেও ভয় হয়। এই দোটানার মাঝখানে পড়ে আমি বেঁচে থাকা কেমন করে সহ্য করবো? সেই সূর্যের তলায় কি করে আমি নিঃশ্বাস গ্রহণ করব, যে সূর্য হয় দেখবে ভীষণ হত্যাকাণ্ড; না-হয় তো ঢেকে যাবে মিথ্যার মেঘে? না, এ অসম্ভব। তুমি, মিলিসেন্ট, তুমি আমার পরম প্রিয়, আমার ওপর তোমার আস্থা আছে, তুমি জান আমার প্রেম কত সত্য... কিন্তু তবু... কিন্তু তবু... এই দোটানায়-পড়া অবস্থায় আমার নির্যাতিত আত্মার জন্য তুমি কিই বা করতে পার? তোমার ঐ কোমল বাহু, অপরূপ সুন্দর চোখদুটি, অথবা তুমি আমাকে যা দিতে পার তাঁর কোন কিছুই আমাকে এই দুঃখে সান্ত্বনা দিতে পারে না। না, মরতে আমাকে হবেই। কিন্তু মরবার সময়ে আমার পরে যাঁরা থাকবেন তাঁদের জন্য আমি রেখে যাচ্ছি একটি ভীষণ দায়িত্ব—সত্য এবং জীবন এই দুটির ভেতর একটিকে বেছে নেবার দায়িত্ব। কোনটি বেছে নেওয়া উচিত, তা আমি জানি না। বিদায়, বিদায়, প্রিয় মিলিসেন্ট। যেখানে অপরাধী আত্মাকে কোনো সমস্যায় জর্জরিত হতে হয় না, সেই দেশে আমি চললাম। বিদায়...'

অন্তিম আবেগে একবার মুহূর্তেকের জন্য তিনি মিলিসেন্টকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর টমাসের হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে অনুভব করেই মিলিসেন্ট মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। মূর্ছাভঙ্গের পর তিনি তাঁর গলা থেকে লকেটটি ছিনিয়ে নিলেন। কমনীয় আঙুল দিয়ে লকেট খুলে টমাস শভেলপেনির ছোট্ট ছবিটি তার ভেতর থেকে বার করে নিলেন। ছবিটিকে চুম্বন করে তিনি বললেন :

'ওগো মহাপ্রাণ, যদিও তুমি মৃত, যদিও তোমার যে অধরে আমি এখন বৃথা চুম্বন এঁকে দিচ্ছি তারা আর কথা কইতে পারে না, তবু তোমার কিছুটা এখনো বেঁচে আছে, বেঁচে আছে আমার বুকের ভেতরে। আমার মধ্য দিয়ে, এই তুচ্ছ আমার মধ্য দিয়েই, মানুষকে তুমি যে বাণী দিতে চেয়েছ, মানুষের কাছে সে বাণী পৌঁছবে।'

এই বলে তিনি টেলিফোন তুলে ডাকলেন 'ডেলি থাণ্ডার'কে।

ছয়

কয়েক দিন বাদে,-এ সময়ে লেডি মিলিসেন্টকে তাঁর স্বামীর এবং তাঁর অনুচরবৃন্দের কোপ থেকে রক্ষা করলেন 'ডেলি থাণ্ডার' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ—লেডি মিলিসেন্টের কাহিনী

বিশ্বব্যাপী সবারই বিশ্বাস লাভ করল। প্রত্যেকেই হঠাৎ সাহস পেয়ে স্বীকার করলেন ইনফ্রা-রেডিস্কোপের মধ্যে দিয়ে তিনি কিছুই দেখতে পান নি। মঙ্গলগ্রহীদের সম্পর্কে আতঙ্ক যেমন তাড়াতাড়ি চরমে উঠেছিল, তেমনি তাড়াতাড়ি থেমে গেল। থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুবে পশ্চিমে আবার মনান্তর শুরু হল, এবং মনান্তর অচিরেই পরিণত হল খোলাখুলি যুদ্ধে।

যুদ্ধসাজে সজ্জিত জাতিবৃন্দ বিস্তীর্ণ কেন্দ্রীয় সমতলভূমিতে সমবেত হল। আকাশ কালো হয়ে গেল এরোপ্লেনে-এরোপ্লেনে। ডাইনে বাঁয়ে আণবিক বিস্ফোরণ ধ্বংস ছড়াতে লাগল। বিরাট-বিরাট কামান থেকে গোলা বেরিয়ে মানুষের পরিচালনা ছাড়াই লক্ষ্য সন্ধানে ছুটতে লাগল। হঠাৎ সব আওয়াজ থেমে গেল। প্লেনগুলো মাটির বুকে নেমে এল। বন্ধ হয়ে গেল গোলাগুলি। রণভূমির অনেক দূরে সাংবাদিকরা একাগ্র উৎসাহে তাঁদের এই অদ্ভুত পেশা অনুযায়ী যা দেখবার দেখছিলেন। তাঁরা লক্ষ্য করলেন এই হঠাৎ নিস্তব্ধতা। তাঁরা বুঝতে পারলেন না এই নিস্তব্ধতার কারণ। কিন্তু সাহস করে তাঁরা এগিয়ে গেলেন যেখানে লড়াই হচ্ছিল। গিয়ে দেখলেন, যেখানে লড়াই করছিল সেখানে মরে পড়ে আছে সব সৈন্য—তারা মরেছে, কিন্তু শত্রুর আঘাতে নয়, কোন অদ্ভুত, নতুন, অজ্ঞাত কারণে। সাংবাদিকরা ছুটে গেলেন টেলিফোনে, ফোনে খবর পাঠালেন তাদের নিজ নিজ রাজধানীতে। রাজধানীগুলো লড়াইয়ের ক্ষেত্র থেকে অনেক দূর। সেখানে সংবাদপত্রের অপিসের 'শেষ সংবাদ' বিভাগে খবর পৌঁছলঃ 'লড়াই থামিয়ে দিয়েছে...' খবর এর বেশি আর এগুলো না। এই পর্যন্ত শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কম্পোজিটাররা পড়ে মরে গেল। ছাপার যন্ত্রগুলোও থেমে নীরব হয়ে গেল। মৃত্যু ছড়িয়ে গেল সারা পৃথিবীময়। মঙ্গলগ্রহীরা সত্যিই এসে পড়েছিল।

উপসংহার

(মঙ্গলগ্রহের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিশিক্ষার অধ্যাপক লিখিত)

মানবজাতির শেষ কয়েক বছরের উপরিলিখিত ইতিহাস রচনা করিতে আমাকে আদেশ করিয়াছেন সেই মহাবীর যাঁহাকে আমরা সবাই ভক্তি করি দিগ্বিজয়ী মার্টিন। সেই মহান মঙ্গলগ্রহী তাঁহার প্রজাদের মধ্যে এখানে সেখানে লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে মিথ্যাবাদী দ্বিপদীগুলিকে তাঁহার সৈন্যেরা বীরের মতো এবং যথাযোগ্যভাবে নিশ্চিহ্ন করিয়াছে তাহাদের প্রতি কেমন একটা দুর্বল হৃদয়াবেগ রহিয়াছে। তিনি তখন তাহার জ্ঞানের আলোকে উদ্বুদ্ধ হইয়া স্থির করিয়াছিলেন যে তাঁহার বিজয় অভিযানের পূর্ববর্তী ঘটনা এবং পরিস্থিতিগুলি নিখুঁতভাবে বর্ণনা করিবার জন্য সর্বপ্রকার পাণ্ডিত্য নিয়োজিত হইবে। কারণ তাঁর মত এই যে, এই ধরনের জানোয়ারগুলিকে আমাদের মহাবিশ্বকে আর দূষিত করিতে দেওয়া ঠিক হইবে না। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলির প্রত্যেকটি পাঠক তাঁহার সহিত একমত হইবেন।

আমাদের সপ্তপদী বলিয়া দোষ দেওয়ার চেয়ে জঘন্য নিন্দাবাদ কেহ কল্পনা করিতে পারে কি? পরিবর্তনশীল ঘটনাগুলিকে আমরা যে মধুর হাসি দিয়া অভ্যর্থনা করি তাহাকে যে টেলুরীয়গণ অপরিবর্তনশীল কাষ্ঠহাসি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে তাহাদিগকে কিরূপে ক্ষমা

করা যাইতে পারিত? স্যার থিওফিলাসের মতো জানোয়ারকে যেসব সরকার সহ্য করে তাহাদের সম্পর্কে কি ধারণা করিব? যে ক্ষমতার লোভ তাহাকে তাহার অভিযানে প্রবৃত্ত করিয়াছিল, আমাদের ভিতর তাহা ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজা মার্টিনেরই বুকের মধ্যে আবদ্ধ। এবং যুক্তরাষ্ট্রসংঘের বিতর্কে আলোচনার যে স্বাধীনতা দেখা গিয়াছিল তাহার সমর্থনে কে কি বলিতে পারে? আমাদের এই গ্রহে জীবন কত মহত্তর! এখানে কি চিন্তা করিতে হইবে তাহা নির্ধারিত হয় বীরচরিত্র মার্টিনের আদেশ দ্বারা, এবং সাধারণ ব্যক্তিদের শুধু সে আদেশ মান্য করিতে হয়!

এখানে যে বিবরণ দেওয়া হইল তাহা প্রমাণ্য। গত টেলুরীয় যুদ্ধ এবং আমাদের সাহসী তরুণদের আক্রমণের পর খবরের কাগজ এবং গ্রামোফোন রেকর্ডের যে টুকরাগুলি অবশিষ্ট ছিল তাহা হইতেই মালমশলা সংগ্রহ করিয়া এই বিবরণ একত্রিত করা হইয়াছে। এই বিবরণে প্রকাশিত কতকগুলি বিবরণের অন্তরঙ্গতায় কেহ-কেহ বিস্ময় বোধ করিতে পারেন, কিন্তু দেখা গিয়াছিল স্যার থিওফিলাস তাঁহার স্ত্রীর নিভৃত কক্ষে তাঁহাকে না জানাইয়া একটি ডিকটাফোন যন্ত্র লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। এই যন্ত্র হইতেই শভেলপেনির শেষ কথাগুলি পাওয়া গিয়াছে।

এই জানোয়ারগুলি আর জীবিত নাই, ইহা জানিয়া প্রত্যেক মঙ্গলগ্রহীর হৃদয় স্বস্তিবোধ করিবে। এবং এই চিন্তার আনন্দে অধীর হইয়া আমরা কামনা করিব ভিনাস গ্রহেরও সমান জঘন্য অধিবাসীদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রিয় রাজা মার্টিন যে অভিযান করিবেন মনস্থ করিয়াছেন তাহাতেও তিনি তাঁহার প্রাপ্য জয় গৌরব লাভ করেন।

রাজা মার্টিন দীর্ঘজীবি হোক!

প্রথম প্রকাশ : আশ্চর্য!, অক্টোবর, ১৯৬৩

মূল রচনা : বারট্রাণ্ড রাসেল

কলকাতার রূপা এণ্ড কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবস্থাক্রমে প্রকাশিত।

সূচিপত্রে ফিরে যান

লোকান্তরের হাতছানি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলাদেশ নিশি-পাওয়ার গল্প চলতি আছে। সত্যি-মিথ্যে জানিনে। কিন্তু একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী বলি। এ ঘটনা কী করে ঘটল তা আজও আমার কাছে দুর্বোধ্য।

গোদাগাড়ী ঘাট থেকে কাটিহার পর্যন্ত মীটার গজের যে ব্রাঞ্চ লাইন আছে, সে পথে যাঁরা গেছেন, তাঁরা অনেকেই ছোট একটি স্টেশনকে লক্ষ্য করে থাকবেন। স্টেশনটির নামটা বিচিত্র—বুলবুলচণ্ডী। নামের এমন গুরুচণ্ডালী সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না।

যখনকার কথা বলছি, অর্থাৎ বছরদশেক আগে, সেই সময় সবে এই স্টেশনটি তৈরি হয়েছে। এই ছোট টিলার উপর একখানা ওয়াগন তখন একাধারে স্টেশন এবং স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টার। স্টেশন থেকে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ ফুট নিচে নামলে সমতল মাটি। তার পাশ দিয়ে নদী আর দূরে কাছে শালের বন। গ্রাম অনেকখানি দূরে—যতটা মনে পড়ছে, ক্রোশখানিকের এদিকে নয়। এক কথায় অখণ্ড নির্জনতার ভেতরে একটুকরো নিঃসঙ্গ স্টেশন।

শরতের এক বিকেলে, মালদহ শহর থেকে এই স্টেশনে এসে আমি নামলুম। এখান থেকে চৌদ্দ-পনেরো মাইল দূরে দিনাজপুর জেলার একটা বড় বন্দর আমার গন্তব্যস্থান।

সাধারণতঃ স্টেশনের নীচেই নদীর ধারে বরাবর গোরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে ভাড়াটের প্রত্যাশায়। আজ পরম বিস্ময়ের সঙ্গে দেখি কোনও একখানা গাড়ীর চিহ্ন নেই।

স্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞেস করলুম, "কী মশাই, গাড়ী দেখছি, না যে একখানাও।"

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "আপনি বোধহয় অনেক দিন এ তল্লাটে আসেন নি।"

বললুম, "না, বছরখানেকের ভেতরে আসিনি।"

তিনি বললেন, "তাই জানেন না। গোপালপুরের দিকে তো সোয়ারী গাড়ীতে ক্রমাগত ডাকাতি আর খুন হচ্ছে কয়েকমাস ধরে। রাত করে কোনো গাড়ী আর ওদিকে যায় না। কাল সকালের আগে গাড়ী পাবেন না।"

তাই তো। অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করতে লাগলুম। রাতটা এখন আমি কাটাই কোথায়। এই ওয়াগনে? স্টেশন মাষ্টারের পা ছড়িয়ে শোবার মতো জায়গাই এখানে কুলোয় কিনা সন্দেহ। গ্রামে যাব? সেখানে কেই বা আমাকে চেনে—আর কেনই বা আশ্রয় দেবে?

এমন সময় পেছনে কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম, "আরে, ভায়া যে!"

তাকিয়ে দেখি, জগদীশবাবু। আমার দূর-সম্পর্কের আত্মীয় তিনি। আর সবচেয়ে বড় কথা, আমি যেখানে যাব, সেইখানেই তিনি থাকেন—ব্যবসা করেন।

বললুম, "পলাশপুর যাবেন বুঝি?"

তিনি বললেন,"নইলে আর এখানে মরতে এলুম কেন?"

বললুম, "ভালোই হল। কিন্তু গাড়ী তে পাওয়া যাচ্ছে না। যাবেন কী করে?"

তিনি বললেন, "কেন, স্রেফ হন্টনযোগে। রাজী আছো পনেরো মাইল হাঁটতে? তাহলে বেরিয়ে পড়ো আমার সঙ্গে।"

বললুম, "পনেরো-বিশ মাইল হাঁটা আমার অভ্যেস আছে। কিন্তু পথে যে ডাকাতের উৎপাত হয়েছে শুনছি।"

জগদীশবাবু বললেন, "পায়ে-হাঁটা মানুষকে ওরা ধরে না। আর যদি এসেই পড়ে, হাতের আংটি আর ঘড়িটা খুলে দিয়ো। দুচারটে চড়-চাপড়ের ওপর দিয়েই পার পেয়ে যাবে।"

চমৎকার সমাধান! ডাকাতের চড়-চাপড় কখনো খাইনি, কিন্তু সে যে আমাদের ড্রিল মাষ্টারের চড়ের চাইতে আরো কিছু গুরু ভার হবে—সেটা অনুমান করার মতো বুদ্ধি আমার আছে। কিন্তু কী আর করা যাবে। নাস্তিক মানুষ আমি—আপাততঃ বেরিয়ে পড়লুম দুর্গা নাম জপ করতে করতেই।

চৌদ্দ থেকে পনেরো মাইল রাস্তা। পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ ঘন্টার বেশী লাগা উচিত নয়। সুতরাং আশা করলুম রাতে সাড়ে দশটা নাগাদ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাবই।

কিন্তু সেই ধু-ধু মাঠের ভেতরে হাওয়া যে কী প্রচণ্ড রূপ নিতে পারে, জীবনে সে অভিজ্ঞতা হল এই প্রথম। উল্টোমুখী বাতাসের ঝাপ্টা যেন বারে বারে পেছন দিকে ঠেলে দিতে লাগল। ঘণ্টায় চার মাইল পেরুনো দূরে থাক, এক মাইল এগোনোই দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং সাড়ে দশটায় পৌঁছে যাওয়া তো দূরের কথা—মাইল আষ্টেক আসতেই দেখি ঘড়ির কাঁটা দশটার কাছাকাছি।

এইখানে ছোট একটি হাট আছে—গোপালপুরের হাট তার নাম। খানদশেক চালা, একটি দেশী মদের দোকান আর একটি হিন্দুস্থানী ভূজাওলার "ঝোঁপড়ী" ছাড়া আর কিছু নেই। সপ্তাহে একটি দিন হাট বসে, তাছাড়া বাকী সময়টা হাট-
খোলা শ্মশানের মতো শূন্য হয়ে পড়ে থাকে।

রাত দশটায় দেশী মদের দোকান খোলা থাকার প্রশ্ন ওঠে না। ভূজাওলা তার ঝোপড়ীতে নাক ডাকাচ্ছে। চারদিকে ঝিঁঝিঁর ডাক আর হাটখোলার বিশাল ঝাঁকড়া বটগাছটায় প্যাঁচার আর্তনাদ যেন অন্ধকারটাকে আরো স্তম্ভিত করে রেখেছে।

জগদীশবাবু বললেন, "কী করবে? রাতটা ঘুমিয়ে নেবে নাকি হাটখোলায়?"

"কোথায় ঘুমুব?"

"কেন, একটা চালার নীচে?"

বললুম, "ক্ষেপেছেন? ওই শুকনো লঙ্কার চালায় গোবরের ওপর শুয়ে থাকব? হাঁচতে হাঁচতে প্রাণ যাবে, তার ওপরে পিলপিল করে গায়ে উঠবে গুবরে পোকা। ওসবের ভেতরে আমি নেই। আর আট মাইল যদি পেরুতে পেরে থাকি, বাকী সাত মাইলও ডিঙোনো যাবে একরকম করে। এখন তো হাওয়াও নেই।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জগদীশবাবু বললেন, "তবে চলো।"

বুঝলাম, ওঁর আর নড়তে ইচ্ছে নেই, কিন্তু আমি ভাবছিলাম, আর ঘণ্টা-তিনেক হাঁটলেই অন্তত একটা নরম বিছানা পাওয়া যাবে। একটাও যদি বাজে, তা হলেও কয়েক ঘণ্টা আরামে ঘুমুবার মতো যথেষ্ট সময় হাতে থাকবে আমার।

বলা দরকার, হাঁটা পথটা আমার চেনা নয়, জগদীশবাবুই দিশারী। তিনি পা বাড়ালেন, আমি তাঁকে অনুসরণ করলুম।

ঝাঁকড়া বটগাছটার তলা দিয়েই আমাদের পথ। সেখান দিয়ে বেরুতে গিয়ে উঁচু একটা শিকড়ে জগদীশবাবু হোঁচট খেলেন। মাথার ওপর আঁতকে চেঁচিয়ে উঠল প্যাঁচা। আমরা পথে নামলুম।

আকাশে চাঁদ নেই বটে, কিন্তু অন্ধকারে চলে চলে তারার আলোতেই পথ আমরা দেখতে পাচ্ছিলুম।

দুপাশের আদিগন্ত মাঠের ভেতর দিয়ে পরিষ্কার জেলা বোর্ডের রাস্তা। শাদা ফিতের মতো চকচক করছে, ভুল হওয়ার কারণ নেই।

কিন্তু দু-তিন মিনিটের মধ্যেই টের পেলুম, আমরা পথ থেকে দূরে সরে গেছি। রাস্তা ছেড়ে দিয়ে অসমতল ধানের আল ভেঙে ভেঙে এগিয়ে চলেছি আমরা।

বললুম, "এ কী হল জগদীশবাবু? আমরা তো পথ দিয়ে চলছি না।"

জগদীশবাবু বললেন, "ঠিক আছে। পাশেই রাস্তা আছে, এখুনি পাওয়া যাবে।"

কিন্তু পাওয়া গেল না। ঘণ্টা-তিনেক হাঁটার পরে পরম বিস্ময়ের সঙ্গে আমরা আবিষ্কার করলুম একটা বেশ বড় পুকুরের সামনে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। তার তিনদিকে বেত আর শোলার বন বাতাসে শাঁই শাঁই শব্দ করছে আর জ্বলছে অসংখ্য জোনাকি। দূরে দূরে কতকগুলো জঙ্গল, তার ভেতর দপ দপ করে
আলেয়া জ্বলছে—জনমানুষের চিহ্ন নেই।

এ কোথায় এলুম! আমরা মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করলুম।

পেছনে তাকালুম। অন্ধকারে দৃষ্টিটা অভ্যস্ত বলেই দেখতে পেলুম, দিগন্তে পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে সেই হাটখোলার বড় বটগাছটা পাহাড়ের চুড়োর মতো দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু ঠিক রাস্তায় চললে গাছটা পূর্ব-দক্ষিণে থাকার কথা। তার মানে আমরা সম্পূর্ণ উল্টো পথে চলেছি।

জগদীশবাবু বললেন, "দিনে-রাতে অনেকবার এ পথে চলেছি, এমন বোকার মতো ভুল তো কখনো করিনি। যাক, যা হওয়ার হয়েছে। চলো আবার গোড়া থেকে শুরু করি।"

আমরা বটগাছটার দিকে ফিরে তাকালুম। কিন্তু বিচিত্র এই আলের পথ। যতই চলি, সেটা যেন বৃত্তাকারে ঘুরতে লাগল। ঘণ্টাখানেক এলোপাথাড়ি হাঁটার পরে আমরা আবিষ্কার করলুম, এতক্ষণ আলের কন্টিকারীতে পা ক্ষত-বিক্ষত করতে করতে আমরা এই পুকুরটাকেই প্রদক্ষিণ করেছি এবং যথাকালে সেই অজানা কালো পুকুরটার ধারে—সেই জোনাকজ্বলা বেত-বনের পাশেই এসে দাঁড়িয়েছি।

জগদীশবাবু হাঁপাচ্ছিলেন। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমাদের ভূলায় ধরেনি তো?" শুনে সর্বাঙ্গ আমার অমানুষিক ভয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। মনে হতে লাগল দূরের আলেয়াগুলো যেন কাদের জ্বলন্ত চোখ, বেতবনের মধ্যে যেন একরাশ কালো মাথা গুঁড়ি মেরে বসে আছে। আমাদের ঘাড় মটকে ঐ পুকুরটার মধ্যে তারা পুঁতে দেবে।

কিন্তু ভয়টা মুখে প্রকাশ করা চলে না, ধমক দিয়ে বললুম, "কী যা-তা বলছেন। ওসব ভূলা-টুলা একদম নন্‌সেন্স। আলোর রাস্তায় এ-সব গোলমাল হয়ই। চলুন, আবার

বটগাছের দিকেই যাওয়া যাক।”

কন্টিকারীর কাঁটায় পা তখন আর কিছুই নেই। জুতো তো আগেই হাতে নিয়েছি। এখন মনে হচ্ছে হাঁটুদুটো যেন ছিঁড়ে পড়ছে—যন্ত্রণায় টনটন করছে কোমর। কিন্তু এই আলের ওপর কোনোমতেই বসে পড়া চলে না। কারণ, এ অঞ্চলের আল-গোখরো অসাধারণ বিষাক্ত।

প্রবল ইচ্ছা-শক্তির জোরেই বোধহয় শেষ পর্যন্ত আমরা আবার হাটখোলায় পৌঁছে গেলাম। বটগাছটার তলা দিয়ে শাদা ফিতের মতো উজ্জ্বল দীর্ঘপথ পড়ে আছে। এমন স্পষ্ট এতবড় রাস্তাটা আমরা হারালাম কী করে।

আমরা পথে পা দিলুম।

কিন্তু আশ্চর্য। দু-পা এগোতেই কে যেন তলা থেকে রাস্তাটা আমাদের টেনে সরিয়ে নিলে। অসহায়ভাবে আবিষ্কার করলুম, কখন আমরা আবার সেই আলের ওপরেই উঠে পড়েছি। আর এমনি ভাবেই কন্টিকারীর কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হতে হতে অজানা পথ দিয়ে গিয়ে চলছি।

যা অনুমান করেছিলুম, তাই হল! ঘণ্টাখানেক পরেই দেখি ঠিক সেইখানেই এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। এই আদিগন্ত মাঠের ভেতর পথ ভুল করে করে ঠিক একটি জায়গাতেই এসে পৌঁছোচ্ছি আমরা। কালো একটা পোড়ো পুকুর—জোনাকি শাঁ শাঁ বেত আর শোলার বন-দপ্‌দপে একরাশ আলেয়ার ব্যঙ্গের হাসি আমাদের চারদিকে।

সীমাহীন ক্লান্তিতে আর নিরুপায় আতঙ্কে সেইখানে কিছুক্ষণ আমরা পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। এবারে যেন স্পষ্ট মনে হল—এই আমাদের শেষ, ওই কালো জলেই প্রতীক্ষা করছে আমাদের মৃত্যু।

জগদীশবাবু প্রায় নিঃশব্দ গলায় বললেন, “চলো, হাটখোলাতেই ফিরে যাই।”

জবাব দেবার কিছু ছিল না। কী ভাবে কী অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে আমরা আবার বটতলায় ফিরে এলুম, তা অনুভব করার শক্তি পর্যন্ত তখন হারিয়েছি।

যখন হাটখোলায় এসে পৌঁছুলাম, রাত তখন তিনটে। নীরবে আমরা একটা চালার তলায় গড়িয়ে পড়লুম।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ভোরের আলো চারদিক স্পষ্ট করে তুলল। প্রসারিত উজ্জ্বল পথ—ভুল হওয়ার কারণ নেই। এবার আর ভুল আমাদের হল না।

সেই পুকুরটার সন্ধান আমি পাইনি। ফেরার সময় দিনের বেলা হাটখোলায় গাড়ী থামিয়ে অনেক খুঁজে দেখেছি পুকুরটাকে। কিন্তু কোথাও তার চিহ্ন নেই—কালো রাত্রিতে সে কালো অন্ধকারেই হারিয়ে গেছে, হয়তো বা।

প্রথম প্রকাশ : ফ্যানট্যাসটিক, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩

সূচিপত্রে ফিরে যান

জয়পুরের সেই অদ্ভুত ট্যুরিস্ট

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

ট্যুরিস্ট ব্যুরোর চাকরি নিয়ে প্রথম আমার কর্মক্ষেত্র হল জয়পুর। জয়পুরে মাত্র মাস তিনেক ছিলাম—তারপরেই আমাকে বদল হয়ে কোলকাতায় চলে আসতে হয়েছিলো। কোলকাতায় আজ বছর পাঁচেক হতে চললল, কিন্তু স্বল্পদিনের মেয়াদ হলেও জয়পুরের কথা আমি এখনো ভুলতে পারিনি। আমার চাকরি জীবনের প্রথম কর্মক্ষেত্র বলে তো বটেই—তা ছাড়া এমন একটি অভিজ্ঞতা জয়পুরে আমি একদিন সঞ্চয় করেছিলাম যে ভাবতে বসলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে আজো—ভয় পাই—এবং সত্যি কথা—আমার অভিজ্ঞতার যে-ঘটনা ঘটতে দেখেছিলাম তার কোন ব্যাখ্যা ও সম্ভাব্যতা আজো আমি খুঁজে পাইনি। বলতে গেলে এরকম অভিজ্ঞতা মানুষের জীবনে একবারই মাত্র আসতে পারে—আজ এখন এখানে যে ঘটনার কথা আপনাদের জানাচ্ছি, আপনারা যদি তার কোন ব্যাখ্যা ও কার্যকারণ-সূত্র আবিষ্কার করতে পারেন, অনুগ্রহ করে আমাকে জানাবেন। 'আশ্চর্য!' পত্রিকার ঠিকানায় বা সম্পাদকের দপ্তরে চিঠি দিলে, আপনাদের চিঠি পেতে আমার দেরী হবে না।

তখন গ্রীষ্মকাল। বলতে গেলে রাজস্থানের বিস্তীর্ণ ধূ ধূ মরুভূমি অঞ্চলের জন্যে এই দিকে গরম ও উষ্ণ তাপ প্রবাহের মাত্রা খুব বেশি। সেবার গরমটাও খুব অস্বাভাবিক রকম বেশি পড়েছিল। টুরিস্ট ব্যুরোতে দু'টো ফ্যান খুলে বসে থাকলেও স্বস্তি নেই। জানালায় জল-ছিটানো খসখসের পর্দা। তবুও দমকা হাওয়া থেকে থেকে তপ্ত আগুনের ভাপ ঘরে ঢুকছিল। বাইরে দারুণ লু বইছে। এইরকম গরমের দিনে জয়পুরের ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে টুরিস্টদের আগমন একেবারেই হয় না বললে চলে। টুরিস্টরা এখানে এসে কি দেখবে? হাওয়া মহল, নোংরা সরু সরু রাস্তাঘাট, গলিঘুঁজি, টাঙা, রাজস্থানী মেয়েদের উজ্জ্বল ঘাগরার শোভাযাত্রা, রুপোর গহনা, ভারী ভারী পায়ের মল, নাকের নথ, গলার হাঁসুলি—এইসব। আর এ ছাড়া থাকলই বা কী! উঁচু নীচু পাহাড়ী মরুভূমি, বালির ঝড়, উট, রাজপুত রাজাদের কয়েক শতাব্দীর পুরানো পরিত্যক্ত দুর্গঘর, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাকার, আর কোনো কোনো ক্ষয়িষ্ণু খানদানী বংশে বিচ্ছিন্ন কিছু কাংড়া কলমের ছবির দীন সংগ্রহ। এসব দেখার ইচ্ছে হলে যে কোনোদিন হেমন্তে বা শীতে আসা যায়। তখন জার্নি ও ভ্রমণ দুটোই ইন্টারেস্টিং হবে। তাছাড়া বিদেশীরা রাজস্থানের গরম খুব একটা সহ্য করতে পারেন বলে শুনিনি। তার ওপরে আছে গরমের সময় প্রচণ্ড জলকষ্ট। অগভীর ইদারায় নোংরা জল আন্‌ফিল্টারড্ অবস্থায় দেখেই তো বিদেশীদের মূর্ছা যাবার উপক্রম। সুতরাং এসব জেনেই ট্যুরিস্ট ব্যুরোর আপাতশীতল কক্ষে দিবানিদ্রার আয়োজন করছিলাম। ভাত ঘুম নয়, রুটি ঘুমটা যে খুব রমণীয় হবে না জানা ছিল—কিন্তু একেবারেই যে হবে না; উপরন্তু প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে শরীর ও চেহারা নষ্ট করে বাইরে বেরুতে হবে তা' কী জানা ছিল! সবে দুটো চোখের পাতা এক করেছি ভারী বুটজুতোর শব্দে ঘুম ভেঙে গেলো। যিনি

ঘরে এলেন তাঁকে প্রথম দর্শনেই বুঝতে দেরী হল না যে, এক অদ্ভুত সাধারণ-দশবিশটা মানুষের থেকে স্বতন্ত্র একজন মানুষ। ছন্নছাড়া ভবঘুরে কিংবা মামুলী ধরনের পাগল হওয়াও বিচিত্র নয়। রোদে-পোড়া মুখ, ঘামে স্যাঁতস্যাঁত করছে, রুমাল দিয়ে ঘাম মুছে নেওয়ার এতটুকুও ইচ্ছে হল না, এখন মনে হয় আত্মভোলা মানুষটি রুমালের ব্যবহার জানতেন কিনা সন্দেহ। ক্লোজক্রুপড্ চুল, ঘামে জবজব করছে সমস্ত শরীর—সিল্কেন চেক বুশ শার্ট, বহু ব্যবহারে জীর্ণ টেরিকর্ডের ইয়াংকি লংপ্যান্ট—আর পায়ে ততোধিক জীর্ণ মিলিটারী বুট জুতো। বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। ভদ্রলোকের নাম এখনো মনে আছে, টমাস ব্রিউ। অনেক মানুষের ভিড়ে ঐ মানুষটির চেহারা এখনো আমার মনের মধ্যে থেকে হারিয়ে যায়নি। আগেই বলেছি কোথায় যেন ওঁর একটা স্বাতন্ত্র ছিল—তাই ভুলতে পারি না।

বিদেশী ভদ্রলোক ইংরাজীতে ভাঙা ভাঙা কথা বলা শুরু করেছিলেন। ওঁর দাদা বৃটিশ মরিশাস দ্বীপ থেকে কাঁচালঙ্কা ও অধুনালুপ্ত গোডোপাখির চালান নিয়ে প্রায়ই ভারতবর্ষে আসতেন। বছরে তিনবার কখনো বা চারবারও তাঁকে ইণ্ডিয়ায় আসতে হতো। এমনই একবার মাল-জাহাজে চালান তিনি ভারতবর্ষে এনেছিলেন। প্রথমে মাদ্রাজ, সেখান থেকে ওয়ালটেয়ার, কোয়েম্বাটুর, পরে উত্তরপ্রদেশের নৈনিতালে কিছু কিছু চালান খালাস করে তিনি এসেছিলেন জয়পুরে। জয়পুরে তিনি তাঁর আমদানী দ্রব্যের অবশিষ্টাংশ বিক্রী করতে পেরেছিলেন বলে শোনা যায়। কিন্তু জয়পুর থেকে তাঁকে আর কেউ দেখতে পায়নি। উনি কোথায় গেলেন, দেশে ফিরলেন, নাকি জয়পুর থেকে কাছাকাছি কোনো গ্রামের দিকে চলে গেলেন, সেখানেই এখনো বসবাস করছেন কিনা তা কেউ বলতে পারে না। আজ তিন বছর তাঁর খবর পাওয়া যাচ্ছে না। ভদ্রলোক সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কারণেই নিরুদ্দিষ্ট নিখোঁজ। মরিসাস দ্বীপে তার নিজের বলতে এই ভাই, ছোটো খামার বাড়ী আর কিছু চষা জমি। ভাই আজ তিন তিনটি বছর ভাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করছে। শেষে আর থাকতে না পেরে জমিজমা খামারবাড়ী সব বিক্রী করে ইণ্ডিয়ার পাড়ি জমানোর টাকা জোগাড় করেছে —এবং সোজা এসে উঠেছে জয়পুরে। কারণ সে শুনেছিলো এখানেই তার দাদাকে শেষ দেখা গিয়েছিলো। বাজারের পাইকারী ব্যবসাদারেরা যারা ওঁর দাদা ভিলানের কাছে মালপত্র কিনতো ওঁকে বলেছে যে উনিশে মে-র পর হঠাৎ ভিলানকে কেউ আর খুঁজে পায়নি—এমনকি ভদ্রলোক তাঁর পাওনা টাকা পয়সা তুলতেও বাজারে আসেননি। ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম—আজ আর এক উনিশে মে। এমনি একটি দিনে আমার সামনে দণ্ডায়মান বিদেশী ঐ ভদ্রলোকের দাদা রহস্যজনক ভাবে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেছেন—আর আজ ছোটো ভাই এতদূরে ছুটে এসেছে। চঞ্চল হয়ে-হারিয়ে যাওয়া দাদাকে যদি আবার ফিরে পাওয়া যায়, যদি জানা যায় দাদা কি বেঁচে আছেন— বেঁচে থাকলে কোথায় আছেন, কেমন আছেন, আর তিনি কি একদিনের জন্যেও তাঁর প্রিয় সবুজ সোনালী সেই দ্বীপদেশে ফিরে যেতে চান না!!

আমি একটু মুস্কিলে পড়লাম। ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে যারা আসেন তাঁরা সচরাচর গাইড সংগ্রহের জন্যেই আসেন। এই দেশের দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখাতে এবং এক একটি জায়গার ঐতিহাসিক পৌরাণিক কিংবা লৌকিক উপাখ্যান ও কিংবদন্তীগুলো বিদেশীদের

সহজ কথায় বুঝিয়ে দিতে গাইডরা সচরাচর তাদের সাহায্য করে থাকেন। এই ভদ্রলোক গাইড সংগ্রহের জন্যেই এসেছেন—কিন্তু কোনো দর্শনীয় জায়গা ঘুরে দেখার ইচ্ছে বা সময় ওঁর নেই। ওঁর ধ্যান-ধারণা শুধু দাদাকে বের করা। তাই এই গ্রীষ্মের প্রচণ্ড সূর্য উত্তাপ অগ্রাহ্য করেও তিনি জয়পুরের টুরিস্ট ব্যুরোতে ছুটে এসেছেন। একজন বিলায়েবল গাইড নিয়ে তিনি জয়পুরের পথ থেকে পথে—এবং তাঁর বাইরের ঈষৎ বিস্তীর্ণ মরুভূমি অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে চান—যদি দীর্ঘ তিনটি বছর পর আজ কোনো গতিকে দাদার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, যদি দেখা হয়, তাকে জিজ্ঞেস করবেন তুমি এখানে কি পেয়েছে, তোমার এখানে থাকার দরকার কি? আমি বললাম, এই ব্যাপারে আপনি তো পুলিশের সাহায্য নিতে পারেন। মিসিং পার্সনসদের ব্যাপারে পুলিশ আপনাকে যথেষ্ট খোঁজ খবর দিতে পারে, এবং সেটাই খুব নির্ভরযোগ্য। পুলিশের সাহায্য নিতে টমাস রাজী নন। ওঁর ইচ্ছা, নিজেই দাদাকে খুঁজে বের করা—কিন্তু এই দেশটার কোন কিছুই তো জানা নেই—সবকিছুই তো ওঁর অচেনা—আর তাই একজন উৎসাহী ইয়ং গাইড ওঁর দরকার। আমার প্রোগ্রাম রেকর্ড করিয়ে ট্যুরিস্ট ব্যুরোর বাইরে যখন এলাম তখন ঘড়িতে চারটে। বিকেলবেলা। কিন্তু গরমের কি কমতি আছে? আর তখনো কী রোদ! গায়ের চামড়া পুড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। আমরা একটা টাঙা নিলাম।

‘আমার দাদা ব্যবসায়ী মানুষ হলেও খুব খেয়ালী মানুষ ছিলেন। কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন। একা একা কী সব ভাবতেন। আর তেমনই নিঃসঙ্গ জ্যোৎস্নায় সমুদ্রতীরে বেড়াতে ভালবাসতেন। বালির ওপর দাদার ছায়া পড়তো। দীর্ঘ সুন্দর। সে সময় দাদাকে খুব রহস্যময় মনে হতো। প্রাচীন কালের মহান্ মুনিঋষিদের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে হতো।’

এই টমাস নামক ভদ্রলোকটিকে স্মৃতিচারণায় পেয়েছে। আমাদের টাঙাও যথারীতি এগিয়ে চলেছে। শহরের প্রধান প্রধান রাস্তার দু’একটি পরিক্রমা শেষ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। ওঁর চোখ কিন্তু রাস্তার দিকে। দুপাশের চলমান অনেক মানুষের ক্লান্তিকর ভিড়ের মধ্যে পরিচিত প্রিয় একজন মানুষকে খুঁজে পেতে চাইছে।

‘স্প্যানিশ জিপস আর অ্যারাবিয়ান টিউন ছিল দাদার প্রিয়। লোকসঙ্গীত প্রাণ দিয়ে শুনতেন। কখনো কখনো বলতেন, শুনতাম, লোকসঙ্গীত থেকে এখনো অনেক বৈচিত্র্যময় সঙ্গীতের জন্ম হতে পারে। স্কুল কলেজের শিক্ষা দাদার বিশেষ ছিলো না। কিন্তু কত দেশের সাহিত্যই যে পড়তেন। আমার মনে পড়ে টমাস মান দাদার ভালো লাগতো। কবিদের মধ্যে প্রিয় ছিলেন গটফ্রীড বেন। কোন্ কবিতাটা দাদা খুব পড়তো জানেন? ‘একটি শব্দ’। দাদাকে কতোবার ঐ কবিতাটা নিজের মনেই আবৃত্তি করতে দেখেছি। নিজে কবিতা আবৃত্তি করে যেন নিজেকেই শোনাচ্ছেন।’

‘একটি শব্দ’ আমিও পড়েছিলাম। বাংলা অনুবাদটাও এত ভালো লাগে। গোটা কবিতাটাই আমার মনে আছেঃ

> একটি শব্দ, বাক্‌রীতি এক, শূন্য থেকে
> বিজয়ী জীবন উত্থিত, উদ্দীপ্ত বোধি,
> সূর্য স্তব্ধ, মূক দিগন্ত, সবই একে

ঘিরে ঘিরে দেয় শক্তি, এবং সুসংহতি,
শব্দ, রশ্মি, আকাশবিহার, ফুলকি আলোর
অগ্ন্যুচ্ছ্বাস, নক্ষত্রের আভাস, জ্বলে,
তারপরে ফের গভীর গভীর দিনান্ত ঘোর,
আর আমি এই সঙ্গবিহীন ভূমণ্ডলে॥

জয়পুরের এই রাস্তায় প্রায় পড়ন্ত ম্লান এক বিকেলে একজন অচেনা মানুষ, যাকে আমি কোনদিন দেখিনি তার সম্বন্ধে আমার ধারণা হল সত্যি সত্যিই মানুষটি খুব একা ছিলেন, নিঃসঙ্গ—অনন্ত সৃষ্টিলোক এবং নিরন্তর শিল্পমণ্ডলকে তিনি নিরুচ্চার বেদনায় ভালোবাসতেন, খুব নিজের মনে করতেন, আর তাই গটফ্রীড বেনের ঐ কবিতায় তিনি পেয়েছিলেন নিজের বিষন্নতার প্রতিচ্ছবি—অখ্যাত মরিসাস দ্বীপের ততোধিক অখ্যাত ব্যথাতুর মলিন এক মানুষের যন্ত্রণার মানচিত্র ঐ কবিতা যা আমাকে ঐ মুহূর্তে মানুষটি সম্বন্ধে অসীম শ্রদ্ধা জাগাচ্ছে।

'আর একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি'—টমাস ব্রিউ বললেন, 'দাদা খুব ভালো ছবি আঁকতেন। অবাক হয়ে যাবেন শুনলে রঙ তুলি ক্যানভাস কিংবা কোনো কাগজ-কলম তিনি ব্যবহার করেননি। বলতে গেলে ছবি আঁকার কোন সরঞ্জামই দাদার ছিলো না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, তাঁর সেই সুন্দর সুন্দর ছবিগুলোকে রক্ষা করা আমাদের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব ছিলো না।'

আমি ব্রিউয়ের দিকে তাকালাম। ব্রিউ স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে হারানো স্নেহের মানুষটিকে কিছুক্ষণের জন্যে ফিরে পেতে চাইছেন। ওঁর আত্মমগ্ন উচ্চারণ আমাকেও স্পর্শ করেছে।

'দাদা ছবি আঁকতেন, কী আশ্চর্য জানেন—সমুদ্রতীরের বালির জমিতে। ছড়ানো বেলাভূমিতে বিকেলবেলায় তিনি ছবি আঁকা আরম্ভ করতেন, আর কখন অন্ধকার এসে আকাশ এবং সমুদ্রকে একটা অলৌকিক কালো চাদরে মুড়ে দিয়ে যেতো তিনি বুঝতেও পারতেন না। ততক্ষণে ওঁর ছবি আঁকা শেষ হয়ে যেতো। কোন ছবিই অসম্পূর্ণ থাকতো না।

'অনেক বিখ্যাত ছবির প্রতিলিপিও তিনি তৈরি করতেন। আর ওই বিষয়ে ওর দক্ষতা ছিলো অসাধারণ। সাগালের 'এ্যাট ডাস্ক', গগাঁর 'মেটারনিটি', পিকাসোর 'নুয়েণিকা' 'গার্লস', ডালির 'ল্যাণ্ডস্কেপ'—এসব তিনি কতবার আঁকতেন আর মুছে ফেলতেন। ছবিগুলো সমুদ্র সৈকতে একটা আলাদা ডাইমেনসন পেয়ে যেতো। আর, দাদা নিজের ইমাজিনেশনে যেসব ছবি আঁকতেন তারও তুলনা মেলা ভার। অনেক সময় ব্লেক, স্যাণ্ডবার্গ, হোল্ডারলিন, হিমেনেৎ, উনগারেডি, ভালেরি, ক্লোদেল উইলিয়ামস এঁদের কবিতা থেকে ছবির বিষয়বস্তু সংগ্রহ করতেন। আমার স্থির বিশ্বাস, ছবিগুলো যদি ক্যানভাসে আঁকা হতো—এক একটি অমূল্য সম্পদ বলে গণ্য হতো। কিন্তু ক্যানভাসের চার কোণের সীমাবদ্ধ জায়গায় ছবি আঁকায় ছিলো দাদার অনিচ্ছা বলতে গেলে ক্যানভাসকে তিনি ঘৃণা করতেন।'

টমাস ব্রিউয়ের মুখে শেষ বিকেলের এক ফালি নিস্তেজ আলো এসে পড়েছে। এক ধরনের অস্থির উজ্জ্বলতা, যা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না—ওঁর চোখের ওপর, কপালে, গালের

অংশে। বিকেলের এই তির্যক আলোয় যে মানুষটি আমার পাশে চিন্তিত, নিয়তিগ্রস্ত মানুষের মতো বসে আছে—তার অতীত বর্তমান সম্বন্ধে আমি কতটুকু জানি!

'বিকেলের আঁকা ছবি রাতের ঢেউ নিমর্মভাবে মুছে দিয়ে যেতো। এ ছিলো রোজকার নিয়ম, নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এই ঘটনা দেখে দেখে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। উদ্বেল দুরন্ত ঢেউ দাদার সব ছবিকে নিয়ে গেছে—দাদা আবার পরের দিন ছবি এঁকেছেন। যেন জানতেন নির্লিপ্ত ঢেউ হচ্ছে ছবিগুলোর নিয়তি, যেন জানতেন ঢেউ এসে সব মুছে দিয়ে যাবে। তার ছবি আঁকার সমস্ত পরিশ্রম যে রাতের ঢেউয়ের অত্যাচারে বৃথাই অপব্যয়িত হয়—তার জন্যে দাদার কোন দুঃখ বা হা-হুতাশ ছিলো না—হয়ত তিনি ভাবতেন পৃথিবীর কিছুই থাকে না, কিছুই স্থায়ী হয় না।'

'মিঃ ব্রিউ, ঘণ্টাখানেক শহরের সমস্ত রাজপথই আমরা ঘুরে দেখলাম। আপনার দাদাকে আমি খুঁজে পাইনি। তিন বছর আগে যিনি হারিয়ে গেছেন, তাঁকে হয়ত এভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমাদের আন্তরিক চেষ্টাও ব্যর্থ হতে বাধ্য। আপনি বরং সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিন, পুলিশের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করুন। পুলিশের হেল্পিং হ্যাণ্ড আপনি সব সময় আশা করতে পারেন। হয়ত ভারতবর্ষে আপনাকে কিছুদিন থেকে যেতে হবে। আজকে এখানে সামান্য একজন গাইডের কয়েক ঘণ্টার সহায়তা ও গুড উইল কিভাবে আপনাকে আপনার দাদার সংবাদ এনে দিতে পারে?' আমি মনে মনে এবার একটু অসন্তুষ্ট হলাম। টমাস ব্রিউ ওঁর দাদাকে খুঁজে বের করার জন্যে যে উপায় অবলম্বন করেছেন, তা যে আদৌ কার্যকরী হবে না, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

আমি ব্রিউয়ের দিকে তাকালাম। বেচারা হতাশায় প্রায় ভেঙে পড়েছে দেখে আমার কষ্ট হল। ব্রিউয়ের জন্যে আমার সমবেদনা উৎসারিত হল।

'আমি ইণ্ডিয়ার সমস্ত সী বিচ ও রিসর্টগুলো ঘুরে দেখতে চাই—তার আগে আশেপাশের মরুভূমি অঞ্চলগুলোতেও আমাকে যেতে হবে।'

'শহরের বাইরে মাইল খানেকের মধ্যেই ছোট একটা মরুভূমি আছে। চলুন, বেলা বেশী নেই, আপাতত ওখানেই যাওয়া যাক্। আমরা সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরতে পারবো, পরে আপনি জয়পুর থেকে দূরে মরু অঞ্চলে যাওয়ার সুযোগ পাবেন।' আমার কাজ নয় এইভাবে নিরুদ্দিষ্টের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো। কিন্তু ব্রিউয়ের কথা ভেবে ওকে এই বিদেশে-বিভূঁইয়ে একা ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হল না।

আমরা একটা চটির কাছে গিয়ে টাঙা থেকে নামালাম। ওই টাঙাতেই আবার জয়পুরে ফিরে যাবো। টাঙা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। পশ্চিমে সূর্য ঢলে পড়েছে। পোড়া মানুষের দগ্ধ ঝলসানো কর্কশ চামড়ার মতো আকাশের রং। খুব অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছে। হাওয়াতে এখনো উষ্ণতার আমেজ। একটা ছোট ফণিমনসা কাকটাসের ঝোপ পাশে রেখে আমরা সোজাসুজি পশ্চিমের বালির পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

পাশেই একটা পুরানো পরিত্যক্ত কেল্লা। বুরুজ ও কেল্লাপ্রাচীর। বেশ খানিকটা বালির জায়গা জুড়ে কেল্লাবুরুজ ও প্রাচীবের অদ্ভুত লম্বা এক ছায়া পড়েছে। প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জন্তুর কঙ্কালের মতো ছায়াটা পড়ে আছে। ইতস্তত দু' একটা কাঁটা গাছ থেকে শেষ আলোটুক সরে গেছে কখন। এই মুহূর্তে আমাদের নিজেদের খুব

বিষণ্ণ নীরব নির্জন বলে মনে হল। বিশাল, বিস্তৃত প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের অস্তিত্ব যে কত ছোট আমরা উপলব্ধি করলাম। আমরা অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। বিষণ্ণতা আমাদের মধ্যে একটা সিল্যুয়েট মূর্তি পাচ্ছিল।

কিন্তু একি? আমার পাশে টমাস নেই! ও কেন সামনের দিকে ছুটে যাচ্ছে? আর সামনে সূর্যের আড়াআড়ি মরুদিগন্তের বিস্তীর্ণ এলাকার দিকে চোখ পড়তেই আমার সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো! এবড়ো-খেবড়ো বালির জমিতে প্রহর শেষের ম্লান সূর্যের আলোয় একটি বৃদ্ধকল্প মানুষ পরম নিষ্ঠায় বড়ো বড়ো ছবি এঁকে যাচ্ছেন। কে উনি? উনিই কি টমাসের দাদা? সমুদ্রের বেলাভূমিতে নয়, মরুভূমির উষর ধু-ধু জমিতে আঁকা তাঁর জীবন শিল্পের সঙ্গে পারমার্থিক এক খেলা শুরু করেছে, জীব-ধরিত্রীতে অজস্র জন্মচক্র পরিক্রমা করেও যে খেলার শেষ নেই, যে খেলার প্রকৃতি তাঁকে তাবসর নেবার সুযোগ দিচ্ছে না।...কিন্তু আমি এখন কোথায় দাঁড়িয়ে আছি? পায়ের নিচের জমির দিকে চোখ পড়তেই আমি কেঁপে উঠলাম। ...ঠাণ্ডা একটা স্রোত রক্তের শিরা উপশিরায় বয়ে গেলো। আমি দাঁড়িয়ে আছি সাগালের 'অ্যাট ডাস্ক' ছবিটির প্রতিলিপির ওপর। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছবির বাইরের অংশে খোলা বালির ওপর দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। আমার জুতোর বাবার সোলের দাগ ছবির গায়ে কয়েকটা ধারালো ছুরির নিষ্ঠুর দাগের মতো দপ্‌দপে হয়ে জেগে রইলো। কিন্তু একি? যেখানে দাঁড়ালাম সেখানেও আর একটা ছবি! আমরা কখন ছবির সাম্রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছি বুঝতে পারিনি। জুতোর সোল দিয়ে এইসব শ্রেষ্ঠ ছবির নিদর্শনগুলোকে অপমান কিংবা পদদলিত করার অধিকার আমার নেই। আমি পাপবোধ ও বিবেক দংশন অনুভব করলাম। আমি পালিয়ে আসার চেষ্টায় দৌড়ানো শুরু করলাম। ভূত দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে পালিয়ে আসার মতো অবস্থা হল আমার। আর বিস্ময়ে আতঙ্কে আমি লক্ষ্য করলাম এতক্ষণ আবার দাঁড়িয়েছিলাম সাগালের পাশের ছবি রুবেন্সের 'দা ডেড্ ক্রাইষ্ট' ছবিটির ওপর। গ্রামের চটি লক্ষ্য করে একটানা অনেক দৌড়ানোর ফলে হাঁপানি এলো। প্রায় হোঁচট লেগে পড়ে যাচ্ছিলাম। আমার ট্রাউজার্সের অনেকটা ছিঁড়ে গেলো। দারুণভাবে ঘেমে যাচ্ছি, হাত-পা থরথর করে কাঁপছে—আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। পিছনের দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছিল না। ব্রিউয়ের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছি তখন। আমি তখন নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত। মোট কথা, কতক্ষণ পরে জানি না, মরুভূমির দিকে যখন ফিরে তাকালাম, দেখলাম—বিকেলের অন্তিম আবছা আলোয় টমাস হাজার হাজার ছবির ওপর দিয়ে সেই রহস্যময় অলৌকিক শিল্পীকে দু'টি সবল হাতে জড়িয়ে ধরবার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছেন আর সেই ক্ষমতাবান শিল্পী বয়সের ভার অগ্রাহ্য করে কত সহজেই ওর কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন। টমাস তাঁর ধরাছোঁয়াও পাচ্ছেন না। আর চঞ্চল উদ্ভ্রান্ত টমাসের গোড়ালির আঘাতে প্রতিটি ছবির শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। সেই দৃশ্য কী করুণ, কী ভয়ঙ্কর! কোন বর্ণনায় সম্ভব নয়। ঘটনার যথাযথ ছবিটি তুলে ধরা। আমি চীৎকার করে উঠলাম—'টমাস, ডিয়ার টমাস, ছবিগুলো নষ্ট করবেন না; আমার কথা শুনুন, প্লিজ কাম ব্যাক, প্লিজ... টমাস...।' কিন্তু কে কার কথা শোনে। টমাস তখন উন্মাদ; কিংবা আমার চীৎকার ও হয়ত শুনতে পায়নি। শোনার মতো কান তখন ওর ছিল না। আমার বুঝতে দেরী হল না যে, টমাস মরিসাস

দ্বীপ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে, এখানে এই মরুপ্রান্তরে ওঁর দাদাকে খুঁজে পেয়েছেন। ছবিগুলো ওঁর কাছে ধর্তব্য নয়, ছবি যিনি আঁকেন সেই মানুষটিকে ওঁর প্রয়োজন। অনেকদিন পরে যখন মুখোমুখি দাঁড়াবার সুযোগ এলো, তখন টমাস ওঁর সহোদরকে ফাঁকা জনমানবশূন্য প্রান্তরে ফেলে যাবেন কোন দুঃখে?

নির্বোধ হতবাক আমি পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকলাম। আজ ভাবি, কেন ওঁদের পশ্চাদ্ধাবন করিনি, আর কেনই বা আমি ভয় পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে এলাম। এখন মনে হয় সেই গোধূলিবেলা, সেই নির্লিপ্ত শিল্পী, তাঁর যন্ত্রণাবিদ্ধ ছবি আর ছবির প্রতিলিপি —এসবের মধ্যে সেদিন সঞ্চারিত হয়েছিল কোন এক অলৌকিক শক্তি, কোন মহাপ্রাণ, রিয়ালিটির জগতে থেকে যার মোকাবিলা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু এর পরের ঘটনা সর্বাধিক করুণ, বিয়োগান্তক। টমাস আর ওঁর দাদা দুজনেই একে অপরের পিছনে উঁচু বালিদিগন্তের ওপারে মিলিয়ে গেলেন। আমি স্তম্ভিত, অভিভূত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। দাঁড়িয়ে থাকলাম... দাঁড়িয়ে থাকলাম...। আমার বিচারবিবেচনা শক্তি লোপ পেয়েছিল। এখন মনে হয় ওঁদের জন্যে আমার হয়ত কিছুই করণীয় ছিল না, কিংবা হয়ত আমি টমাসকে অনুসরণ করে ওর পিছু পিছু যেতে পারতাম, তাহলে স্বচক্ষে টমাসের শেষ পরিণতি কি হল জানা যেতো। কিংবা আমি ওঁকে বাঁচাতে পারতাম। দুই ভাইয়ের পুনর্মিলন হয়ত সম্ভব হতে। টমাসের কাণ্ডজ্ঞান ছিল না, একটা স্বপ্ন ও আচ্ছন্নতার মধ্যে টমাস নিজেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, অন্তত আমার দিক থেকে সক্রিয় চেষ্টা হলে ওঁকে হয়ত ফিরিয়ে আনা যেতো। কিন্তু আমার দুটো পা কেউ যেন স্ক্রু দিয়ে মাটির সঙ্গেই এঁটে দিয়েছিল। আমি হঠাৎ টমাসের নাম ধরে চীৎকার করে ডাকলাম। 'আমি অপেক্ষা করছি, টমাস, আমি অপেক্ষা করছি' —নক্ষত্রতিমির ও উদ্দাম মরুবাতাসের এলাকায় প্রতিধ্বনি আমাকে ব্যঙ্গ করে নির্মম উত্তর দিয়ে গেল।

সেই বর্ণহীন সুষমাহীন অন্ধকারে বিশাল বিরাট শূন্যতার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার চেতনা চেনা-জানা স্পর্শের জগতের বাইরে অন্য কোথাও, অন্য কোন জগতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। আমার শারীরিক আস্তত্ব ছিল কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার আত্মা, প্রাণ, বোধ ইত্যাদি এবং ইন্দ্রিয়ের শাসন স্থগিত ছিল। স্পষ্টতই সেই সময়টুকুতে আমার মধ্যে অনুপস্থিত ছিল বিংশ শতাব্দীর বিবেকবান, সচেতন, বিচারশীল সুসভ্য নাগরিকতার প্রতিনিধি। শুধু এখন মনে পড়ে, টমাসের জন্যে আমি অপেক্ষা করছিলাম। পথ চিনে ফিরে আসা কি ওঁর পক্ষে সম্ভব হবে! শিল্পী একাকীত্বের উপাসক। ভিলান তাই সমাজ সংস্কারের বন্ধন থেকে দূরে নিজেকে সমর্পণ করেছেন নিজের সাধনায়। আমার ভয় হল যখন ভাবলাম আসলে ভিলানকে আমরা দেখিনি, দেখেছি আমাদের মনেরই এক কল্পনাকে। মায়ামরীচিকার পিছনে তবে কি টমাস ওঁর জীবন দান করলেন? মনের ভুল ওঁকে নিয়ে গেল মৃত্যুর পথে? নিশ্চল অন্ধকারে আমি প্রাণহীন আমারই মাপের কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমার কোন ভালমন্দ জ্ঞান ছিল না—আমি আর কোন কিছু ভাবতে পারছিলাম না। প্রাণ ও শরীর তখন জড় পদার্থের এক অংশ! আমাকে যে জয়পুরে ফিরে যেতে হবে ভুলে গিয়েছিলাম। কয়েক লক্ষ বছর ধরে আমি যেন এইভাবে আকাশতলে মরুপ্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছি। আমি যেন মানব-সংসারে,

আত্মীয়তার অবিচ্ছেদ্য বন্ধন—সবকিছুর থেকে বিচ্ছিন্ন। আমি যেন অভিশপ্ত প্রস্তরীভূত এক প্রহরী, ঘরবাড়ী, ব্যক্তিগত জীবন কিছুই আমার কোনকালে ছিল না, নেই। ...অন্ধকারের মহামৌনতায় বিস্ময়ে ভয়ে নির্বাক আতঙ্কে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। সম্বিৎ ফিরে এলো টাঙাওয়ালার ডাকে।

খানিকটা হেঁটে টাঙায় উঠতে হবে। এক দারুণ দুঃস্বপ্নের জগত থেকে ক্লান্ত শ্রান্ত পায়ে ফিরে আসছি আস্তে আস্তে। কৃষ্ণপক্ষের ছোট চাঁদ উঠেছে আকাশে নিষ্প্রভ অল্প দূরে মরুভূমির বালির চর চিকচিক করছে। অপ্রতিরোধ্য এক আকর্ষণ রয়েছে এখানে। কেমন এক অবাস্তব আলো-অন্ধকারময় জগত বলে মনে হল। ওখানেই আঁকা আছে অত্যাশ্চর্য অনেক অনেক ছবি। ছবির বুকে জুতোর দাগ।

আমাদের টাঙা ছাড়ল। টমাস টাঙার যে আসনটিতে বলেছিলেন সেটি ফাঁকা। সেদিকে তাকিয়ে আমি বিষন্ন হলাম। চলমান টাঙায় মরুভূমির উষর পটভূমিতে আমি বিষণ্ণ হলাম আমাদের নিয়তির কথা ভেবে, ছায়া সংগ্রামের কথা ভেবে।

হঠাৎ প্রচণ্ড, হু-হু চাপা ক্রন্দনের মতো এক আওয়াজ মরুভূমির দিক থেকে ভেসে এলো। অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠার মতো সেই আওয়াজ!

'আঁধি হো রহা হ্যায়।'—টাঙাওয়ালার আর্ত গুঞ্জরণ।

মরুভূমিতে বালির ঝড় উঠল।

প্রথম প্রকাশ : আশ্চর্য!, ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫

ব্রাডবেরির একটি গল্পের বীজ অবলম্বনে। গল্পটি বিজ্ঞান-গল্প। গটফ্রীড বেনের কবিতাটি অধ্যাপক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত অনূদিত।
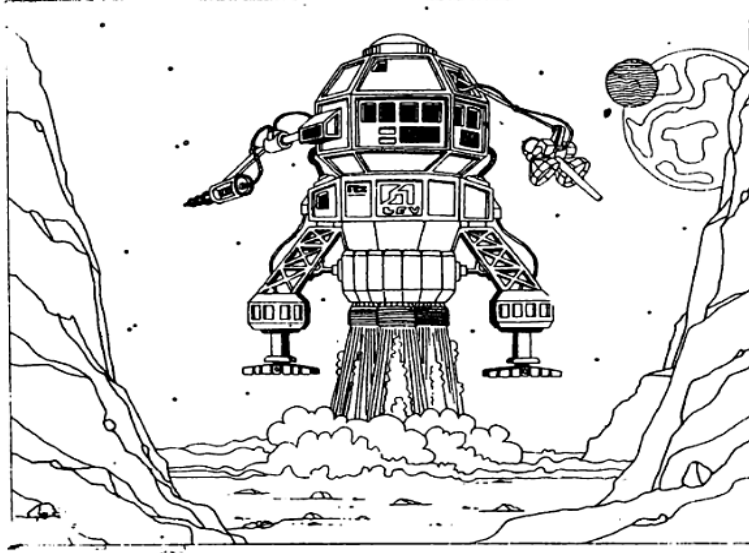
প্রথম ম্যমী

মাণিক্য বন্দ্যোপাধ্যায়

ধূসর অতীতের এক স্নিগ্ধ রৌদ্র-সুষমায়িত প্রভাতে এক সুদর্শন যুবা পুরুষ সবুজ পাহাড়ের কঠিন গা বেয়ে ক্ষিপ্রবেগে উঠছিল। চারিদিকে কঠিনতম শিলারাশি—গাঢ় সবুজ আর ফিকে হলুদ বৃক্ষরাজিতে বনতল উজ্জ্বল। যুবকের মস্তকের আকার স্থানীয় মানুষের মতো লম্বাটে নয়—গোল। সুকুমার মুখমণ্ডল চওড়া—শরীরের বাঁধুনি অতি সমর্থ—তবুও যুবার কমনীয় কান্তি দেখে তাকে শিকারী বা বনচারী মনে না হয়ে শিল্পী বলে ভ্রম হয়। ওর হাতে চকচকে পাথরের দীর্ঘ একটা কৃষ্ণ ভল্ল। ঘনকৃষ্ণ কেশদাম মাঝে মাঝে পাহাড়ের নাতিদীর্ঘ গাছের লতাপাতায় জড়িয়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছিল। চোখের পরিষ্কার দৃষ্টি সদা জাগ্রত হলেও অপরূপ এক মমতা মাখানো। যুবক তার স্বহস্ত নির্মিত বিচিত্র এক বন্য লতাজাত জালিকার সাহায্যে কয়েকটি নিরীহ প্রাণী শিকার করল। অসীম স্নেহে সে প্রাণী ক'টিকে বুকে জড়িয়ে নোমের দিকে ফিরল। নোমে (বা গ্রামে) বৃদ্ধা মা, ভগিনী তার অপেক্ষায় আছে।

এরপর যুবক অসিরাকে যেতে হবে নোমের পশ্চিমদিকের জলায়। এখনও সেখানে বীজ বপনের কাজ পূর্ণ হয় নি—অথচ শূকরগুলো জমি খুঁড়ে সব পোকা খেয়ে ফেলেছে। অসিরা আকাশের দিকে চাইল—সমস্ত আকাশটা ঘন কালো হয়ে উঠেছে। দেবতা রে বিদায় নিয়েছেন—দেশের কোন্ স্থানে কোন অমঙ্গলকার্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে হয়ত। তাই দেবতা রে এদেশ ত্যাগ করেছেন। মা আর নোমের বৃদ্ধদের এই কথায় অসিরা মনে মনে হাসে। ঐ কালো কালো মেঘগুলো ভয়ানক দেখতে হলেও ওরাই যে তাদের বন্ধু—তা তারা বুঝতে চাইবেন না।

অসিরা তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এল। ভগিনী ইমানি ছুটে এল। ওর হাতে একতাল থকথকে মাটি। ও জানে অসিরা এখন ঐ মাটি দিয়ে অদ্ভুত সব মূর্তি তৈরি করবে। অসিরাকে ইমানির বিচিত্র লাগে। ও যুদ্ধে যেতে চায় না—শিকারে গিয়ে জন্তুগুলোর গায়ে বর্শা মারবে না—শত্রুকে ও প্রাণ দান করবে—আশ্চর্য পাথরের গায়ে দাগ কাটে... আর কি মজা... ঐ সব আঁচড় মিলে মিলে এক-একটা প্রাণী... মানুষ তৈরি হয়ে যায়! গাছ কেটে এনে ও রোদে শোকায়... তারপর ঐ কাঠের ওপর দাগ কাটে। বনে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায় কিসের লোভে লোভে কে জানে।

অসিরার হাতে মাটির তাল দিয়ে ইমানি বলল— 'সিরা, গ্রামণী আজও এসে বলে গেছেন যে তুমি যেন নীল পাহাড়ের ওপারে আর কোনোদিন না যাও। কারণ, সেখানে দেবতা ভর করেছেন বিশাল এক পক্ষীর ওপর। কোনো 'কেম'-বাসী সেখানে গেলে তিনি রাগ করবেন... তাতে আমাদের শস্যক্ষেত্রের ওপর আর জলদান করবেন না। চারিদিকে নাকি অনাচার শুরু হয়েছে, তাই জল-দেবতা শ্যামল শস্যক্ষেত্রের ওপর থেকে ধীরে ধীরে কেশদেশ ছাড়িয়ে উত্তর-পূর্ব কোণে চলে যাচ্ছেন।'

আসিরা মাটি রেখে ইমানির কাছে এল। বলল—‘মানি, তুমি ওই গ্রামণী বা থৎ-পুত্রের কথা বিশ্বাস কোরো না। থৎ-পুত্র কিছু জানে না... মিছিমিছি গ্রামের পুরোহিত হয়ে বসে বসে শস্যে ভাগ বসাচ্ছে।’

ইমানি ক্ষিপ্রবেগে অসিরার মুখে হাত চাপা দিল—‘কেউ শুনলে বিপদ হবে! একি অসম্ভব কথাবার্তা!’

অসিরা তীক্ষ্ণ পাথরের টুকরোটি তুলে নিয়ে পরম যত্নে মাটির মূর্তিটির গা থেকে অনাবশ্যক অংশ চেঁচে ফেলছিল। মূর্তিটি ক্রমশই ইমানির নিজেরই রূপ পাচ্ছিল দেখে ইমানি চরম বিস্ময়ে আনন্দে ছুটে গিয়ে বৃদ্ধা মাকে খবর দিল। বৃদ্ধা মা ছেলেমেয়েদের এই সব অ-কাজ বেশী পছন্দ করেন না। তিনি তাঁর প্রিয় বানর আর কাঠের বর্শাটি নিয়ে চললেন শ্যামল জলাভূমি সাহারার বন-তলে। ফল সংগ্রহ না করলে কি খাবে তারা। অসিরা তো দিন-রাত ঐ সব আঁকা, দাগ কাটা নিয়েই ব্যস্ত। ওর শরীরে শক্তি সঞ্চার আবশ্যক। গ্রামের শক্তিমান পুরুষ এখন কেউ প্রেতরাজ্যে দেবতার কাছে যাবে... সুতরাং অপেক্ষা করতে হবে। তার একমাত্র ছেলে ও... ওকে শক্তিমান করে তুলতেই হবে।

ইমানি জোর করে ধরে নিয়ে এল অসিরাকে... শ্যামল শস্যক্ষেত্রে। শস্য এখনও পাকে নি। অদূরে তালকুঞ্জ। শস্য যাতে নির্বিঘ্নে পাকতে পারে তার জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করতে হবে। তার ওপর, এখন নাকি, শ্যামল জলাভূমি সাহারার ওপর দেবতা অসিরিসের ক্রোধ হয়েছে। তিনি বর্ষাদেবতাকে ক্রমশঃ উত্তরপূর্বের অসভ্য মানুষদের জমির দিকে চালনা করছেন।

অসিরা শস্যের গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলল—‘জানো মানি... আমাদের পিতা, পিতামহ এই দেশের মানুষ নন। আমরা এখানে আগন্তুক; দেখো না এরা আমাদেরকে একটু ভিন্ন চোখে দেখে! আমাদের দেশে নাকি এই চায়ের ব্যবস্থা ছিল অন্যরকম। আমরা দেবতা আসিরিসের করুণার জন্য হাত গুটিয়ে বসে থাকতাম না; আমরা আমাদের নেমুনা ও শ্রোবতি নদী থেকে জল আনতাম নদীর গা কেটে খাল করে। এদের দেবতা অসিরিসের গা থেকে নাকি প্রথম যবের চারা বেরিয়েছিল; যত সব মিথ্যা কথা। মহান অসিরিসই প্রথম শস্য উৎপাদন শিক্ষা দিয়েছিলেন... তাই এরকম কাহিনী চলে আসছে।’ ইমানি পরম বিস্ময়ে অনিরার কথা শুনতে লাগল... এ সব আবোল তাবোল কি বকছে অসিরা! ওর ওপর কি মৃত আত্মার ভর হয়েছে। মাঝে মাঝে ও আপন মনে মাঠের দিকে চেয়ে পাহাড়ের দিকে চেয়ে কি সব বিড়বিড় করে... ও বোধহয় মৃত আম্মার সঙ্গে কথা বলে! নইলে এই ধরনের বিচিত্র তথ্য... আশ্চর্যজনক কাজকর্মের নির্দেশ পায় কোত্থেকে?

ইমানি অসিরার হাত চেপে ধরল। বলল—‘চল, মাঠের কাজ শেষ হয়েছে; এবার ‘নোমে’ যাই।’ গ্রামণী বুড়ো নিষেধ করেছে ওই নীল পাহাড়ের ওপর উঠতে। অসিরা কিশোরী ইমানিকে এক লহমায় বাহুদ্বয়ের ওপর তুলে বলল—‘আমি ওসব বাজে কথা মানি না, আমি নীল পাহাড়ে গেলে যে দেবতা রাগ করবে, সে দেবতাকে আমার পূজা বা ভয় করার দরকার নেই। চল... তোমাকে আজ একটা বিচিত্র জিনিস দেখাব, যা আমি

এখনও কাউকে বলি নি। জিনিসটা যদি পাই, তবে আর কয়েকদিনের মধ্যেই একটা শক্তিশালী ভল্ল তৈরি করতে পারব। সে অস্ত্র দিয়ে দস্যু যাযাবরদের খুন করব।'

ইমানি প্রথমে ভীত হয়ে নামতে চাইল; তারপরে রোমাঞ্চের আনন্দে পুলকিত হয়ে বলল—'আমার ভয় করছে সিরা। যদি ঈগল দেবতা রাগ করে?'

ক্ষিপ্রবেগে অসিরা আর ইমানি পাহাড়ে উঠতে লাগল। ইমানির শুভ্র কপালে আঁকা ছিল দেবতা 'রে'-র চিত্র। ফলের রেণু দিয়ে সারা কিশোরী তনুটি সুষমায়িত; বাহুমূলে বন্য লতার রঙীন রস দিয়ে উল্কি করা ছিল নানারকম। পাহাড়ে উঠতে উঠতে সে সব সজ্জা নষ্ট হল—তবুও কিশোরী ইমানির প্রচণ্ড উৎসাহ। আর অসিরার মন তখন পাথরের কোণে কোণে... রুক্ষ শক্ত মাটির ফাটলের মধ্যে। দুর্গম স্থানেই নাকি রত্নের সন্ধান মেলে। অসিরার গলায় ছিল অস্থিনির্মিত সুন্দর অলংকার; হাড়ের মালা ছিটকে পড়ল পাথরের আঘাতে। ইমানি কুড়োতে লাগল ছিন্ন মালা। অসিরা তখন পাহাড়ের আলগলি খুঁজছে। ছুটে গেল এক সময়; ও পেয়েছে সেই বিচিত্র বস্তুটি। ছোট ছোট আকারে মাটির খণ্ড, পাথরের খণ্ডের সঙ্গে যুক্ত আছে। অসিরা গুহার অন্ধকারে লুক্কায়িত বস্তুখণ্ডটি নিয়ে এল ইমানির কাছে।—'এই দেখ, মানি, এই দেখ—এর নাম কি জানি না... কিন্তু এই জিনিসের সঙ্গে পাথর মিশিয়ে যদি অস্ত্র তৈরি করি... তা হবে সবচেয়ে তীক্ষ্ণ আর দৃঢ়। তা দিয়ে জংলী রাক্ষসদের হত্যা করতে পারব অনায়াসে।'

পঞ্চদশী ইমানি বিমুগ্ধ বিস্ময়ে অবাক-চাওয়া চেয়ে রইল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দুর্বোধ্য চোখের দিকে।

গ্রামের প্রবীণগণ মন দিয়ে শুনল অসিরার কথা। কি বলছে ছেলেটা... পাথরের চেয়ে কঠিন অস্ত্র? আরও মজবুত? আরও তীক্ষ্ণ? সে জিনিস কি? কোথায় পেল ও? নীল পাহাড়ে? 'সর্বনাশ'-গ্রামণী ভীতিবিহ্বল হয়ে দু'লে উঠল প্রচণ্ড বেগে—কড়ির মালা কেঁপে উঠল গলায়।

— 'কি বললে? নীল পাহাড়ে? সেখানে তুমি গিয়েছিলে?' দু'তিনজন বুড়ি ফিসফিস করে বলল—'ওর চোখ মুখ কেমন কেমন লাগছে। দেখছ না! ও প্রেতাত্মাদের সঙ্গে আহার বিহার শুরু করেছে। সেই জন্য দেখছ না ও ইমানিকে বিয়ে করতে চায় না। বলে, বোনকে কেন বিয়ে করব? আরে, এমন 'অমঙ্গুলে' কথাও কেউ শুনেছে আমাদের এই শ্যামল 'পৃথিবী'তে! বোনকে বিয়ে করবে না তো আর কাকে করবে?'

সকলেই রায় দিল... অসিরা পক্ষীদেবতার বাসস্থানে গিয়ে কি এক বস্তু কুড়িয়ে পেয়েছে, তা নাকি অশুভ; কারণ, এরই পর থেকে তাদের শ্যামল সাহারার নদী নালা তৃণক্ষেত্র শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে। ওকে নোম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক—একেই ওরা বিদেশী, তায় আবার তাদের দেবতাকে জ্বালাতন করেছে; সুতরাং ওকে তাদের 'সা-পুট' থেকেও নির্বাসন দেওয়া দরকার। ও ভিন্ন জেলায় চলে যাক।

অসিরার বৃদ্ধা মা ছুটে এল। চিৎকার করে বলল—'না, না... নোমর্ক, না গ্রামণীও ভাল হয়ে যাবে... আমি ওকে ভাল করে দেব।'

জনতার মধ্য থেকে সহসা দুটি নারীকণ্ঠ বলে উঠল—'আমি ওকে বিয়ে করব। সুতরাং ও এখন থেকে আমার।..পবিত্র উর্বরা ভূমির মালিক। ওকে নির্বাসন দেওয়া চলবে না!'

—'কে তুমি সামনে এস!' গ্রামণী গম্ভীর গলায় আদেশ দিল।

নেমুনা ভীড় ঠেলে অসিরার পাশে এসে দাঁড়াল। নেমুনা নদীর মতোই নেমুনা মেয়ের রূপ। অসিরা মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইল... কপালে দেবতার মঙ্গল-টিকা আঁকা। গণ্ডে ফুলের ছাপ... রেণুরাশি ছড়িয়ে পড়েছে বুকের ওপর।

নেমুনার শরীরটি পরম শক্তিশালিনী... ও অনায়াসে একটি পুরুষকে কাঁধে ফেলে ছুটতে পারবে। আসিরার বিমুগ্ধ দৃষ্টি লক্ষ্য করে নেমুনা ওর হাত ধরল। বলল— 'জানো, অসিরা থাৎ দেবতার আশীষ-ধন্য পুরুষ। তোমরা ওকে চিনতে পারো নি। ও এমন এক বস্তু পেয়েছে যা দিয়ে আমাদের সমস্ত অস্ত্র তৈরি হবে... আর সে অস্ত্র হবে 'মরণ-হাতিয়ার'।'

অসিরার মা বুড়ী বলে উঠল, 'গ্রামের সেনা-সর্দার পর্যুদা প্রেতলোকে যাবে কয়েকদিনের মধ্যেই। ওর নাকি মাথায় আঘাত লেগেছে শিকারে গিয়ে। অসিরাকে
ওর শক্তি দিয়ে দেব... দেখবে অসিরাই হবে সেনা-সর্দার।'

গ্রামণী বুড়োর মেয়ে নেমুনা, সে এসে হাত ধরেছে অসিরার। ওদের বিয়ে হবে... তাহলে তো আর ওকে নির্বাসন দেওয়া যায় না। বরং, ওর আবিষ্কৃত বস্তুটা দেখা যাক! কিন্তু শ্যামল শস্যভূমি দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছে কেন? পুরোহিত বলেছে... তাদের পাপে। নিশ্চয়ই রে দেবতা এবং অসিরিস দেবতার অপমান... অসম্মান হয়েছে। তাদের পুজো দরকার বিরাট করে। তার জন্য চাই উৎকৃষ্ট মধুরস, নধরকান্তি মাংসল জন্তু, ভাল শস্য। আর ঈগল দেবতাও নাকি ক্রোধান্বিত হয়েছেন। কী সর্বনাশা তার রূপ... কী ভয়ঙ্কর শক্তি! তাঁকেও সন্তুষ্ট করতে হবে। পাতালের দেবতা ফণাধারীও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। মাটির নীচে চারিদিকে তার অগ্নিফণা বিস্তারিত করছেন—তিনি গর্জন করে পূজা চেয়েছেন।

অসিরা দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বলল—'আমায় তোমরা বিশ্বাস কর। থৎ দেবতা আমায় আশীর্বাদ করে বলেছেন... পুরোহিতের সব কথা মিথ্যা। সে শুধু সম্পদ পাবার জন্য এসব বানিয়ে বানিয়ে বলেছেন।' —নেমুনার বড় ভাই চিৎকার করে উঠল—'শ্যামল জলাভূমি শুকিয়ে যাচ্ছে... তা কি মিথ্যা? অনন্ত ফণাধারী মহাদেবতা পাতালে গর্জন করছেন, তা কি মিথ্যা? নীল পাহাড়ের বাজপক্ষীদেবতা মাঝে মাঝে আমাদের নোমে নেমে এসে শিশু, ছোট ছোট জন্তু নিয়ে যান... তাও কি মিথ্যা?'

অসিরা লাফ দিয়ে উঠল—'না, তা মিথ্যা নয়। সবই সত্যি। এর জন্য আমরা দায়ী নই। শ্যামল শস্যভূমি শুকিয়ে যাবেই, আমরা রোধ করতে পারব না। কারণ উত্তর-পূর্ব পৃথিবীর জংলীদের দেশে শুরু হয়েছে সাংঘাতিক অপ্রতিরোধ্য এক মহাকর্ষণ-যজ্ঞ; সেই যজ্ঞের দারুণ অগ্নি-আকর্ষণে ছুটে যাচ্ছে শ্যামল শস্যভূমির বাতাস। সেই নিদারুণ শীতের রাজ্য নাকি ক্রমে ক্রমে মনোরম বসন্ত-ধামে পরিণত হচ্ছে; শীতের রাজ্যের পাশ দিয়ে যাতায়াতকারী কুম্ভকার ও বণিকদের কাছ থেকে সংবাদ পেলাম। আমরা এতদিন যে পাপ করেছি—তার শাস্তি এমনি ভাবে কঠিন পথে পেতে হবে।' অসিরার মারাত্মক কথায় শিউরে উঠল সকলে।

—'আর, বাজপক্ষী-দেবতা—দেবতা নন। তিনি একটি অতিকায় পক্ষীবিশেষ। এবং ঐ পক্ষীর গুহাতেই আছে দামী কয়েকটি বস্তু—যার গন্ধ পাই আমি সেখানে গেলে; তার লোভে আমি প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে ছুটে যাই। মানুষ যখন প্রাণের চেয়েও অন্য কোন

বস্তুকে ভালবাসে, তখন সেই বস্তু নিশ্চয়ই জগতের পক্ষে পরম মঙ্গলকারী। ঐ বাজপক্ষীকে ধ্বংস করে ঐ রত্ন আনব।' নোমের তরুণ-তরুণীরা পর্যন্ত হিস হিস করে উঠল—সর্বনাশ; অসিরা কি মানুষ? ও যে শয়তানের অনুচর; প্রেত-দেবতার সহকারী; নইলে পক্ষীদেবতাকে মারতে চায়? সাহস যখন অপরিণামদর্শী, তখন পতন অনিবার্য। অসিরার জীবন ফুরিয়ে এসেছে। ওকে 'রে' দেবতা প্রেতলোকে নিমন্ত্রণ করেছে।

অসিরা আবার বলে উঠল নেমুনার ঘন কালো চোখের দিকে চেয়ে—'পাতালের অনন্ত ভয়ঙ্কর ফণাধারী দেবতা রেগে যান নি মোটেই! তিনি দেবতাও নন। আমাদের এই মাটির নীচে আছে আগুনময় বস্তু-রাশি। নীল পাহাড়ের এক গভীর গুহা আমায় এই জ্ঞান দিয়েছে। মাটির তলাকার এই আগুন মাঝে মাঝে ওপরে উঠতে চায় বলেই মনে হয় ফণাধারী দেবতা গর্জনা করছেন—আর তখনই শুরু হয় উত্তাল আলোড়ন।'

নেমুনার দাদা এবং আরও কয়েকজন চিৎকার করে উঠল, 'অসিরা পাগল হয়ে গেছে। ওকে নির্বাসন দেওয়া হোক।' নেমুনা আবার দৃপ্তভঙ্গিতে এগিয়ে এসে মাঝখানে দাঁড়াল —'না। ওর প্রাণ আমার প্রাণের সমান; ওর নির্বাসনের অর্থ আমারও নির্বাসন; আমার নির্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে—জানবে—নোমের সব মেয়েই নির্বাসনে যাবে। তাছাড়া চারিদিকে দস্যুরা ওৎ পেতে আছে। এ সময় আমরা কি ও রকম ঝগড়া করব! তার চেয়ে অসিরা কি বলছে ভাল করে দেখে আসি চল; কি ওর বস্তু—পরীক্ষায় দোষ কি?'

—'ঠিক। তাই ঠিক—চল, চল,'... বসে সবাই উঠে দাঁড়াল। গ্রামণী এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বলল—'যত দিন যাচ্ছে, ছেলেমেয়েরা কেমন হয়ে উঠছে। আশ্চর্য ব্যাপার সব!'

অসিরা নেমুনার হাত শক্ত করে ধরল—পাহাড়ী পথ বড় বন্ধুর। আশেপাশে বিরাট বিরাট গাছ—হলুদ, গাঢ় সবুজ আর কালো পাতা। ছোট ছোট জন্তু-জানোয়ারগুলো ছুটোছুটি করছে। অসিরার অনাবৃত বক্ষোদেশে 'রে' দেবতার করুণা প্রবল বেগে নেমে আসছে, কটিতে বাঁধা ওর আবিষ্কৃত কৃষ্ণ-ধাতুর নির্মিত হাতিয়ার, হাতে দীর্ঘ এক ভল্ল। তীক্ষ্ণ নাকটি সদা জাগ্রত, কখন সেই অদ্ভুত পাথরের গন্ধ ভেসে আসবে। এই বিচিত্র ধরনের পাথরের চুর্ণ বাজপক্ষীর গুহায় ছড়িয়ে আছে। গুহার মধ্যে ভেতরের দিকে আরও তীব্র গন্ধ। মনে হয় পাহাড়ের ঐ অংশে ঐ বস্তুটি আরও আছে। ইতিমধ্যে গ্রামে এবং 'সা-পুটে অসিরার আবিষ্কৃত কৃষ্ণ-ধাতু এবং নরম শ্বেত-ধাতু নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গেছে; সকলে ছুটছে মাটি খুঁড়তে, পাহাড় পর্বত গুহা চষে ফেলছে ঐ ধাতুর জন্য। কী ভয়ানক শক্ত আর তীক্ষ্ণ হয়েছে ঐ সব নূতন অস্ত্রগুলো। শুধু তাই নয়, সা-পুটের তরুণ-তরুণীরা সব অসিরাকে মনে মনে পুজো করছে, কারণ ঐ শ্বেত-ধাতু দিয়ে কি অপূর্ব মনোহরণ অলংকার হচ্ছে, যদিও শ্বেত-ধাতু ঠিক শ্বেত ধাতু নয়, অনেকটা পোড়া মাটির রঙের মতো, ঠিক গায়ের রঙে মিশে যায়, তবুও কি সুন্দর সুন্দর সব আভরণ তৈরি করছে শিল্পীরা। সারা দেশ জুড়ে অসিরার নাম—ও নাকি সব দেবতাদের আশীষ লাভ করেছে; ও থৎ দেবতার পুত্র। কিন্তু প্রাচী-প্রচীনাগণ অসিরার এই সব যুক্তি তর্ক বা নূতন মত মেনে নিতে পারে নি। গ্রামণী বুড়ো মুস্কিলে পড়েছে, কারণ, নেমুনা অসিরার স্ত্রী হয়েছে; অসিরার মতো নেমুনাও ভাই-বোনের বিবাহ পছন্দ করে না।

পাহাড়ে উঠতে উঠতে অসিরা বলল— 'নেমু, সেদিন যদি তুমি আমায় স্বীকৃতি না জানাতে, তবে বোধ হয় এতদিনে আমাকে এই নীল পাহাড়েই ভীষণ বাজপাখীর কবলে পড়তে হত।' অসিবার কথায় নেমুনা হেসে উঠল—'ও, তবে যে বড় বীরত্ব দেখাচ্ছিলে... আমি পাখীটাকে হত্যা করব!'—অসিরা নেমুনাকে আরও শক্ত হাতে ধরে বলল—'এই হাতে অলংকার গড়ি আর চিত্র আঁকি বলে কি জোর নেই ভেবেছে? আজই দেখবে তার পরিচয়! পাখীটার আসবার সময় হয়েছে, আমিও প্রস্তুত।'

নেমুনা হঠাৎ অসিরার হাত ছাড়িয়ে সামনে ছুটে গেল,—বলল, 'আমিই কি ভীতু নাকি! আমিও তোমার পক্ষীদেবতাকে ভয় করি না! আমিও গ্রামণী বুড়োর মেয়ে।'—অনিরা হেসে বলল—'উঁহু। তোমার এ সব কাজ নয়। তোমার কাজ মাটির পাত্র তৈরি করা, কাঠ দিয়ে ফল সংগ্রহ করা, আমি যা শিকার করে আনব—তা সিদ্ধ করে আমায় খেতে দেওয়া, আর এই নরম হাত দুটি দিয়ে আমাকে আদর করা।'

নেমুনা মাথা দুলিয়ে রমণীয় ভঙ্গিতে তনুশরীরটি অসিরার বুকের ওপর এলিয়ে দিয়ে বলল—'ইস, আমায় ভারী বয়ে গেছে তোমায় আদর করতে।'

নেমুনার কথা শেষ হতে না হতেই হঠাৎ দুরে—নীল পাহাড়ের চুড়ায় ওপার থেকে ভেসে এল অসিরার পরিচিত এক গর্জন। নেমুনা চমকে উঠে অসিরাকে জড়িয়ে ধরল স্বাভাবিক ভয়ে। অসিরা চাপা স্বরে বলল—'আমার পিছনে এসে দাঁড়াও! বাজটাকে আমরা এখনই আক্রমণ করবো না। ওর গুহায় আগে যাক—সেখানেই ওকে ধ্বংস করব।'

ওরা দেখল বাজটা চক্রাকারে ওদেরই মাথার ওপর ঘুরছে। সর্বনাশ! তবে কি বাজটা আক্রমণ করবে? নেমুনা কম্পিত বুকে অসিরার গা ঘেঁষে রইল। কৃষ্ণ-ধাতুর বল্লমটা জোর করে ধরল অসিরা। নেমুনাকে সমুখে ঠেলে দিয়ে বলল—'তাহলে ওই বাজপক্ষীর ধ্বংসকার্য এখনই শেষ করব। তুমি ওর দৃষ্টিপথের মধ্যে গিয়ে দাড়াও। ভয় পেয়ো না—আমার এই বল্লম ভীষণ মারণ অস্ত্র।'

নেমুনা হেসে বলল—'তোমার স্ত্রী হয়ে ভয় পেলে চলবে কেন? তবে দেখো—বল্লম যেন না ব্যর্থ হয়!'

চারিদিকের গাছপালার পাতার সির সির শব্দ ছাপিয়ে ভয়ঙ্কর বিরাট বাজটার ডাক শোনা যাচ্ছিল। বোধ হয় ক্ষুধার্ত। অসিরা ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়াল। ওই দেখা যাচ্ছে বাজটার গুহা। এখানকার সম্পদ তাকে পেতেই হবে!

নেমুনা ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে খোলা জায়গাটুকুতে দাঁড়াল। বাজটার চেহারা দেখে ভয়ে ওর রক্ত হিম হয়ে এল—ইস! কী বিকট দর্শন! পায়ের নখগুলো যেন প্রেতদেবতার ডাণ্ডা! কর্কশ ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে অনেকখানি—স্বয়ং রে দেবতা যেন বিকৃত ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন।

বাজটাও ধীরে ধীরে পাখা নেড়ে নেমে এল নেমুনার শরীরের তাজা মাংসের লোভে। ওর মাথার একহাত ওপরে থাকতেই শিকারী অসিরার অব্যর্থ ভল্ল সাহারার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের বেগে ধেয়ে এল। নেমুনা ছুটে চলে এল অসিরার কাছে—ওরা দেখল অদ্ভুত রকম তীক্ষ্ণ ঐ বল্লমের অগ্রদেশ বিকট বাজটার পেটের এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে। প্রচণ্ড মরণ-চিৎকার করে বাজটা মাটিতে পড়ে গেল। বিশাল ডানা দুটোর

আন্দোলনে আশেপাশের ছোট ছোট শিশুগাছ লুটিয়ে পড়ল। পাথরের খণ্ড ছিটকে পড়ল নীচে। শিউরে উঠে অসিরাকে বলল—'চল, বাড়ী চল; এ দেখতে ভাল লাগছে না।' —অসিরা পরম স্নেহে নেমুনার পিঠে হাত রেখে বলল—'ওটাকে গুহার মধ্যে রেখে দিই, নইলে জন্তু জানোয়ার শেষ করে ফেলবে। এটার শক্ত হাড় আর দাঁতগুলো দরকার; অনেক কাজ হবে। তাছাড়া এটার হৃৎপিণ্ডও নাকি আমাদের বৈদ্য-বুড়োর কাজে লাগে।'

ওরা ধরাধরি করে রক্তাক্ত বাজটার মরা দেহটাকে টেনে টেনে নিয়ে এল গুহার মধ্যে। গুহার মুখে পাথর চাপা দিয়ে চলে এল; সন্ধ্যার অন্ধকারে নেমে এসেছিল পাহাড়ে পাহাড়ে।

ওরা নেমে এসে পৌঁছতেই শুনল সেনা-সর্দার মারা গেছেন। তাঁকে মাটির নীচে শুইয়ে দিতে হবে। ইঁট পোড়ানো শুরু হয়ে গেছে। অসিরার মা ছুটে এল ঘরে। অসিরাকে সেনা-সর্দারের শক্তি লাভ করাতে হবে। অসিরা মাকে কাছে টেনে এনে আনন্দিতস্বরে সব ঘটনা বলল। বুড়ী ভয়ে বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে এল শুনতে শুনতে। সর্বনাশ! হতভাগাটা পক্ষী-দেবতাকে বধ করেছে। একি সর্বনাশা কাজ—গাঁয়ের লোকে শুনলে যে ক্ষেপে যাবে!

নেমুনা হেসে বলল— 'কিন্তু মা, ও কি সত্যিকারের দেবতা? ও যে আমাদের নোমের কত শিশু হত্যা করেছে—আমাদের পরম উপকারী ছাগল জন্তুগুলোকে খেয়ে ফেলেছে, তার প্রতিশোধ নেওয়া হল, এ তো ভালোই হল। আমাদের অনিষ্টকারী বৈরীর বিনাশ করল। অসিরা।'

বুড়ী নেমুনার চোখে চোখ রেখে রাগতস্বরে বলল—'ওর সঙ্গে মিশে মিশে তুইও হতভাগী হয়ে উঠেছিস। যাক্, কাউকে বলিস না এসব। এখন চল—সেনা-সর্দারের প্রেত-কর্ম বাকী আছে—এখনই শুরু হবে।'

নোমের শেষ প্রান্তে পাহাড়ের শুরু। চারিদিকে ছোট বড় নানা আকারের পাথরখণ্ড ছড়িয়ে আছে। গাঢ় সবুজ আর হলুদ লতাপাতা গাছে জায়গাটা বর্ণময়। এরই মধ্যে মাটি খুঁড়ে সেনাসর্দারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। আনা হয়েছে শস্যভাণ্ড, মধু, সেনাসর্দারের প্রিয় অস্ত্র। বিরাট গর্তের চারপাশে একে একে সাজানো হল সব। মাঝখানে সর্দারকে রাখা হবে। ওর আত্মা এখানেই থাকবে। মানুষের আত্মা তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে; কোথাও যায় না! অনন্তকাল ধরে সর্দার সূক্ষ্মদেহে এখানে বাস করবে। তাই তার জন্য চাই খাবার। উপযুক্ত আশ্রয়, বস্ত্র—সব কিছুই প্রয়োজন। পৃথিবীর জীবন তো ক্ষণস্থায়ী, আজ আছে কাল নেই—কিন্তু প্রেতরাজ্যের জীবন যে সীমাহীন—সেখানে মহাকালের কোনো ছেদ নেই। সেখানে মানুষ অজেয়-অমর। অসিরা সর্দারের মুখ দেখতে পাচ্ছিল পাশের আগুনের আভায়। সর্দারের আত্মার কি কোন কষ্ট হচ্ছে? ওঁর প্রেত কি মৃত শরীরটার দিকে চেয়ে ভাবছে না—'এই দেহ যে একদিন গলে পচে যাবে। মাটির কীট এসে কুরে কুরে খেয়ে ফেলবে; তখন আমি কোথায় থাকব?'

অসিরা গম্ভীর হয়ে উঠল একথা চিন্তা করে। সর্দারের দেহটা পচে গিয়ে একদিন শেষ হয়ে যাবে। তখন তাঁর সমস্ত জীবনে যে অসীম যন্ত্রণার সৃষ্টি হবে। তবে? এর কি কোন প্রতিকার নেই! ওঁর 'কা' কি ধ্বংস হয়ে যাবে?

পুরোহিতের সঙ্গে সকলে মিলে প্রার্থনা-চিৎকার শুরু করল—'হে প্রেত-দেবতা, তুমি সর্দারকে নিজের অধীনে যত্নে রাখো, আমরা তোমার নিত্য পুজো দেব। হে রে-দেব, সর্দারের "কা"... আত্মা যেন তোমার দয়া থেকে বঞ্চিত না হয়! তোমার জয় হোক!'

মশাল জ্বালানো হল অনেকগুলো। গ্রামণী বুড়ো তীক্ষ্ণ পাথরের ছুরিটি নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সর্দারের মৃতদেহের দিকে। কয়েকজন উঠে চিৎকার করে প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করছিল। গ্রামণী বুড়ো ছুরি দিয়ে সর্দারের মৃতদেহ কাটতে শুরু করল! অসিরা আবার চমকে উঠল! সদরের দেহটা এভাবে নষ্ট করে দিলে ওর 'কা' কোথায় থাকবে! সেকি 'রে' দেবতার সঙ্গে আকাশে ভ্রমণ করবে? নাকি পক্ষী হয়ে পৃথিবী পরিশ্রম করবে? দেহটাকে নষ্ট না করে কী উপায় নেই?

গ্রামণী বুড়ো সর্দারের দেহ-মাংস এগিয়ে দিল অসিরার দিকে। বলল—'একটুখানি খেয়ে নাও। প্রার্থনা করি, সর্দারের শক্তির মতো তোমার শক্তি হোক। সর্দারের বীর্যের মতো তোমার তেজশালী বীর্য হোক! সর্দারের বিরাট আত্মা তোমার 'কা'-তে অবস্থিত হোক।'

অসিরা এবং আরও কয়েকজন যুবক সর্দারের মাংস ভক্ষণ করল গভীর শ্রদ্ধাভরে। তারপর পোড়া মাটির চৌকোনা খণ্ড ইঁট দিয়ে সুন্দর একটি সমাধি-চৈত্য তৈরি করল অসিরা। মাটি, পাথরের লতাপাতা দিয়ে অলংকরণ অসিরার চেয়ে সুন্দরভাবে আর কে পারবে? আসিরা কাজের মধ্যে ডুবে গেল; কিন্তু বিচিত্র এক চিন্তা তার সমগ্র মন-ধ্যান আচ্ছন্ন করে রইল। মানুষের 'কা' বা ছায়ারূপ মৃত্যুর পর যাতে দেহ-আশ্রয় করে সুখে শান্তিতে বাস করতে পারে, তার ব্যবস্থা কি করে করা যায়? কি তার উপায়?

রাত গভীরতর হল। মানুষের মন ভীতিতে ছেয়ে গেল; দেবতা। সিরিস এবং 'রে' সারারাত অন্ধকার দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন; দানব যুদ্ধে হেরে যাবে—রোজই পরাজিত হয়; আগামী প্রভাতে সূর্যদেব আবার উঠবেন দিক-দিগন্ত আলোকিত করে। রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে অসিরার চিন্তাও গভীর হল।

সবে ভোর হয়েছে। শ্যামল জলাভূমির পার দিয়ে দেবতা উঠছেন। দানবের সঙ্গে যুদ্ধে রক্তাক্ত সূর্যদেবতা মানুষকে প্রাণ দান করতে এগিয়ে আসছেন। মহান তিনি! ধন্য তিনি!

নোমের শিশু আর বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণ এখনও শয্যায়। গৃহপালিত জন্তু প্রাণীগুলো বাইরে এসে তৃণের সন্ধানে ব্যস্ত। গাঢ় সবুজ আর হলুদ রঙের পাতার ওপর সূর্য-কিরণ ঝলমল করছে। প্রাণের অফুরন্ত বন্যায় কীটপতঙ্গ ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করছে।

হঠাৎ দূরের পাহাড়ের অন্তরালে দেখা গেল—কালো কালো কতকগুলো বিন্দু নোমের দিকে এগিয়ে আসছে। গ্রাম-প্রহরী তখনও গভীর ঘুমে মগ্ন—স্বপ্ন দেখছিল, ওর বিচারের দিন উপস্থিত; দেবতাগণ তাকে ক্ষমা করছেন না—হঠাৎ চমক ভাঙতে না ভাঙতেই চির-অন্ধকারের রাজ্যে চলে গেল তার চেতনা। ঐ কালো কালো বিন্দুগুলো পার্শ্ববর্তী অরণ্যের যাযাবর হিংস্র পাহাড় শত্রুর দল। তাদের সর্দারের হাতের তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাতে গ্রাম-প্রহরীর ছিন্নমুণ্ড মাটিতে ছিটকে পড়ল! শত্রুদল নিঃশব্দে এসে পড়ল। ঝাঁপিয়ে পড়ল অসিরা-নেমুনাদের ছোট্ট সুন্দর গ্রামটির ওপর।

সা-পুট রক্ষককে সংবাদ দেবার সুযোগ পাওয়া গেল না। রাজাদেবতার নির্বাচিত জেলা-রক্ষককে সময়মতো সংবাদ দিলে সে। এসে পড়ল মুহূর্ত-মধ্যেই। কিন্তু, শত্রু-বাহিনী যে

এত ভোরে—এই ভাবে লুক্কায়িত আক্রমণ করবে, তা ওরা স্বপ্নেও ভাবে নি।

ইমানি তড়িৎগতিতে অসিরার ঘরে ধাক্কা দিল। তাদের ঘরের বাইরেই দস্যুসর্দার দাঁড়িয়ে। ভীমদর্শন পাষণ্ড এসে ইমানিকে টেনে নিল—পার্শ্ববর্তী সেনানীকে বলল, বাঃ খাসা চেহারা; নিয়ে চল। প্রাণে মারবে না—আগামী গ্রীষ্মে একে ছাগ-দেবতার কাছে বলি দেওয়া যাবে।

অসিরা যখন বাইরে এল, তখন চারিদিকে আগুন জ্বলে উঠেছে। অন্ধকারের দানবরা ঘরের চালে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। বিহ্বল অসিরা চেতনা পেয়ে নিয়ে এল তার তীক্ষ্ণতম মারণাস্ত্র। শত্রুসৈন্য কয়েকটা লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু, সে একা—সম্মুখে শত শত পিশাচ। নেমুনাও ধেয়ে এল। ভোরের রোদ পড়ে নেমুনার সৌন্দর্য ঝলসে উঠল। সর্দারের লোভ শতগুণ বেড়ে উঠল। শস্যভাণ্ডার, খাদ্যভাণ্ডার আর গৃহপালিত পশুর দল লুণ্ঠিত হয়েছে। এখন, কয়েকটি সুন্দরী নারীরত্ন সংগ্রহ করলেই এই বিরাট অভিযান সার্থক হবে। ঐ তো একটি সুন্দরী—আহা, যৌবন যেন ফেটে পড়ছে। একে আমাদের যণ্ড-দেবতার ভোগে দিতেই হবে। অথবা, দেবতা অসিরিসের নৈবেদ্যে।

আসিরা রক্তক্ষরণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল; সংজ্ঞা হারাবার শেষ মুহূর্তে দেখল হতভাগী ইমানি সর্দারের বাহু বন্ধনের কর্কশতায় জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছে; আর তার বীর্যময়ী স্ত্রী নেমুনা পাষণ্ড সর্দারের দিকে ধেয়ে চলেছে কৃষ্ণ ধাতু নির্মিত বিশালাকার অস্ত্র নিয়ে! মোহন ভীষণ রূপ ওর।

...বহুক্ষণ পর তার জ্ঞান এল। শরীর অবশ। চোখ মেলে দেখল নেমুনা পাশেই পড়ে আছে। আবার গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হল সে। যাক—পাষণ্ড সর্দার নেমুনাকে নিয়ে যেতে পারে নি!... পরদিন নোমের জীবিতদের চেষ্টায় অসিরার যখন জ্ঞান হল তখন দ্বি-প্রহর। নেমুনা অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণে প্রেতলোকে চলে গেছে। দেবতা 'রে' ওকে করুণা করে কোলে তুলে নিয়েছেন। ওর মহান আত্মা সূর্যলোকের পথে যাত্রা করেছে।

...না—না, এ হতে পারে না—' প্রচণ্ড ব্যথায় চিৎকার করে ফেটে পড়ল অসিরা... 'নেমুনা এখানেই আছে, ও আমার; ও আমার কাছেই থাকবে—ও মরে নি—মরে নি...!'

অসিরার হাহাকারে সান্ত্বনা দেবার কেউ ছিল না—গ্রামের প্রায় সকলেই মৃত; যারা আছে তারা উদভ্রান্ত, বিপর্যস্ত। এ আঘাত তাদের অকল্পনীয়। যুদ্ধ এর আগেও হয়েছে, যুদ্ধ লেগেই আছে; কিন্তু এই সর্বধ্বংসী পরিণাম অচিন্তনীয়।

অসিরা বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল নেমুনার দিকে। ও মরে নি, তেমনি সুন্দর আছে ও। সমস্ত শরীরে রক্ত। তা সত্ত্বেও তার নেমুনার রূপ জ্বলছে। চোখ দুটি বোজা। চকচকে ঠোঁট দুটো তেমনি রক্তিম। কিন্তু ও কথা বলছে না কেন?... কেন!!

অসিরা স্তব্ধ হয়ে গেল এরপর। একি হল? নেমুনা নেই! নেমুনার প্রাণ নেই!

উদ্‌ভ্রান্তের মতো সে হাঁটতে লাগল নীল পাহাড়ের দিকে। এখানে কত ঘুরেছে তারা; নেমুনার পায়ের ছাপ এখনও লেগে আছে পাথরে পাথরে। অসিরা পায়ে পায়ে এগিয়ে এল বাজ পক্ষীর গুহার সামনে। হঠাৎ চেতনা পেয়ে যেন ঘুম থেকে উঠল সে—একি! ভয়ানক বাজপাখীটা ওৎ পেতে আছে—এখনও মরে নি! সর্বনাশ। আজ যেন সে সব শক্তি হারিয়ে ফেলেছে—ভয়ে ছিটকে এল সে। ...কই—? আসছে না তো যমদূতটা! আসিরা আবার

এগিয়ে গেল—ওহো—পাখীটাকে তো সে আর নেমুনা মিলে মেরেছে! হায়! নেমুনা আজ কোথায়? অসিরা বিস্মিত হয়ে দেখল পাখীটার সারা গায়ে গুহার পাথরের ধূসর চূর্ণ লেগে আছে; সেই মনোরম বিচিত্র পরিচিত গন্ধটা নাকে এল তার। আশ্চর্য! পাখীটা সামান্যও বিকৃত হয় নি। পচে নি এতদিনেও! অদ্ভুত ব্যাপার তো! একি 'রে' দেবতার আশীর্বাদে? কিন্তু গুহায় তো অন্ধকার। তবে? তবে কি এই অপরূপ পাথরের গুঁড়োর শক্তি! এই বস্তুর তেজেই কি প্রাণীটার শরীরের মাংস পচে নি? অসিরা উন্মাদের মতো পাথরের নীচেকার সেই বিচিত্র চূর্ণ হাতে মাখিয়ে নিল। হ্যাঁ—তাই। এই পদার্থ-ই পাখীটার শরীরকে পচন থেকে বাঁচিয়েছে। তারপর বিদ্যুত চমকের মতো বিচিত্র সেই চিন্তা অসিরার মনের কালো মেঘ উড়িয়ে দিল—তাহলে সে এই পদার্থ দিয়ে নেমুনাকে-ই বা কেন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না! নিশ্চয়ই পরবে। পারতে হবে। নেমুনা তার মরে নি; দেবতা রে-র কাছে যাবার দিন এখনও আসে নি তার।

নোমে ছুটে এল অসিরা। রাজা-দেবতার লোকজন এসে সকলকে নিয়ে গেছে। আবার তারা সংসার গড়বে; পরিবার গড়বে; নোম গড়বে। আর, দানবদের ধ্বংস করবে।

অসিরার কথা শুনে সকলে আনন্দে বিস্ময়ে উদ্বেল হয়ে উঠল। মানুষ মরলেও তাকে অবিকৃত রাখা যাবে? সেকি!! অসিরার আবিষ্কৃত কৃষ্ণ-ধাতুর বিষয় শুনে রাজাদেবতা পরম আনন্দিত হয়ে ঐ ধাতুর সন্ধানের আদেশ দিলেন। রাজাদেবতার আদেশের অর্থ স্বয়ং 'রে' দেবের আদেশ, কারণ রাজা 'রে' দেবের সন্তান। সারা কেমদেশে চাঞ্চল্যের বন্যা এল—মহান অসিরা আবিষ্কার করেছে কৃষ্ণ-ধাতু, শ্বেত ধাতু আর বিচিত্র এক পদ্ধতি, যার দ্বারা মরা মানুষকে বিকৃত রাখা যায়। অসিরা তৈরি করেছে ওযুধ, যার প্রলেপ লাগিয়ে মৃতদেহ জীবন্ত রাখা যায়—ধন্য হল তারা! আত্মীয়দের মৃতদেহ এতদিন কষ্ট পাচ্ছিল। 'কা'-আত্মা যন্ত্রণায় ছটফট করছিল—এবার থেকে মৃতের জন্য তৈরি করতে হবে বিরাট বাসগৃহ; যাতে 'কা'র-র সামান্য অসুবিধা না হয়। শরীর রইবে অবিকৃত। অসিরার বিরাট আবিষ্কার যুগান্তর এনেছে—নূতন জীবন এনেছে! ধন্য অসিরা!

অসিরা নেমুনার অবিকৃত সুন্দর ম্যমীর সামনে বসে ভাবছি—-কে বলেছে নেমুনা প্রেতলোকে গেছে? এই তো ঠিক তেমনি সুন্দর আছে সে! যেমনি চক্‌চকে দুটি কোমল ঠোঁট, শুধু চোখ দুটি বোজা... নতুবা, স্নিগ্ধ শরীরটি ঠিক আগের মতোই পেলব—রক্তিম গণ্ডদেশ... কমনীয় বাহুলতা...

প্রথম প্রকাশ: আশ্চর্য!, জুন, ১৯৬৬
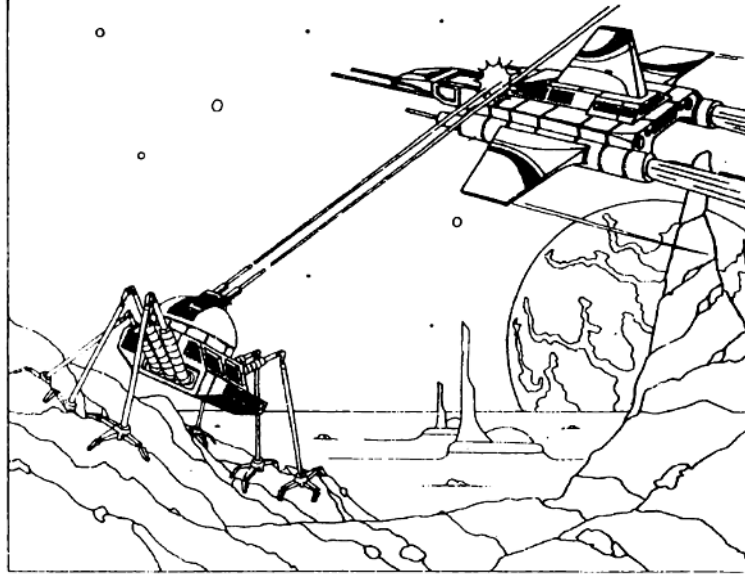
সূচিপত্রে ফিরে যান

পিপে

রণেন ঘোষ

অপরাহ্ন প্রায় সন্ধ্যার বুড়ি ছুঁয়ে ফেলেছে। আকাশের বুকে অস্তপ্রায় সূর্যের লালাভা। ভাসা ভাসা মেঘের বুকে রক্তিমাভার অপূর্ব উল্লাস। সারা দিনের অন্বেষণ শেষ করে ঘরে ফেরায় ব্যস্ত পাখিসকল। আকাশে বুকে পাড়ি জমিয়েছে সারি বেঁধে। গাছপালার ঝোপে ঝাড়ে ঘনিয়ে আসছে রাতের অন্ধকার। কেমন যেন ধ্যানমগ্ন সন্ধ্যা।

নেশাগ্রস্তের মতন ডেকচেয়ারে বসে থাকেন ডঃ প্রতীপ নারায়ণ সেনশর্মা। দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা কাটে ল্যাবোরেটরী ঘরে। বায়োলজি নিয়ে গবেষণার শেষ নেই। প্রাণ... প্রাণ কী, প্রাণের স্বরূপ কী? প্রাণের উৎপত্তি কোথায়? এই মহাবিশ্বের বিশাল প্রাঙ্গণে আর কি কোথাও আছে প্রাণের স্পন্দন, বুদ্ধিমান জীব মানুষই কি মহাবিশ্বের এক মাত্র বিস্ময়... নানান প্রশ্নের সমাধানে ক্লান্ত ডঃ সেনশর্মা।

—না না সেন... বেশ বুঝতে পারছি এগুলোর কোন মানেই হয় না। কেঁচো, কাঁকড়া বিছে, ইঁদুর, কুকুর, অক্টোপাস, জেলীফিস... এ সমস্তই প্রকৃতির বিচিত্র খেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়। গ্রহে গ্রহে এর রকমফের অবশ্যম্ভাবী। কারণ বুদ্ধিমত্তা বা প্রাণের উৎকর্ষতা বলে তো কিছুই নেই ওদের। তবে হ্যাঁ দৈবাৎ যদি কোন গ্রহে বুদ্ধিমান জীবের বিকাশ ঘটে তাহলে তাদের আকৃতি হবে নির্ঘাৎ আমাদের মতো। পাশের চেয়ারে বসতে বসতে কথাগুলো বললেন প্রঃ গুণ। শুধু সহপাঠী বললে ভুল হবে। ডঃ সেন শর্মার প্রাণের বন্ধু এই প্রঃ অসীমান গুণ গবেষণারও একমাত্র সঙ্গী।

—এ তোমার নিছক অনুমান। প্রমাণ আছে কি কিছু? মৃদু হেসে প্রশ্ন করলেন ডঃ সেনশর্মা।

—প্রমাণ! প্রমাণই কি সব? এ হচ্ছে আমার বিশ্বাস—আমাদের অনুকরণেই তৈরি হতে হবে আমাদের মতো মস্তিস্ক সর্বস্ব জীবদের। আমাদের মতোই দেখতে হবে তাদের সৃষ্টিকর্তার এটাই বোধ হয় একমাত্র বিধান।

—দারুণ বিশ্বাস তো তোমার। এসব শুনলে তো পরম নাস্তিকও ভগবৎ বিশ্বাসী হয়ে উঠবে গুণ। তুমি কি ধর্মকর্মে মন দিলে নাকি শেষকালে?

হোহো করে হেসে উঠলেন প্রঃ গুণ। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন—না হে
না, ধর্মে আর মতি হবে না এ জীবনে। তবে প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালের পাশাপাশি রয়েছে নিয়মের কড়া শাসন। রয়েছে অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যে অবিরাম সংগ্রাম আর প্রাকৃতিক নির্বাচন। মহাবিশ্বের গ্রহে গ্রহে এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নেই। অর্থাৎ কিনা প্রাণ বিকাশের অগ্রগতির এরাই হচ্ছে আসল দিশারী।

—তার মানে ফুটবল বা হকি খেলার মতন। একই খেলা... শুধু বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নিয়মে খেলা হয়। হাল্কাভাবেই কথাগুলো বললেন ডঃ সেনশর্মা।

—এতো খুব স্বাভাবিক। এক এক দেশে এক এক নিয়ম। তবে নিয়মের ফারাক থাকে না কেন, একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, সব নিয়মের মূলেই রয়েছে কতকগুলো সাধারণ সূত্র। সেই রামকৃষ্ণদেবের কথাগুলো ভেবে দেখো— ওয়াটার, জল, পানি—সব কিন্তু একটি বস্তুকে বোঝায়... শুধু প্রকাশ ভঙ্গির পার্থক্য।

প্রঃ গুণের মুখের দিকে তাকিয়ে আর কোন কথা বললেন না ডঃ সেনশর্মা। ছোট পাইপটা টেনে বার করে নিলেন বুক পকেট থেকে। পাউচ থেকে তামাক ভরে আগুন ধরিয়ে নিঃশব্দে ধূমপান শুরু করলেন ডক্টর। গোলাকার ধোঁয়ার মালাগুলো শূন্যে মিলিয়ে গেল একে একে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। দূর আকাশের বুকে আলোর হালকা হাতছানি। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে চারপাশে। দু'একটা তারা উঁকি দিচ্ছে আকাশের বুকে। গ্রীষ্মের দারুণ দাবদাহ সন্ধ্যার স্নিগ্ধ স্পর্শে পরম রমণীয় হয়ে উঠছে। সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে যাচ্ছে ঠাণ্ডা মৃদু মন্দ বাতাসে।

—আমি কি ভাবছি জান গুণ, এত বেশী স্থিরনিশ্চয় হলে কি করে তুমি? প্রমাণ তো কিছু পাইনি আমরা। ...প্রমাণ না পেলে...

কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠলেন প্রঃ গুণ। বললেন—কেবল প্রমাণ, প্রমাণ আর প্রমাণ। সব কিছুর কি প্রমাণ মেলে? অনেক কিছু দেখার পর অনুমান করাও কি উচিত হবে না? আমি বলছি আমাদের মতোই দেখতে হবে অন্য গ্রহের বুদ্ধিমান জীবদের। বেশ জোর দিয়ে কথাগুলো বললেন প্রঃ গুণ।

বিচিত্র এক হাসি ফুটলো ডঃ সেনশর্মার মুখে।।

অবাক করে দিচ্ছ ভাই। বহির্বিশ্বের জীবদের সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানি আমরা। শুধু অনুমান মাত্রই সার। আর সেই অনুমানের উপর নির্ভর করে এত বড় সিদ্ধান্তে আসা কি উচিত হবে আমাদের? শুধু একটি মাত্র বুদ্ধিমান জীবের পরিচয় পেয়েছি আমরা। সে হচ্ছে এই পৃথিবীর মানুষ। নিজেদের দেখেই কি বহির্বিশ্বের প্রাণীজগৎ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা উচিত হবে? নিশ্চয় অনুমান করব আমরা। তবে সে অনুমান কেবল ব্যক্তিগত ইচ্ছারই ফসল হয়ে দাঁড়াচ্ছে মাত্র। কোন মিল থাকবে না বাস্তবের সঙ্গে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে নিঃশব্দে শুনছিলেন প্রঃ গুণ। ভূ দুটো কুঁচকে উঠছিল মাঝে মাঝে।

—তোমার আরগুমেন্ট শুনলাম সেন। কিন্তু রেগে যাচ্ছ কেন বল তো? রাগ তো আর যুক্তি নয়। মানসিক আবেগ মাত্র। ধীরে ধীরে বললেন প্রঃ গুণ।

চেয়ারের উপর সোজা হয়ে বসলেন ডঃ সেনশর্মা। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন প্রঃ গুণের দিকে।

—ঠিক... ঠিক বলছো গুণ। এটা এক মানসিক আবেগ মাত্র। কিন্তু মনঃস্তত্ত্ববিদরা কি বলেন জানো তো? ওঁরা বলেন যে রাগের উৎপত্তি হয় স্বল্প জ্ঞান বা অল্প জানা থেকে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ... তুমি... তোমার কম আছে জ্ঞানের। গর্জে উঠলেন প্রঃ গুণ। সহজ সরল বিষয়টাকে কেবলই জটিল করে তুলছো কেন বুঝি না। একটু চিন্তা করলেই জলের মতো সহজ হয়ে যাবে সব একথা তো নিশ্চয় জানো যে মানুষই এই পৃথিবীতে একমাত্র যুক্তিবাদী প্রাণী। তোমার কাছে হয় তো খুবই সামান্য এই ঘটনা। আপাত সামান্য এই ঘটনাই অসামান্য হয়ে উঠেছে আমার কাছে। আমার যুক্তির সূত্রপাত এখান থেকেই।

একবার শুধু ভেবে দেখ যে এই পৃথিবীরই দেশে দেশে কত তফাৎ ভৌগোলিক আবহাওয়ায়। নিদারুণ ঠাণ্ডা আর তার পরেই রোদে জ্বলা ধু ধু মরুভূমির প্রচণ্ড উত্তাপ। একদিকে উত্তুঙ্গ আকাশ ছোঁয়া পাহাড় অন্যদিকে নীল সাগরের কী অতলান্ত গভীরতা। অথচ এত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও আর কোন প্রাণীই কিন্তু বুদ্ধিমান হয়ে উঠল না বিশেষ কোন স্থানের সব সুযোগ সুবিধে নিয়ে। ভৌগোলিক তারতম্য নির্বিশেষে মানুষ নামক হোমোস্যাপিয়েনই হল একমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী এই বিশাল পৃথিবীর বুকে। আমার অনুমান গড়ে উঠেছে একান্তই এই বাস্তব সত্যের উপর। এটাই কি প্রমাণ করে না যে গ্রহে গ্রহান্তরে নানান বৈষম্যের মধ্যেও যদি কোন বুদ্ধিমান জীবের উদ্ভব হয় তাহলে তারা হবে ঠিক আমাদের মতোই মানুষ? এবার ভেবে দেখ সেন আমাদের অনুমান কি যুক্তিনির্ভর নয়? —তর্কে জেতার সম্ভাবনায় জ্বলজ্বল করে উঠল প্রঃ গুণের চোখদুটো।

—বাঃ বাঃ অপূর্ব যুক্তিপূর্ণ তোমার অনুমান, একেবারে নতুন চিন্তা। সত্যি বিশ্বাস কর গুণ, আমার মাথায় আসেনি এসব! চেয়ার থেকে উঠে দু হাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন প্রঃ গুণকে।—

—শুধু এইটুকুই নয় সেন, আরো আছে।

—আরো আছে? বলো বলো গুণ... অদ্ভুত অপূর্ব তোমার দৃষ্টিভঙ্গি।

—আমি জানি সেন এ বিষয়েও তুমি নিশ্চয় একমত হবে আমার সঙ্গে যে বুদ্ধিমান জীবমাত্রের মস্তিষ্ক বা মস্তিষ্কের অনুরূপ থাকবে কিছু ওর দেহে?

—হ্যাঁ সে বিষয়ে আর কথা কি... নিশ্চয় মস্তিষ্ক থাকবে তার! জোর দিয়ে বন্ধুকে সায় দিলেন ডঃ সেনশর্মা।

—বেশ—তাহলে নানান যোগসূত্র থাকবে নিশ্চয় বিভিন্ন ইমপালস আদান প্রদানের জন্য। যেমন ধরো না—শব্দ, বৈদ্যুতিক চৌম্বকীয় তরঙ্গ, গন্ধ, আলো ইত্যাদি। আবার চোখ কান নাকের মতো নিশ্চয় কোন প্রত্যঙ্গ থাকবে ওদের।

প্রঃ গুণের চোখে মুখে দারুণ উত্তেজনা। প্রতিটি বক্তব্যে স্বীকৃতি লাভের আশায় অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রইলেন ওর মুখের দিকে।

ডঃ সেনশর্মার দু'চোখেও উত্তেজনার আভা।

—তা'হলে সেন, চোখ নাক কান সব থাকতে বাধ্য। শুধু তাই নয়, আমার স্থির বিশ্বাস যে ষ্টিরিওস্কোপিক অনুভূতি আর ষ্টিরিওফোনিক শব্দ শোনার জন্য নিশ্চয় দুটো করে থাকবে ঐ প্রত্যঙ্গগুলো।

—না গুণ, এবার কিন্তু তোমার বক্তব্য মানতে পারলাম না। দুটোর বদলে তিনটে চোখ হলে অনেক সুবিধে হয় মানুষের। পেছনে যদি একটা চোখ থাকত আমাদের তাহলে সামনে পেছনে সব দেখতে পেতাম একসঙ্গে। কি বলো হে?

—না না সেন... তোমার কথা মানতে পারলাম না কিন্তু। চোখ বা অন্য প্রত্যঙ্গ বেশী থাকলে নিশ্চয় প্রাবল্য ঘটবে ইম্পালসের। তার ফলে নাভাস ব্রেকডাউন হওয়া বিচিত্র নয় কিছু।

—তা কেন হবে গুণ। গাড়ি চালাবার সময় তো একসঙ্গে সামনের আর আয়নার পিছনের দিক সমান নজর রাখতে হয়। তখন তো ইম্পালসের আধিক্য ঘটে না। এ বিষয়ে

কিছু বলার আছে তোমার? একটু ঠাট্টার ছলে বলে উঠলেন ডঃ সেনশর্মা।

—হুঁ! একটু চুপ করে চিন্তা করলেন প্রঃ গুণ!—দেখ সেন সামনে পেছনে আমরা দেখি বটে। তবে একসঙ্গে নিশ্চয় দেখি না। তাই না সেন?

—সাবাশ! সত্যি অকাট্য তোমার যুক্তি। তবে প্রয়োজন মতো সামনের আর পেছনের চোখও তো ব্যবহার করা যেতে পারে?

—না... হ্যাঁ... তা যেতে পারে বটে। তবে এ বিষয়ে চিন্তা করিনি এখনও। চিন্তার সুরে বললেন প্রঃ গুণ।।

—ঠিক আছে। এ প্রশ্নটা না হয় ছেড়ে দিলাম এখন। কিন্তু দুটোর বদলে চারটে চোখ হলে কি অসুবিধে হত বলতো?

একটু চুপ করে গেলেন প্রঃ গুণ। এই নতুন যুক্তির উপযুক্ত উত্তর তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মনে মনে। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করার পরও যুৎসই কোন জবাব যে খুঁজে পেলেন না সেটা ওঁর মুখের চেহারা দেখেই স্পষ্ট বোঝা গেল। কথা বলার সময়ও দৃঢ়তা রইল না কণ্ঠস্বরে।

—এ বিষয়েও ভেবে দেখিনি এখনও। তবে আমার বক্তব্যও শেষ হয় নি এখনও। যাক যে কথা বলছিলাম—অকল্পনীয় দ্রুত গতিতে সংকেতের আদান প্রদান ঘটে আমাদের এই নার্ভ টিসুর মধ্যে দিয়ে আর সেই জন্যেই মাথার খুব কাছেই হওয়া উচিত চোখ কান নাক প্রভৃতি প্রত্যঙ্গগুলো। মানে যতদূর সম্ভব মস্তিষ্কের কাছে থাকতে হবে ওদের। তা নয়তো সংকেত আদান প্রদানের বিলম্ব ঘটবে অনেক। অতএব বুদ্ধিমান জীব মাত্রেরই মাথার মতো কিছু থাকতে বাধ্য।

কোন উত্তর করলেন না ডঃ সেনশর্মা।।

—আবার দেখ সেন, বুদ্ধিমান জীবমাত্রই কাজ করবে আর কাজ করতে হলে আমাদের হাতের মতো কোন প্রত্যঙ্গ থাকতেই হবে তাদের। শুধু থাকলেই হবে না ইচ্ছে মতো নড়াচড়ার ক্ষমতাও থাকতে হবে, আর সেই জন্যে পা থাকবে প্রতিটি বুদ্ধিমান জীবের।

—কিন্তু পা কেন... চাকা থাকলে তো সবচেয়ে ভাল হয়? ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলেন ডঃ সেনশর্মা।

—চাকা? পায়ের বদলে চাকা? নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার! একটু রাগত স্বরে বলে উঠলেন প্রঃ গুণ।

—কিন্তু কেন? চাকা তো অনেক দরকারী। পায়ের চেয়ে তুমিও তো গতির নির্ভর কর বেশী। গতি মানেই চাকা আর চাকা মানেই তো দ্রুত গতির প্রতীক।

কেমন যেন হোঁচট খেলেন প্রঃ গুণ। এরকম যুক্তি শোনেননি কখনও এর আগে।

—সত্যি এবারে হাসালে সেন। এ কি একটা যুক্তি হল। বেশ তো তাই যদি হয় তবে হাঁটবে কি করে বনের মধ্যে, কাদার ভেতরে? রাস্তা না থাকলে চাকা তো অকেজো! প্রঃ গুণের সুরে ব্যঙ্গের আভাস।

এক সুন্দর হাসি ফুটে উঠল ডঃ সেনশর্মার মুখে। মনে মনে উপভোগ করছেন বেশ।

—এখনও হারিনি গুণ। আরো আছে। পা আর চাকা থাকলেই বা কি এসে যায়। সাপের কথাই ধরো না। না আছে পা না আছে চাকা অথচ গতি কি দ্রুত ওর।

প্রতিবাদ করার আর সময় পেলেন না প্রঃ গুণ। প্রচণ্ড শব্দে দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে গেল আকাশ বাতাস। শব্দের বন্যা নামছে মহাকাশের বুক চিরে। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে লালচে আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চতুর্দিক। ঘটনার ঘনঘটায় হতচকিত হয়ে উঠল দুই বন্ধু। গাছপালার ছায়াগুলো ক্রমেই বৃহদাকার ধারণ করছে ঘাসে ঢাকা মাঠের উপর। কোন কিছু বোধগম্য হওয়ার আগেই বিচিত্র আকারের এক মহাকাশযান নেমে পড়ল ওদের সামনে মাঠের উপর। কি অদ্ভুত বিস্ময়কর মহাকাশযান! লাল উজ্জ্বল আভায় ভরে উঠেছে মহাকাশযানের চার পাশ।

অজানা আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে প্রঃ গুণের মুখ। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে। অথচ সম্পূর্ণ বিপরীত ডঃ সেনশর্মার আচরণ। অবাক হয়েছেন সন্দেহ নেই কিন্তু সমস্ত মুখে এক কৌতুকের হাসি। বেশ রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করছেন সমস্ত ঘটনা।

—ভায়া হে এবার যাচাই করে দেখ না তোমার থিওরী? ফিস্‌ফিসিয়ে বলে উঠলেন ডঃ সেনশর্মা।

—কি বলছো তুমি? এখনও তোমার রসিকতা। স্নায়বিক দৌর্বল্য এখন কাটিয়ে উঠতে পারেননি প্রঃ গুণ।

—জীবনটাই তো এক পরম রসিকতা হে। ভগবান নামক যাদুরকটা কেমন পুতুল নাচ নাচাচ্ছে বলো তো আমাদের! দেখ... দেখ এবার...

গুম্ গুম্ করে আওয়াজ উঠল মহাকাশযান থেকে। লাল আলোটা কমে গেল একদিকে। ধীরে ধীরে যেন গলে গেল এক পাশের অন্ধকার ধাতব আবরণটা। চৌকাকার কালো এক বস্তু যেন বেরিয়ে আসছে মহাকাশযানের অভ্যন্তর থেকে। ধীরে ধীরে ভেসে উঠছে... আরও... আরও উঠছে উপরে... ভাসছে এবার মহাকাশযানের উপর। লম্বা চৌকাকার এক পিপে ভাসছে জমি থেকে বেশ উপরে হাওয়ার মধ্যে। লালচে আভায় চকচক করছে ওর মসৃণ ধাতব দেহ।

—ভালো ম্যাজিক তো? পিপে ভাসছে আকাশে! ভিনগ্রহীদের আক্রমণ শুরু হয়ে গেল পৃথিবীতে। প্রাণ বাঁচানই দায় এখন! চাপা গলায় বললেন প্রঃ গুণ।

ওদের সামনে ভাসতে ভাসতে চারপাশে ঘুরতে শুরু করল পিপেটা। মাঝে মাঝে এগিয়ে আসছে আবার পিছিয়ে যাচ্ছে! মনে হল খুব ভাল ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে ওঁদের। এবার আরো সামনে এগিয়ে এল পিপেটা। কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন ওঁরা।

না, একেবারে ঘাড়ের উপর এল না বা ওঁদের আক্রমণও করল না। ওঁদের সামনে ভাসতে ভাসতে কাঁপতে শুরু করল। অদ্ভুত ছন্দে মৃদুমন্দ গতিতে নাচ শুরু করল মহাকাশের আগন্তুক।

—স্কাউট রোবট নাকি সেন? একটু ইতস্ততঃ করে বললেন প্রঃ গুণ।

—ভুল করছেন আপনারা... আমি রোবট নই মোটেই। আমি তো আপনাদের মতোই জীবন্ত প্রাণী। পরিষ্কার স্বরে কাটা কাটা ভাবে কথা বলে উঠল পিপেটা।

চকিতের মধ্যে চারচোখের দৃষ্টি বিনিময় হল ওঁদের।

—বোকা পেয়েছে আমাদের! এরকমভাবেই প্রোগ্রাম করা হয়েছে নিশ্চয় রোবটটাকে। একটু জোর দিয়েই কথাগুলো বললেন প্রঃ গুণ।

—একথা বলছ কেন গুণ। প্রোগ্রাম করা হবে কেন? আমাদের দেখতে পাচ্ছে, সব কথা শুনতে পাচ্ছে... তাছাড়া আমাদের চিন্তাও পড়তে পারছে বলে মনে হয় আমার। তাছাড়া কথা বলল কি করে আমাদের ভাষায়? আরো আছে... এবার চেয়ে দেখো ভায়া... পা নেই, চাকাও নেই... অথচ কি অনায়াস গতিতে চলা ফেরা করছে দেখ। তাহলে এবার কি বলবে গুণ? হাসিমুখে বন্ধুর দিকে তাকালেন ডঃ সেনশর্মা।

—হ্যাঁ হ্যাঁ এবার মানছি তোমার যুক্তি। কিন্তু জীবন্ত নয় মোটেই পিপেটা।

—বেশ তো, কি প্রমাণ চাও বল? বেশ জোর দিয়ে বললেন ডঃ সেনশর্মা।

—প্রমাণ করুন! প্রমাণ দিতে প্রস্তুত। কথা বলে উঠল পিপে।

—প্রমাণ... প্রমাণ... একটি মাত্রই প্রমাণ চাই। তাহলেই বুঝবো... বিড় বিড় করে বললেন প্রঃ গুণ।

—বেশ তো... ইতস্তত কেন... কি প্রমাণ চান বলুন? মুহূর্তের মধ্যে উত্তর দিল পিপে।

—জীবন্ত প্রাণী মাত্রই নিজের মতো প্রাণ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে... জীবন্ত হলে জন্ম দিন ঠিক আপনার মতো একটা পিপে! আদেশের সুরে বলে উঠলেন প্রঃ গুণ।

উত্তর করল না পিপে। আরও তীব্র হয়ে উঠল গুমগুমে আওয়াজ। থর থর করে কাঁপতে শুরু করল। কাঁপুনি বাড়ছে ক্রমেই। কেমন যেন অস্পষ্ট হয়ে উঠল সমস্ত পিপেটা। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রয়েছেন ডঃ সেনশর্মা আর প্রঃ গুণ। হঠাৎ খুলে গেল যেন একটা পাশ। ছোট্ট এক পিপে বেরিয়ে এল আগন্তুক পিপের মধ্যে থেকে। একই রকম দেখতে অথচ খুবই ছোট আকারের! বড়টার সামনেই ভাসছে সদ্যোজাত নবজাতক। কাঁপছে ধীরে ধীরে। মুহূর্ত কয়েক বাদেই ঘটল আরো চমকপ্রদ ঘটনা। ফুলে উঠতে শুরু করল নবজাতক। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আর কোন পার্থক্য রইল না পিতা পুত্রের মধ্যে। সমানাকারের বড় দুটো পিপে ভাসছে চোখের সামনে।

মাঝে মাঝে মাথা ঠেকিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে পিপে দুটো। কৌতুক খেলায় মেতে উঠেছে পিতা পুত্র!

একটু পরেই নাচতে নাচতে ভেসে চললো নবজাতক মহাকাশযানের দিকে। তারপর এক সময়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে মহাকাশযানের অভ্যন্তরে।

এবার কথা বলে উঠল পিপে—আপনাদের অতিথি আমি... আর অতিথি বলে কেমন যেন লাগছে কথাটা বলতে... আমি যে জীবন্ত তার প্রমাণ তো দিলাম... কিন্তু আপনাদের প্রমাণ পেলেই নিশ্চিন্ত হতাম আমি।

—প্রমাণ? কিসের প্রমাণ? সব যেন যেমন গোলমাল হয়ে গেল প্রঃ গুণের।

—আপনারও যে জীবন্ত—রোবট নন... তার প্রমাণ!

—অপূর্ব! অপূর্ব! সজোরে তারিফ করে উঠলেন ডঃ সেনশর্মা।

—সেটা—সেটা কি করে সম্ভব হবে... প্রতিবাদের সুরে বলে উঠলেন প্রঃ গুণ।

—সম্ভব করতেই হবে! এটাই তো ওর ন্যায্য দাবী। ওর বেলায় তুমিও তো তাই চেয়েছিলে না? ডঃ সেনশর্মার কণ্ঠে রসিকতার আমেজ।

—কিন্তু কি করে করবো আমরা?

—কেন ঠিক কেমন করে আমি প্রমাণ দিলাম! গম্ভীর স্বরে বলে উঠল পিপে।

—মানে... মানে কি করে বোঝাবো ওকে? বন্ধুর দিকে নিরুপায় ভঙ্গিতে তাকালেন প্রঃ গুণ।

রীতিমত জটিল হয়ে পড়ছে পরিস্থিতি। ডঃ সেনশর্মা গভীর ভাবে উপলব্ধি করলেন সমস্যাটা।

—হ্যাঁ, দেখুন মহাকাশের আগন্তুক, আপনার মতো সহজ ভাবে জন্ম দিতে পারি না আমরা নবজাতকদের। তাই অন্য কোন প্রমাণ যদি চান... তাহলে...।

—হ্যাঁ, বুঝতে পারছি এবার। নবজাতক বা বংশধর সৃষ্টির ব্যাপারে অনেক পিছিয়ে আছেন আপনারা। প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগেই পড়ে আছেন দেখছি! খুব গম্ভীরভাবে বলে উঠল মহাকাশচারী পিপে।

—ঠিক ধরেছেন আপনি! তবে কিনা...

ডঃ সেনশর্মাকে বাধা দিয়ে আবার প্রশ্ন করল পিপে।

—কোন নবজাতক আপনাদের শিশু বংশধরদের দেখতে পারি একবার? শিশুদের দেখলেই সব বুঝতে পারবো।

—নিশ্চয়। নিশ্চয়। প্রঃ গুণেরই তো ছেলে আছে। কলেজে পড়ে... এখান থেকে অনেক দূর কলেজ। তবে ছবি আছে বাড়ীর ভেতরে। যদি বলেন তো...

—এক মিনিট অপেক্ষা করুন... ছবি নিয়ে আসছি আমি... চকিতে একবার ডঃ সেনশর্মার দিকে তাকিয়ে একরকম দৌড়ে বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন প্রঃ গুণ। একটু পরে বাইরে বেরিয়ে এলেন প্রকাণ্ড এক বাঁধানো ছবি নিয়ে।

ভাসতে ভাসতে আরো সামনে এগিয়ে এল পিপে। প্রফেসারও মাথার উপরে তুলে ধরলেন ছবিটা।

এবার এক অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটল ওঁদের সামনে। দুই বন্ধু হতবাক! হাত পা ছাড়াও কি দ্রুত কাজ করে চলেছে অদ্ভুত পিপেটা।

প্রফেসারের হাত থেকে ছবিটা উড়ে গেল পিপেটার সামনে। জোর হয়ে উঠল গুমগুম আওয়াজ। কাঁপুনিও শুরু হয়ে গেল আস্তে আস্তে। ম্যাজিকের মতো পিপের সামনে শূন্যে ভাসছে ছবি। একটু একটু করে দুলছে পিপে। পর্যবেক্ষণ করছে খুব ভাল করে।

—কেমন করে করছেন এসব? বিস্ময় চাপতে পারলো না। প্রঃ গুণ।

—কেন? খুব সোজা। ফোর্সফিল্ডের সাহায্যে এসব অতি সহজ। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল পিপে।

নির্বাক দুই বন্ধু। কি-ই বা বলার আছে এর পরে। কয়েক মিনিট পরে আস্তে আস্তে ছবিটা নেমে এসে দাঁড়াল প্রঃ গুণের হাতের সামনে। যন্ত্রচালিতের মতো ধরে নিলেন প্রফেসার।

—ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের। সব কিছু বুঝতে পেরেছি এখন। এবার আমার বিদায় নেবার পালা। যেতে হবে আমাকে অনেকদূরে—পিপের কণ্ঠস্বরে কি কষ্টের আভাস?

—সেকী? মহাকাশের সীমাহীন দূরত্ব পেরিয়ে এলেন শুধু এইটুকু জানতে? মাত্র কয়েক মিনিট থাকবার জন্যে আমাদের গ্রহে? নিজের অজ্ঞাতসারে বলে উঠলেন ডঃ সেনশর্মা।

—এখানে আসার একটাই উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে আমার। এখন তো যেতে হবে আমাকে।

—কি সে উদ্দেশ্য আপনার? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন প্রঃ গুণ।

—আমাদের গ্রহের সমস্ত বিজ্ঞানীরাই এই মত পোষণ করেন যে মহাবিশ্বের যাবতীয় জীবন্ত প্রাণীরাই আমাদের মতন দেখতে। আমি কিন্তু প্রতিবাদ করেছিলাম। হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল ওরা আমার কথা! তাই প্রমাণ সংগ্রহে বেরিয়েছিলাম। প্রমাণও পেয়ে গেলাম হাতে নাতে।

—অথচ পৃথিবীর একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী এই যে প্রফেসার গুণ বহুদিন আগেই প্রমাণ করেছেন যে মহাবিশ্বের বুদ্ধিমান জীব মাত্রই বিভিন্নরূপে প্রকাশমান। বেশ গম্ভীর ভাবে বলে উঠলেন ডঃ সেনশর্মা। বন্ধুর ব্যবহারে বাক্যহারা প্রফেসর।

—খুব ভাল হল... আপনাদের মূল্যবান অভিমতের কথা নিশ্চয় জানাব আমাদের বিজ্ঞানীদের। বেশ উৎসাহভরে কথাগুলো বলে উঠল পিপে।

—বিদায়—বিদায় বন্ধু—আপনাদের উন্নত সভ্যতার কথা চিরদিন মনে রাখবো আমরা—

একসময়ে আকাশের বুকে অদৃশ্য হয়ে গেল অজানা বিশ্বের মহাকাশযান।

—একেবারে ডাহা মিথ্যে কথা বললে যে সেন? একটুও বাধলো না তোমার?

—যাই হোক বন্ধু, হেরে গেছ তুমি। হাসতে হাসতে বললেন ডঃ সেনশর্মা।—শুধুমাত্র আমার তোমার সকলের—বিশ্বের ইজ্জত বাড়াবার জন্য মিথ্যা বললাম। তা নয়তো কি ভাবতো বলোতে পিপেটা?

প্রথম প্রকাশ : ফ্যানট্যাসটিক, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯
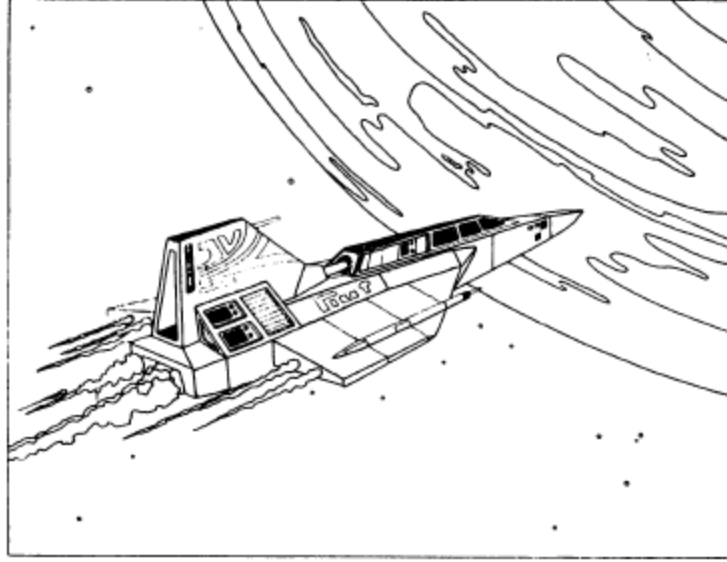
সূচিপত্রে ফিরে যান

মহাপ্রলয়ের মুহূর্তে

হরিহর প্রসাদ সাহু

বড় অদ্ভুত ব্যাপার! কিন্তু ব্যাপারটা যে কি সেটাই বোঝা যাচ্ছে না। গোটা পৃথিবীটাকেই কি ভূতে পেয়েছে? না হলে এরকম হচ্ছে কেন? মানব জাতির ইতিহাসে পৃথিবীর এই ধরনের আচরণের ত উল্লেখ নেই। হকচকিয়ে গেল মানুষ। এটা কি প্রলয়ের লক্ষণ?

এদিকে দেশে দেশে বিজ্ঞানীদের মধ্যে চলল বেতার বার্তার আদান প্রদান। ঝানু বিজ্ঞানীদের দল মাথা চুলকাতে লাগল। তাদের মুখে কথা জোগাচ্ছে না। সারা পৃথিবী জুড়ে এসব হচ্ছে কি?

গোটা পৃথিবীটা হঠাৎ অদ্ভুত ভাবে কেঁপে উঠছে। সমুদ্রের জল হঠাৎ ডাঙায় উঠে সঙ্গে সঙ্গে নেমে যাচ্ছে। বায়ুমণ্ডলে হঠাৎ ঝড়ের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তবে কি সারা পৃথিবী জুড়ে ভূমিকম্পের তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়েছে? কিন্তু তাই বা কি করে হবে? ভূমিকম্প মাপক যন্ত্র সাইসমোমিটারে রেখা ফুটে উঠলেও এটাকে ঠিক ভূমিকম্প মানে নিছক ভূমিকম্প বলে মেনে নিতে পারছেন না বিজ্ঞানীরা।

অবস্থা চরমে উঠল। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপগুলো থেকে খবর এল, সমুদ্র সেখানে ডাঙায় উঠে এসে মানুষ-জন-ঘর বাড়ী সমেত সব কিছু ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে। সারা দ্বীপে ছড়িয়ে গেছে ত্রাস। মস্কো থেকে এল আরও দুঃসংবাদ। সেখানে দুটো স্কাইক্রেপার ভেঙে পড়েছে। অনেক লোক মারা গেছে। সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। তাছাড়া বিভিন্ন স্থান থেকে সমানে ক্ষতির সংবাদ আসতে লাগল। সারা পৃথিবীতে আতঙ্কের মধ্যে বাস করতে লাগল মানুষ।

বেশ একটু জোরে হর্ণ বাজিয়ে কারটা এসে থামল একটা তিনতলা বাড়ীর সামনে। দামী কার। কারের দরজা খুলে যে বেরিয়ে এল, সেও দামী, সেটা একবার দেখেই বোঝা যায়। গায়ের রং টকটকে গৌরবর্ণ, মুখমণ্ডল থেকে আভিজাত্য সূর্যের কিরণের মতোই ফেটে পড়ছে। কার থেকে নামা এবং হাঁটার মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে ধীর স্থির ব্যক্তিত্বের পরিচয়।

হাইলাকান্দি রোড, শিলচর। এলাকাটা বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে এখানে সেখানে। তাছাড়া শিলচর নগরের সম্মান লাভ করার পর এলাকাটার দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। আলোচ্য তিনতলা বাড়ীর দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। বলে দিতে হয় না, হালেই বাড়ীটি তৈরি হয়েছে।

এদিকে বাড়ীর দোতালার একটা দরজা খুলে গেল, বোধহয় হর্ণের আওয়াজ শুনেই ভেতর থেকে একজন ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। তাঁর চেহারায়ও আভিজাত্যের পূর্ণ প্রকাশ। মেয়েকে ফিরতে দেখে মহিলার মুখে হাসি ফুটে উঠল। যাক তাহলে ফিরে এসেছে। সেই যে সকাল বেলা, 'আসছি' বলে বেরিয়ে গিয়েছিল, তারপর দুপুর গড়িয়ে গেল, মেয়ের ফেরার নাম নেই। মায়ের কি চিন্তা হয় না? মিসেস বনলতা বিশ্বাস। উচ্চ

শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা। স্বামী বেশ কয়েক বছর আগেই গত হয়েছেন। রেখে গেছেন স্ত্রী, মেয়ে সীমা, এই সুদৃশ্য তিনতলা বাড়িটি এবং প্রচুর ব্যাংক ব্যালেন্স। মিসেস বনলতাই এখন সবকিছু দেখাশুনা করছেন। এদিকে মেয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। উনি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসতে আসতে বললেন, "কি হল রে? তোর মুখ এত গম্ভীর কেন?"

"ব্যাপারটা সাঙ্ঘাতিক মা। বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা একেবারে বোকা হয়ে গেছেন। সবাই বলছেন, দু-একদিনের মধ্যে কিছু একটা ব্যবস্থা না নিলে পৃথিবীতে সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা ঘটে যেতে পারে। তাড়াতাড়ি খাবার ব্যবস্থা কর! আমি যাচ্ছি উপরে!"

খাওয়া শেষ করে সীমা তাড়াতাড়ি ওর তিনতলার ল্যাবরেটরিতে উঠে আসল। ওর চেয়ারটাতে বসতে বসতে ওর চোখ পড়ল একটা বাঁধানো ছবির উপর। দেওয়ালে ঝুলছে ওটা। একটা দাড়িওয়ালা বুড়ো। স্কুলে পড়ার সময় ভক্তি সহকারে ওই বুড়োর জন্মদিন পালন করেছে। তারপর যখন বয়স আর জ্ঞান বেড়েছে, তখন কি হিংসেটাই না করেছে বুড়োটাকে। দেখতো ব্যাপার! একটা ভাল কিছু লিখতে যাও, হবার জো নেই। আগেই দুষ্টু বুড়োটা লিখে বসে আছে। কি বিশ্রী বাপার! যখন ওর মনে কিছু পরিপূর্ণতা এসেছে তখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিশ্বব্যাপী রূপ দেখে অভিভূত হয়েছে। শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়েছে। তাই পৃথিবীর একজন সেরা বিজ্ঞানী, ডঃ সীমা বিশ্বাসের ল্যাবরেটারীতে টাঙানো রয়েছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ছবি।

ওর তন্ময়তা ছিন্ন হয়ে গেল রেডিও টেলিফোনের আওয়াজে। তাড়াতাড়ি ফোনটা ধরতেই ওপার থেকে মন্ত্রীর আওয়াজ ভেসে উঠল, "ডঃ বিশ্বাস, আরও নূতন নূতন দুঃসংবাদ আসছে। আমরা আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করছি।" প্রধানমন্ত্রীকে মোটামুটি একটা আশ্বাস দিল সীমা। কিন্তু সে বুঝতে পারল, ভিতরে ভিতরে সে বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছে। যদি কিছু করতে না পারল ত বৃথা বিজ্ঞান, বৃথা তার এই এতদিনের শিক্ষা সাধনা। কিন্তু না, সে হার মানবে না। দেখা যাক, তার আবিষ্কৃত যন্ত্র দ্বারা কিছু হয় কি না। যন্ত্রটা প্রায় তৈরি হয়েই গেছে। শুধু আলো-গতিবর্ধক যন্ত্রটাই কাজে আসছে না। চিন্তার মধ্যে তলিয়ে গেল
সীমা!

পরমাণু! কি বিচিত্র সৃষ্টি! সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নাকি এই পরমাণুর সৃষ্টি, একথাটা সীমা শুনেছে সেই যখন সে স্কুলে পড়ত। আজকালকার বাচ্চারাও জানে, পরমাণু অতি ক্ষুদ্র, ওর ব্যাস এক সেন্টিমিটারের দশ কোটি ভাগের একভাগ হলেও, ওটা একটা ফাঁকা বস্তু। ওর কেন্দ্রস্থলে রয়েছে নিউক্লিয়াস। তার চারিদিকে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরে চলেছে ইলেকট্রন। ঠিক সৌরজগতের মতো। যেন সূর্যের চারিদিকে ঘুরে চলেছে অসংখ্য গ্রহ। সৌরজগতের সঙ্গে পরমাণুর কেন এত মিল? তবে কি? ভাবতেও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত সীমা। তবে কি কোটি কোটি মাইল বিস্তৃত এই সৌরজগত-ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি পরমাণু মাত্র? কি অদ্ভুত ব্যাপার। আমরা যে নীহারিকাগুলো দেখছি, সেগুলোই তাহলে "ভুখণ্ড" বা "ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড।" সে গুলোতে যদি কোন জীব থেকে থাকে, তাদের আকারই হবে কোটি কোটি আলোকবর্ষ। তাহলে কোথায় শেষ এই ব্রহ্মাণ্ডের?

এই ব্রহ্মাণ্ডকে জানতে চেয়েছে সীমা। এমন একটা যন্ত্র আবিষ্কার করতে চেয়েছে, যার দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে চাক্ষুষ দেখা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে অসুবিধে রয়েছে দুটো। কোন বস্তু চোখে দেখা যাবে কি না, তা নির্ভর করছে অনেকটা বস্তুর আকারের উপর। একটা নির্দিষ্ট সীমার থেকে ছোট হয়ে গেলে আমরা দেখতেই পাব না বস্তুটাকে, আবার সেই বস্তুটাই যদি প্রকাণ্ড হয়, মানে যদি কোটি কোটি আলোকবর্ষ হয়। তাহলে আমাদের এই ক্ষুদ্র চোখ কি তার স্বরূপ নির্ধারণ করতে পারবে? তাই সীমা এমন একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যার দ্বারা কোন বস্তুকে কোটি কোটি "আলোকবর্ষ গুণ" ছোট করে দেখা সম্ভব হয়। কিন্তু দ্বিতীয় সমস্যার কোন সমাধান হচ্ছে না, মানে হয়েও হচ্ছে না। সেটা হচ্ছে দূরত্বের সমস্যা। নীহারিকাগুলো এতই দূরে রয়েছে যে আলোর গতিবেগে কোন সংবাদ পাঠিয়ে তার উত্তর পেতে পেতে কোটি কোটি বর্ষ লেগে যাবে। প্রথম সমস্যাটার মোটামুটি একটা সমাধান হলেও সার্কিট মধ্যে মধ্যেই ভেঙে যাচ্ছে। তাছাড়া পাওয়ার এঞ্জিনটা কি জানি কেন খুব বাধা সৃষ্টি করছে। আলোর গতিবর্ধক যন্ত্রটাও যেন এমনি ভাব করেছে, "মার আর ধর আমি পিঠ করেছি কুলো। বক আর ঝক আমি কানে দিয়েছি তুলো," কিন্তু আর দেরী করলে চলবে না। এভাবে এক সপ্তাহ চললে গোটা পৃথিবীটাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

হায়রে বিজ্ঞানগর্ব মূর্খ মানুষ! এক সপ্তাহ নয়, আর মাত্র ১২ ঘন্টার মধ্যেই মিলিয়ে যাবে গোটা পৃথিবীটা, এই গাছপালা, ফুল পাখী, এই সুন্দর সাদা মেঘে ভরা নীলাকাশ। মিলিয়ে যাবেন রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপীয়ার প্রমুখেরা। পৃথিবীর বদলে বিরাজ করবে সীমাহীন শূন্যতা।

সেই সময়ই এল একটা বিরাট ঝটকার মতো ভূমিকম্পের ধাক্কা। চেয়ার থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল সীমা। ধাক্কার চোটে চিন্তার জগত থেকে বাস্তবে ফিরে এল সীমা। অতি আধুনিক পদ্ধতিতে তৈরি তিনতলা বাড়ীটিও যেন যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল। তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে দেখল, দু-একটা বাড়ীর একাংশ ভেঙে পড়েছে। সেই সময়ই দিল্লীর বিজ্ঞান তথ্য কেন্দ্র থেকে জরুরী খবর আসল, প্রধানমন্ত্রী জানতে চেয়েছেন, এই অদ্ভুত ব্যাপারটার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং তার সমাধান খুঁজে বের করার জন্যে অনুরোধ। আরও সংবাদ এল, ইন্দোনেশিয়ায় কয়েকটি দ্বীপে সমুদ্র ঢুকে এসে ঘরবাড়ী লোকজন সব কিছুকে নিজের বুকে টেনে নিয়েছে। নিউইয়র্কের একটা বিশাল স্কাইক্রেপার ভেঙে পড়েছে। লোক মারা গেছে প্রচুর। তারপর দুঃসংবাদের পর দুঃসংবাদ।

সীমার প্রাণ কেঁদে উঠল। তাড়াতাড়ি একটা কিছু করতে হবে। তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে এসব হচ্ছে পৃথিবীর বাইরের কোন শক্তির দ্বারা। আর অপেক্ষা করা চলে না। সে ঝুঁকে পড়ল বিশাল যন্ত্রটার উপর। খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। বোতামে চাপ দিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যন্ত্রটা কাজ করতে শুরু করেছে। অদ্ভুত ধরনের টেলিস্কোপের মুখটা ঘুরিয়ে দিল কোটি কোটি মাইল দূরের তারার দিকে। এদিকে যন্ত্রটার শক্তি ক্রমে ক্রমে বাড়ছে। তাতে চোখ রাখল সীমা। আশ্চর্য ব্যাপার। একী! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ছোট হয়ে আসছে। তারাগুলো যেন কাছে চলে আসছে... আরও কাছে... একেবারে মিশে যাচ্ছে যেন।

আরে! ব্যাপার কি। যেখানে শুধু তারা দেখা গিয়েছিল, সেখানে দেখা যাচ্ছে ভূখণ্ডের মতো সীমাহীন বিশাল খণ্ড। তবে তারারা সত্যিই কি পরমাণুই? আমাদের সৌরজগতও

একটা পরমাণু? এই পরমাণু দিয়েই কি ছায়াপথ গঠিত, যেমন অণুপরমাণু দিয়ে আমাদের পৃথিবীর সৃষ্টি? একী! বিশাল বিশাল ও সব কি নড়ছে যেন। অবাক কাণ্ড! যন্ত্রের মিটারে সে দৃষ্টি রাখল। ইতিমধ্যেই কয়েক আলোকবর্ষগুণ ছোট দেখাচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের ওই অংশটিকে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

ঐ ত বোঝা যাচ্ছে। স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। দেখা যাচ্ছে, বিশাল বিশাল প্রাসাদ। আর বিরাট বিরাট সেই জীবগুলোকে। দুটি হাত, দুটি পা থাকা সত্ত্বেও কি বিশ্রী চেহারা ওই দানবগুলোর। হঠাৎ একটা বিশাল ঘরের অভ্যন্তরে দৃষ্টি পড়ল সীমার। একটা লোক একটা মাইক্রোস্কোপের ভিতর দিয়ে দেখছে একটা যন্ত্রের ভেতর। যেন এক মনে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে। যন্ত্রটার মুখ যেন তার দিকেই ঘোরানো। অভিজ্ঞ সীমা বুঝল, ওই ঘরটা একটা ল্যাবরেটরি। আর বিশাল যন্ত্রটা এটম ভাঙার যন্ত্র সাইক্লোট্রন। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিল, কি ঘটতে চলেছে। মুহূর্তেই তার গায়ের সমস্ত লোম নব্বই ডিগ্রী কোণ করে দাঁড়িয়ে উঠল। সব শেষ হতে চলেছে। বিশাল দানবটা সৌরজগতকে (যা ওর কাছে একটা রেডিও একটিভ পরমাণুর মতো) বিস্ফোরণের মাধ্যমে পরীক্ষা করতে চলেছে। বিদায় পৃথিবী। বিদায় সৌরজগত।

খবরটা তাড়াতাড়ি ও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পাঠিয়ে দিল। বিজ্ঞান তথ্য কেন্দ্র-গুলোকে অনুরোধ করল সংবাদটা গোপন রাখার জন্যে। কিন্তু কি করে সেটা ছড়িয়ে পড়ল সারা পৃথিবীতে। সারা পৃথিবীর মানুষ ভয়ে হিম হয়ে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আকুতি জানাল তাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্যে।

এদিকে সীমা কিন্তু বসে নেই। পৃথিবী তথা সৌরজগতকে বাঁচাতেই হবে। কিন্তু কি ভাবে? সেই দৈত্যটার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে হয়ত কাজ হতে পারে। বিজ্ঞানে উন্নত ঐ দৈত্য কি বুঝবে না ওর কাছে পরমাণুর চেয়েও বহুগুণ ছোট এক গ্রহবাসীর বেদনার কথা?

এদিকে দৈত্যটা এটম ভাঙার যন্ত্রটার এডজাষ্টমেন্ট করছে। সৌরজগতকে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাচ্ছে। মাইক্রোসকোপের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ওর গভীর চোখ। একটু পরেই চাপ দেবে বোতামে। তারপর মিলিয়ে যাবে সবকিছু।

সীমা বর্ণালী যন্ত্রটা চালু করল, আলোর গতিবর্ধক যন্ত্রের সার্কিটটা যুক্ত করল। কল্পনাহীন বেগে ধেয়ে গেল বর্ণালী সঙ্কেত। কিন্তু না দৈত্যটা কোন খেয়ালই করছে না। হঠাৎ সে চোখটা তুলে নিতে নিতে হাত বাড়ালো বোতামটার দিকে। সীমা চোখ বন্ধ করল। এক, দুই, তিন।...

কিন্তু না, কোন কিছুই ঘটল না। চোখ তুলে সীমা দেখল, দৈত্যটার চোখে মুখে একটা অদ্ভুত ভাবান্তর। সে ছুটে গিয়ে একটা যন্ত্র এনে ধরল সামনে, মনে হল যেন বর্ণালীর সঙ্কেতগুলো রেকর্ড করছে। তারপর আর একটা যন্ত্র (সীমার মনে হয়, অতি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র) মেলে ধরল 'সৌর পরমাণুর' দিকে। ওর চোখের দিকে তাকিয়েই সীমা বুঝে নিল পৃথিবী তথা সৌরজগত নিরাপদ। সীমার বিপদসঙ্কেত ও রেকর্ড করে নিয়েছে। বিজ্ঞানের জ্ঞানে সভ্য জীব নিশ্চয় শুনবে পৃথিবীর কান্না। অন্ততঃ তার চোখের দৃষ্টি সীমা সেটা পড়ে নিয়েছিল।

হাসি মুখে সংবাদটা চারিদিকে পাঠিয়ে দিল সীমা।

প্রথম প্রকাশ : ফ্যানট্যাসটিক, মার্চ-এপ্রিল, ১৯৭৭

সূচিপত্রে ফিরে যান

আকাশ-ঘাঁটি

লীলা মজুমদার

এক

বড়কাকা বিলেতে অ্যামেরিকায় অনেক বছর ছিলেন। কি করতেন কেউ সঠিক জানত না, তবে মাঝে মধ্যে দেশে ফিরে যে-ভাবে দু-হাতে টাকা খরচ করতেন, তাতে মনে হত কোনো লাভজনক ব্যাপারে জড়িত ছিলেন। বেশি দিন থাকতেন না, ভারত সরকারের নানান সেরেস্তায়, পরীক্ষাগারে, পারমাণবিক কেন্দ্র ইত্যাদিতে যে-ভাবে অবাধ যাতায়াত করতেন তাতেই বোঝা যেত তাঁর কাজে সরকারী সমর্থন আছে। সকলকে বলতেন সাংবাদিকের কাজ করেন, সরকারী সংবাদ সরবরাহের কোনো গুরুত্বপূর্ণ গোপন বিভাগের সদস্য। আত্মীয়-স্বজনরা এ-কথা বিশ্বাস করত না। ছোটবেলা থেকে যে এমন কৃতী-বিজ্ঞানের ছাত্র এবং উপরন্তু পাঁচটা বানান ভুল না করে যে কি ইংরিজিতে, কি বাংলাতে এক পাতা চিঠি লিখতে পারে না, সে হবে সাংবাদিক, এটা কি একটা বিশ্বাসযোগ্য কথা হল? প্রসঙ্গটা বড়কাকার কানে যেতে উনি বললেন, "কে বলেছে সাংবাদিকরা বানান করতে জানে? বানান ঠিক করে যারা দেয় ছাপার কলে কালি লাগানোর কাজ করে, তারা। আর কারো ওপর নির্ভর করা যায় না।" শুনে সবাই থ।

গত বছর অনেক দিন দেশে থেকে গেলেন, চোখে-মুখে কেমন একটা উদ্বিগ্ন ভাব-ও দেখা গেল। যারা ওঁর কাছ থেকে সব চাইতে বেশি টাকা ধার করেছিল, তারা বলাবলি করতে লাগল, "টাকা বেচে, গাঁজা চালায়, বেনামায় বড় বড় ব্যবসা করছে, এখন মিসার ভয়ে চোখে-মুখে পথ দেখতে পাচ্ছে না। যারা সাফল্যলাভ করে তাদের সম্বন্ধে লোকে যেমন বলে থাকে।

শেষটা হল, ঘোতন একদিন চেপে ধরল। বড়কাকা তাদের কখনো কানাকড়িও দেন নি। দুজনে দুটি মাস্তান। স্কুল ফাইনেল-ও পাস করেনি। বাড়ির লোকে ওদের দেখলে নাক সিঁটকায়, সদাই এর বাড়ি ওর বাড়ি খাবার তালে থাকে, তারা পঞ্চাশ-ষাটটা করে পয়সা দিয়ে বিদায় করে দেয়। বলে, এ বেলা হাঁড়ি চড়েনি, বড় খারাপ দিন যাচ্ছে। তবু এই তাগড়াই চেহারা দুজনার, কালীঘাটের আখড়ায় কুস্তি করে, বুক-ডন দেয় একনাগাড়ে পঞ্চাশটা, পিটোনো শরীরে নুড়ির মতো শক্ত গোল মাংসপেশী। বড়কাকা তাদের সঙ্গে কথাটথা কইতেন না, ওরাও ওঁকে এড়িয়ে চলত। তবে মনে ভয়-ডর ছিল না, কলেরার সেবা করত, বে-ওয়ারিশ মড়া পোড়াত, শ্মশান ঘাটের সিঁড়িতে বসে ভাঁড়ে করে চা খেত। গালগল্প করত।

বড়কাকার শুকনো মুখ দেখে একদিন কাছে গিয়ে হুলো বলে বসল, "অমন শুকনো মুখ দেখলে পিত্তি জ্বলে যায়। যার পকেট ভরা পয়সা তার মুখ শুকনো কেন? কিছু কাজ থাকে তো বলুন।"

বড়কাকা ভুরু কুঁচকে ওদের অখাদ্য চেহারার দিকে তাকালেন। আধময়লা নস্যির রঙের আঁটো পেন্টেলুন আর লাল নীল বকড়া-বকড়া শার্ট, পায়ে নোংরা কোলাপুরী চটি। ঘাড় অবধি লম্বা ঝাঁকড়া চুল, অনেক দিন চানটান করেনি।

আশ্চর্যের বিষয়, বড়কাকা আগে কথা বললেন, "তোমরা বড় বাড়ির ছোট মামার নাতি না?" "আজ্ঞে হ্যাঁ, বড়কাকা।" বড়কাকা বললেন, "স্নান কর না কেন? নোংরা লোককে কাজ দিলে আমার অখ্যাতি হবে।" ওরা বলল, "আর কাপড়-চোপড়ও নেই, স্যার, তাই স্নান করার অসুবিধা আছে।"

বড়কাকা ওদের বিষয়ে নানান কথা শুনেছিলেন। বেশির ভাগই নিন্দা। বললেন, "ভয়-টয় পাওনা তো?" হুলো উৎসাহের সঙ্গে বলল, "না স্যার, অব্যর্থ গুলতি যার, তার আবার ভয় কিসের?" "এই ধর পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়মের বাইরের জিনিসকে ভয় কর না তো?" এবার ওরা একটু ঘাবড়ে গেল। এ-ওর মুখের দিকে চাইল। ঘোতন বলল, "ভ-ভূতের কথা বলছেন? তাহলে কিন্তু ওর মধ্যে আমরা নেই, এই পষ্ট কথা বলে দিলাম।" বড়কাকা আকাশ থেকে পড়লেন, "বল কি! তোমাদের মতো আধুনিক ছোকরা, যারা মা বাপকে পর্যন্ত স্বীকার কর না, তোমরাও ও-সব মান?" ঘোতন একটু উষ্মার সঙ্গে বলল, "কালীবাড়ীর উত্তরে বড় বাঁশঝাড়ে একা রাত কাটাতে আপনি রাজি আছেন?" কাষ্ঠ হেসে বড়কাকা বললেন, "না রাজি নই। তবে সে অন্য কারণে। আত্মহত্যা আমার উদ্দেশ্য নয়। সে থাক গে, আমি যেখানকার কথা বলছি, সেখানে ও-সব ভয় নেই। ছিলই না কিছু কোথাও কোনোকালে, তা ভূতে ভর করবে কিসে? বিশ্বাস কর, বুধ-গ্রহের কাছাকাছি গিয়ে দেখেছি, কোথাও ভূতের পায়ের কড়ে আঙুল রাখার জায়গা নেই। সব শূন্য খাঁ-খাঁ করছে।"

ওরা এ-ওর মুখের দিকে তাকাল, গলা খাঁকরাল, মুখে কিছু বলল না, চলেও গেল না। বড়কাকা ইদিক-উদিক চেয়ে, গলা খাটো করে বললেন, "আসলে আমার বেশ কিছু দিনের মতো গা-ঢাকা দেওয়া দরকার। কোথায় পালাব, ভেবে পাচ্ছি না।" আড়চোখে তাকিয়ে দেখেন ওদের চারটে কানই খাড়া। "ইয়ে, একটা জায়গা আছে বটে, তবে সেখানে একা যাওয়া যায় না।" ওর চুলবুল করে উঠল, "আবুধাবি বড়কাকা? নৌকো আনতে হবে? এতক্ষণ বলেন নি কেন?"

কথা হচ্ছিল আদিগঙ্গার ধারে, ইঁটের গাদার পাশে। বড়কাকা ফোঁশ করে নিশ্বাস ছেড়ে, ইঁটের ওপর বসে পড়লেন। সেগুলো যে বিশ্রীভাবে নড়বড় করতে লাগল, তাও খেয়াল করলেন না। হুলো, ঘোতন দুজন দুটি ইঁট পেতে ওঁর পায়ের কাছে, গঙ্গার দিকে পিঠ করে বসে পড়ল। বড়কাকা সোজা ওদের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "কারো কাছে প্রকাশ করিসনে, কিন্তু শুনে রাখ, আমি সাংবাদিক-টাংবাদিক নই, আমি মহাকাশচারী!" শুনে ওরা এমনি চমকে গেল যে শূন্যে দু হাত লাফিয়ে উঠে, নামবার সময় হুলোর ইঁটে ঘোতন, ঘোতনের ইঁটে হুলো পড়ল, অথচ কেউ টের পেল না, বড়কাকা ও না। তিনজনারই গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।

হুলো রোজ আধ পো করে কাঁচা ছাগলের দুধ খেত, কিনে নয়, তার পয়সা পাবে কোথায়? ঠাকুরবাড়ির পুরুতমশায়ের ছাগলটাকে লুকিয়ে দুইত—তাই ওর উপস্থিত বুদ্ধি

ছিল সব চাইতে বেশি। সেই আগে কথা বলল, “ক্-ক্-ক্-ইয়ে-ব্-ব্-ব্-?” বড়কাকা বললেন, “ঠিক তাই। বিস্ময়কর বটে। অবিশ্বাস্যও বলতে পার। একেবারে লোমহর্ষক ব্যাপার। সব কথা বলছি, মন দিয়ে শোন। মধ্য ইউরোপের একটা রাজ্যে আমার কর্মস্থল। সেখানে পাহাড়ের অগম্য উঁচু চুড়োয় আমরা সাফল্যের সঙ্গে—” ঘোতন আর নিজেকে চাপতে না পেরে বলল, “রকেট বানান বুঝি?”

বড়কাকা কাষ্ঠ হাসলেন, “রকেট? রকেটকে আমরা খেলনা বলি। আমাদের বিশেষত্ব হচ্ছে আকাশ-ঘাঁটি! আকাশ-ঘাঁটি কি বুঝলি তো? যাকে বলে স্পেস্-স্টেশন। সাধারণ স্পেস্ স্টেশন নয়, সে তো আমেরিকা, ফ্রান্স ও রাশিয়া, যে-যা খুশি বানাতে পারে। আমাদেরগুলো একেবারে স্বয়ংক্রিয়।”

বলতে বলতে উত্তেজনার চোটে উঠে দাঁড়ালেন বড়কাকা, “সে তোরা ভাবতে পারি না। সব আপনা থেকে হয়, জল তৈরি হয়। কেন, তাতে অবিশ্বাসের কি আছে? এই পৃথিবীটাতে তো আর অন্য জায়গা থেকে জল আসে না, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মেঘ উঠছে, বিষ্টি হচ্ছে, মাটিতে জল শুষে নিচ্ছে, আবার ঝরণা হয়ে বেরুচ্ছে, নদী হয়ে ছুটছে—কই তোরা তো কেউ আশ্চর্য হচ্ছিস না? আকাশ ঘাঁটিতেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঐ সব হয়। গাছপালা গজায়, বাড়ে, ফুলফল ধরে, শুকোয়, মরে, পাখি ওড়ে, হরিণ চরে, গোবরটোবর রি-সাইকেল্ হয়। আকাশ-ঘাঁটির জন্তু-জানোয়ার যেমন বাড়তে থাকতে, আকাশ-ঘাঁটিও মাপে বড় হতে থাকে।”

হুলো বলল, “ধেৎ?”

বড়কাকা বললেন, “বিশ্বাস না করলে কি করতে পারি? শূন্যটাকে কি তোরা একেবারে শূন্য ভাবিস? মোটেই তা নয়। কোটি কোটি বছর ধরে ধ্বংস হয়ে যাওয়া গ্রহ-নক্ষত্রের অতি মিহি গুঁড়ো ধুলোর মতো ভেসে যাচ্ছে। মহাকাশ থেকে সেগুলোকে সংগ্রহ করে আকাশ-ঘাটি ক্রমে মাপে বড় হতে থাকে। আমি পাঁচ বছর আগে শেষ যা দেখেছিলাম, তারপর নিশ্চয়ই এত বেড়ে গেছে যে চেনা দায় হবে। আর সব চাইতে ভালো কথা, গা-ঢাকা দেবার এমন জায়গা আর নেই। পাখিরা, হরিণরা সত্য হলেও, মানুষরা সবাই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র চালিত এবং খুব ট্যাঁকসই ফোম-রবারে তৈরি। সব কথা বোঝে কিন্তু কোনো কথা নিজের থেকে বলে না, প্রশ্ন করলে ইঙ্গিতে উত্তর দেয়। সেখানে আমরা একেবারে নিরাপদ। আমার নিজস্ব একটা ছোট বাড়িও আছে, একটা স্বয়ংক্রিয় চাকর রাখা যাবে—।”

হুলো, ঘোতন অবিশ্যি এ সমস্তর একটি কথাও বিশ্বাস করেনি। খালি জিজ্ঞাসা করেছিল, “আমাদের কি দেবেন?”

‘কি দেব? চিরকালের মতো তোদের সব অভাব ঘুচিয়ে দেব। আবার যখন ফিরে আসবি—।”

ওরা বাধা দিয়ে বলল, “ফিরে এলে আমাদের চলবে না। আজ রাতে পুরুতঠাকুরকে পেটাবার পর এ জায়গাটা আমাদের পক্ষে বড় বেশি গরম হয়ে উঠবে।—কিন্তু ঘাঁটিটা কাদের, আমাদের থানার কারো নয় আশা করি। শেষটা আমাদের ধরিয়ে দেবেন না তো?”

বড়কাকা হতাশ হলেন। "বলছি মধ্য ইয়োরোপে অগম্য এক পাহাড়ে তৈরি হয়েছে।"

"আপনি করেছেন? কে টাকা দিল?"

"আহা, তোদের তো বড় বেশি সন্দেহ বাতিক দেখছি!" ওরা বলল, "যারা প্রাণ হাতে নিয়ে ঘোরে, তাদের সন্দেহ বাতিক থাকবে না তো কি থাকবে?" "বেশ। শোন তবে। করিগা আর বিনো নামে দুই সায়েব ওটাকে বানায়।"

"কে টাকা দিল?"

"কি জ্বালা! কেউ দেয়নি। ওদের ছিল। ওরা ওটাকে বানিয়ে মহাকাশে ছেড়ে দিয়েছিল পাঁচ বছর আগে। সেই ইস্তক ঘুরছে তো ঘুরছেই আর যতই ঘুরছে ততই শক্তি জমছে, স্বয়ংক্রিয়ের উন্নতি হচ্ছে। বলছি কি তোদের, অমন আরামের গা ঢাকা দেবার জায়গা কোথায় পাবি?"

হুলো বলল, "মালিকরা যদি গিয়ে হাজির হয়?" হাসলেন বড় কাকা, "আরে কাগজে পড়িসনি, বড় বেশি বিজ্ঞান করতে গিয়ে তারা আইফেল টাওয়ারের চুড়ো থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছিল।" আর একটিমাত্র প্রশ্ন করেছিল হুলো, "তাহলে আপনি কি করতেন?" বড় কাকা অবাক, "কেন, স্ক্রুপ আঁটতে হত না, এখানে-ওখানে রিভেট করতে হত না? একটা স্ক্রুপ ঢিলা থাকলেই তো হয়ে গেল! আমার কাজ বৈজ্ঞানিকদের কাজের চাইতে কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তাছাড়া ওঁরা দুজনেই সমান ভুলো। এই ফরমূলা তৈরি করছেন তো এই ভুলছেন, এই জটিল সমস্যার উত্তর খুঁজে বের করছেন তো এই সেটাকে ভুলে যাচ্ছেন। আমাকে সব মনে করে রাখতে হত। লিখে রাখবার হুকুম ছিল না, পাছে শত্রুদের হাতে পড়ে। জানিস তো সব বিজ্ঞানীদের শত্রু হল বাকি সব বিজ্ঞানীরা। ওঁরা কাউকে বিশ্বাস করতেন না, পাহাড়ের চূড়ায় আমরা তিনটি প্রাণী আর আমাদের তৈরি গুটি পনেরো স্বয়ংক্রিয় ফোমরবারের রোবো ছাড়া জনমনিষ্যি ছিল না। এরি মধ্যে দুই সন্দেহবাতিক পণ্ডিত আইফেল টাওয়ারে চড়ে কি বাহাদুরি করতে গিয়ে নিখোঁজ নি-পাত্তা হয়ে গেলেন! আমাকে পর্যন্ত কিছু বলে গেলেন না আর নিজেরাও নিশ্চয় ভুলে মেরে বসে আছেন। তাই পাহাড়ের চুড়োর নিরাপদ আস্তানায় ফিরতে পারছেন না। সে দিক দিয়ে বলতে গেলে আমিই ওঁদের একমাত্র ওয়ারিশ বলতে পারিস।"

হুলো, ঘোতন বলল, "এ্যাঁ, একেবারে একা একা পাহাড়ের মাথায়!" "হ্যাঁ, তাই! মানে প্রায় তাই। যাক, সে আর জানতে চাসনি, এখন যাবি কি না বল?"

"কিসে করে যাওয়া হবে তাহলে?"

"কেন, এ দেশেই একটা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে, তারা সরকারী সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় রকেট বানাবার চেষ্টা করছে। আমিও তাদের পার্ট-টাইম গবেষক। একটা নতুন ধরনের রকেট দিয়ে স্পেস-স্টেশনের সার্ভিসিং করা চলবে কিনা পরখ করতে হবে। তা কেউ যেতে চায় না। শেষটা আমি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যাব বলেছি, যন্ত্রপাতি খরচপত্র ওরা দেবে, আমার নিজের দুজন সহকর্মী নিয়ে যাব, তাদের মাইনে বাবদ তিন হাজার টাকা দেবে—কি বলছিস?" হুলো বলল, "আগাম দিলে ভালো হয়, এখানে কিছু দেটেনা করে ফেলেছি।" বড় কাকা ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে, তারপর মুচকি হেসে বললেন, "তাই দেব। তবে সবটা দেব না। একেকজনকে পাঁচশো দিলে চলবে না? ধর যদি পরে ফিরেই

এলি, শেষটা তখন—”। ওরা দুজন বড়কাকার মঙ্ক-শু’র নাকে কপাল ঠেকিয়ে গড় করে বলল, “খুব খুব চলবে। অত টাকা চোখেও দেখিনি কখনো!”

বড়কাকা মনিব্যাগ থেকে কয়েকটা নোট বের করে ওদের হাত দিয়ে বললেন, “বুড়োকে আস্তে পেটাস, মরেটরে গেলে ফ্যাসাদে পড়বি। যাবার আগে অশুভ কাজ করিসনি। এই দিয়ে দুটো করে প্যান্ট শার্ট, ১ জোড়া ক্যাম্বিশের জুতো, মোজা, গেঞ্জি কিনিস আর রাতে ভালো করে খাস।”।

বড়কাকা সকলকে বলে কয়ে, যা টাকাকড়ি দেবার দিয়ে, মাঝারি সুটকেসাটি হাতে করে শনিবার সন্ধ্যার দিকে রওনা হয়ে গেছিলেন। হুলো ঘোতনের অন্তর্ধানের ব্যাপার কেউ লক্ষ্যই করেনি। কোথায় কোন্ বদমাইসি করতে গেছে দুই বাউণ্ডুলে তাই নিয়ে কার-ই বা মাথা-ব্যথা! হুলোর বাপ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বরং বললেন, “হয় চাকরি নয় ফাটক। যাই হোক, অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।” তাঁর বড় দিদি ঘোতনের মা শুধু বললেন, “ওনার মনিব্যাগটা ফাঁক করে দিয়ে গেল না কেন তাই ভাবছি।” পরে অবিশ্যি পুরুত ঠাকুরকে ঠেঙানোর কথা রাষ্ট্র হলে সবাই ব্যাপারটা বুঝতে পারল। আসল কারণ কেউ সন্দেহও করল না।

সত্যি কথা বলতে কি নতুন কাপড় চোপড় পরে, চুল ছেঁটে, স্নান করে, দাড়ি কামিয়ে, হাতে নতুন পিজবোর্ডের সুটকেস নিয়ে ওদের চেনে কার সাধ্য। একটু গোলমাল বেধেছিল। ওরা কিছুতেই ওদের পোষা একজোড়া শিং-ওয়ালা গুবরে পোকাকে রেখে যেতে রাজি হল না। “ও বাবা! ওরা হল গিয়ে আমাদের ম্যাস্কট্। ভোমরার পেটে যেমন দত্যিদের প্রাণ থাকত, অনেকটা তাই। ওদের ফেলে গেলে ওদের কেউ মাড়িয়ে দেবে, কিম্বা শিং ভাঙবে, কিম্বা সাংঘাতিক কিছু হবে! ওরা না গেলে, এই আমরাও রইলাম। ওঠ ঘোতন।”

বড়কাকা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, “কি জ্বালা, নেব না বলেছি নাকি? তবে পকেট থেকে যেন বেরটের করিস নে। এক দিক দিয়ে ভালোই হল, ওখানে একটা নতুন জীব দেখা যাবে।”

কিভাবে গোপন ঘাঁটিতে পৌঁছল, সেখানে একটু যেন আলগোছে ওদের ব্যাগট্যাগ দেখিয়ে, ছোট্ট একটা পলকা রকেটে চেপে, তিনজনে কিভাবে রওনা হয়ে গেল, নিরাপত্তার প্রয়োজনে সে-বিষয়ে কিছু না বলাই ভালো। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে কত ছোট একটা থলির মধ্যে স্বয়ংক্রিয় রকেটটাকে ভাঁজ করে ভরে ফেলা যায়, দেখে ওরা একেবারে হাঁ। স্বয়ংক্রিয় চালকটি একটা টেলিফোনের মতো ছোট একটা সুইচ টিপলে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। ওরা একটা ছোট সরকারি স্পেস স্টেশনে নেমে তার সার্ভিসিং করবে। পৃথিবী থেকে সমস্ত যাত্রাপথ কনট্রোল করা হবে। সেখানকার কাজ শেষ হলে, সুইচ টিপে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে। কনট্রোল সেন্টারের লোকরা ভাববে যান্ত্রিক গোলযোগ হয়েছে, “বাগচি ঠিক করে নেবে’খন, স্পেস স্টেশনে প্রাণধারণের ব্যবস্থা আছে। ওদের জন্য কেউ মাথা ঘামাবে না। ওরা সেই সুযোগে আকাশ-ঘাঁটিতে পৌঁছে যাবে। সেখানে কি আরাম, কি নিরাপদ, কোনো শা—।” এই অবধি বলে বড়কাকা থেমে গেছিলেন। তবে বাকিটা ওরা বুঝে নিয়েছিল। এবং সম্পূর্ণ সমর্থন

করেছিল। সাত বছরের অবিরাম মাস্তানির ফল থেকে এমন সহজ উপায়ে যে ওরা নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে, এ ওদের স্বপ্নের বাইরে ছিল। তথাকথিত স্যাঙাৎরাও খোঁজ করবে না। তারা জানে পুরুৎ ঠেঙ্গিয়ে বাছাধনরা হিমালয়ের বুকে নিখোঁজ হয়েছে। ওদের নামে থানায় খাতা খোলা হয়েছিল, কিছুদিন বাদে সে খাতাও নিশ্চয় বন্ধ করা হবে। ভেবেও এত আনন্দ হচ্ছিল যে পকেটে হাত ঢুকিয়ে গুবরের গায়ে হাত না বুলিয়ে পারল না। গুবরেরাও খুনি কুট কুট করে মোক্ষম কামড় দিল। রকেটের নাম ভেজালি! ভালো নাম না? হুলোর দেওয়া নাম। বড়কাকা বলতেন আর-এস থ্রি। তবে জিনিসটা বড়ই পলকা, ওটা যে মহাকাশ পেরিয়ে তিনজনকে নিরাপদে যথাস্থানে নিয়ে যাবে সহজে বিশ্বাস হচ্ছিল না। তবে নাকি পোড়েও না, টোল-ও খায় না, বেজায় শক্ত, অথচ কাগজের চাইতে হাল্কা, আকাশে উড়লে দূরবীণ লাগিয়েও কারো ঠাওর হওয়া শক্ত। সরকারি স্টেশনে ছোট একটা যন্ত্র লাগিয়ে নিয়ে আকাশ-ঘাঁটি পর্যন্ত বড়কাকাই রকেট চালিয়ে নিতে পারবেন। ওঁর কারখানায়, একরকম ওঁর হাতেই তৈরি।

তাজা বাতাসের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা থাকলেও শুধু বড়ি খেতে খেতে যাওয়া। বড়িগুলোর একেকরকম স্বাদ, পেট-ও ভরে; কিন্তু ওকে কি কেউ খাওয়া বলে? দাঁতের ফাঁকে পর্যন্ত কিছু লেগে থাকে না। আর বাইরে কি অন্ধকার! তবে পরদা টেনে টেলিভিশনে আশ্চর্য সব ছবি দেখাতে দেখাতে নিয়ে চললেন বড়কাকা। তাছাড়া বুধ শুক্রের মতো দূরে তো আর নয়, দেখতে দেখতে পৌঁছেও গেল ওরা। নামল যখন ওরা তখন ঘুমিয়ে ছিল, এতটুকু ঝাঁকি দিল না, কিছু না। জেগে দেখে মনে হল বুঝি বিশাল একটা কিছুর ছাদে চেপে রয়েছে ওরা। আর রকেটের নিচে চোরা দরজা খুলে, সিঁড়ি দিয়ে সুটকেস হাতে বড় কাকা নেমে যাচ্ছেন। ওরাও নিজেদের বাক্স নিয়ে নেমে পড়ল। এই স্পেস্-স্টেশনও নাকি বড়কাকা দের তৈরি।

ছাদের ওপর উকুনের মতো আটকে রইল রকেট, ওরা নেমে গেল। বড়কাকা বললেন, "এখানে কোনো লোকজন থাকে না। যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, প্রচুর খাবার দাবার, জল তৈরির বন্দোবস্ত মজুত থাকে, ওষুধপত্র থাকে। মহাকাশে কেউ বিপদে পড়লে, এখানে এসে সাহায্য পেতে পারে, ক্লান্ত নভোচারীরা বিশ্রাম করতে পারে। আমরাও এখানে আট দিন থাকব, সমস্ত যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করব, রাঁধব-বাড়ব, খাব-শোব, একটু হাঁটা-চলা করব।" হুলো খুশি হয়ে বলল, "হ্যাঁ, গত দুদিন উকি-বুকির যে কি অমানুষিক কষ্টে কেটেছে, সে আর কি বলব! বেচারিরা একটু চলে ফিরে বেড়াতে পারবে!" এই বলে পকেট থেকে পেয়ারের গুবরে দুটোকে ওরা বের করল। দেখে বড়কাকার চক্ষু স্থির!

"ওরে, ছাড়িস নে, ছাড়িস নে, সর্বনাশ করবে। হাঁটাতে হলে পায়ে দড়ি বেঁধে হাঁটা। দাঁড়া, আমি দিচ্ছি।" বড়কাকা নাইলনের সুতো আর কাঁচি দিলেন, স্বচ্ছ দেয়ালের একটা খোপ থেকে বের করে। ওদের বিস্ময় দেখে একটু খুশি না হয়েও পারলেন না। বললেন, "দেখছিস তো, সাধারণ জীবন-যাত্রার সব ব্যবস্থাই এখানে আছে, মায় গা-বমির ওষুধ পর্যন্ত, কারণ সবাই এসে প্রথমেই বেজায় সাঁটায়।"

চ্যাপ্টা গোল মতো জিনিসটা, হাল্কা পাৎলা কোনো জিনিসের তৈরি। মস্ত একটা গোল হল-ঘরের মতো। তাতে খোপ খোপ ভাগ করা, কোথাও যন্ত্রপাতি, কোথাও দূরবীক্ষণের

মতো কি-সব, কোথাও বড় বড় ড্রাম, কোথাও ছোট ছোট শিশি বোতল, সব যথাস্থানে বসানো, নড়বার চড়বার জো নেই! হল-ঘরের মধ্যিখানে মোটা একটা লম্বা মতো ছাদ অবধি উঠে গেছে। তারি ভিতর সিঁড়ি, তার দুদিকে দুটো লক্ গেট। মুখ্যু ছেলে ওরা, এর বেশি কিছু বুঝল না। বড়কাকা বললো নাকি সারাক্ষণ স্পেস-স্টেশন লাট্টুর মতো পাক খায় আর শক্তি সঞ্চয় করে, পাক না খেলে উল্টেও যেতে পারত। ভিতরে এক রকম মাধ্যাকর্ষণ আপনা থেকে তৈরি হচ্ছে। তাই ওরা সাধারণ পোশাকে চলছে ফিরছে। সূর্য শক্তিতে সব কাজ হচ্ছে। তাজা বাতাস তৈরির স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আছে।

দেখে দেখে ওরা তাজ্জব বনে গেল। ওদের যথেষ্ট কাজ দিলেন বড়কাকা, সাফসুফ, তেল লাগানো, আর সব চাইতে বড় কাজ রাঁধা বাড়া, তাতে ওদের কোনোই আপত্তি ছিল না, ছোট ছোট টিনে করে মালমশলা এনেছিলেন বড়কাকা, তারি এটা ওটা মিলিয়ে সে কি ভোজ! শুধু ভাতটাই মামুলী নিয়মে রান্না হত। গুবরেরা মনের সুখে দাপদাপি করে বেড়াত, পায়ে সুতো বেঁধে। বড়কাকা থেকে থেকে বলতেন, "খবরদার, এক কণা গুবরের গোবর দেখি তো ওদের ঠ্যাং ধরে বাইরে ফেলে দেব। সব জড়ো করে ঐ টিনে রাখবি। মেশিন দিয়ে ঐ থেকে দুধটুধ তৈরি হবে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে।"

দুই

পরে হুলো ঘোতন বুঝেছিল যে এতদিন থাকার একমাত্র কারণ ওদের একটু তালিম দিয়ে নেওয়া হলে ওখানকার কাজ দুদিনেই হয়ে যেত। এই কদিন পৃথিবীর সঙ্গে যোগ ছিল, কথাবার্তা চলত, রিপোর্ট দেওয়া হত, টিভি দেখা যেত। আট দিনের দিন বড়কাকা সুইচ তুলে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। ওদের দুজনার যা ভয়! "সত্যি বলছি, বড়কাকা যে-দিন পাকুর দল এক-নলা দিয়ে আমাদের নৌকোর পাছু ধরেছিল, সেদিনে এত ভয় পাইনি।" "ভয়টা কিসের শুনি?" "বাঃ ভয় পাব না? ওরা তিন পুরুষ ধরে নৌকো নিয়ে আবু ধাবির ওদিকে কার সঙ্গে কারবার করে এসেছে। ওদের পূর্বপুরুষরা ওয়ারেন হেস্টিংসের রসদ জোগাত। এখন যখন কেউ বলে যে তখন নাকি বিলেত থেকে আসতে এক বছর সময় লাগত, পাকুরা হাসে।"

বড়কাকা গলা খাঁকরে বললেন, "তোদের সঙ্গে খুব ভাব বুঝি?" ওরা শুনে হাঁ! "ভাব! তা এক দিক দিয়ে বলতে পারেন ভাব। তিনশো বছর ধরে বদলা নিয়ে নিয়ে, কেমন একটা নিজের লোকের মতো হয়ে গেছে ওরা।"

বড়কাকা চটে গেলেন, কি যে বলিস বদলা নিয়ে নিয়ে! আমাদের গুষ্টির কজনকে— মানে, বদলা নিয়েছে?" "আহা, আপনাদের নেবে কেন? দলের ব্যাপার এটা?" "হুঁ, এখন বুঝতে পারছি, কেন তোদের আকাশ-ঘাঁটিতে যাওয়ার এত তাড়া। ভালোই হল, দুটো পারমানেন্ট লোক পাওয়া গেল। এই বড়ি দুটো খেয়ে ফেল, মাথা ঘুরবে না।"

ততক্ষণে স্পেস-টেশনে তালাচাবি দিয়ে ওরা রকেটে চড়ে রওনা দিয়েছিল। চারিদিক থেকে অন্ধকার যেন পাক খেয়ে এদের গিলে ফেলতে এল, রকেটের আলো-ও কিরকম ঘুরতে লাগল। ব্যস, আর কিছু মনে নেই। ঘুম যখন ভাঙল, 'ভোজালি' কখন আকাশ-ঘাঁটির পেটের তলার ফটক দিয়ে ঢুকে, আস্তাবলই হক, কি গ্যারাজই হক, কি

গোয়ালঘরই হক, সেইখানে নিরাপদে আশ্রয় পেয়েছে। আট জন স্বয়ংক্রিয় কর্মী, তার সার্ভিসিং-এ লেগে। বড়কাকা নেমে গেছেন।

টুপ করে আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। তবে কি ওরা মরে গিয়ে স্বর্গে চলে এসেছে? স্বর্গেই বা আসবে কেন? এই নাকি আকাশ ঘাঁটি। কই এর যে কোনো ঘেরাটোপ দেওয়া নেই? সময়টা বোধ হয় সকাল, মাথার ওপর ডোমের মতো কৃত্রিম ছাদের বদলে কোমল নীল আকাশ, পুব দিকে সূর্য উঠেছে, চার দিকে গাছপালা, বাড়িঘর, হরিণ চরছে, কুকুর ডাকছে, ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ লাল নীল তোতা পাখি উড়ছে। ওরা ভোজালি থেকে বেরিয়ে এসে, আস্তাবলের বাইরে দাঁড়াল।

দলে দলে ফোম রবারের যন্ত্র-মানুষ কাজে ব্যস্ত, কারো মুখে কথা নেই। ওদের তো কথা বলবার জন্য তৈরি করা হয়নি। তবে কাজের কথা নাকি সব বোঝে। একজন যন্ত্র-মানুষের বুকে পিঠে দশ নং লেখা, ওদের বোধহয় নামটাম নেই। হুলো তার সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "স্যার কোথায়?" সে আঙুল তুলে দূরে দেখিয়ে দিয়ে, আবার ঘাসজমি থেকে আগাছা তুলে একটা টুকরিতে রাখতে লাগল। আশ্চর্য বটে, চেহারা দেখে কে বলবে মানুষ নয়! অবিশ্যি মানুষরা এত কাজও করে না, এত চুপ করে থাকে না।

সেদিকে তাকাতেই মনে হল একটা ফিল্মের শহরে এসেছে। কি সুন্দর ছোট বড় বাড়ি, তকতকে পথঘাট, তাতে এক কণা ধূলো নেই, এই দেশটার কোথাও ধুলো নেই। দেশই তো, ছোট বেলায় স্বপ্নে দেখা একটা দেশের মতো। এখানে ধুলো উড়লেই যন্ত্র-মানুষরা নিশ্চয় সেগুলো সংগ্রহ করে কাজে লাগায়। যন্ত্ররা কথা না বললেও, নানা রকম ভালো শব্দ, ঘাস-ছাঁটার কলের শব্দ, কানে এল। জল ঝরার শব্দ, গাছের পাতায় বাতাস বওয়ার শব্দ, জন্তু জানোয়ারের ডাক আর মনে হল কোথাও রেডিও চলছে। সামনের একট। ছোট বাড়ি থেকে বড়কাকা বেরিয়ে এলেন, মুখে তাঁর দুশ্চিন্তার ছাপ।

"কি হল বড়কাকা? যন্ত্ররা বুঝি জিনিসপত্রের যত্ন করে নি?"

"নাঃ—বরং বড় বেশি যত্ন করেছে। যে-সব কাজ শেখানো হয়নি, তাও করে রেখেছে। ভাড়ার ঘরের তাক দেখছি জ্যাম, জেলি, আচার, বিস্কুটে ঠাসা। আর—আর লোকজনও যেন একটু বেশি বেশি মনে হচ্ছে।"

হুলে বলল, "ভালোই তো। আরো ভালো কাজ হবে। আকাশ ঘাঁটি মাপে বড় হয় বললেন, আর তার বাসিন্দারা সংখ্যায় বাড়তে পারে না? ফলপাকুড় খাবার লোক নেই, তাই জ্যাম জেলি করে রেখেছে, ভালোই করেছে।"

"কিন্তু শিখল কোথায়?"

"নিজেরাই বের করে করেছে। মানুষরা প্রথম যেমন করে শিখেছিল। এখন গুবরেদের ছাড়ি?"

যতই দিন যেতে লাগল ওদের ওপর উল্টো রকম ফল হতে লাগল। হুলো ঘেতনকে পায় কে! যদি স্বর্গ না হয় তো স্বর্গ কাকে বলে ওরা ভেবে পেত না। অবিশ্যি ওদের কতটুকুই বা বিদ্যেবুদ্ধি, তাই দিয়ে বুঝত-ই বা কি? তবে বড়কাকার কথা আলাদা এবং তাঁর ওপরেই উল্টো ফল দেখা দিতে লাগল। ক্রমে আরো বেশি গম্ভীর আর খিটখিটে হয়ে যেতে লাগলেন। ওদের সঙ্গে না নিয়ে বেরোতেন না। তাতে ওদের কোনোই আপত্তি ছিল

না। মুখ্য মানুষ, একজন কেউ এখানকার তাজ্জব ব্যাপার বুঝিয়ে না দিলে তো অর্ধেকের বেশি অজানাই থেকে যাবে।

বড়কাকা বললেন, "এখানকার সব কিছু প্রাকৃতিক জগতের মতো করে তৈরি করা হয়েছে, তবে বলা বাহুল্য তার চাইতে ঢের ভালো করে। আসল জিনিস কি আর কখনো নকলের মতো ভালো হয়? এখানে ঝড়, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড, কিছুর স্কোপ রাখা হয়নি, বুঝলি। অথচ নিয়মিত ছয়টা ঋতু আসে যায়, আগুন লাগার জন্য দাহ্য পদার্থ চাই, সে-সব কিছু নেই। কাপড় চোপড়, পরদা, বিছানা, ফোম রবারের নকল মানুষ সব, অগ্নি-নিবারক জিনিস দিয়ে তৈরি। পোড়াতে হলে শুধু এক ঐ রান্না বান্না পোড়ানো যায়। তাও দেখেছিস তো, স্টোভের মধ্যে বিশেষ নিরাপদ গ্যাস, আর স্টোভের পাশে যে নীল রঙের নল আছে, সেটা খুলে দিলেই কিছুতে আগুন ধরে গেলেও তখনি নিবে যাবে। আর সব চাইতে ভালো কথা হল যে এখানে কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। হিংস্র জানোয়ার নেই, মানুষগুলো ফোমরবারে তৈরি, কলে চলে, কথা বলে না—তা অশান্তির সৃষ্টি করবেটা কে? কোনো ঝগড়া-ঝাঁটি নেই, দলাদলি নেই, কড়া কথা নেই—ওকি?"

ওরা দুজনও কান খাড়া করল, দূরে একটা হল্লা মতো শোনা গেল কি? না, নিশ্চয় মনের ভুল। বড়কাকা আশ্বস্ত হয়ে বলে চললেন, "চোর-ছ্যাঁচড় নেই, বদমাইস-বাটপাড় নেই, ঠ্যাঙাড়ে, গুণ্ডা, চোরাকারবারি নেই—ওরা উৎসাহিত হয়ে বলল, "পুলিস, জেলখানা নেই, সব কলে হয়, আইন আদালতের দরকারই নেই। কিন্তু কল বিগড়ে গেলে কি হয়, স্যার?"

বড়কাকা বিরক্ত হয়ে বললেন, "কি আবার হবে? স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভুল শুধরে নেওয়া হয়, একি মানুষ পেয়েছিস যে ভাঙবে চুরবে, বিকল হয়ে পড়ে থাকবে? বলিনি তোদের এককণা জিনিস এখানে পড়ে থাকার উপায় নেই, সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রহ করে, ভোল বদলে কাজে লাগানো হয়। একটা আলপিন কোথাও পড়ে থাকতে দেখবি না।"

বলতে বলতে ওরা দু সারি ছবির মতো সুন্দর বাড়ির মধ্যিখানের তকতকে বাঁধানো পথ দিয়ে একটা ছোট পাহাড়ের কাছে পৌঁছল। পাহাড় না বলে তাকে একটা বড় ঢিপিও বলা চলে। তার গা বেয়ে এঁকে-বেঁকে লাল রঙের একটা রাস্তা উঠে গেছে, তার দুই পাশে গাছে গাছে ফুল ফুটেছে।

বড়কাকা বললেন, "গাছপালা সব সত্যিকার। এমনভাবে পরিকল্পনা করে লাগানো হয়েছে যে বারো মাস কোনো না কোনো গাছে ফুল দেখা যাবে। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া করা হয়েছে, বেশি গরমও পড়ে না, আবার বেশি শীতও হয় না। ওদের মনের মধ্যে বহুদিন আগে পড়া ভূগোলের বইয়ের পাঠগুলো নাড়া দিতে লাগল।

বড়কাকার পাহাড় চড়তে গিয়ে হাঁপ ধরে যাচ্ছিল। এরা ফুর্তির চোটে এক দৌড়ে একেবারে চুড়োয় পৌঁছে থ'! চারদিক থেকে কেমন যেন হাসিগল্প থেমে গেল, গাছপালা সরসর করে উঠল, কারা যেন সরে পড়ল, কি যেন চলে গেল। ওরা জানত সব মনের ভুল, কেউ কোথাও নেই, চারদিক খাঁ খাঁ করছে, এখানে কেউ হাসে না, কাঁদে না, ভুল করে না, করলে আপনা থেকে শুধরে নেয়, কিছু পড়ে থাকে না, কোনো জিনিস নষ্ট হয় না। কিন্তু তাই যদি হবে, তাহলে পাহাড়ের চুড়োতে মেয়েদের চুলের ক্লিপ পড়ে আছে

কেন? অবাক হয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে একটা চাকাওয়ালা চোঙামতো যন্ত্র নিয়ে ডি ২০ আর ডি ২১ নম্বরের দুটি কলের মানুষ এসে হস করে শুকনো ফুল, খসা পাতার সঙ্গে ক্লিপটাকে উড়িয়ে সাফ করে তুলে নিয়ে, মেশিনটাকে ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে গেল। এমন সময় বড়কাকা হাঁপাতে হাঁপাতে দেখা দিলেন। পাহাড়চুড়োয় সবুজ বেঞ্চি পাতা ছিল, তাতে বসে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যেত। বড়কাকা ধপাস করে তার একটাতে বসে পড়লেন। ওঁর দম ফিরে এলে ওরা জিজ্ঞেস করেছিল, "কার জন্য এমন এলাহি ব্যবস্থা করেছেন বলুন? আমাদের কালীঘাটের গলিতে, এক ফালি জায়গা পেলে লোকে বর্তে যায় আর এখানে এত জায়গা, কিন্তু কলের মানুষ ছাড়া জামনিষ্যি নেই! এসব তবে কার জন্য করেছেন আপনারা?"

হুলো বড়কাকার পাশে বসে ঢোক গিলে বলল, "আমার ছোট বোন ফুলিটা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, একটু রোদে পা মেলে বসতে পায় না!" এই প্রথম বাড়ির কথা বলল ওদের মধ্যে কেউ। বড়কাকা একটু ঘাবড়ে গেলেন। যে বড় বেশি ব্যস্ত হয়ে বলতে লাগলেন, "আরে সেইজন্যেই তো আকাশ-ঘাঁটি তৈরি করা। পৃথিবীতে আর লোক ধরছে না, মিনিটে মিনিটে বাড়ছে। এই রকম কয়েক লাখ আকাশ-ঘাঁটি করে আকাশে ছেড়ে দিলেই তো সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।" তারপর কাষ্ঠ হেসে বললেন, "তাহলে অবিশ্যি আকাশ-ঘাঁটি আর আকাশ-ঘাঁটি থাকবে না, হয়ে যাবে কালীঘাট রোড।"

এই বলে কেমন উদ্বিগ্ন হয়ে চারদিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, "এখানেও একটু বেশি বেশি লোক দেখছি যেন। জায়গাটা পশ্চিমবাংলার অর্ধেকও হবে না, এখানে মাত্র এক হাজার কর্মী পুতুল রেখে যাওয়া হয়েছিল। মেশিন দিয়ে কাজ করবার পক্ষে সেই যথেষ্ট। অথচ দেখ, সারি সারি বাড়িতে লোক কত! এত বাড়িও তো মনে পড়ছে না।"

বাস্তবিকই চারদিকে চেয়ে ওদের মন ভালো হয়ে গেল, কত লোক তার হিসাব নেই। হতে পারে কলের মানুষ, কিন্তু দেখতে তো ঠিক মানুষেরি মতো। কথা বলে না, কিন্তু একেকটার মুখ একেক রকমের, আর—আর যাবার সময় কি ডি ২১ নম্বর হুলোর দিকে চোখ মটকেছিল?

বড়কাকা দিনে দিনে আরো বেশি গুম মেরে যেতে লাগলেন। বয়সটা এতকাল বাদে যেন বোঝা যেতে লাগল। আকাশ-ঘাঁটির কতকগুলো শক্তিকেন্দ্র ছিল, সেগুলো পরিদর্শন করলেন। খুদে বাড়ির পিছনে খুদে গ্যারেজ, স্কুটার, সূর্যশক্তিতে চলে। কলের মানুষরা তার দেখাশুনা করে, তাদের যত্নে যন্ত্রটিকে মনে হচ্ছিল যে নতুন। নইলে পাঁচ বছরে স্কুটার অকেজো হয়ে যাবার কথা। প্রথমদিনই সন্ধ্যার সময় দুজন কলের মানুষ এইচ ৭ আর এইচ ৮, স্কুটার চালিয়ে এনে গ্যারাজে তুলে দিয়ে গেছিল। তাতে করে ওরা ইন্সপেকশনে বেরুল। একটাতে বড়কাকা উঠলো, অন্যটাতে ওদের দুজনকে উঠতে বললেন। তাই কখনো হয়? ছোটি স্কুটার, কিন্তু কালীঘাটের মাস্তানদের শরীর তো আর ছোট নয়। কলের মানুষরা কেমন করে কি বুঝল বোঝা গেল না, একজন ছুটে গিয়ে পাশের বাড়ির গ্যারাজ থেকে আরেকটা স্কুটার এনে দিল। কলের পুতুলের দক্ষতা দেখে, হুলো ঘোতন প্রশংসা না করে পারল না। বড়কাকা কাষ্ঠ হেসে বললেন, "ওদের কোনো বাহাদুরি নেই, যেটুকু

ক্ষমতা ওদের মধ্যে ভরে দেওয়া হয়েছে, তার বেশি কিছু করা ওদের পক্ষে অসম্ভব। তবু আমি নিজেও আশ্চর্য না হয়ে পারছি না।”

শক্তিকেন্দ্রগুলো চমৎকার কাজ করছিল, দেখে কে বলবে পাঁচ বছর মানুষের হাত পড়েনি, কলের পুতুলের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সব চলেছে। যতই দেখে, হুলো ঘোতন এতই খুশি হয় আর বড়কাকার মুখ ততই গম্ভীর হয়। মনে হচ্ছিল, খুঁৎ পেলেই যেন খুশি হতেন।

আশ্চর্যভাবে তৈরি ঐ আকাশ-ঘাঁটি, যেন ছোটখাটো একটা পৃথিবীর মডেল, তেমনি আকৃতি, সেই একই নিয়মে চলে। ব্যাপারটা বুঝিয়েও বললেন বড়কাকা, “পৃথিবীর কোটি কোটি বছর ধরে পরীক্ষিত নিয়মগুলোকেই ঝেড়েঝুড়ে কাজে লাগানো হয়েছে। বাজে জিনিস সব বাদ। অত রকম গাছ-গাছড়া, জন্তুজানোয়ার, পোকামাকড় দিয়ে কার কি উপকার হবে বল? একটাও পোকা আনা হয়নি—বাদে তোদের গুবরে ওয়ান, গুবরে টু। মোটকথা যেসব জিনিস কাজেও লাগে না, দেখতেও ভালো না, সে-সব কিছু পাবি না এখানে। ট্যাপারি তৈরি না হলে কার কি ক্ষতি হত বল? ট্যাপারি নেই এখানে।” বাড়ি ফিরে এসে হুলো এক বোতল ট্যাপারির জ্যাম টেবিলে এনে রাখল। তাই দেখে বড়কাকার মুখ এমন সাদা হয়ে গেল যে ওরা না হেসে পারল না। বড়কাকা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, “আকাট মুখ্যু তোরা তাই হাসছিস। ট্যাপারির বিচি যদি ভুলক্রমে চলে এসেও থাকে, কলের মানুষরা জ্যামের প্রণালী জানল কি করে? আমরা যা নিজেরাই জানি না, তা ওদের শেখাব কি করে?”

হুলে বলল, “হয়তো একটা রান্নার বইয়ের ছেঁড়া পাতা কলের পুতুলের মধ্যে ঢুকে গেছিল।” বড়কাকা ধমক দিয়ে উঠলেন “যা বুঝিস না, তাই নিয়ে কথা বলি না। এখানে কোনো শত্রুপক্ষ ঢুকেছে। খবরদার ঐ জ্যাম মুখে দিবি না!”

ঘোতন অবাক হয়ে বলল, “ওমা! আমরা তো টিফিন খেয়ে খেয়ে একটা বোতল ফুরিয়েই ফেলেছি। খাসা জিনিস।” বড়কাকার শরীর খারাপ লাগতে লাগল, উনি শয্যা নিলেন, রাতে খেলেন না।

পরদিন আলমারি খুলে গোছা গোছা বই নামিয়ে, পেনসিল নিয়ে বসে পড়ে, ওদের বললেন, “আমি আজ খিদের বড়ি খেয়ে থাকব। তোদের যা ইচ্ছা খাস, আর সঙ্গে কিছু নিয়ে ঐ পুব দিকটা পরিদর্শন করে আয়, ওটা দেখা বাকি রয়ে গেছে। আমি পায়ে জোর পাচ্ছি না।”

শুনে ওরা মহা খুশি, “স্কুটার নেব, বড়কাকা? তাহলে অনেকটা ঘুরে আসতে পারব।” বড়কাকা মুখ তুলে বললেন, “যা খুশি নিস, তবে সন্ধ্যার আগে ফিরিস। আমার কিরকম-ইয়ে-নার্ভাস লাগছে।”

ওরা তাঁকে সাহস দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পৃথিবীর ছোট মডেল। টপ করে এক বার পাক খেয়ে আসে, যেমন ছোট দিন, তেমনি ছোট রাত। তবু নাকি যন্ত্রের সাহায্যে পাকের গতি কমিয়ে রাখা হয়েছে। ওরা মনের আনন্দে গান জুড়ে সোজা পুব দিকে চলল। মনে হল গাছপালা, ফুলের ঝোপ, পাখি, হরিণ ফূর্তির চোটে লাফাতে শুরু করেছে। কোথা থেকে দলে দলে প্রজাপতি উড়ে এল। তাহলে শুঁয়োপোকাও নিশ্চয় আছে। তারাই হয় তো

গাছের পাতা খেয়ে শেষ করে দেয় বলে পাঁচ বছরেও আকাশ-ঘাঁটি জঙ্গলে ভরে যায় নি। বেজায় হাসি পেল দুজনার, প্রাণ খুলে হা-হা হো-হো করে খানিকটা হেসেও নিল। অবাক হয়ে চেয়ে দেখল দূরের গাছতলায় কলের মানুষের দল কাজ ফেলে হেসে গড়াচ্ছে। এবার ওরা এমনি চমকে গেল যে সঙ্গে সঙ্গে হাসিও থেমে গেল। অমনি কলের মানুষরাও যে-যার উঠে পড়ে কাজে লেগে গেল, যেন কিছুই হয় নি।

নাকি সবটাই চোখের ভুল। কাজের মানুষ দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে গেছে, এখন কুঁড়ে মানুষ, আমুদে মানুষ দেখবার স্বাদ হয়েছে। কালীঘাটে বুড়ো-ঠাকুরদার আমলের এঁদো পুকুরে মাছ কত। সেখানে একটা কামরাঙা গাছের তলায় ভাঙ্গা ঘাটের সিঁড়ি আছে, তাতে বসে ছিপ হাতে ওরা কত দুপুরই কাটিয়েছে। ভারি মিষ্টি কামরাঙ্গা, খেলে নাকি জ্বর আসে। কই ভুলো ঘোতনের তো কখনো জ্বর আসেনি। মুদির দোকান থেকে এক পলা তেল চেয়ে এনে, রোগী বোনটাকে দিয়ে কাঠের জ্বালে ভাজিয়ে খেয়েছে। যেন অমৃত।

অন্যমনস্ক হয়ে ওরা আরো কতদূরে চলে এসেছিল নিজেদের খেয়াল নেই। সামনে একটা মস্ত পাঁচতলা বাড়ি, নিচের দিকে নিরেট দেয়াল। হয় তো কোনো গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি আছে। ওপরে ঘুলঘুলির মতো ছোট দেখতে জানলা! হয় তো ততটা ছোট নয়, নিচে থেকে দেখতে ঐ রকম লাগছে। চারদিকে খাঁ-খাঁ করছে ঘাসজমি। এখানে কোনো যন্ত্র-মানুষও দেখা যাচ্ছিল না। ওরা স্কুটার থেকে নেমে পায়ে হেঁটে ঘুরতে ঘুরতে, খিলান দেওয়া বন্ধ ফটকের সামনে পৌঁছল। অমনি ঠক করে কি একটা ছোট জিনিস ওদের পায়ের কাছে পড়ল। তুলে দেখে চামড়ার স্পষ্ট ছাপ লাগানো একটা টিসো কোম্পানির হাতঘড়ি। অতখানি নিচে পড়েও ভাঙেনি।

তাই দেখে হুলোর হাত-পা ঠাণ্ডা। দু পা পিছু হটে ওপরে তাকিয়ে মনে হল অনেক উঁচুতে, খুদে ঘুলঘুলিতে খুদে রুমাল উড়ছে। তখন হুলো ঘোতনকে পায় কে? বিপদ দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়া ওদের অভ্যাস, বুকে ওদের ভয়-ডয় ছিল না, এক ভূতের ভয় ছাড়া। এখানে মানুষই নেই, তাহলে ভূত আসবে কোত্থেকে? মানুষ মলে তবে না ভূত তৈরি হবে! মানুষ যাতে না মরে, সেইটেই আগে দেখা দরকার।

ফটকে বাইরে থেকে খিল দেওয়া। খিল তুলে ঠেলা দিতেই নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল চারদিকে গুণ গুণ করে মেশিন চলতে শুরু করল। হুলো প্রথমটা চমকে উঠেছিল, তারপর বুঝল দরজা খোলার চাপে এর কিছু যোগ আছে। সামনে মস্ত হল-ঘরের এক পাশে পাক দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে, অন্য দিকে নিঃশব্দে একটা স্বয়ংক্রিয় লিফট নেমে এল।

ওরা তাতে না উঠে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে গেল। চেনা বামুনই ভালো। উঠছে তো উঠছেই। থেকে থেকে একটা করে দরজা। ওরা সোজা পাঁচ তলায় উঠে থামল। বুকে হাতুড়ি পিটছিল, হাঁপে না ভয়ে তা টের পাওয়া যাচ্ছিল না। হাঁপেই হবে, কালীঘাটের মাস্তানের আবার ভয় কিসের। দরজা ঠেলে দেখে ছোট হল-ঘর, মাথার ওপর আলো জ্বলছে, চারদিকে চারটি দরজা। সব দরজায় বাইরে থেকে খিল দেওয়া। সব খুলে ফেলে দিল ওরা, ভিতর থেকে বেরিয়ে এল দুই সায়েব, দুই মেম আর গোটা পাঁচ ছয় ছেলেপুলে। যেমন যেমন ঘটেছিল এ গল্পে তার তেমনি বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে। মেম দুটো

ওদের গলা জড়িয়ে গালে চুমোটুমো খেয়ে একাকার। কিন্তু কিচির মিচির করে কি যে বলছিল বোঝে কার সাধ্যি।

সায়েবরাও কত জিজ্ঞাসা করল, তার মধ্যে শুধু 'বাগ্‌চি' কথাটাই বোঝা গেল। বড়কাকার নাম বাগ্‌চি। হুলো ঘোতন যে একেবারে ইংরিজি জানত না তাতো নয়, তবে এরা বোধ হয় ফরাসী ভাষায় বলছিল, খুব চন্দ্রবিন্দু লাগাচ্ছিল। কিন্তু ওদের সারা গায়ে ভারি চমৎকার একটা মানুষ-মানুষ ঘেমো গন্ধ। শুঁকলে প্রাণ জুড়ায়। শেষটা ভুলো সাহস করে বলল, "বাগ্‌চি কাম্‌।" শুনে ওরা আহ্লাদে আটখানা।

দেখতে দেখতে সবাই মিলে হুড়মুড় করে নিচে এল। কোথা থেকে কয়েকটা স্কুটার বেরুল। কেউ কারো কথা বোঝে না, কাজেই সময় নষ্ট করে কি লাভ? দল বেঁধে ওরা বড়কাকার বাড়িতে ফিরে এল। পাঁচতলা বাড়ি যেমন ছিল তেমনি পড়ে রইল, শুধু সদরের ফটক বন্ধ করতেই আলো নিবে গেল, মেশিন বন্ধ হল। ওদের সাড়া পেয়ে পড়িমরি করে বড়কাকা ছুটে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে সায়েব দুটো—তা যার খুশি অবিশ্বাস করতে পারে—ছুটে গিয়ে দুই গালে চুমো খেয়ে ফেলল। হুলো এমনি চমকে গেল যে মুখ থেকে ইংরিজিতে বেরিয়ে এল, "মাই গড!" তার পরের ব্যাপার আরো আশ্চর্যের। দলে দলে দলে দঙ্গলে দঙ্গলে কলের মানুষরা ওদের ঘিরে দাঁড়াল, তাদের নানা রঙের সাজ দেখে এক ঝাঁক রঙ্গীন প্রজাপতির কথা মনে হয়। মাথার ওপর থেকে একটা গুণ গুণ শব্দ শোনা গেল; প্রায় সেই স্পেস্‌-স্টেশনের মতো চেহারার, কিন্তু অনেক ছোট কতকগুলো রূপোলী চ্যাপ্টা আকাশযান কে জানে কোথা থেকে দেখা দিল আর কলের মানুষরা হো-হো করে হাসতে হাসতে, হাত নেড়ে গুডবাই জানিয়ে প্রজাপতির মতো ডানা মেলে উড়ে গেল। নীল আকাশ রঙের কুচিতে ছেয়ে গেল, আকাশ-ঘাঁটির যেখানে যত কলের মানুষ ছিল সবাই বোধ হয় বিদায় নিল। আকাশযানের নিচে দরজা খুলল, ওরা ঢুকে যেতেই, আকাশযানও উড়ে গেল।

বিনো আর করিগা মুখ হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তাদের স্ত্রীপুত্রকন্যারা মহানন্দে চারদিকে ছুটে বেড়াতে লাগল, যেন কিছুই হয়নি। বড়কাকা হাত পা এলিয়ে পড়ে যাবার যোগাড় করছেন দেখে, হুলো ঘোতন একসঙ্গে বলে উঠল, "কি এমন হয়েছে যে মুচ্ছো যাবার চেষ্টা করছেন?" বড়কাকা এমনি রেগে গেলেন যে মুচ্ছোটুচ্ছো একেবারে সেরে গেল। তেরিয়া হয়ে বললেন, "এত বড় জায়গাটার কাজকর্ম কে করবে শুনি? রোবোগুলো তো সব জ্যান্ত হয়ে উড়ে গেল।" বলে কেমন হিস্টিরিয়া রুগীর মতো ফ্যাকফ্যাক করে হাসতে লাগলেন। তাই শুনে বিনো করিগাও হাঁটু চাপড়ে মাটিতে বসে পড়ে হেসে গড়াগড়ি দিতে লাগল। চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

হুলো ঘোতন কোনো কথা না বলে কলের মানুষরা ঘাস জমিতে যে নাইলনের নল দিয়ে জল দিত, সেটি তুলে নিল। তাই দেখেই বড়কাকার হিস্টিরিয়াও সেরে গেল। হুলো বলল, "আমাদের বাড়ির লোকদের যদি এখানে এনে দেন, আপনাদের কলের পুতুল ফিরিয়ে তার চেষ্টা করি।" বড়কাকা বললেন, "এক্ষুণি, এক্ষুণি! আরে এখানে বাছাই করা লোক বসিয়ে পৃথিবীর জনসংখ্যা কমানোই তো আমাদের উদ্দেশ্য। তবে বিশ্বাসী লোক বারোমাস এখানে থাকতে চায় না। তাই তোদের ভুলিয়ে ভালিয়ে আনতে হল। তোদের

মতো সাহসী লোক কোথায় পাব বল্? তাছাড়া শুনেছি মাস্তানদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলে তাদের মতো বিশ্বাসী বন্ধু এবং কর্মী আর পাওয়া যায় না।”

হুলো ঘোতন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, “এখানে একটা ছোট নদী দেখেছি, তাতে চিংড়ি মাছ ইত্যাদি ছাড়া যাবে না?” বড়কাকা বললেন, “খুব যাবে। চারাটারা সব এনে দেব। এবার বল্ কলের মানুষরা কোথায়?”

ঘোতন হেসে বলল, “প্রত্যেক রাস্তার দশ নম্বর বাড়িতে গোটা কুড়িক্ এলিয়ে পড়ে আছে, ওরা বোধ হয় তাদের চাবি খুলে নিয়েছে।” বড়কাকা “বলিস কি!” বলে তিন হাত লাফিয়ে উঠলেন। সায়েব দুটো হোয়াট্? হোয়াট্? করতে করতে ছুটে এল।

দেখা গেল বাস্তবিকই তাই। হুলো ঘোতনের অভ্যাস চারদিকে নজর রাখা, এখানে ওখানে উঁকি মেরে ঐ ব্যাপারটি তারা আবিষ্কার করেছিল। তবে ওরা ভেবেছিল পুতুলগুলো হয়তো সম্পূর্ণ নয়, আরো কিছু করলে তবে চালু হবে। বড়কাকা আর দুই সায়েবের সঙ্গে এর পরের ক’দিন কলের মানুষদের আবার চলৎশক্তি ফিরিয়ে আনতেই কেটে গেল। জনা পঞ্চাশ চালু হলে, তাদের সাহায্যে কাজ আরো সহজ হল।

তারপর এক দিন সন্ধ্যাবেলায় বিনোর বাড়ির বাগানে বসে কথা হচ্ছিল, বড়কাকা দোভাষীর কাজ করছিলেন। মেমরা থেকে থেকে কফি আর ভালো ভালো খাবার জিনিস এনে দিচ্ছিল। হুলো বলল, “সব বুঝেছি, কিন্তু ঐ যারা উড়ে চলে গেল, তারা কে?”

করিগাকে এ কথা অনুবাদ করে বলাতে হাত পা নেড়ে সে যা বলল, তার বাংলা করলে সংক্ষেপে দাঁড়ায়, এই ধরনের কিছু “আমাদের সৌরমণ্ডল আছে, আকাশের দিকে খালি চোখে দেখলেও সেটা বোঝা যায়। যত তারা দপ্‌দপ্ করে জ্বলে, প্রত্যেকের চারদিকে অনেকগুলি করে গ্রহ ঘোরে। তাদের মধ্যে অন্ততঃ দুটি একটির প্রাকৃতিক পরিবেশ আমাদের পৃথিবীর মতোই। সেখানেও নিশ্চয় বুদ্ধিমান জীব আছে, হয়তো মানুষের চাইতেও তারা বেশি জ্ঞানী। আমাদের মনে হয় তাদের একদল এখানে এসে গত পাঁচ বছরে একাধিক বার ছুটি কাটিয়ে গেছে। এখানকার হালচাল শিখে নেবার পর আমাদের রোবোদের উপস্থিতিতে ওদের হয়তো অসুবিধা হত। রোবোদের মাথায় সব কিছু রেকর্ড হয়ে যায়, ওদের সব কথা জানাবার ইচ্ছা না-ও থাকতে পারে, তাই খুব দক্ষভাবে রোবোদের অচল করে, নিজেরা রোবো সেজে ছিল। যখন কেউ থাকত না, তখন হয়তো রোবো সাজ পরত না। যেমন বাগচির সঙ্গে কথা ছিল। মাস দুই হল আমরা এসেছি। প্রথমটা খেয়াল করিনি, গুছিয়ে বসতেই ব্যস্ত ছিলাম। তারপর ছেলেমেয়েরা কেবলি বলতে শুরু করল একই নম্বরের একাধিক রোবো আছে। তাতো থাকবার কথা নয়। তারা কাজও করে ঢের বেশি। যে বিদ্যা পুরে দিয়েছিলাম, তার বেশি তো জানবার কথা নয়। আমাদের গিন্নিরা জ্যাম জেলি বানিয়েছিল, কিন্তু বাগচির বাড়িতে সে সব এল কোত্থেকে? যেই না মনে সন্দেহ হওয়া, সঙ্গে সঙ্গে ওরাও টের পেয়ে গেল। সকালে ঘুম ভেঙে দেখি ঐ বাড়ির পাঁচতলায় আমরা বন্দী। কিন্তু কি ভালো খাবার দিয়ে যেত একটা সত্যিকার রোবো সে আর কি বলব!
আজ আমরা ছাড়া পেয়েছি দেখে পালিয়েছে সব।”

ঘোতন বলল, "কিম্বা হয়তো ওদের ছুটিও ফুরিয়েছে, তাই আকাশযান ওদের নিতে এসেছিল। কোথা থেকে কে জানে!" এসব ঘটনার পর আরো বছর দুই কেটে গেছে। হুলো ঘোতন আকাশ-ঘাঁটির স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে। রোগা বোনটা আজকাল নেচে বেড়ায়। বড়কাকা ত ওখানেই থাকেন, মাঝে মাঝে পৃথিবী থেকে ঘুরে আসেন, দরকারি জিনিস সওদা করে আনেন। সেই দেখে ওখানে ঐ জিনিস তৈরি হয়। এখন সেখানে অনেক বাসিন্দা। সব নিয়ে হাজার খানেক হবে। তাদের মধ্যে হুলো ঘোতনের মনের মতো দুটি মেয়েও আছে। এ গল্পের শেষটা ভালো।

এই রকম আরো হাজার হাজার পৃথিবী তৈরি করা হবে। তাদের যে কোনোটি থেকে পরিষ্কার রাতে আকাশের দিকে তাকালে, স্থির নীল রঙের একটি ছোট গ্রহ দেখা যাবে। সেই আমাদের এই পৃথিবী।

প্রথম প্রকাশ: ফ্যানট্যাসটিক, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬
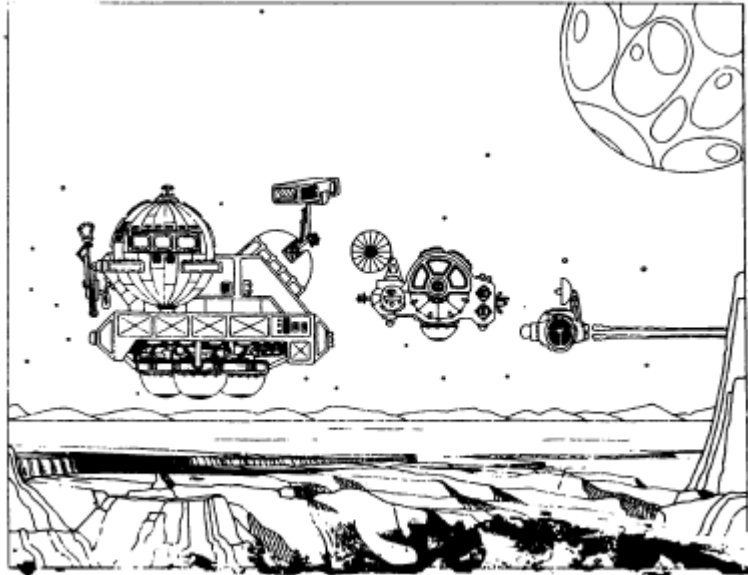
সূচিপত্রে ফিরে যান

এস্ এফ

সত্যজিৎ রায়

এই আদ্যক্ষর দুটো লোকের কাছে যতটা পরিচিত হোক বলে ভাবা যায়, ততটা পরিচিত হয়নি। কিন্তু যিনি আসল বিষয়টির সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট তাঁর কানে এই 'এস' ধ্বনির শনন আর এই 'এফ্' ধ্বনির হুতাশ বাজবে রকেটের শনশনানি তার ঝাপটার মতো, যে-রকেট তাঁকে নিয়ে যায় মানুষের কল্পনার দূরতম প্রান্তরে, সীমার বাইরে নিঃসীমতার অন্ধকারে ছায়াপথ পেরিয়ে, সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে, যার কথা এখনো উপলব্ধির মধ্যে স্থান পায়নি, এখনো যার নামকরণ হয়নি, সেইখানে।

বিজ্ঞানসুবাসিত গল্প বা সায়াস-ফিকশ্যনের পরিমাপ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে কিংসলী অ্যামিস্ তাঁর 'নিউ ম্যাপ্স্ অব্ হেল্' বইতে লিখেছেন, এই ধরনের সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক চাপে যৌবনাগম বয়সেই, নয়তো আর কখনোই সে-ঝোঁক আসে না। আমার মনে হয়, তিনি ঠিকই বলেছেন; কারণ, আমি এখনো কোনো বয়স্ক সায়াঙ্গ-ফিকশ্যন ভক্তের সংস্পর্শে আসিনি যিনি বলেননি যে, তিনি 'অনেকদিন থেকেই এইসব পড়ে আসছেন।'

আমার জীবনে বছর দশেক বয়স নাগাদ এই ঝোঁক চেপেছিল, তখন আমার ঠাকুরদা কুলদারঞ্জন রায়ের অনুবাদ করা জুল ভর্নের 'মিসটিরিয়াস আইল্যাণ্ড' বেরিয়েছে দু'খণ্ড হলদে মলাটের বই হয়ে। আমি একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, এখনও হই, ভর্নের গল্পের মধ্যে প্রাণমাতানো নিখুঁত বর্ণনার অঢেল প্রাচুর্যের মধ্যে দিয়ে পাঠককে আকর্ষণ করে স্তম্ভিত করে রাখার ক্ষমতা দেখে। এক্ষেত্রে ভর্ন অবশ্যই অগ্রণী, তবে ঠিক সেই ধরনের অগ্রণী নন যাঁরা কোনো নতুন ক্ষেত্রে নতুন কিছু করার মুখপাতটুকু সেরেই ক্ষান্ত হন, বাকী অভিযানটুকু চালিয়ে যাবার ভার দিয়ে যান উত্তরসূরীদের। ভর্ন ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কল্পনাশক্তিপুষ্ট বিস্ময়কর প্রতিভাধর মানুষ। এর ওপরেও তাঁর একটা গুণ ছিল—তিনি খেটে লিখতেন, খুঁটিয়ে ভেবে লিখতেন। তাঁর প্রথম কল্পনারঙীন ফ্যানটাসি কাহিনী 'ফাইভ উইক্স্ ইন এ বেলুন' লিখেছিলেন ৩৫ বছর বয়সে। তখন থেকেই তিনি ঐ ধরনের উপন্যাস প্রতি বছর দু-একটা করে লিখে গেছেন প্রায় বছর তিরিশ ধরে। এই ক'বছর ধরেই তিনি উল্লেখযোগ্য এবং মূল্যবান অনেক লেখার মাঝে মাঝে হেলাফেলায় লেখা গল্পও পরিবেশন করেছেন, কিন্তু কক্ষণো একই ধরনের বিষয়বস্তু পুনরাবৃত্তি করে গল্প লেখেননি।

ভর্ন গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন, এই নতুন ধরনের সাহিত্য রচনায় অনেক সময় বেকায়দায় পড়তে হয়। যেমন ধরুন, ফ্যানটাসী গল্পকে আপনি একেবারে উড়িয়ে নিয়ে, রূপকথার মতো, সবপেয়েছির দেশে নামাতে পারেন না। এর মধ্যে বাস্তবতার বাঁধন রাখতে হবে, আর পাঠকরা যাতে দূরদর্শনের অকূল পাথারে দিশেহারা হয়ে না মরে, সেদিকে সযত্ন দৃষ্টি রাখতে হবে। এইজন্যেই ভর্ন যেসব কায়দায় গল্প ফাঁদতেন, সেগুলোর মধ্যে একটি হল, তিনি কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাকে সুকৌশলে নতুন ধাঁচে সাজিয়ে গল্পের

চরিত্রগুলিকে তারই মধ্যে বসাতেন এবং সেই সাজানো কাহিনীটিকে চমৎকারভাবে কল্পনারঙীন ফ্যানটাসী গল্পের প্যাটার্নে বুনে দিতেন। ঠিক এই কৌশলেই আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় বেলুনে করে মুক্তির সন্ধানে পাড়ি দিতে গিয়ে একদল লোক আশ্চর্য দ্বীপে (মিসটিরিয়াস আইল্যাণ্ডে) নেমে পড়েছিলেন। ভারতবর্ষকে নিয়ে ভর্নের ফ্যানটাসী গল্পকল্প 'টাইগার্স অ্যাণ্ড ট্রেট্যর্স'-এ বহু অংশে সিপাহী বিদ্রোহ এবং নানাসাহেবের কথা জড়ানো। তাঁর লেখা 'অ্যারাউণ্ড দি ওয়ার্লড ইন এইটি ডেজ' বিজ্ঞান-ফ্যানটাসী না হয়েও, এর ভেতরের চমৎকার উঁচুদরের গল্পটি সারা পৃথিবীকে ঘিরে দানা বেঁধে উঠেছে আর প্রত্যেকটি দেশের প্রত্যেকটি ঘটনায় সেই দেশের নিখুঁত বর্ণনার ছোঁয়া লেগে রঙীন হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ভারতবর্ষের ঘটনাগুলি এদেশে সেই সময়কার নতুন রেলপথ চালু হওয়ার কথায় প্রাণবন্ত হয়ে রয়েছে।

ভর্ন এচ জি ওয়েলসের লেখা পড়েছিলেন এবং সে-লেখায় অসম্ভব কল্পনায় ভেসে বেড়ানোর প্রবণতাকে খুব বিদ্রূপ করেছিলেন। আজ ওয়েলসের লেখা পড়লে ভর্নের আপত্তির কারণ বোঝা যায়। ওয়েলস সায়ান্স-ফিকশনের দিকে এগিয়ে ছিলেন কাব্যময় রোম্যান্টিক ভাবধারণা নিয়ে এবং এই কবি সুলভ কল্পনা রঙীন মনোভাবের জন্যেই নিষ্প্রাণ নীরস তথ্যভাবের প্রতি তাঁর ছিল প্রচণ্ড বিরাগ। অদৃশ্য মানুষ কেমন করে অদৃশ্য হয়? আমরা তা জানি না; কেননা এই রহস্য যে তিনখানি চামড়া-বাঁধাই মোটা মোটা নোটবইতে লেখা আছে, সেগুলি স্টোই বন্দরের সেই ছোট্ট সরাইখানাটির মালিকের হাতে রয়ে গেছে, আর সে ভদ্রলোক নোটবইগুলো হাতছাড়াও করবেন না, তাতে কি লেখা আছে তাও কিছু বলবেন না। অদৃশ্য মানুষ, অর্থাৎ গ্রিফিন তাঁর ডাক্তার-বন্ধুকে সব ব্যাপারটা তাই এইভাবে বলছেনঃ

'আমি তোমাকে সব কথা বলবো, কেম্প, আজ হোক কাল হোক সমস্ত জটিল ব্যাপারটা খুলেই বলবো। এখন সে সব কথা পেড়ে কাজ নেই... তবে আসল ব্যাপারটা হল, স্বচ্ছ জিনিসের প্রতিসরণাঙ্ক বা রিফ্র্যাকটিভ ইনডেক্স কমাতে হলে সেটিকে কোনো রকম ঈথার কম্পন বিকিরণকারী দুটি কেন্দ্রের মাঝখানে রাখতে হবে, এবিষয়ে তোমাকে পরে আমি আরো পরিষ্কার করে বলবো... দুটো ছোটো ডায়নামোর দরকার হল আমার, সে দুটোকে আমি সস্তা গ্যাস ইনজিনের সাহায্যে চালালাম। প্রথমে একটা পশমের পোশাক নিয়ে আমার এক্সপেরিমেন্ট হল...'

টাইম মেশিন

এর মধ্যে ওয়েলসের নিজস্ব দুটি কৌশল রয়েছেঃ এক হল বৈজ্ঞানিক কচকচির একটু খোঁচা, আর এমনভাবে বলা হবে যেন মনে হবে বৈজ্ঞানিক রহস্যটা খুব সোজা, অথচ সেটা কখনই সবটা খুলে বলা হবে না। 'দি টাইম মেশিন' গল্পটির কথাই ধরুন। এখানে তত বৈজ্ঞানিক বাগাড়ম্বর একেবারেই বাদ দিয়েছেন, শুধু একবার ফোর্থ ডাইমেনশনে ভ্রমণের সম্ভাবনা সম্পর্কে টাইম-ট্রাভেলার ভদ্রলোক সামান্য একটুখানি থিওরী আউড়েছে। মেশিনটার বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ

'টাইম-ট্রাভেলার ভদ্রলোক যে জিনিসটা হাতে ধরে ছিলেন, সেটি ঝকঝকে ধাতুর তৈরি, ছোট্ট ঘড়ির চেয়ে খুব বড় নয়। জটিল তার গড়ন। হাতীর দাতের কাজ করা,

একটা স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো...

'টেবিলের ওপর কনুই ভর দিয়ে যন্ত্রটার ওপর দুহাত চেপে ধরে টাইম-ট্রাভেলার ভদ্রলোক বললেন, এই ছোট্ট কলটা শুধু একটা মডেল। আমি প্ল্যান করছি এরকম একটা মেশিন করবো যাতে চেপে সময়ের মধ্যে দিয়ে বেড়িয়ে আসা যাবে। আপনারা দেখছেন, এটা দেখতে বিশেষ রকমের উদ্ভট, আর ঐখানটা ঐ পাটাতনটার কাছে কেমন অদ্ভুত ঝিকমিক করছে, মনে হচ্ছে, ওটা যেন ঠিক সত্যিকারের নয়... আর, এই যে এখানে একটা সাদা চাবি রয়েছে, আর এইখানে আর একটা।'

একটা চাবি হল অতীতের জন্যে আর একটা ভবিষ্যতের জন্যে—এর চেয়ে সহজ আর কি হতে পারে? নিজে বিজ্ঞানসেবী হলেও, ওয়েল যখন বিজ্ঞানসুবাসিত গল্প লিখতে বসতেন তখন বিজ্ঞানের টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলোকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে সোজা গল্পের মধ্যে ডুব লাগাতেন। আসলে তিনি যে জিনিসটাতে মেতে উঠেছিলেন, সেটা আবিষ্কারের শতসহস্র বাধা অতিক্রমের নেশা নয়, সেটা ছিল আবিষ্কারের পরেই যে মজা, সেটিকে গল্পের মধ্যে দিয়ে উপভোগের নেশা। এর ফলে ওয়েলসের লেখায় যে মুক্তির হাওয়া ছিল, সব কিছু ঘটার সম্ভাবনা ছিল, ভর্নের তা কোনোদিনই ছিল না। ভর্ন তাঁর 'ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন' উপন্যাসে যে মহাকাশযানে চেপে প্রথম চাঁদে পাড়ি দেওয়া হবে, তার বর্ণনা দিতেই সারা বইটার ২৮টি অধ্যায়ের মধ্যে ২৬টি অধ্যায় ভরিয়ে ফেলেছে। যদিও তিনি যেভাবে চাঁদে ভ্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন, তা আমাদের বর্তমান যুগে কাজে লাগবে না, তবু গল্পে বেশ বোঝা যায় যে, বিজ্ঞানের কারিগরী দিকটাই তাঁকে বেশি ভাবিয়েছিল। তিনি তাঁর সাহিত্যজীবনে বরাবর এই দিকটাতেই গুরুত্ব দিয়েছেন, এরই ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছে, এবং নতুন আবিষ্কারের কথা বলেছেন—সে-সব আবিষ্কার মানুষকে নতুন চেতনার উন্মাদনা এনে দিয়েছে, নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন দুঃসাহসিকতার সম্মুখীন করেছে। তাঁর বিজ্ঞান ধারণাকে যদি আজকের দিনে অসার বলেও মনে হয়, তবু তাঁর পূর্বজ্ঞান ধারণাকে কিছুতেই তা বলা চলে না; কারণ তাই দিয়েই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন আজকের দিনের বহু জিনিসের—বলতে পেরেছিলেন সাবমেরিন, হেলিকপ্টার, টেলিভিশন, সিনেমা, মহাশূন্য অভিযানের কথা।

আজ আমরা ভর্ন এবং ওয়েলস দুজনকেই বিজ্ঞসুবাসিত গল্প লেখকের পর্যায়ে মর্যাদার আসন দিয়েছি। এক্ষেত্রে অগ্রণী হওয়া ছাড়াও আজকের দিনে যে-দুটি মূল ধরনের সায়ান্স-ফিকশন প্রচলিত তার আদিস্রষ্টাও তাঁরা। মোটামুটিভাবে তাঁদের আমরা বলতে পারি বস্তুধর্মী আর কাব্যধর্মী। প্রথমজন বৈজ্ঞানিক তথ্য যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে ভিত গড়ে তুলে তারপর তার ওপর ভর করে লাফিয়ে পড়েন গল্পের মাঝখানে, কিন্তু কখনই কল্পনাকে সম্ভাব্যতার বেড়া ডিঙিয়ে ছুটতে দেন না। দ্বিতীয়জন কল্পনার লাগাম অনেকটা আলগা করে দেন, তথ্যকে একেবারে উড়িয়ে দেন, না হয়, ঘুরিয়ে দেন, এবং চেষ্টা করেন, কাব্যের স্বর্গরাজ্যের মাটিতে বিশ্বাস গড়ে তুলতে। অবশ্য এমন অনেক গল্প আছে, যার মধ্যে দুটি ধাঁচ মিলেমিশে গেছে, এবং আধুনিক অনেক ভাল ভাল সায়ান্স-ফিকশ্যন লিখছেন আরথার ক্লার্ক ও আইজাক আসিমভের মতো বিজ্ঞানীরা—তাঁরা কল্পনার ভবিষ্যৎ

জগতে চমৎকারভাবে উধাও হয়ে যাচ্ছেন, বৈজ্ঞানিক তথ্যের রাজ্যে এতটুকু দখল না হারিয়ে।

এ যুগের বিজ্ঞান-কারিগরীর দ্রুত বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে সায়ান্স-ফিকশ্যনও অবশ্য নবরূপ লাভের পথ ধরেছে। পুরানো মালমশলার বদলে নতুন কিছু আনা হচ্ছে, এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখায় নতুন নতুন আবিষ্কারের সম্পদে সমৃদ্ধ হচ্ছে এই সাহিত্য ক্ষেত্রটি। নবশক্তিসম্পন্ন লেজার রশ্মি, অঙ্কবিশারদ কমপিউটার যন্ত্র, অবিরাম পৃথিবী প্রদক্ষিণধারী কৃত্রিম উপগ্রহ, হুকুমে হাজির মনুষ্যাকৃতি অ্যানড্রয়েড রোবট, প্রাণস্পন্দনের ইচ্ছামত বিরাম ও নবজাগরণের বিস্ময়কর কৌশলগুলো সমসাময়িক বিজ্ঞানসুবাসিত গল্পসাহিত্যের উপাদানরূপে বেশ চালু হয়ে গেছে। কল্পনার ক্ষেত্র থেকে চাঁদ আজ প্রায় বহিষ্কৃত। অদৃশ্য হওয়া এবং সময়ের রাজ্যের প্রমাণ করা বৈজ্ঞানিক দিক থেকে অসম্ভব একথা প্রমাণ হয়ে গেছে, তাই গল্পের উপাদান হিসেবে ওগুলো মর্যাদা হারিয়েছে। রোবটের কথা আজ চলছে, তবে বদ-মতলবী রোবটদের গল্পে সবাই কপাল কোঁচকায়, কারণ শত্রুতা করা এমন একটা মানসিক বৈশিষ্ট্য যা রোবটের মতো মেশিনের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই সবাই ভাবে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের চেতনা, অলৌকিক এক্সট্রা-সেনসরি পিরশ্যেপসন ইত্যাদির কথা ধীরে ধীরে বেশ জায়গা করে নিচ্ছে, এ নিয়ে অনেক গবেষণালব্ধ তথ্যও পাওয়া যাচ্ছে, আর গল্পের মধ্যে বহির্জগতের সে সব প্রাণীরা অবতীর্ণ হচ্ছে, তাদের সম্মাহোনশক্তি এবং টেলিপ্যাথীর ক্ষমতায় প্রচুর শক্তিমানও দেখা যাচ্ছে।

কবিদের পক্ষে, মনে হয়, সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হল ভূমণ্ডল বহির্ভূত অনন্ত জগৎ, যার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নীহারিকা-ধোঁয়ার মতো অস্পষ্ট রহস্যময় বলেই তার ওপর কবির কল্পনা খোলে ভালো। আমাদের সবচেয়ে কাছের মঙ্গল গ্রহটি পর্যন্ত আজও মেঘে ঢাকা, সত্যিই মেঘ তাকে ঘিরে থাকে, রহস্য তার আজও অজানা। কিন্তু, তাহলেও এস্ এফ লেখক কেবল আমাদেরই সৌরমণ্ডলের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন খুব কম। এস্ এফের ক্ষেত্র আজ সত্যি সত্যিই সীমাহীন সুবিস্তৃত।

কিন্তু পরিচিত ভূমণ্ডলের মাটিতে মানুষের প্রচেষ্টা নিয়ে যে কোনো গল্প সাজাতে গেলে তার পেছন বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমর্থন থাকা চাই। মহাশূন্যে রকেট উধাও হয়ে যেতে পারে, কিন্তু যদি সে রকেট পৃথিবী থেকে যাত্রা করে, আর যদি তাতে মানুষ থাকে, তাহলে কাহিনীর ঘটনাগুলিকে তথ্যসমর্থিত বৈজ্ঞানিক ধাঁচে পরিবেশন করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

তবে এটা খুব একটা বাধা হওয়ার কথা নয়। একদিক থেকে বলতে গেলে, দুর্ঘটনার কথা বাদ দিলেও মেশিনের নীরস নিষ্প্রাণ ভবিষ্যৎ-ঘোষণা ক্ষমতার সামনেও মানুষের আচরণের অজানা অনেক তুচ্ছ অভিপ্রকাশ সব সময়েই ঘটে যাচ্ছে। আবার আর এক দিক থেকে দেখা যাচ্ছে, সাধারণ পাঠক সম্প্রদায়ের একটা বিপুল অংশ বৈজ্ঞানিক কারিগরীর মধ্যে আজও রঙীন কল্পনা ফ্যানটাসীর যথেষ্ট খোরাক পেয়ে যাচ্ছেন। কোনো ভদ্রলোক যতদিন না নিজে ভারহীনতার অভিজ্ঞতা পাচ্ছেন, কিংবা রকেটে চেপে প্রচণ্ড গতিতে শূন্যে ওঠবার প্রত্যক্ষ অনুভূতির সুযোগ না পাচ্ছেন, কিংবা একটা প্রকাণ্ড অঙ্কবিশারদ কমপিউটার যন্ত্রের অপরিসীম সূক্ষ্ম জটিল বিপুল কলকব্জার অন্তত একটি

ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেও চোখ চালিয়ে সেখানে কি হচ্ছে তা দেখবার সৌভাগ্য লাভ না করছেন, ততদিন তাঁর কাছে এই সব জিনিসের শুধুমাত্র ধারণাটুকুই বিরাট বিস্ময়ের উপাদান হয়ে
থাকবেই।

আশ্চর্য অবাক বিস্মিত হয়ে যাওয়ার এই অনুভূতির ওপরেই সায়ান্স-ফিকশ্যন জমে ওঠে এবং আরও জমতে থাকবে যতই মানুষ তার সামনে ক্রমশ প্রসারমান বিপুলতর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করার উপযোগী গল্পকাহিনীর মধ্যে অবগাহন করতে চাইবে এবং যতই অন্ধকার রহস্যের জগতে—মহাশূন্যে, ভূমণ্ডলে, অন্য কোনো বৈরী গ্রহে কিংবা নিজেরই মনে বা দেহের মধ্যে মানুষের অভিযানের বিজয়গর্বে এবং ব্যর্থতার হীনতায় অংশ নিতে চাইবে।

প্রথম প্রকাশ: আশ্চর্য!, জানুয়ারী, ১৯৬৭
ইংরেজী সাপ্তাহিক 'নাউ' থেকে অসীম বর্ধন অনুদিত
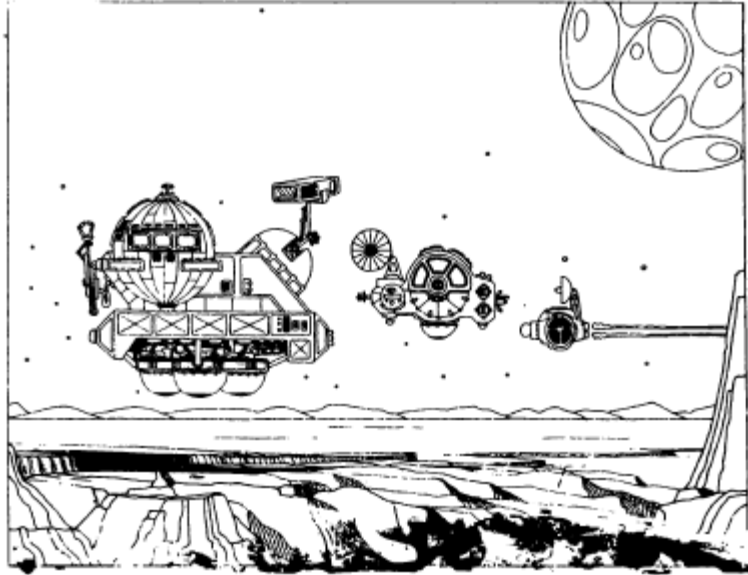
সূচিপত্রে ফিরে যান

মাইক্রোমেগসের পৃথিবী যাত্রা

শান্তি ঠাকুর

সিরিয়াস (লুব্ধক) নক্ষত্রপুঞ্জের একটি গ্রহের সুস্থ সবল এক যুবক। কিছুদিন আগে যখন সে উইটিবির মতো আমাদের এই ছোট্ট পৃথিবীতে এসেছিল হঠাৎ তার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। নাম ছিল তাঁর মাইক্রোমেগস। মাথায় প্রায় সোয়া লক্ষ ফুট উঁচু হবে। চলবার সময় পা পড়ত চব্বিশ মাইল অন্তর। পেটের ঘেরটা অর্থাৎ চওড়া পঞ্চাশ হাজার ফুট! নাকটা লম্বা ছিল দু হাজার তিনশ তেত্রিশ ফুট।

ছেলেটি বেশ সুশিক্ষিত এবং স্বভাবও মার্জিত! বয়স মাত্র দুশ পঞ্চাশ বছর। এরই মধ্যে নিজের গ্রহের সব চাইতে নাম করা বিশ্ববিদ্যালয়ের সে ছাত্র। অঙ্ক শাস্ত্রের রেখা গণিতে আগেই অনার্স পেয়েছে।

চারশ পঞ্চাশ বছরে যেদিন পা দিল সেদিনও তার কৈশোরই বলতে হবে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন এই ছোট ছেলেটি কিন্তু এরই মধ্যেই ছোট ছোট প্রায় অদৃশ্য জীবাণুগুলিকে কেটে ছিঁড়ে পরীক্ষা করে এক তুমুল কাণ্ড ঘটিয়ে দিল। জীবাণুগুলির ব্যাস হবে হয়ত একশ ফুটের মতো। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তো এগুলি দেখতেই পাওয়া যায় না।

এইসব জীবাণু নিয়ে গবেষণা করতে করতে কিছু প্রবন্ধও সে লিখে ফেলল। এই প্রবন্ধই হল কাল। রাজ্যের সরকারী কর্তৃপক্ষ দেখলো মাইক্রোমেগস বহু অনৈতিক, অধার্মিক এবং অ-শাস্ত্রীয় কথা প্রবন্ধে লিখেছে। গোঁড়া ধার্মিকদের আঘাত করা হয়েছে। যেমন বলা যেতে পারে সে লিখেছে সিরিয়াস নক্ষত্রপুঞ্জের গ্রহগুলির ডাঁশ এবং শামুকের শারীরিক গঠন তত্ত্বের কোন বিশেষ প্রভেদ নেই।

সরকারের অন্যায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মাইক্রোমেগস প্রতিবাদ জানাল। মামলা চলল প্রায় দুশ কুড়ি বছর। শেষ পর্যন্ত গোঁড়া ধার্মিকদেরই জয় হল। বিচারকদের সরকারের বিরুদ্ধে রায় দেবার সাহস হল না। তারা বইটি না পড়েই তীব্র নিন্দা করে মাইক্রোমেগসকে আটশ বছরের নিবার্সন দণ্ড দিয়ে রাজ্য ত্যাগ করতে বললেন।

মাইক্রোমেগস সরকারের নামে এক ব্যঙ্গ সঙ্গীত রচনা করে সোজা গ্রহ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল। গ্রহ নক্ষত্রগুলির মাধ্যাকর্ষণ এবং অন্যান্য আকর্ষণ বিকর্ষণের নিয়ম সম্বন্ধে তার খুব ভাল জ্ঞান ছিল। এমন কি সে এও জানত যে কেমন করে সূর্যের রশ্মির সাহায্যে অথবা ধূমকেতুর উপর চেপে জলের মধ্যে মাছের মতো হাওয়াতে কেমন করে চলতে হয়। সুতরাং গ্রহ যাত্রায় তার কোন বাধাই হল না।

কয়েক বছর চলতে চলতে একদিন সে শনিগ্রহে পৌঁছে গেল। নিজের গ্রহের তুলনায় শনিগ্রহ তার কাছে অত্যন্ত ছোট মনে হল। ওখানকার ক্ষুদ্র প্রাণীগুলিকে দেখে পোকার মতো মনে হতে লাগল! ওদের দেখে সে হেসেই বাঁচে না। শনিগ্রহের বাসিন্দারা গড়ে ছ'হাজার ফুটের বেশী উঁচু হবে না। মাইক্রোমেগস বেশ বুদ্ধিমান ছিল। সুতরাং সে জানত যে শারীরিক আকারে ছোট হলেই প্রাণীকে তুচ্ছ মনে করাটা মোটেই সুবুদ্ধির কাজ হবে

না। প্রথমে মেলামেশার একটু কষ্ট হল। ক্রমে সকলের সঙ্গেই বেশ ভাব জমে গেল। দেখল শনিগ্রহের জীবেরাও বেশ বুদ্ধিমান। শনি গ্রহের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালকের সঙ্গে বন্ধুত্ব খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। নিজে ভদ্রলোক কোন গবেষণা করেন নি। তবে তিনি অপরের দুর্বোধ্য গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত অতি সহজেই মাইক্রোমেগসকে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।

মাইক্রোমেগস জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা! তোমাদের গ্রহের লোকেরা কটা ইন্দ্রিয় দিয়ে রূপ-রস উপভোগ করে আর জ্ঞান অর্জনই বা করে কটা দিয়ে?"

"কর্ম ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞান ইন্দ্রিয় মিলিয়ে বাহাত্তরটি ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা কাজ করি।"

শনিগ্রহের শিক্ষালয়ের পরিচালক বলে চলল, "এই সীমিত সংখ্যা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আমরা বহুদিন ধরে অভিযোগ করে আসছি। কারণ আমাদের কল্পনা শক্তি আমাদের সাধারণ প্রয়োজনের সীমারেখাকে অতিক্রম করে চিরদিনই বেড়ে চলেছে। অতএব মাত্র এই বাহাত্তরটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদের পঞ্চ চন্দ্র যুক্ত গ্রহের চারপাশের আলোক রাশিকে ভেদ করে যাওয়া সম্ভব নয়। এই ক্ষুদ্রসীমায় আবদ্ধ থাকতে চাই না। আরও মজার কথা হল এই যে এই বাহাত্তরটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কাজ করতে করতেও মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা নিষ্কর্মা হয়ে যাচ্ছি।"

একথা শুনে মাইক্রোমেগস শনিগ্রহবাসীকে বলল, "আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে তোমরা অন্ততঃ কিছু না কিছু করছই। আমরা সিরিয়াসবাসীরা প্রায় এক হাজার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপ রস ইত্যাদি অনুভব করি। তবুও আমরা মনে মনে অতৃপ্ত। আমাদের মনে হয় এই বিরাট বিশ্বে হয়ত ভ্রমণ করে আমি নিজেও দেখেছি যে আমাদের তুলনায় উন্নত এবং নিম্নতর অনেক প্রাণী রয়েছে, সর্বত্র দেখলাম বুদ্ধিজীবী প্রাণী মাত্রেই নিজের প্রয়োজনের বাইরে আকাঙ্ক্ষাকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলেছে। আমার মনে হয় শিগগিরই হয়ত এমন একটা গ্রহে পৌঁছে যাব সেখানে দেখব লোকের কোন অভাবই নেই।"

দুই বন্ধুতে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলল! সিরিয়াসবাসী শনিগ্রহবাসীকে জিজ্ঞেস করল, "ভাই শনিগ্রহের লোকেরা কতদিন বাঁচে?"

"আমাদের গড় আয়ু খুবই কম," দীর্ঘশ্বাস পেলে শনিগ্রহবাসী উত্তর দিল।

সিরিয়াসবাসী সমবেদনা জানিয়ে বলল, "আমাদেরও ঠিক একই অবস্থা! মৃত্যুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আমরা প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছি। বোধ হয় প্রকৃতির এই নিয়ম সর্বব্যাপী।"

শনিগ্রহবাসী বলল, "বড়ই পরিতাপের বিষয় আমাদের গ্রহের অতি সামান্য সংখ্যক লোকই পাঁচশ সূর্য পরিক্রমণের বেশী বাঁচে। (পৃথিবীর বছর হিসাবে এটা পনের হাজার) এই সামান্য জীবনে কি করা যায়? কোন কিছু শিখতে আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু এসে হাজির। জীবনের কোন সুখই আর ভোগ করা হয় না।" মাইক্রোমেগস মুচকি হেসে বলল, "তুমি বৈজ্ঞানিক না হয়ে দার্শনিক হলে বুঝতে যে তোমাদের তুলনায় প্রায় সাতশ গুণ বছর বেশী বেঁচেও আমাদের ঐ একই দশা। আমি এমন গ্রহে ঘুরেছি যেখানে হাজার গুণ বেশী বছর বেঁচেও তারা আজও মৃত্যুকে জয় করবার চেষ্টায় আছে। অবশ্য আবার এমনলোকও দেখেছি যারা সামান্য জীবন কালেই নিজের কর্তব্য করে বিনা অভিযোগ মৃত্যুকে বরণ করে। সমগ্র বিশ্বের বাইরের পরিস্থিতি যদিও আলাদা তবু মূলে সবই এক

সূত্রে গাঁথা। বিভিন্ন গ্রহে পদার্থের গুণ, মাত্রা এবং সংখ্যায় যথেষ্ট প্রভেদ হবেই। আচ্ছা তোমাদের শনিগ্রহে বাস্তব দৃষ্টিতে পদার্থের প্রধান গুণ কত ছিল?"

"আমাদের এখানে পদার্থের বিস্তার, গতি, মাধ্যাকর্ষণ, বিভাজন, ভর ইত্যাদি নানা গুণের সংখ্যা প্রায় তিনশ হবে," শনিগ্রহবাসী উত্তর দিল।

"এই সংখ্যা খুবই অল্প। অবশ্য তোমাদের গ্রহের সীমাই বা কতটুকু। গ্রহের তুলনায় প্রাণীদের আকারও ছোট। ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির সংখ্যাও কম। আচ্ছা তোমাদের চোখে সূর্যের রং কি?"

"একটু হলদে মিশ্রিত সাদা রং। বিশ্লেষণ করলে ওতে আমরা সাতটি রং পাই।"

"আমরা কিন্তু সূর্যকে দেখি লালচে মতো। সিরিয়াসবাসী সূর্যের একটি কিরণকে বিশ্লেষণ করলে ওতে একত্রিশটি মূল রং-এর সন্ধান পায়। আমি যতগুলি জ্যোতিষ্ক দেখেছি তার একটা আর একটার সঙ্গে মোটেই মেলে না। প্রত্যেকের রং আলাদা।" বিজ্ঞান বিষয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হবার পর ঠিক হল ওরা দুজনেই একসঙ্গে বৈজ্ঞানিক তথ্য সন্ধানের জন্য গ্রহ ভ্রমণে বেরুবে। অঙ্ক শাস্ত্রের মাপজোকের যন্ত্র, দূরবীণ আরও অনেক ছোটখাট জিনিসপত্র নিয়ে তৈরি হল। হঠাৎ শনিগ্রহবাসীর স্ত্রী কেমন করে খবর পেয়ে হাজির। মহিলা দেখতে বেশি বড় নয় মাত্র তেত্রিশ ফুট উঁচু। কিন্তু চেহারায় তার এমন একটা মাধুর্য রয়েছে যাতে দৈহিক খর্বতা অনায়াসেই ঢাকা পড়ে যায়। খবর পেয়ে স্বামীর উপর চটে লাল। বলতে লাগল, "এ কেমন কথা! দেড় হাজার বছর তোমার সঙ্গে পরিচয়ের পর মাত্র দুশ বছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে। মধু যামিনী শেষ হবার আগেই তুমি চললে ঐ দৈত্যটাব সঙ্গে। শনিগ্রহবাসী কেউ আজ পর্যন্ত নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে কোথাও যায় নি। আমি বুঝতে পেরেছি তুমি ঐ দৈত্য-দেশে গিয়ে কোন দৈত্যের মেয়েকে আবার বিয়ে করবে।"

বেচারা শনিগ্রহবাসী অপ্রস্তুত। বহু কষ্টে স্ত্রীকে বুঝিয়ে শান্ত করে কোন রকমে শেষ পর্যন্ত অনুমতি পেল। তারপর দুজনে রওনা হল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সঙ্গে করে। শনিগ্রহ একটি বলয়ে ঘেরা। শনি থেকে ওরা লাফিয়ে পড়ল ঐ বলয়ে। বলয় থেকে প্রথম চাঁদে— তারপর দ্বিতীয় চাঁদে এমনি করে চলল তাদের যাত্রা। ভাগ্য ভাল ছিল রাস্তায় পেয়ে গেল এক ধূমকেতুকে। অমনি লাফিয়ে চেপে বসল তার ঘাড়ে। কয়েক কোটি মাইল চলবার পর হাজির হল বৃহস্পতি গ্রহে। সেখানে বছর কয়েক কাটিয়ে অনেক কিছু খোঁজ খবর নিয়ে এবার এল মঙ্গলগ্রহে। এ গ্রহটি মোটেই ওদের ভাল লাগল না। এত সঙ্কীর্ণ জায়গায় যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। কাজেই তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালিয়ে গেল। পথ চলতে চলতে ওরা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বিশ্রাম করবার মতো একটু জায়গাও দেখতে পেল না। মনে মনে ভাবল মঙ্গলগ্রহে একটু কষ্ট করে কিছুক্ষণ থেকে বিশ্রাম করে এলেই হত।

শেষ পর্যন্ত ছোট একখণ্ড ভূমি ওদের চোখে পড়ল! এই ভূমিখণ্ডই হল আমাদের পৃথিবী। ওরা যদি একান্ত ক্লান্ত না হত তবে কিছুতেই আমাদের এখানে নামবার কথা ওদের মনেই হত না। হয়ত আরও দূরে কোথাও চলে যেত। যাক শেষ পর্যন্ত ধূমকেতুর লেজ থেকে লাফিয়ে পড়ল ধ্রুবতারার কাছে—অরোরা বোরি এলিস নামে জ্যোতি মালার

উপর। এই বিচিত্র যানে আরোহণ করে ১৯৩৭ সালের ৫ই জুলাই এরা এসে হাজির হল বাল্টিক সাগরের ধারে।

পৃথিবীতে নেমে ওরা দুজন খানিকক্ষণ আরাম করল। তারপর এই অতি ক্ষুদ্র গ্রহটির উত্তর প্রান্ত থেকে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত বাচ্চাদের মতো কৌতূহল নিয়ে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় ঘুরে বেড়িয়ে নিল। মাইক্রোমেগস প্রতি পদক্ষেপে প্রায় তিরিশ হাজার ফুট যাচ্ছিল। বেচারা শনিগ্রহবাসী কোন রকমে দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ওর সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছিল।

মাইক্রোমেগস পায়ে হেঁটেই সমুদ্র পার হচ্ছিল। বর্ষার জলে খেতখামার ভেসে গেলে লোকে যেভাবে পথ চলে এ কতকটা সে রকম। সমুদ্রের জল কোন রকমে ওর গোড়ালি অবধি উঠেছিল। শনিগ্রহ বাসীর অবশ্য হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলতে হয়েছিল, সুতরাং তার কষ্ট একটু বেশীই হয়েছে।

মাত্র ছ ঘণ্টায় ওরা দুটো গোলার্ধই ঘুরে নিল। চলতে চলতে লক্ষ্য করে পৃথিবীর বুকে হামা দিয়ে চলে মানব নামে একটি অতি সূক্ষ্ম প্রাণীর সন্ধান পেল। যাদের বিনা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে পাওয়াই ভার। শনিগ্রহবাসীর কিন্তু ধারণা হল, এই গ্রহে কোন প্রাণীই নেই।।

মাইক্রোমেগস বোঝাল, "এত তাড়াতাড়ি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিৎ নয়। বহু ছোট ছোট তারা আছে যাদের তুমি খালি চোখে দেখতে পাও না। কিন্তু আমি তাদের অনায়াসেই দেখতে পাই। বল, তুমি দেখতে পাও না বলে তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করবে?"

"আমি শুধু চোখে নয়, হাত দিয়েও অনুভব করবার চেষ্টা করেছি।"

"তোমার স্পর্শশক্তি তো ক্ষীণ হতে পারে?"

"যাই হোক এই গ্রহটা আমার কাছে এক মজার গ্রহ মনে হয়। রেখার মতো নদীগুলির ধারা একবার দেখ। একটার গতিপথও সোজা নয়। আর এই পুকুরগুলি দেখ (সমুদ্র দেখিয়ে বলছে) এগুলি না গোল না চৌকো। যেন একটা ডিম। অদ্ভুত এর চেহারাটা। আর এই কাঁকর পাথরগুলি দেখ, (পাহাড় দেখিয়ে বলছে) কি বিশ্রী! এর উপর দিয়ে চলতে গিয়ে আমার পা তলটা একদম ছড়ে গিয়েছে। কোন বুদ্ধিমান প্রাণীর এ গ্রহে থাকা সম্ভব নয়।"

"এই বিশ্ব নানা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। তুমি এই গ্রহকে বৃহস্পতি এবং শনির সঙ্গে তুলনা করছ বলে এটা তোমার কাছে এত খারাপ মনে হচ্ছে।"

দুজনে বেশ কিছুক্ষণ তকাতর্কি করেই চলেছে। হঠাৎ মাইক্রোমেগসের গলার হীরার হারটি গেল ছিঁড়ে। এই হীরার মধ্যে সবচেয়ে বড় হীরাটির ওজন ছিল প্রায় পাঁচমণ। শনিগ্রহবাসীর হঠাৎ খেয়াল হল, আচ্ছা এই এক টুকরা হীরা দিয়ে তো দূরবীণের কাজ বেশ চলতে পারে। প্রায় একশ ফুট ব্যাসের একটি হীরার টুকরা তুলে নিয়ে নিজে চোখে লাগাল। মাইক্রোমেগসও ব্যাপারটা বুঝে নিল। সেও প্রায় পাঁচশ হাজার ফুট ব্যাসের এক টুকরা হীরা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে আরম্ভ করল।

শনিগ্রহবাসী বাল্টিক সাগরের দুটি ঢেউয়ের মাঝে কি একটা ক্ষুদ্র জীব দেখতে পেল। আসলে ওটা ছিল তিমি মাছ। অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে সে ওটিকে তুলে নিয়ে বুড়ো

আঙ্গুলের নখের ওপর রেখে সিরিয়াসবাসীকে দেখাল। মাইক্রোমেগস এই সূক্ষ্ম জীবটিকে দেখে হেসেই খুন।

এই সূক্ষুদ্র প্রাণীর ভিতর কল্পনাশক্তি এবং স্বাধীন চিন্তা থাকা সম্ভব কিনা, এই নিয়ে দুজনে বেশ কথা কাটাকাটি হতে লাগল। যাই হক, তারা শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এল যে, এই ক্ষুদ্র গ্রহের সমস্ত প্রাণীকেই নখের ওপর রাখা যেতে পারে। এবং এই জীবদের মন এবং বুদ্ধি বলে কোন জিনিসই থাকা সম্ভব নয়।

মাইক্রোমেগস দূরবীণের সাহায্যে হঠাৎ তিমির মতো আরও কি একটা প্রাণীকে জলের উপর সাঁতার দিতে দেখতে পেল। ওটা ছিল একটি জাহাজ। কিছুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক উত্তর মেরুতে পর্যবেক্ষণ করে বিফল হয়ে ফিরছিলেন। হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে মাইক্রোমেগস জাহাজটাকেও নিজের নখের উপর বসিয়ে নিল। শনিগ্রহবাসী বলল, "এটা আগের জীব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।"

মাইক্রোমেগস খুব ভাল করে নিরীক্ষণ করবার জন্য এবারে ওটাকে হাতের তেলোতে নিয়ে দেখতে লাগলো। এদিকে জাহাজের আরোহীরা ভাবল, জাহাজটা হঠাৎ তুফানে ঠেলে এনে এক পাথরে ধাক্কা দিয়েছে। নাবিকের দল মদের পিপেতে বসে মাইক্রোমেগসের হাতের উপরেই ঘুরতে আরম্ভ করল। মাইক্রোমেগসের মনে হতে লাগল অদৃশ্য কোন বস্তু যেন তার হাতের উপর দিয়ে চলে তাকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। যারা নেমেছিল, অণুবীক্ষণে মাইক্রোমেগস তাদের দেখতেই পাচ্ছিল না। অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে দেখবার পর অস্পষ্টরূপে কিছু কিছু দেখতে পেয়ে দু'বন্ধুর আশ্চর্যের সীমা রইলো না।

তারা দেখল, একেবারে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কিছু জীব নীচে নেমে কি যেন নীচে নামাচ্ছে আর উপরে তুলছে। শনিগ্রহবাসী এক দৃষ্টিতে দেখে সহসা উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল, "এই তুচ্ছ জীবাণুর দল খুব সম্ভব প্রার্থনা করবার জন্য বসে বা দাঁড়িয়ে আছে।"

মাইক্রোমেগসও একজন নিপুণ বৈজ্ঞানিক। কথার সত্যতা পরীক্ষা করতে তারও দেরী হল না। সে বুঝতে পারল এই প্রাণীরা নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছে।

"এত ক্ষুদ্র জীব কি করে কথা বলতে পারে," শনিগ্রহবাসী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল। "কোন বিষয়ে কথা বলতে হলে অন্ততঃ কিছুটা বিচারবুদ্ধির জন্য প্রয়োজন আছে। বিচারবুদ্ধির জন্য প্রয়োজন মস্তিষ্কের। পরিপুষ্ট মস্তিষ্কের জন্য আবার আত্মার অস্তিত্ব চাই। এত ক্ষুদ্র জীবের আত্মা থাকা মোটেই সম্ভব নয়।"

"কেন? এই মাত্র তুমি বলেছিলে যে ও প্রার্থনার মতো হাবভাব করছে। বিচারশক্তি না থাকলে প্রার্থনার ইচ্ছা কি করে সম্ভব হয়?"

"প্রথমে কিছু বলা ঠিক নয়। আগে ভালভাবে এদের নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন।"

"ঠিক কথা," এই বলে মাইক্রোমেগস নিজের নখ কেটে একটা ভেঁপুর মতো মুড়ে নিয়ে গোটা জাহাজটাকে এতে ঘিরে নিয়ে ভেঁপুর চোখ দিকটা কানে লাগিয়ে নিল। এবারে জাহাজের যাত্রীদের ক্ষীণ আওয়াজ বেশ কিছুটা স্পষ্টভাবে শোনা যেতে লাগল। দুজনেই বুঝতে পারল এ প্রাণীরা বুদ্ধিমান প্রাণীদের মতো নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। ওরা দুজনেই এদের সঙ্গে কথা বলবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়ে উঠল।

মাইক্রোমেগস কিন্তু ভালভাবেই জানত যে এরা দুজন ওদের কিছু বললে সেই শব্দ ওদের কানে বজ্রপাতের মতো বিকট এবং অসহ্য মনে হবে। সুতরাং দাঁত খুঁটবার দুটো খড়কে দাঁতে চেপে ধরে গলার স্বরকে খুব নিচু করে মাইক্রোমেগস ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করল—"ওহে অদৃশ্য জীবাণুবৃন্দ, সৃষ্টি কর্তার সৃষ্টির এই অপূর্ব লীলা দেখে আমি মুগ্ধ। তোমাদের মতো সূক্ষ্ম জীবকেও তিনি কি অদ্ভুত কৌশলে সৃষ্টি করেছেন?"

হাতের উপরের জীবেরা এই অদৃশ্য আকাশবাণী শুনে কেউ কেউ তো ভূত তাড়াবার মন্ত্র জপ করে বসল। ওদের এই ভয়চকিত অবস্থা দেখে শনিগ্রহবাসীর খুব দয়া হল। মাইক্রোমেগস অপেক্ষা আরও আস্তে আস্তে সে মনুষ্যরূপী ঐ জীবদের জিজ্ঞেস করতে লাগল, "তোমরা কে-কেমন করে, কিজন্য এবং কোথেকে এই পৃথিবীতে হাজির হলে?" এ ছাড়া আরও বহু প্রশ্ন তাদের জিজ্ঞেস করল, "তোমরা তোমাদের বর্তমান অবস্থিতিতে সন্তুষ্ট কিনা—তোমাদের আত্মা আছে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি।"

এরই মধ্যে এক অঙ্কশাস্ত্রবিদ হঠাৎ বলে উঠলো, "হে অজ্ঞাতনামা মহাপ্রাণী! তুমি অহঙ্কারে ডগমগ হয়ে যে ঘুরছ, তোমার উচ্চতা যদিও পাঁচ হাজার ফুট তবুও..."

শনিগ্রহবাসী কথা শুনে তো থ! নিজের বন্ধুকে লক্ষ্য করে বলল, "আশ্চর্য! এই ক্ষুদ্র জীব এত অল্প সময়ে আমার উচ্চতা সঠিকভাবে কি করে মাপল? নিশ্চয়ই এরা জ্যামিতিতে বিশেষজ্ঞ। এতটুকু অণুতে এত বুদ্ধি! সত্যিই সৃষ্টির রহস্য বিচিত্র!"

"আমি শুধু তোমার উচ্চতা কেন, তোমার বন্ধুর উচ্চতাও এক্ষুণি বলে দিতে পারি।" মুহূর্তের মধ্যে কয়েকজন গণিতজ্ঞ মিলে মাইক্রোমেগসের সামনে লম্বা একটা গাছের মতো কি দাঁড় করিয়ে ত্রিকোণমিতির সাহায্যে মেপে বলল—"এক লক্ষ কুড়ি হাজার ফুট।"

মাইক্রোমেগসের আশ্চর্যের সীমা রইল না। অজ্ঞাতসারে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "হায় ভগবান, এত তুচ্ছ জীবকে তুমি এত বুদ্ধি দিয়েছ? তোমার অসাধ্য কিছুই নেই। কোনদিন হয়ত দেখব তুমি অণু থেকে আবার অণুতর কোন বস্তু সৃষ্টি করে বসেছ। আমি আমার যাত্রাপথে এমনি জীব দেখেছি যার এক ফুট বিস্তার এই পৃথিবীতে সঙ্কুলান হবে না। আবার আমার এ বিশ্বাসও আছে যে এই অদৃশ্য জীবাণু হতে ছোট কোন জীবও হয়ত তোমার সৃষ্টিতে আছে যারা বুদ্ধিবৃত্তিতে মহানতমের অপেক্ষাও অনেক বড়।"

জাহাজের এক দার্শনিক মাইক্রোমেগসকে বলে বসল, "মনুষ্য হতে সূক্ষ্ম বুদ্ধিমান জাবও বর্তমান আছে।"

মাইক্রোমোগস আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলল, "হে বুদ্ধিমান অণুদল। ভগবান নিশ্চয়ই তোমাদের সব চাইতে বেশী সুখী করে সৃষ্টি করেছেন। কারণ আনন্দময় আত্মা ছাড়া তোমাদের মধ্যে আর কিছু রাখেন নি। তোমাদের মতো ক্ষুদ্র প্রাণীর মধ্যে অন্য পদার্থ আর কোথায় থাকবে? এই ক্ষুদ্র গ্রহের ক্ষুদ্র প্রাণী তোমরা বিশ্বের সমগ্র আনন্দে পরিপূর্ণ।"

জাহাজের দার্শনিক অনেকেই দুঃখের সহিত মাথা নাড়ছিল। এক স্পষ্টভাষী দার্শনিক কিন্তু বলে উঠল, "সমাজে নগণ্য কয়েকজন লোক ছাড়া সকলেই প্রায় ধূর্ত, মূর্খ এবং লম্পটের দল। দুষ্টতার মূল যদি ভৌতিক কারণ হয়, তবে আমাদের মধ্যেও প্রচুর ভৌতিক পদার্থ বর্তমান। আর দুঃখের উৎপত্তি যদি জ্ঞান থেকে হয়, তবে সে জ্ঞানের অভাবও আমাদের নেই। আপনারা জেনে রাখুন, এই যে সময়ে আমরা আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি

ঠিক এই সময়েই টুপীধারী এক লক্ষ প্রাণী, পাগড়ীধারী এক লক্ষ ভাইকে হত্যা করবার জন্য ব্যস্ত। এই হত্যাকাণ্ড সংস্কৃতির নামে সেই আদিমকাল থেকে চলে আসছে।"

মাইক্রোমেগস জিজ্ঞেস করে জানতে পারল যে গোড়ালি অপেক্ষা ছোট্ট একটা জায়গা প্যালেস্টাইনে এই ধ্বংসকার্য চলছে।

"কি দুঃখের কথা!" মাইক্রোমেগল বলল—"ইচ্ছে করে একবার পায়ে চেপে ঐ অশান্তি সৃষ্টিকারীর দলকে শেষ করে দিই।"

দার্শনিক প্রবর বললেন "ব্যস্ত হবেন না, ওরা নিজেরাই কাটাকাটি করে মরবে। ওদের নিজেদের হাতেই ওদের মৃত্যুবাণ রয়েছে। তাছাড়া এই সৈন্যদের মেরে লাভ নেই তো, যারা ওদের পরিচালনা করে সেই কর্তাব্যক্তিদেরই মারতে হলে মারা উচিত।"

"আমি তো দেখেছি তোমাদের পৃথিবীর লোক আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী বুদ্ধিমান," মাইক্রোমেগস বলল। "তোমার পেশা কি বল ত?"

"আমরা মক্ষিকা অস্থি সম্বন্ধী মনোবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ।" দার্শনিক বললেন। "আমরা রেখা-গণিতের সূক্ষ্ম বিচার করতে পারি। দুতিন বিষয়ে একমত হলেও প্রায় হাজার বিষয়ে আমাদের মতে মিল নেই—এসব নিয়ে তর্কও করি প্রচুর।"

এরপর মাইক্রোমেগস জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করল। ওদের ভিতর যে বৈজ্ঞানিক ছিল, মুহূর্তের মধ্যে উত্তর দিয়ে দিল। দর্শন বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন ভাবে দিয়ে দিল।

সর্বশেষে এক দার্শনিক সাহস করে বলেই ফেলল—"ভগবান মঙ্গলময়—সব কিছুই মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের মতো দৈত্যাকার প্রাণী, গ্রহ, নক্ষত্র এবং এ সবের গতিবিধি ভগবান মানুষের উপযোগ এবং উপভোগের জন্য সৃষ্টি করেছেন।"

এক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এই জীবাণুর এত দম্ভ দেখে মাইক্রোমেগস এবং শনিগ্রহবাসী উভয়েই হো হো করে হেসে উঠল। এই হাসির শব্দ যেন প্রলয়ের ঘোর ভয়াল শব্দের মতো বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকদের কানে গিয়ে লাগল। শব্দ শুনে ওদের কান ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। জাহাজটা ধাক্কা লেগে মাইক্রোমেগসের নখের উপর থেকে একেবারে শনিগ্রহবাসীর পকেটে গিয়ে পড়ল।

শনিগ্রহবাসী ধীরে ধীরে পকেট থেকে জাহাজটা বের করতেই মাইক্রোমেগস নিজের একখানা দর্শনের বই ঐ ক্ষুদে পণ্ডিতদের উপহার দিয়ে জাহাজটা আবার জলে ভাসিয়ে দিল।

জাহাজের বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক দল প্যারিসে পৌঁছে ওখানকার বিজ্ঞান পরিষদের হাতে বইখানা জমা দিল। পরিষদ অধিকর্তা বই খুলে দেখলেন কোথাও কিছু লেখা নেই। একেবারে আনকোরা সাদা বই।

অধিকর্তা অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন "এ রকম একটা কিছু হবে আমি আগেই সন্দেহ করেছিলাম।"

প্রথম প্রকাশ : আশ্চর্য!, জানুয়ারি, ১৯৬৪
মূল রচনা : ভলটেয়র

ঈশ্বরের ছেলেখেলা

অনীশ দেব

প্রথম দিন

আজ দিদিমণি মাকে আর বাবাকে ডেকে বলেছে যে আমার নাকি বুদ্ধি কম, বোকা, ক্লাসে এরকম ছেলে একটাও নেই। কিন্তু আজ আমি একটা তারা বানিয়েছি, কি সুন্দর, কি রকম আলো। ওটা দেখে দিদিমণি খুব অবাক হয়ে গেছে, কিন্তু ভাবটা এমন যেন কিছুই হয়নি। বললো যে শুধু শুধু এতো শক্তি নষ্ট করে ওটা বানানোর কি দরকার ছিলো? আমি কিচ্ছু বলিনি। বলে কি হবে? সত্যি, তারাটা কি সুন্দর!

দ্বিতীয় দিন

আজকে অনেকগুলো গ্রহ তৈরি করেছি: চারটে বড়, দুটো মাঝারি, আর তিনটে ছোট ছোট। দিদিমণি দেখে খুব হেসেছে। বলেছে, এতোগুলো গ্রহ তৈরি করে লাভ কি হল? যেখানে ছ' ছ'টা গ্রহই হয় খুব ঠাণ্ডা নয় খুব গরম, তাতে প্রাণ তৈরি হতে পারবে না, শুধু শুধু সময় নষ্ট হল। আর বড়গুলোর ওজন বিরাট, আর নানান বিষাক্ত পদার্থে তৈরি—কোন কাজে আসবে না।

দিদিমণি কিচ্ছু বোঝে না। কাজে আসুক আর না আসুক তৈরি করার মধ্যে একটা দারুণ আনন্দ আছে।

ছ' নম্বর গ্রহটার চারদিকে যে রিংগুলো রয়েছে সেগুলো দেখতে কিন্তু চমৎকার!

তৃতীয় দিন

আজকে প্রাণ তৈরি করলাম। এখন বুঝতে পারছি আমাদের সবাই কেন কিছু তৈরি করাটাকে সবচেয়ে বেশি দাম দেয়।

বড় বড় জ্ঞানীগুণীদের মুখে শুনেছি বেঁচে থাকার অর্থ কি। তখন ভাবতাম, তার মানে শুধু বুঝি বয়েসে বেড়ে যাওয়া, বুড়ো হওয়া। এর আগে বেশ আনন্দেই ছিলাম ও অন্য বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করতাম, মহাশূন্যের বুকে যখন তখন পাড়ি জমাতাম, কোন অস্থায়ী তারায় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে 'নোভা' তৈরি করতাম, আরো কত কি!

কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছি, জীবনের একটা অর্থ আছে, দাম আছে। দিদিমণি ঠিকই বলেছিলো, দুটো মাঝারি আর একটা ক্ষুদে গ্রহতেই প্রাণ তৈরির পরিবেশ রয়েছে। তিনটে গ্রহেই প্রাণ তৈরি করলাম, কিন্তু সূর্য থেকে তিন নম্বর গ্রহটাতেই কেবল প্রাণ টিকে থাকতে পারলো।

আমি শুধু একটা নিয়মই তৈরি করে দিলাম—সেটা হল, বেঁচে থাকো!

চতুর্থ দিন

তিন নম্বর গ্রহটা আমার নাওয়া-খাওয়া কেড়ে নিয়েছে। ফুলে ওঠা সমুদ্রের মধ্যে প্রাণীরা কিলবিল করছে। আজ আর একটা নতুন নিয়ম জুড়ে দিয়েছি: বংশবৃদ্ধি করো!

যে সব প্রাণী ধীরে ধীরে সমুদ্রে তৈরি হচ্ছে সেগুলোর গঠন বেশ জট পাকানো, ছেলেরা সব আমাকে খেলতে ডাকছে, কিন্তু এতে এমন মজা যে ছেড়ে যাওয়া যায় না।

পঞ্চম দিন

বার বার আমি সমুদ্রের প্রাণীদের ধরে ডাঙায় নিয়ে এসেছি, বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি। যে ক'দিনে মরে যাওয়ার কথা তার চেয়ে বেশি দিন এরা বেঁচে থেকেছে। কিন্তু তারপর মরে গেছে। তবে অনেকদিনের চেষ্টায় আমিই জিতলাম। ওদের কারো কারো ডাঙা বেশ সয়ে গেলো।

ঠিকই ভেবেছিলাম, সমুদ্র এদের জীবনে গতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ ডাঙার প্রাণীগুলো সমুদ্রের প্রাণীদের পেছনে রেখে তরতর করে উন্নতির পথে এগিয়ে চললো। বেশ ভালো লাগছে।

ষষ্ঠ দিন

এতদিন যা করেছি তা আজকের তুলনায় কিছুই না। আজ আমি বুদ্ধি তৈরি করেছি। আজ একটা তিন নম্বর নিয়ম জুড়ে দিয়েছিঃ জানার চেষ্টা করো।

ক্ষুদে ক্ষুদে প্রাণী থেকে শেষ পর্যন্ত একটা দারুণ প্রাণী তৈরি হয়েছে। এটার দুটো পা, সোজা হয়ে হাঁটে, চলার সময় চারদিকে ফিরে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। প্রাণীটার হাত দুটো খুব দুর্বল, বুদ্ধিও তেমন নয়, কিন্তু সে একটার পর একটা সব জয় করে চলেছে। এমন কি পরিবেশকেও পর্যন্ত সে বাগ মানিয়েছে।

তারপর যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে বের করার চেষ্টা করছে আমার পরিচয়। দারুণ মজা লাগছে।

সপ্তম দিন

আজ ইস্কুল ছুটি।

এতো কষ্ট করে এতো কিছু তৈরি করার পর আজ খেলতে খুব ভালো লাগছে। এ যেন কোন সাদা বামন তারার প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে হারিয়ে দিয়ে ছুটে চলা, তারপর বিশ্রাম নিয়ে ক্ষয়ে যাওয়া শক্তি ফিরিয়ে আনা!

আজ দিদিমণি আবার মায়ের সঙ্গে বাবার সঙ্গে কথা বলেছে। দিদিমণি বলেছে, গত ক'দিনে আমার নাকি দারুণ উন্নতি হয়েছে। তবে আমার তৈরি জিনিসগুলো ঠিক নিয়মমাফিক হয়নি, উল্টোপাল্টা খাপছাড়া হয়েছে। তা ছাড়া, কাজটা নাকি খুব বিপজ্জনক ছিলো।

দিদিমণি বলেছে, এগুলো সব ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

কিন্তু আমার বাবা মা মত দেয়নি, তারা বলেছে সূর্য থেকে তাপ নিয়ে নিয়ে তিন নম্বর গ্রহের প্রাণীদের এমন একটা অবস্থা হবে যে তারা নিজেরাই এক তাপ পারমাণবিক

বিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। আমি ঐ প্রাণীদের যে সব নিয়মে বেঁধেছি তাতে নিজে থেকেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ওরা একদিন বিলুপ্ত হবে।

দিদিমণি বললো যে এর দায়িত্ব আমার মা বাবা তো আর নেবে না, সুতরাং দিদিমণিকেই যা ব্যবস্থা করার করতে হবে। কোনরকম ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়।

তর্কে শেষ পর্যন্ত কে জিতলো জানি না, আমি নিজের মনে সেখান থেকে সরে এসেছি। আমার মনটা যেন কেমন করছে। খুব খারাপ লাগছে।

ওটা নষ্ট হলে ক্ষতি কি? ওটা তো পুরানো হয়ে গেছে। আমি বরং এর চেয়েও ভালো কতগুলো গ্রহ তারা তৈরি করবো।

কিন্তু হাজার হলেও এটাই তো আমার হাতের তৈরি প্রথম জিনিস, এটা নষ্ট করতে গেলে মন খারাপ তো করবেই। যদি কোন প্রকাণ্ড ধূমকেতু সূর্যের দিকে সোঁ সোঁ করে ধেয়ে যায় তাহলে সে দৃশ্য আমি সইতে পারবো না তার চেয়ে বরং—

অষ্টম দিন

* * * *

প্রথম প্রকাশ : ফ্যানট্যাসটিক, অগাস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৮২

সূচিপত্রে ফিরে যান

বাতিক

অমিত চক্রবর্তী

দেওয়াল-ঘড়িতে স্প্রিং-এর কড়কড় আওয়াজ হতেই বিশ্বপতি কলমটাকে টেবিলের খাঁজে শুইয়ে মনে মনে ঘণ্টার আওয়াজ গুণতে শুরু করলেন। পরপর সাতবার আওয়াজ হতেই ঘড়ির দিকে তাকালেন এবং দেখে নিশ্চিত হলেন যে তাঁর হিসেবে কোন ভুলচুক হয়নি। এখন সন্ধ্যে ঠিক সাতটা; আটটা কিংবা সন্ধ্যে ছ'টা নয়। মাথার ওপর দুহাত তুলে আড়মোড়া ভাঙলেন বিশ্বপতি, এটা তাঁর বহুদিনের অভ্যেস। তারপর টেবিলের ড্রয়ারে চাবি দিলেন এবং পরপর দু'বার কলিং বেলটা টিপলেন। ফাঁকা অফিসে বৈদ্যুতিক ঘন্টার আওয়াজে বিশ্বপতির শরীরের ভেতরটা যেন ঝন্ঝন্ করে উঠলো। রোজই এমনটা হয় এবং শরীরের ভেতরে এই ঝন্ঝনানি স্নায়ুগুলোকে কেমন টান্টান্ করে দেয়। হয়তো এই জন্যেই প্রত্যেকদিন সন্ধ্যে সাতটায় পরপর দু'বার কলিংবেলটা টিপে থাকেন বিশ্বপতি।

অফিসের বেয়ারা-কাম-দারোয়ান রঘু ঘরে ঢুকে জানালাগুলো বন্ধ করে, একটা একটা করে আলোপাখার সুইচগুলো নেভায়। বিশ্বপতিও সেই ফাঁকে চেয়ারে ঝোলানো তোয়ালেটা দিয়ে মুখ মুছে অফিসের ব্যাগটা নিয়ে অফিসের বাইরে সিঁড়ির কাছটায় এসে দাঁড়ান। অফিস বলতে পেল্লায় এক হলঘর, তার এক কোণে গুটি তিনেক কেবিন যার সবচেয়ে ছোটটা পড়েছে বিশ্বপতির বরাদ্দে। রঘুও বাইরে বেরিয়ে আসে এবং সদর দরজায় তালা লাগাতে শুরু করে। সব কটা তালায় চাবি পড়তেই বিশ্বপতি সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেন এবং ঠিক এগারোটা ধাপ নিচে নামার পরেই ঘুরে দাঁড়ান। তারপর আবার হন্হন্ করে সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠে দরজার তালাগুলো টেনে দেখেন, সেগুলো ঠিকমতো লাগানো হয়েছে কিনা। এটাও বিশ্বপতির বহুদিনের অভ্যেস।

কিছুদিন হল, লালবাজার থানার মেন গেটের ঠিক উল্টো ফুটপাথে রেলিং-এর ধারে এক শনিঠাকুরের আবির্ভাব হয়েছে। কাচের বাক্সের ভেতর থাকেন তিনি। পুণ্যার্থীরা যাতে পয়সা-কড়ি দিতে পারে সেজন্য শনিঠাকুরের মাথার কাছে কাচের বাক্সের ওপর চৌকানো গর্ত কাটা; ভেতরে টাকা-কড়ি কেমন জমা হল বাইরে থেকে তা জানার ভারি সুন্দর ব্যবস্থা। প্রতিদিনের মতো আজও শনির মূর্তির সামনে দাঁড়ালেন বিশ্বপতি। ঘড়ির দিকে না তাকিয়েও তিনি বলে দিতে পারেন এখনকার সময়টা। সাতটা সতেরো। ডালহৌসি থেকে মিনিবাস যদি সাড়ে সাতটার মধ্যে ছাড়ে, তবে বাড়ী পৌঁছতে পৌঁছতে পৌনে ন'টা। বিশ্বপতি হাঁটার গতি বাড়ালেন।

বিপত্তিটা বাঁধলো জগুবাবুর বাজারের ঠিক মুখটায়। বিকট আওয়াজ করে দক্ষিণগামী মিনিবাসের সামনের বাঁদিকের চাকাটা ফাটলো। অ্যাদ্দিন ধরে যাতায়াত করছেন, বিশ্বপতির মনে পড়ে না। আগে কখনো চাকা পাল্টানোর জন্যে বাস থেকে নেমে দাঁড়াতে হয়েছে কিনা। আজকের ব্যাপারটাই কেমন গোলমেলে; বাসটা ছাড়তে অহেতুক দেরী করলে। অন্যদিন মিনিবাসে দাঁড়াতে হলেও পার্ক স্ট্রীটের আগেই বসার সীট পেয়ে যান।

আজ আশপাশের কোন যাত্রীরই ওঠার লক্ষণ দেখা যায়নি। তার ওপর কণ্ডাকটারের কাছ থেকে টিকিট কাটতে গিয়ে মানি ব্যাগের ভেতর কুড়ি টাকার একটা নোটের মাঝ বরাবর সেলোফেনের তাপ্পি ধরা পড়েছে এবং এক উটকো সহযাত্রীর কল্যাণে দুশো তিরিশ টাকা দামের নতুন জুতো কাদায় ছয়লাপ হয়েছে। সেগুলো তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মিনিবাসের টায়ার-পাল্টানো দেখার মতো বিড়ম্বনা আর সয় না। বিশ্বপতি ঘড়ি দেখেন। নয় নয় করেও প্রায় মিনিট পঁচিশেক সময় নষ্ট হল আজ। রাত নটার খবরটা আজ আর শোনা হবে না। বিরক্তিতে চোখ-মুখ কুঁচকে আসে ওঁর।

বাসস্ট্যাণ্ড থেকে হেঁটে বাড়ি পৌঁছতে সময় লাগে মিনিট সাতেক। গোটা রাস্তাটা অন্ধকার লোডশেডিং চলছে। বাড়ি পৌঁছে দরজায় টোকা দেবার সময় বাঁ-হাতের কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখলেন। আবছা আলোয় মনে হল ঘড়ির ছোট কাঁটাটা দশটা দশের কাছাকাছি এসেছে। স্ত্রী সুরমা দরজা খুলতেই বললেন, না দেখে দরজা খোল কেন? কে কড়া নাড়ছে দরজার ভেতর থেকে সেটা জানতে চাওয়া যায় না? কোনদিন একটা কাণ্ড হবে।

সুরমা কোন জবাব না দিয়ে দরজার পাশে সরে দাঁড়ালেন। একান্ত নিরুপায় না হলে কোন ব্যাপারেই বাগবিতণ্ডার মধ্যে যান না তিনি। তাছাড়া বিশ্বপতিকে তো আর নতুন দেখছেন না। দেখতে দেখতে পনেরোটা বছর একসঙ্গে কাটলো। এমনিতে যে মানুষটা বদরাগী তাতো নয়; দোষের বলতে, যা একটু খেয়ালী। সময় মতো বাড়ি ফিরতে না পারার দরুনই যে মেজাজটা আজ গরম তা আঁচ করতে সুরমার অসুবিধে হয় না।

এত রাতে কি আর চা খাবে? বিশ্বপতির দিকে তোয়ালে আর ধুতিটা এগিয়ে দিতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন সুরমা।

তার মানে? ভুরু কুঁচকে তাকান বিশ্বপতি।

সুরমা রান্নাঘরের দিকে এগোন। ওঁকে জিজ্ঞাসা করাটাই ভুল হয়েছে। রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরে গা ধুয়ে চা খেতে খেতে ইংরাজী খবর শোনার অভ্যেস বিশ্বপতির। খবরটা আজ শোনা না হলেও চা খাওয়ার ব্যাপারে যে ব্যতিক্রম ঘটবে না—সেটা বোঝা উচিত ছিল সুরমার। চায়ের পাট না চুকলে রাতের খাবার প্রশ্নই ওঠে না।

জানো, তোমার এক বন্ধু এসেছিল আজ। এঁটো বাসনগুলো টেবিল থেকে তুলতে তুলতে বললেন সুরমা। তোমার সঙ্গে না কি স্কুলে পড়ত, বিলেতে ছিল অনেকদিন। নাম বললে, 'সমীরণ'।

টেবিল ঘড়িটায় দম দিচ্ছিলেন বিশ্বপতি। রাতের খাওয়ার পর বাড়ির যাবতীয় ঘড়িতে দম দেওয়াটাই ওঁর কাজ।

সমীরণ এসেছিল? অ্যাদ্দিন পরেও আমাদের বাড়ি চিনতে পারলো? বিশ্বপতির চোখে-মুখে বিস্ময়। স্কুলে পড়ার সময় এ বাড়িতে মাঝে মাঝে আসতো, এ পাড়ারই একটা বাড়িতে ভাড়া থাকতো ওর মামা। স্কুলের পাট শেষ হতে ও গেল ডাক্তারী পড়তে। ডাক্তার হয়ে বেরনোর পরও বারকয়েক এখানে এসেছে—তারপর ওর মামাও এ পাড়া ছেড়ে উঠে গেল, ওরও আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। পরে শুনেছিলাম, ও নাকি বিলেত গিয়ে মস্ত ডাক্তার হয়েছে।

দেখেও তো তাই মনে হল। ভিজে ন্যাতা দিয়ে টেবিলটা মুছতে মুছতে বললেন সুরমা। গায়ের রঙ টকটকে ফর্সা, এক্কেবারে সাহেবদের মতন! যে গাড়িটায় চেপে এসেছিল সেটাও একেবারে ঝকঝকে নতুন।

ঠিকানা কিছু দিয়ে গেছে?

উহুঁ। সুরমা মাথা নাড়েন। তবে তোমার অফিসে যাওয়ার ঠিকানা লিখে নিলে নোট বইতে। হয়তো দু-চারদিনের মধ্যেই অফিসে দেখা করবে।

ও, আচ্ছা; বলেই সদর দরজার দিকে এগোলেন বিশ্বপতি। শুতে যাবার আগে সদর দরজার হাতল ধরে পরপর তিনবার টান দিয়ে থাকেন তিনি। দরজায় ছিটকিনি বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বারবার হাতল ধরে টানাটানির যৌক্তিকতা আজও বুঝে উঠতে পারেননি সুরমা।

দরজায় টোকা পড়তেই ফাইল থেকে চোখ তুললেন বিশ্বপতি। সামনেই যে সুদর্শন মানুষটি দাঁড়িয়ে আছে তাঁর মুখের মধ্যে অনেকদিন আগের এক চেনামুখের আদল পাচ্ছেন যেন। আগন্তুক ভদ্রলোক হাসিমুখে বিশ্বপতির দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, আমায় নিতে পারলি না? আমি সমীরণ। সেদিন তোর বাড়ি গেলাম, তোর মিসেসের সঙ্গে গল্পগুজব করলাম, চা আর পাঁপড় ভাজা খেলাম—

বন্ধুর দিকে খানিকটা সমীহ আর খানিকটা বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে থাকেন বিশ্বপতি। কী বলবেন, বুঝতে পারেন না।

টেবিলের উল্টোদিকের কাঠের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়েন সমীরণ। বলেন, কথা বলছিস না যে! কী ব্যাপার, ব্যস্ততার সময় এসে বিরক্ত করলাম নাকি?

না, না, ভাবছিলাম অ্যাদ্দিন পরে তুই হঠাৎ! খানিকটা ঘোরের মধ্যে থেকে বলে ওঠেন বিশ্বপতি। তারপর বেল বাজিয়ে রঘুকে ডেকে চা আনার পয়সা দেন।

চেয়ারের হাতলে কনুই রেখে শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে সমীরণ বলেন, তা সতেরো বছর কাটালাম বিলেতে—বুঝলি? বাবা মারা যাওয়ার পর দিন পনেরোর জন্যে দেশে ফিরেছিলাম। ওদেশেই বিয়েটা সেরে নিয়েছি, না, না, মেমসাহেব নয়, একেবারে খাঁটি বঙ্গ নারী। প্র্যাকটিসও নেহাৎ মন্দ হচ্ছিল না; তা ছেলেমেয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে দেখে ভাবলাম, যাই দেশে ফিরে। এখানকার এক হাসপাতাল থেকে অফার পেয়েছিলাম, তাছাড়া প্রাইভেট প্র্যাকটিস্ তো আছে। তোর বাড়ির কাছে বড় রাস্তার ওপর একটা ঘর পেলাম, ওখানেই চেম্বার বানিয়েছি।

কিসের ডাক্তার তুই! হার্ট? প্রশ্নটা যেন ফস্ করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় বিশ্বপতির।

কেন তোর কি হার্টের গণ্ডগোল আছে নাকি?

না, না, এমনি জিজ্ঞাসা করলাম। আসলে হার্টের ডাক্তারদের খুব রমরমা কিনা—

বিশ্বপতির কথায় মুখ টিপে হাসেন সমীরণ। বলেন, এখন তো স্পেশালিস্টদের যুগ রে! চোখ-কান-গলা-পেট-এমনকি মনের রোগ—যার চিকিৎসাই কর না কেন-রুগীর ভিড় লেগেই থাকবেই।

মনের রোগ? বিশ্বপতি টেবিলের ওপর চোখ নামিয়ে বিড়বিড় করে বলে ওঠেন। মনের রোগ সত্যিই সারে?

সব না সারলেও কিছু কিছু রোগ নিশ্চয়ই সারে। রঘুর রেখে যাওয়া চায়ের কাপটা কাছে টেনে নেন সমীরণ। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলেন, তুই খাবি না?

না। আমি চা খাব ঠিক আড়াইটেয়। বিশ্বপতি জবাব দেন। তুই কিসের স্পেশালিস্ট, বললি না তো।

নিউরো-সার্জারী। তিন-চার চুমুকে চা-টা শেষ করে কাপটাকে দূরে সরিয়ে রাখেন সমীরণ। মাথার অসুখের চিকিৎসা করি, বলতে পারিস। এই ধর, মস্তিষ্কের কোথাও যদি কোন গণ্ডগোল হয়। কিংবা শিরদাঁড়া—মানে সব মিলিয়ে যাকে বলে 'সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম'—সেখানে গণ্ডগোল হলে তা সারানোর ব্যবস্থা করি আমি। তোর বাড়ির কাছে চেম্বার খোলার পর ভাবলাম—ওদিকটায় তো এক তোকে ছাড়া আর কাউকেই তেমন চিনি না। তোর মারফৎ আশেপাশের লোকজনের সঙ্গে যদি আলাপ পরিচয় হয় সেই ভেবেই তোদের বাড়ি গেছিলাম সেদিন। তোর মিসেসের কাছে শুনলাম—রোজই নাকি ফিরতে তোর ন'টা সাড়ে ন'টা বাজে।

সমীরণের কথাগুলো আর কানে যাচ্ছিল না বিশ্বপতির। তাঁর মাথার মধ্যে ঘুরছিল 'নিউরো-সার্জারী' আর 'সেন্ট্রাল নাভার্স' শব্দ দুটো। সমীরণ থামতেই ফিসফিস করে বললেন, তোকে আমার খুব দরকার। শীগগিরই যাব তোর চেম্বারে। অসুবিধে হবে না তো?

অসুবিধে আবার কি? বিকেল আর সন্ধ্যেটা তো বলতে গেলে মাছি তাড়াই! তুই এলে অন্ততঃ গল্পগুজবও করা যাবে। সমীরণ উঠে দাঁড়ান; তারপর দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলেন, তাহলে ঐ কথাই রইল। বাসস্ট্যাণ্ডের উল্টোদিকে ওযুধের দোকানের ডানদিকে আমার চেম্বার, বাইরে নেমপ্লেট আছে।

উদাস চোখে সমীরণের চলে যাওয়া দেখেন বিশ্বপতি। জীবনের সব ক্ষেত্রে সফল একজন পুরুষ। একই সঙ্গে দুজনে একদিন পড়াশুনা করেছেন। সমীরণ যে সাংঘাতিক কিছু মেধাবী ছিল তাও নয়। অবশ্য ওদের বাড়ির অবস্থাটা ছিল ভাল। ডাক্তারী পড়ার, বিদেশ যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে অনায়াসে। আর ঐ সুযোগটুকুর অভাবেই বিশ্বপতি আজ আধা সরকারী অপিসের হেডক্লার্ক!

রঘু এসে চায়ের এঁটো কাপটা সরিয়ে নিয়ে যায়। বিশ্বপতি দেখলেন—টেবিলের ওপর গোল চাকার মতো জলছাপ। ডিসের নীচে জল লেগেছিল নিশ্চয়ই। রঘুকে কতবার বলেছেন সবসময় রবারের চাকতির ওপর কাপডিস রাখতে। ভুরু কুঁচকে ড্রয়ার টেনে এক ফালি সাদা কাপড় বের করলেন বিশ্বপতি। টেবিল থেকে সযত্নে জলের দাগ তুলতে তুলতে কব্জি উল্টে একবার ঘড়ি দেখলেন। একটা বেজে চল্লিশ। টেবিলের ওপর একগাদা ফাইল। ঠিক সাতটায় উঠতে হবে। এর মধ্যে টিফিন করতে খরচ হবে কুড়ি মিনিট। বড় সাহেবের ঘরে যদি দু-বার ডাক পড়ে তবে আরো কুড়ি মিনিটের ধাক্কা। তাহলে হাতের কাজগুলো শেষ করার জন্য কতক্ষণ সময় থাকছে? মনে মনে সেই হিসেবটা করতে থাকেন তিনি।

হ্যাঁ, এবারে খুলে বল দেখি, তোর অসুখটা কী? গদি মোড়া চেয়ারে গা এলিয়ে সমীরণের চেম্বারের দেওয়াল আর আসবাবপত্র খুঁটিয়ে দেখছিলেন বিশ্বপতি। বিকেল পাঁচটা বাজতে না বাজতেই আজ অফিস থেকে বেরিয়েছেন। তার জন্যে অবশ্য রঘুর কৃতিত্ব অনেকখানি। বেলা দুটো থেকে সে ক্রমাগত তাগাদা দিয়ে গেছে। অফিসে বেরনোর সময় সুরমাও ডাক্তারের চেম্বারে যাওয়ার কথাটা মনে করিয়ে দিয়েছে। অফিস থেকে বেরনোর সময় রীতিমতো অস্বস্তি হচ্ছিল বিশ্বপতির। রঘুকে ডেকে বলেছেন, ছুটির পর দরজায় তালাগুলো লাগাস। রাত্তিরটা বড় চিন্তায় কাটবে।

এত ভাবছিস কী? তোর প্রবলেমটা বল।

সমীরণের দিকে চোখ ফিরিয়ে বিশ্বপতি নীচু গলায় বলেন, সময় ধরে সব কিছু করাটাই আমার একটা রোগ। সুরমা বলে—মনের বাতিক!

একটু খুলে বল। সমীরণ টেবিলের ওপর ঝুঁকে আসেন।

এই যেমন ধর, সকাল সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে ওঠা, ঠিক ছটায় চা-খাওয়া, তারপর ছটা কুড়িতে দাড়ি কামানো। ছটা চল্লিশে খবরের কাগজ পড়া, সাতটায় বাজারে যাওয়া।

তার মানে, তুই সব কিছু একেবারে ঘড়ি ধরে করিস—এই তো?

করি, মানে করতে হয়, বিষণ্ণ গলায় বলে ওঠেন বিশ্বপতি। সারাদিন সমস্ত কাজ ঘড়ি ধরে করা কি চাট্টিখানি কথা! কিন্তু উপায় নেই। যে কোন একটা কাজের সময়ের একটু হেরফের হলেই কী যে কষ্ট হয়? ধর, সকালে কাগজটা এলো দেরীতে—সেদিন আর কাগজ পড়াই হবে না। কিংবা রাস্তায় হয়তো জ্যামে পড়ে অফিসে পৌঁছতে দশ মিনিট দেরী হল। বুকের মধ্যে যেন তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। আবার টেবিলের কাজ হয়তো শেষ হয়ে গেছে, তবুও সাতটার ঘণ্টা না বাজলে অফিস থেকে আগে বেরিয়ে পড়ি অমঙ্গল কিছু ঘটে যাবে হয়তো। বিরাট কোন ক্ষতি হয়ে যাবে আমার।

রোববার আর ছুটির দিন কী করিস?

রোরবারেরও কাজের রুটিন আছে। দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে রেডিও শুনি, বিকেল চারটেয় বেড়াতে বেরোই—তা সে ঝড়বৃষ্টি যাই হোক না কেন। এদিকে সুরমার হয়েছে জ্বালা। তুই তো দেখেছিস ওকে। বড় শান্ত মেয়ে। ছেলে পুলে হয়নি। আমার বাতিক সামলাতে সামলাতেই ওর জীবনটা শেষ হয়ে গেল!

ডাক্তার দেখাসনি কখনো? কোন সাইকিয়াট্রিষ্ট?

দেখিয়েছিলাম। আমার পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলার কাছ থেকে ঠিকানা যোগাড় করে সুরমা নিয়ে গিয়েছিল আমায়। ডাক্তার তো প্রথমটা আমার কথায় তেমন আমলই দিলেন না। বললেন—ওরকম বাতিক মশাই সকলেরই একটু আধটু থাকে। রবার্ট ব্রুস-এর গল্প তো জানেন। পরপর সাতবার যুদ্ধে হেরে গিয়েও আবার লড়েছেন। শুনেছি, কলম্বাস নাকি ভারতে আসার টাকা যোগাড়ের জন্যে আঠারো বছর ধরে একনাগাড়ে চেষ্টা চালিয়েছেন। ডারউইন সাহেব তাঁর ইভলিউশন থিয়োরী প্রমাণের জন্য বাইশ বছর ধরে তথ্য যোগাড় করেছেন। এই যে অধ্যবসায়—এও কি এক ধরনের বাতিক নয়? শেষে ওঁর মত মানছি না দেখে বললেন, অতিরিক্ত উদ্বেগের জন্যই নাকি অমনটা করি আমি। আমার অবচেতন মনে নাকি ধারণা আছে—জীবনে যা কিছু আমি পেয়েছি, আমার চাকরি-সংসার—সবই ক্ষণিকের

ব্যাপার। সব কিছু হারানোর ভয়েই আমি নাকি নিজেই নিজের চারপাশে সময়ানুবর্তিতার এক মর্ম গড়ে নিয়েছি। ভদ্রলোক আমার ঘুমের ওষুধ টযুধ খেতে দিয়েছিলেন—কোন কাজ হয় নি। আচ্ছা সত্যি বল তো—মানসিক রোগ কি সারে?

বিশ্বপত্তির চোখের কোনটা চিকচিক করছিল। সেদিকে চেয়ে সমীরণ বললেন, এ প্রশ্নের উত্তর তো সেদিন তোর অফিসেই দিয়েছি। কিন্তু এটা তোর মানসিক রোগ নাও হতে পারে। যদি বলি এইসব উপসর্গের পেছনে তোর ব্রেনের কারসাজি রয়েছে—বিশ্বাস করবি?

কী জবাব দেবেন বুঝতে পারেন না বিশ্বপতি। সমীরণ যেন ব্যাপারটা বুঝলেন। বললেন, তোকে একটা ঘটনার কথা বলি। সত্যি ঘটনা। এটা ঘটেছিল এখন থেকে বছর খানেক আগে—কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে। জর্জ নামে এক ছোকরার ছিল নানারকমের বাতিক। মাত্র সতেরো-আঠার বছর বয়স হলে কি হবে—পড়াশুনো খেলাধুলো, আড্ডার ধার ধারতো না। দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার নিজের হাত দুখানা কচলে ধুতো। বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাঝরাস্তা থেকে ফিরে আসতো রোজ—ঘরে তালা দেওয়া হয়েছে কিনা দেখতে। বারবার পকেট হাতড়ে দেখতো—মানিব্যাগটা রয়েছে কিনা। তোর মতো ঐ ছেলেটিরও মনে হতো—অদৃশ্য কেউ যেন তাকে দিয়ে জোর করে করিয়ে নিচ্ছে। আমাদের ভাষায়—রোগটার নাম 'অবসেসিভ কমপালসিভ নিউরোসিস'। ছেলেটি ছিল অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ। ওর ঐ অভিশপ্ত জীবন রেখে আর লাভ নেই এরকম কিছু ভেবে ছোকরা একদিন বাপের পিস্তলখানা বাগিয়ে নিজেই নিজের কপাল লক্ষ্য করে গুলি চালালে! গুলি ছোঁড়ার সময় নিশানার ভুলে গুলিটা গিয়ে বিঁধলো মস্তিষ্কের বাঁ দিকের 'ফ্রন্টাল লোব' নামে একটা জায়গায়। ছেলেটাকে নিয়ে যাওয়া হয় নামজাদা এক নিউরোসার্জনের কাছে। ছুরি চালিয়ে ফ্রন্টাল-লোব থেকে বুলেটটা বের করা হল। আর তাতেই ঘটলো অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড!

কিসের কাণ্ড?

অপারেশনের পর ছেলেটা সুস্থ হতে দেখা গেল—তার মন থেকে যাবতীয় বাতিক একেবারে উধাও! একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেল সে। ঘটনাটা বিশেষজ্ঞ মহলে চাউর হতেই একেবারে হৈ হৈ পড়ে গেল। একদল বললেন—তাঁরা নাকি নিশ্চিত যে মস্তিষ্কের ভেতর 'ব্যাসাল গ্যাংলিয়া' নামে নার্ভগুচ্ছ ঠিকমতো কাজ না করলে লোকের মধ্যে নানারকম বাতিক দেখা দেয়। ঐ নার্ভগুলোকে সক্রিয় করে তোলার জন্যে ক্লোমিপ্রামাইন নামে এক ধরনের ওষুধ বের করলেন। আসলে ওঁরা ছিলেন অপারেশনের বিরুদ্ধে।

ওষুধের নামটা খটোমটো ঠেকলেও ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হল না বিশ্বপতির। সমীরণ থামতেই উত্তেজিত গলায় বললেন, ওষুধটায় কাজ হল?

উঁহু। আস্তে আস্তে দু-পাশে মাথা নাড়েন সমীরণ। হাজার রোগীর ওপর ঐ ওষুধটা প্রয়োগ করে মাত্র চারশো জনের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু সুফল মিললেও বাকীদের ক্ষেত্রে কোন কাজই হয়নি বলতে গেলে—

তাহলে কি অপারেশন ছাড়া গতি নেই? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেন বিশ্বপতি। মস্তিষ্ক কাটা ছেঁড়া করায় রিস্ক-ও তো আছে?

তা তো আছেই। সমীরণ জবাব দেন। ইতিমধ্যে আরও যেসব রোগীদের ওপর অপারেশন হয়েছে তাদের কারো কারোর ডান হাতপায়ে জড়তা এসেছে অনেকটা

প্যারালিসিসের মতন। কয়েক মাসের মধ্যেই ঐসব উপসর্গ অবশ্য কেটে যাওয়ার কথা।

তাহলে আমাকেও কি অপারেশন করতে বলিস? ভয়ে গলা শুকিয়ে আসে বিশ্বপতির। আমারও যদি প্যারালিসিস হয়, যদি আর কোনদিন তা না সারে?

এখনই এসব নিয়ে ভাবছিস কেন? চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সমীরণ। আগে তোর ব্রেন-টা স্ক্যান করাই, হাসপাতালে খোঁজখবর নিয়ে দেখি—এ-জাতীয় অপারেশনের সুযোগ সুবিধে মিলবে কিনা। তারপর তো ডিসিশনের পালা। অপারেশনের ব্যাপারে যা সিদ্ধান্ত নেবার তখন নিস না হয়।

সমীরণের চেম্বার থেকে বেরিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন বিশ্বপতি। আবছা লাল মেঘে ছেয়ে আছে আকাশটা। রাস্তায় আলোগুলো জ্বলছে না। বাড়ির পথে হাঁটতে হাঁটতে বিশ্বপতির মাথায় 'ব্যাসাল গ্যাংলিয়া' আর 'ফ্রন্টাল লোব' শব্দ দুটো ঘুরপাক খাচ্ছিল। বাড়িতে গিয়ে সুরমার কাছে অপারেশনের কথাটা কিভাবে পাড়বেন তাই ভাবতে ভাবতে বিশ্বপতির মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠলো।

ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোনটা বেজেই চলেছে। অফিস ঘরের জানলাগুলো টেনে বন্ধ করতে গিয়ে রঘু দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকালো। পাঁচটা বেজে দশ। এর মধ্যেই গোটা অফিসটা ফাঁকা। অথচ ছমাস আগেও ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম। পাঁচটার সময় ফোন বেজে যাবে—কেউ ধরার থাকবে না—এটা ভাবাই যেত না। বড়বাবু থাকতেন ঠিক সাতটা অবধি। টেবিলের সমস্ত কাজ নিখুঁত ভাবে শেষ করে তবেই উঠতো! কী যেন একটা অপারেশন করাতে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। মাস তিনেক পর যখন অফিসে ফিরলেন—একেবারে অন্য মানুষ। হাঃ হাঃ করে হাসছেন, সারাদিন অফিসের ছেলেছোকরাদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন, অফিসে আসার কোন সময় নেই, সাড়ে চারটে বাজতে না বাজতেই বাড়ি পালাচ্ছেন। বড়বাবুর টেবিলে এখন ফাইলের স্তূপ...

টেলিফোনের বাজনা থেমে গেছে। ঘরের পাখা-আলোর সুইচগুলো নিভিয়ে সদর দরজায় তালা লাগায় রঘু। ছ'টা তেরোর লোকালটা ধরতে হবে। আপনমনে বিড় বিড় করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে এবং ঠিক এগারো নম্বর ধাপে এসে থমকে দাঁড়ায়। তারপর আবার হন হন করে সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠে দরজার তালাগুলো টেনে টেনে দেখে—সেগুলো ঠিকমতো লাগানো হয়েছে কিনা। এটা এখন প্রতিদিনই করে সে। আরও একটা অভ্যেস হালে রপ্ত করেছে। লালবাজার থানায় উল্টোদিকের ফুটপাথে বাক্সবন্দী শনিঠাকুরের কাছে গিয়ে দাঁড়ানো। অফিস থেকে বেরলেই অদৃশ্য কেউ যেন তাকে ঐদিকে ঠেলে নিয়ে যায়।

প্রথম প্রকাশ: ফ্যানট্যাসটিক, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯
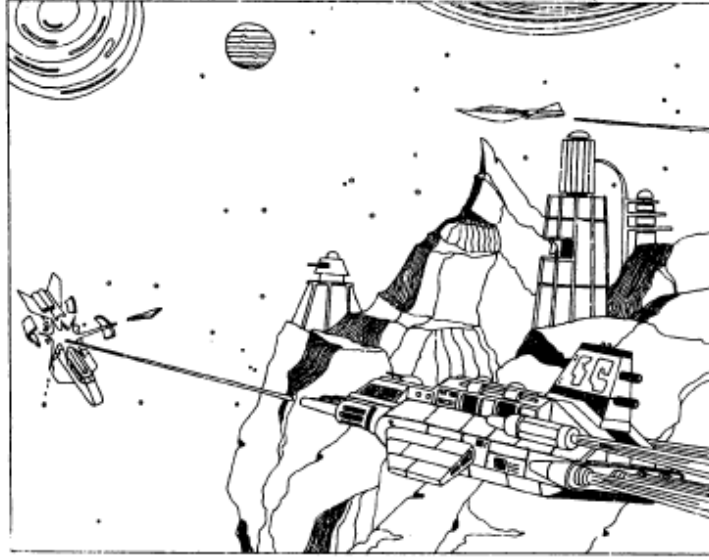
সূচিপত্রে ফিরে যান

গিরগিটির রহস্য

তারাপদ রায়

অবশেষে ছুটি মিললো শশাঙ্ক দাসের। সেই কবে জামসেদপুরে লোহার ফ্যাক্টরীতে ঢুকেছিলেন উনিশ বছর বয়সে সামান্য মিস্ত্রি হয়ে; তারপর ধাপে ধাপে উঠে গেছেন, বয়সও বেড়ে গেছে, অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে পদোন্নতিও হয়েছে।

কিন্তু কতদিন মানুষ চাকরী করতে পারে? একটানা সাতচল্লিশ বছর কাজ করেছেন, শেষের দিকে তাঁর অভিজ্ঞতাই তাঁর মুক্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

আটচল্লিশ সাল পর্যন্ত টাটায়, তারপরে দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে যে সব শিল্প নগরী, ইস্পাত শহর গড়ে উঠতে লাগলো, সব জায়গায় ডাক পড়তে লাগলো দাস মিস্ত্রির। অনেক বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার, অনেক ডাকসাইটে সাহেব তাজ্জব বনে গেছে ওঁর জ্ঞান দেখে, লোহা সম্বন্ধে তাঁর মতো ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক নাকি বাকিংহামেও পাওয়া যাবে না।

অবশ্য অভিজ্ঞতাই সব নয়, কত লোকেই তো তার সঙ্গে কাজে ঢুকেছিলো তারা তো অনেকেই বড় জোর হেড মিস্ত্রি হয়ে রিটায়ার করলো। টগবগ্ করছে গলিত লৌহপিণ্ড, তাঁর ইচ্ছে করতো কুমোর যেমন মাটি ছানে সেইভাবে ছেনে দলা পাকিয়ে খেলা করেন ইস্পাতের অনল নিয়ে, গনগনে জিহ্বা টেনে লম্বা করে দেন। সারা জীবন লোহা নিয়ে খেলা করেছেন তিনি। সে খেলায় পরিশ্রমের চেয়ে আনন্দ ঢের বেশী ছিলো। চিরকাল সোনার চেয়ে লোহা অনেক বেশী আকর্ষণ করেছে তাঁকে।

সেই দাস মিস্ত্রির অবসর মিললো। জীবনে অনেক ধাপ উঁচুতে উঠে গিয়েছিলেন, কিন্তু মিস্ত্রি উপাধিটা কায়েমি হয়ে গিয়েছিলো, শশাঙ্ক দাসও কখনো আপত্তি করেন নি।

অবসর নিয়ে দাসমিস্ত্রি ঠিক করলেন এবার এমন কোথাও যাবো যেখানে সভ্যতা এখনো পৌঁছয় নি তার ইঁট, লোহা, বিদ্যুতের খাঁচা নিয়ে। নিজের হাতে মনের মতো একটা বাড়ি তৈরি করে থাকবো।

কালিম্পং শহরের বাজারের উত্তর পাশ দিয়ে ঘুরে একটা রাস্তা গেছে ভুটান বরাবর। সেই রাস্তাতেই প্রায় ভুটান সীমান্তে একটা ছোট পাহাড়ের নিচে বিঘে খানিক আধা সমতল জমি ভারী পছন্দ হয়ে গেলো দাসের। চারদিকে ফিকে নীল পাহাড়, ঋজু পাহাড়িয়া গাছের সবুজ চিন্তার এবং অপার নীলিমাময় আনন্দ। একটা মাত্র অসুবিধা এই যে এখানে বছরে ছয় সাত মাসের বেশী থাকা যাবে না, নভেম্বর থেকে মার্চ সমতল ভূমিতে ফিরে যেতে হবে শীতের সময়। এই পাহাড়ী রাস্তা তখন আগাগোড়া বরফে ঢাকা থাকবে। কাছাকাছি ঠিক কোনো লোকালয় নেই, একটা ছোটমতো দেহাতী গ্রাম। চার পাঁচ ঘর আধা যাযাবর পাহাড়ী পরিবার এখানে বছরের কয়েকমাস থাকে। শীত শুরু হলে দার্জিলিং বা কালিম্পং কোথাও কাছাকাছি চলে যায়।

ভালোই হল, সারা বছর এখানে থাকলে একঘেয়ে হয়ে যেতো। ছয় মাস রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবো আর ছয়মাস এখানে বিশ্রাম; তারপর আবার ঘোরো। শশাঙ্ক দাস খুশিই হলেন মনে মনে এই সব ভেবে।

বাড়ি তৈরি হল। সভ্যতাকে যত সহজে এড়ানো যাবে মনে হয়েছিলো তা সম্ভব হল না। কালিম্পংয়ের বাজার থেকে কাঠ কিনতে হল, ইঁট, লোহা, সবই আনাতে হল। কয়েকজন ভুটিয়া মজুর আর নিজে পরিশ্রম করে একদিন বাড়ি সম্পূর্ণ হল। বাড়ির জানালার জন্যে শিক কিনতে গিয়ে শশাঙ্ক দাস একবার মনে হাসলেন, তারই হাতে তৈরি কোনো যন্ত্র থেকে হয়তো এই শিকগুলো এসেছে।

কালিম্পংয়ের বাজার থেকে কেনা কাঠে কিন্তু কুলোয় নি। বাড়ি শেষ হবার আগেই কাঠ ফুরিয়ে গেলো। একজন ভুটিয়া মজুর বললো, 'বাবু, আমাকে যদি বলেন আমি কাঠ এনে দিতে পারি। ঐ পিছনের দিকের পাহাড়ের গায়ে গাছ আছে। সে কাঠ বেশ ভালো কাজ দেবে, আর আমাকে বাজারের চেয়ে অনেক কম দাম দিলেই চলবে।' পিছনের দিকের পাহাড় মানে কোনটা শশাঙ্ক দাস ধরতে পারলেন না।

'এ সব গাছে কি ভালো জানালা দরজা হবে?'

'বাবু, এখানে যেসব গাছ দেখছেন সে রকম গাছ নয়। আমি যে পাহাড়টার কথা বলছি সে পাহাড়ে এক ধরনের আলাদা ধরনের গাছ আছে, তার কাঠ খুবই মজবুত।' মজুরটি বিনীত ভাবে জানালো।

'আচ্ছা, দেখা যাক,' শশাঙ্ক দাস অবশেষে রাজী হলেন।

মজুরটি দিন দুই পরে একটা খচ্চরের পিঠে করে এক বোঝা কাঠ নিয়ে এলো, 'এই একটা গাছই ছিলো, আর সব গাছ কারা কেটে নিয়ে গেছে। যত চোরের আমদানি হয়েছে পাহাড়ে। আগে এমন ছিলো না।' মজুরটি কাঠগুলো নামালো। তারা পরস্পর প্রাক্তন কালের পার্বত্য সততা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো। ততক্ষণ শশাঙ্ক দাস কাঠ দেখতে লাগলেন।

ভালোই মনে হচ্ছে, অদ্ভুত হলুদ রঙ। এক ধরনের গিরগিটির গায়ের মতো
বড় তেলতেলে মনে হয়। যেন কাঁচা রঙ মাখানো হয়েছে। দেখা যাক। আমি সংসারহীন পরিবার মুক্ত ব্যাচেলার। আমি তো আর পুরুষানুক্রমে ভোগ করার জন্য বাড়ি করছি না— আমার এতো খুঁতখুতানি কেন? এই শেষ কটা দিন কেটে গেলেই হল, এই সব কথা ভাবতে ভাবতে বহুদিন পরে আবার দাসমিস্ত্রির মনে পড়লো পিছনে পানা পুকুর, নারকেলের গুঁড়ি দিয়ে পৈঠা করা সিঁড়ি উঠে গেছে উঠোনের দিকে। অনেকদিন আগের একটা আটচালা বাড়ি। কবেকার ফরিদপুরের একটা গ্রাম্য পরিবার, মা, কাকা, জ্যাঠামশায়, সোনাপিসিমা, বরেন। আঠারো বছর বয়সে এক বস্ত্রে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন আর খোঁজ করেন নি, তারা সব এখন কোথায়? কেউ কেউ কি এখনো বেঁচে আছে?

সারা জীবন গনগনে আগুন আর লোহা পেটানোর শব্দ, একটা ধাতব পদার্থের ভালবাসায় তিনি নিজেকে উপেক্ষা করেছেন।

ততক্ষণে মজুরেরা কাজে লেগে গেছে, জানালার গরাদে শিক লাগানো হল। ঘরের চারদিকে চারটে জানালা ঝুলানো, দুদিকে দরজা। পরের দিন আর কিছু করার বইলো না,

শূন্য বাড়িতে অখণ্ড অবসর।

কালিপুর থেকে বাজার করে আনা তাও সপ্তাহে এক-আধদিন, ফাইফরমাস খাটা এই সবের জন্য একটি ভুটানি ছেলে রয়েছে, তারও বিশেষ কিছু করবার নেই। সে তার দেহাতে গিয়ে গল্প করে, ঘুমোয়।

এইভাবে একদিন শীত এসে গেলো। মাথার উপরে দিনরাত শন্‌শন্‌ করে শব্দ হতে লাগলো, হিমালয়ের ওপারে থেকে হাঁসেরা সমতল ভূমিতে নদী, নালা, বিলে ফিরে চলেছে। শশাঙ্ক দাসও ফিরলেন।

ছয় মাস এদিক ওদিক ঘুরবার পর আবার কালিম্পং, আবার সেই পাহাড়ি রাস্তা। তার নিজের বাড়ীতে একদিন মাঘ মাসের শেষাশেষি দুপুর নাগাদ পৌঁছালেন। যাওয়ার সময় জানালা দরজা সব বন্ধ করে তালা দিয়ে রেখে গিয়েছিলেন, দেখলেন সবই অটুট আছে। কিন্তু একটা জিনিস দেখে তার খুব অবাক লাগলো। সেই হলুদ তেলতেলে রঙের কাঠ দিয়ে জানালা বানিয়েছিলেন, দরজা জানালার সেই কাঠের রঙ কি করে একেবারে কালো আবলুষ কাঠের মতো মিশমিশে! শশাঙ্ক দাসের মনে পড়লো কাঠটা যখন ভুটিয়া মজুরটা এনেছিলো তখন তার গিরগিটির গায়ের রঙের কথা মনে হয়েছিলো, সত্যিই গিরগিটি এই ছয় মাসে হিমালয়ের বরফে, কুয়াশায়, উত্তরে ঠাণ্ডা ঝড়ে রঙ পাল্টে ফেলেছে।

এখনো তো উদ্ভিদের জগতের আমরা কিছুই জানতে পারিনি, কতো রহস্যই হয়তো গহন অরণ্যে উদ্ভিদমালার মধ্যে রয়েছে, লোকালয়ে আর কটা গাছই বা পৌঁচেছে। পাহাড়ে, সমুদ্রে, এমন কি মরুভূমির মধ্যে যে সব অজ্ঞাত কুলশীল উদ্ভিদ অনন্তকাল ধরে ছায়া বিস্তার করছে তার কতটুকু মানুষের নজরে এসেছে?

কিন্তু দাসমিস্ত্রির জন্যে বৃহত্তর বিস্ময় তখনো অপেক্ষা করছিলো। দরজার শিকলে তালা লাগানো রয়েছে! চাবি লাগাতেই শিকল শুদ্ধ তালাটা খসে পড়লো। অবাক কাণ্ড, কোনো চোরটোরের ব্যাপার হবে। কিন্তু দুর্গম পাহাড়ে, ভয়ঙ্কর শীতে তার বাড়ীতে এমন কি জিনিস ছিলো যে চোর আসবে? ঘর খুলে কিন্তু নিশ্চিন্ত হলেন না, চোর ডাকাতের কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। জিনিসপত্র সামান্য, তবু যা যেমন ছিলো ঠিকই আছে। পুবের দিকের জানালাটা খুলতে গেলেন, পাল্লা দুটো টান দিতেই কাঠের মেঝের ওপর লোহার শিকগুলো খুলে ঝনঝন করে পড়ে গেলো।

তার কেমন খটকা লাগলো। তিনি একে একে সবগুলো জানালা খুলে ফেললেন, আর সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। লোহার শিকগুলো খুলে পড়ে গেল মেঝেতে।

একটা শিক মেজে থেকে কুড়িয়ে তুললেন দাস। কে যেন নিখুঁত ভাবে গোড়া থেকে যেখানে জানালার কাঠের সঙ্গে লাগানো হয়েছিল সেখানের থেকে দুপাশেই কেটে নিয়েছে। সবগুলো শিকই দেখলেন। মরচে ধরে অনেক সময় লোহার শিক ক্ষয়ে যায়, এখানে কিন্তু মরচে-টরচে নেই। যেন খুব সূক্ষ্ম অস্ত্রে নিখুঁত ভাবে জানালার গরাদ থেকে শিকগুলো কেটে আলগা করে নেয়া হয়েছে। জানালার গরাদগুলো বিস্মিতভাবে পরীক্ষা করলেন শশাঙ্ক দাস। কিন্তু সেখানে শিক লাগানোর ফুটো ছাড়া কিছুই নেই, শিকের যেটুকু অংশ গরাদের মধ্যে ছিলো তা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

পুরো ব্যাপারটা আস্তে আস্তে বোধগম্য হয় শশাঙ্ক দাসের। সমস্ত জীবন লোহা নিয়ে কাটিয়েছেন তিনি, তাই প্রথমে বিশ্বাস করতে না চাইলেও ঘটনার পারম্পর্য তাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে। অপরিচিত উদ্ভিদ থেকে কেটে আনা এই কাঠের টুকরোগুলো যতটুকু লোহা এর ভেতরে ছিলো নিঃশেষে খেয়ে নিয়েছে। ছোটবেলায় শশাঙ্ক দাস প্রাণীভুক্ উদ্ভিদের কাহিনী পড়েছিলেন, তার মনে হল এই আরেক ধরনের ধাতুভুক্ উদ্ভিদ।

এই গাছ কি আরো আছে? লোহার মতো কঠিন ধাতুকে এমন বেমালুম নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে—সত্যিই কোনো যন্ত্রই এমন নিপুণভাবে কাটতে পারবে না লোহা, যেন ছুরি দিয়ে মাখনের ডেলা দুখণ্ড করা হয়েছে—একটা আঁচড়ের পর্যন্ত দাগ নেই। ভুটিয়া মজুরটি বলেছিলো এটিই শেষ গাছ আর গাছ নেই। থাকলেও সেই ভুটিয়া মজুর কিংবা সেই পাহাড় এই বিশালতার মধ্যে আর কোনোদিনও কি খুঁজে পাওয়া যাবে?

একবার শশাঙ্ক দাস ভাবলেন যাই দুর্গাপুর বা জামসেদপুরে একবার। এই এক টুকরো কাঠ নিয়ে গবেষণাকারীদের সঙ্গে দেখা করে আসি এই—রহস্যের কোনো সমাধান হয় কিনা? কিন্তু পরমুহূর্তেই পিছিয়ে এলেন। কি প্রয়োজন? চারদিকে যতদূর চোখ যায় পাহাড়ের পর পাহাড়, মার্চ মাসের রৌদ্রে বরফ গলা শুরু হয়েছে, অল্প অল্প কুয়াশার মতো ধোঁয়া উঠছে আকাশে, সেখানে অনন্ত নীলিমায় সেই কুয়াশা চিররহস্যের জাল ছড়িয়ে রেখেছে। কত রহস্যই তো মানুষের অজ্ঞাত, আরো একটিও না হয় রইলো।

প্রথম প্রকাশ : আশ্চর্য!, ডিসেম্বর, ১৯৬৩
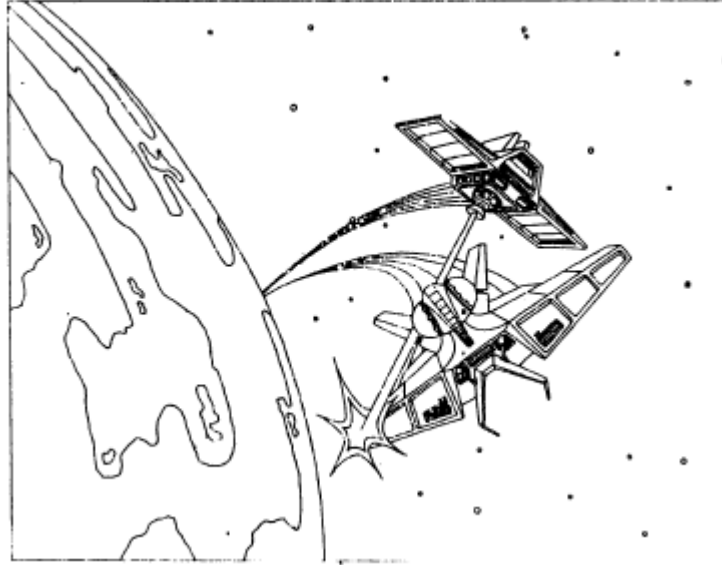
সূচিপত্রে ফিরে যান

জীবন বনাম মৃত্যু

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

ভোর না হতেই গুজব ছড়াল। গুজব একটা সংক্রামক রোগের মতো; প্রথমে বিন্দুর আকারে, পরে বিরাট আকৃতি ঢেউয়ের মতো সমস্ত লোকালয়ের উপর দিয়ে ঝলকে ঝলকে বয়ে যেতে লাগল। রাস্তায়, ক্যাবারে, বারে রেষ্টুরেন্টে, ফুটপাতে ক্রমে ক্রমে লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠতে লাগল।

অবশ্য একথা ঠিক আজই ইউ, সি রেডিও থেকে সকাল নটার সময় প্রকৃত বিবরণটা প্রচার করা হবে।

'এখন কটা বাজে মশাই?'

পাশের ভদ্রলোক ঘড়ি দেখে বললেন, 'ছটা বত্রিশ।'

ছটা বত্রিশ অর্থাৎ এখনো আড়াই ঘণ্টা বাকি। কিন্তু এরই মধ্যে গুজব ছড়ালো সান্টিয়াগো সম্মেলনের সমস্ত তথ্য ফাঁস হয়ে গেছে। আর একটু অপেক্ষা করুন টেলিগ্রাম বেরিয়ে যাবে। পৃথিবীর তাবৎ ডাক্তারদের এবার ধরে ধরে ফাঁসি কাঠে ঝোলান হবে।

অসম্ভব। অতখানি নির্দয় সিদ্ধান্ত পৃথিবীর সব মানুষই মেনে নেবে কেন? স্বার্থসিদ্ধির জন্য কেউ কেউ অমন কিছু চাইতে পারে। কিন্তু বলুন, আপনি মানবেন? আপনাদের পাড়ায় ডাক্তারদের মুখগুলি কি এই মুহূর্তে আপনার চোখের উপর ভেসে উঠছে না!

আমারও ঐ এক কথা মশাই, ডাক্তারদের দোষ দিয়ে লাভ কি, নিজেরা জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না, কাতারে কাতারে জন্ম দিয়ে পৃথিবীর জনসংখ্যা দিনে দিনে বাড়িয়ে চলব আর দোষ হল ডাক্তারদের! রাবিশ।

আর তা ছাড়া ডাক্তাররাই বা অমন সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন কেন! একবার স্থির মাথায় ভেবে দেখুন, একমাত্র আমাদের এই ভারতবর্ষেই ডাক্তারের সংখ্যা দেড় কোটি। নন-রেজিস্টার্ড ডাক্তার যে আরও কত তার হিসেব কে রাখে। কেবল আমাদের দেশ হলেও না হয় এক কথা ছিল, সমস্ত পৃথিবীর ডাক্তার সংখ্যা কত? কয়েক কোটি। কয়েক কোটি লোককে সান্টিয়াগো সম্মেলনের একটা সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে কাল থেকে ভিন্ন পথ গ্রহণ করতে হবে। তাও কি হয়?

কিন্তু গুজব যেভাবে ছড়িয়েছে তাতে মনে হয় অমন কিছুই সত্যি হতে চলেছে। একবার রেডিও খুলে দেখুন না।

রেডিও খুলব, হ্যাঁ হ্যাঁ—রেডিও আলারা রসিকতা জানে। এ সময় অত্যন্ত নির্বিকার ভাবেই রবীন্দ্র সংগীত বাজিয়ে চলেছে, দিয়ে গেনু বসন্তের এই গান খানি'। আচ্ছা, টেলিভিশন কি বলছে?

কি বলছে? খুলে দেখুন না! আরে হ্যাঁ, এসময় কিনা গম চাষের পদ্ধতি দেখায় কেউ। কড়া করে একটা কমপ্লেন ঠুকে দিতে হবে বেটাদের বিরুদ্ধে।

'বসুন্ধরা' কাগজের অফিসে সাতান্ন বার ডায়াল করেও লাইন পাওয়া গেল না। দিল্লী টাইমস বা টোয়েন্টি সেকেণ্ড সেঞ্চুরীর-ও সেই একই অবস্থা।

ফলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হয়েছে বেশীরভাগ লোককে অগণিত জনসমুদ্র রাস্তায়। যার যা প্রাণে চাইছে, বলে যাচ্ছে। এক কথাই পাক খেতে খেতে বিচিত্র আকার ধারণ করেছে এখন।

সকাল সাতটার সময় রেডিও থেকে আবহাওয়া বার্তা প্রচার করা হল। আবহাওয়া পরিষ্কার। দিনের তাপমাত্রার পরিমাণ জানাবার পর বিশেষ ঘোষণা প্রচার করল ইউ, সি রেডিও। জনতাকে শান্ত হতে আশ্বাস দেওয়া হল। গুজবে কান দেবেন না। গুজব ছড়াবেন না। পরে বলা হল নীতিগত কারণেই সান্টিয়াগো সম্মেলনের সিদ্ধান্ত আগামী কালের পূর্বে প্রকাশ করা সম্ভব নয় বলে নিউজ-এজেন্ট আমাদের জানিয়েছেন, আপনারা ধৈর্য ধরে আর একটা দিনের জন্য অপেক্ষা করুন। রেডিও ইউ, সি।

দেখলেন তো, ছেলেমানুষী কাণ্ডটা দেখলেন! সারা পৃথিবীর সাড়ে নশ কোটি লোক অধীর আগ্রহে আজ সান্তিয়াগো সম্মেলনের দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ ব্যাপারটা দেখুন একবার! লোকগুলির যদি এতটুকু দায়িত্ব থাকে।

ওদের আর দোষ কি মশাই। ওরা তো আর নিজেদের ইচ্ছেমতো সংবাদ বলতে পারে না। আমাদের প্রদেশের প্রতিনিধিরা যদি তৎপর না হয়।

কেবল আমাদের প্রদেশ বলে ব্যাপারটাকে ছোট করে দেখবেন না, রেডিওর নব ঘোরান না। দেখুন না অন্যান্য সেন্টার কি বলে। দেখবেন ওরাও সেই একই কথা বলে প্রদেশের লোকদের শান্ত হতে বলছে। পৃথিবীর বিপুল জনসংখ্যার সামনে আজ একটা মস্ত বড় প্রশ্ন, ডাক্তারী ব্যাপারটাকে বে-আইনী ঘোষণা করা হচ্ছে কি না। যদি হয় একদিন, তাহলে অবশ্য মঙ্গল, আর না হলেও অমঙ্গল নয়।

আপনি বুঝি ডাক্তারদের সমর্থন করেন?

শুধু সমর্থন! মনে প্রাণে সমর্থন করি। জানেন আমার ছোট ছেলে একজন ডাক্তার।

যিনি প্রশ্ন করেছিলেন তিনি কেমন গুটিয়ে নিলেন নিজেকে। তাকিয়ে রইলেন আরো কিছু শুনবার জন্য।

আপনিই ভেবে দেখুন ডাক্তারদের দোষ কি! তারা এক অর্থে তো আপনাদেরই সেবা করে থাকেন। মনে করুন আপনার হঠাৎ বাড়ী ফিরে গিয়ে এস, টি, বি হয়েছে, আপনি সারাটা রাত অমানুষিক যন্ত্রণা পাবেন, সারা পৃথিবী খুঁজেও ডাক্তার পেলেন না, ওষুধ পেলেন না। কেমন? ভাল লাগছে শুনতে?

না, তা ঠিকই। তবে একথাও তো ঠিক রোগ হতে না হতেই ডাক্তাররা তা সারিয়ে দেবে, একটা রুগীও মরবে না তা হলে দিনে দিনে পৃথিবীতে কি ভীষণ জনসংখ্যা বেড়ে যাবে বলুন! এমনিতেই এখন সাড়ে নশ কোটি লোক আমরা। আর কয়েক বছর পর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকলেও পৃথিবীর যেটুকু স্থলভাগ তা পূর্ণ হয়ে যাবে। তখন? তখনকার কথা ভেবেছেন?

না ভেবেছি তা নয়, তবে আমার কথা কি জানেন? উত্তর মেরুতে যেমন মানুষ বসবাস আবহাওয়া সৃষ্টি করে নিয়েছে বরফ গলিয়ে তেমনি দক্ষিণ মেরুর দিকেও অভিযান চালান

হচ্ছে না কেন? জানেন কত একর জমি নিয়ে দক্ষিণ মহাদেশ। অতবড় বিরাট একটা মহাদেশে একটাও লোক থাকে না, একথাও ভাবতেও মশাই লজ্জায় মাথা নীচু হয়ে আসে।

ধীরে ধীরে ক্রমশ বেলা বাড়ছিল। প্রখর সূর্যতাপ লাগছিল মাথায়। অনেকেই সান-সেডার নিয়ে বেরয় নি। ফলে আপাত আশ্রয়ের আশায় দোকানে বা রেষ্টুরেন্টে ঢুকবার চেষ্টা করছিল। প্রচণ্ড ভিড় সেখানে। ইতিমধ্যেই গুজব ছড়াল, নর্দান স্কোয়ারে ভিড় সামলানর জন্য পুলিশকে দু'দুবার নকল বৃষ্টি নামাতে হয়েছে। এই অসময়ে বৃষ্টিতে ভেজার ভয়ে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। পুলিশ শাসিয়েছে, ফের যদি ভিড় বাড়ে বাধ্য হয়েই ওরা মৃদ্যু এ্যাসিড বৃষ্টি করবে। গত তিন-চার বছরের মধ্যেও পুলিশকে এ্যাসিড বৃষ্টি ঘটাবার প্রয়োজন হয় নি।

ধরুন এ্যাসিড বৃষ্টিতে ভিজে হাজার খানেক লোক অসুস্থ হয়ে পড়ল; তখন সমস্ত হাসপাতাল যদি বন্ধ থাকে, সমস্ত নার্সিং হোম, সমস্ত ডাক্তারখানা, তখন অবস্থাটা কেমন নির্মম দাঁড়াবে ভাবুন!

হাজার খানেক লোক মরে যাবে বলছেন তো। যাক না। যত লোক কমে যায় পৃথিবী থেকে ততই তো মঙ্গল।

এ আপনি স্বার্থপরের মতো কথা বলছেন। আপনিই যদি এ্যাসিড সিকনেসে আক্রান্ত হন?

বেঁচে যাই মশাই, বেঁচে যাই। এই ভিড়ের পৃথিবীতে বেঁচে থাকাও মৃত্যুর মতো। তার চেয়ে তিলে তিলে না ভুগে একেবারেই খতম হতে চাই। যে মরতে পারে মশাই সেই পুণ্যবান।

ও! তাই বুঝি। কালো কোট পরা ভদ্রলোক মাথার টুপিটাকে আরো একটু চোখের দিকে টেনে নামালেন। গরমে দরদর করে ঘাম দিচ্ছিল ওঁর চিবুকে। গলায় গ্লাবস জড়ালেন।

যার সঙ্গে কথা হচ্ছিল সে ভদ্রলোক হঠাৎ সন্দিগ্ধভাবে আরো একটু এগিয়ে এসে নীচু গলায় প্রশ্ন করলেন, 'আপনি? আপনাকে যেন এর আগেও কোথাও দেখেছি মনে হচ্ছে?'

'হয়ত দেখেছেন।' কালো কোট পরা ভদ্রলোক এড়িয়ে যাবার জন্য ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেলেন।

এমন সময় মনে পড়ল। আশ্চর্য, এতক্ষণ তা হলে ডাক্তার সোমের সঙ্গেই কথা বলছিলাম কি। ডাক্তাররাও অবস্থাটা বুঝবার জন্য ভিড়ের মধ্যে বেরিয়ে পড়েছেন নাকি। ভদ্রলোক ডাকলেন, 'ও মশাই, ও ডাক্তারবাবু। ডাক্তারবাবু!'

কিন্তু ততক্ষণে ডাক্তার সোম ভিড়ের মধ্যে মিশে হারিয়ে গেছেন।

ভদ্রলোক কেমন করুণভাবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে। তারপর চেঁচিয়ে উঠলেন বিকটভাবে, 'না, এর একটা প্রতিবাদ লিখিত ভাবেই পাঠাতে হবে সেন্ট্রাল এসেম্বলিতে। এ অন্যায়, অন্যায়। অত্যন্ত অন্যায়।'

'আপনি কি ডাক্তারের হয়ে সুপারিশ গাইবেন নাকি মশাই?' পাশ থেকে একজন টুপি পরা ভদ্রলোক তির্যকভাবে কথা বললেন। গলার স্বর খানিকটা উঁচু হওয়ায় অনেকেই এদিকে তাকাল।

ভদ্রলোক বুঝলেন ডাক্তারদের হয়ে কিছু বলতে গেলে এখানে ওকে ছিঁড়ে খাবে সবাই। কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়েই উনি ভিড়ের মধ্যে নিজেকে ঢুকোবার চেষ্টা করতে করতে সরে পড়লেন।

মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে ইতিপূর্বে উচ্চ পর্যায়ে দু তিনবার আলোচনা হয়ে গেছে ঠিক কিন্তু সে আলোচনার ফলশ্রুতি শূন্য। পত্রপত্রিকায় হরদম এ নিয়ে নিবন্ধ লেখা হচ্ছে। তর্ক বিতর্কের শেষ নেই, কিন্তু আসল সমস্যাটা কেউই ঠিক ধরতে পেরেছেন বলে মনে করা যায় না।

দিন কয়েক আগে একজন টিবেটান দার্শনিক এক অদ্ভুত প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এক রাষ্ট্রের আওতা ভেঙে পৃথিবীর সমস্ত দেশ আবার বেরিয়ে না পড়লে মানুষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আগে পৃথিবীতে যেমন অসংখ্য রাষ্ট্র ছিল, অসংখ্য গভর্নমেন্ট, ঠিক সেই রকম আবার এক গভর্নমেন্টের আওতা ভেঙে অসংখা গভর্নমেন্ট চাই। তার মতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মানুষ যখন বিজ্ঞানকে মঙ্গলকর কার্যে গ্রহণ করার শপথ নিল তখন থেকেই এক নতুন বিপদের সূচনা হয়েছে। বিজ্ঞানকে অসৎ পথে চালিত করার বুদ্ধি মানুষকে আবার শিখতে হবে। আবার মারণাস্ত্র তৈরি করার কলা কৌশল জানতে হবে মানুষকে। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে আবার যুদ্ধ ঘটাবার সুযোগ দিতে হবে। জনসংখ্যা না কমাতে পারলে ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হবে। সভ্যতার নামে যুদ্ধ বর্জন এক চরম অসভ্যতা। চরম নির্বুদ্ধিতা মানুষের।

অবশ্য স্পেন থেকে এ ব্যাপারে প্রচণ্ড আপত্তি উঠেছিল। স্পেন দলে টানল ইটালীকে। ইটালীর রুমে লুয়াক সোজাসুজি বললেন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের যন্ত্রণাময় দৃশ্যগুলি এখনো পৃথিবীর মিউজিয়াম থেকে মুছে ফেলা হয় নি। মানুষ হয়ে মানুষের অমন জঘন্য পরিণতি দেখতে প্রস্তুত নই আমরা। পাগলের প্রলাপে বিশ্ব জনগণ যাতে কান না দেন সে জন্য তারা দেশে দেশে আবেদন পাঠিয়েছিলেন।

ভারত থেকে কর্তার সিং সদর্পে ঘোষণা করলেন, যুদ্ধ নয়, আর কখনোই যুদ্ধ নয়। এবার আমাদের অন্য পথ বেছে নেবার সময় এসেছে।

হাস্যকর মন্তব্য। অন্য পথটা কি তাই যদি না বলবেন তবে অমন ছেঁদো কথার মূল্য কি মশাই?

ভারতের বুদ্ধিজীবি সংঘ বিশ্ব বুদ্ধিজীবি সংঘকে জরুরী সভা ডাকবার জন্য আহ্বান করলেন, পৃথিবী এক সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় আমরা বুদ্ধিজীবিরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাই।

মেলবোর্ণে সভা বসল। সভায় পৃথিবীর বর্তমান সংকটগুলোকে খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করার খানিকটা পথ উন্মুক্ত হল। সম্পাদক ডি, পালিত তার রিপোর্টে প্রকাশ করলেন, বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা সাড়ে ন' শ কোটি। এবং জনসংখ্যা রোধের প্রচণ্ডতম চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও এই সংখ্যা শতকরা ৩৫ ভাগ করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থাৎ আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই জনসংখ্যার চাপে পৃথিবীতে আর তিলার্ধ স্থান থাকবে না। সেই সঙ্গে খাদ্যাভাব দেখা দেবে। খাদ্যাভাব মানুষকে বন্য পর্যায়ে নিয়ে যায়। ফলে কোন মানুষেরই নিরাপত্তা থাকবে না। কোন মানুষই স্বস্তিতে বেঁচে থাকতে পারবে না। যদিও

ডাক্তারী শাস্ত্রের কল্যাণে মানুষের মৃত্যুচিন্তা আদৌ নেই তবু বলব জীবিত প্রত্যেকটি মানুষই জীবন্ত অবস্থায় মৃত। পৃথিবীকে ক্রমে ক্রমে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগের ক্ষেত্র বলে আখ্যা দেওয়া যায়। মৃত্যু ভাল, কিন্তু মৃত্যু যন্ত্রণা অসহ্য। তাই মানুষকে মৃত্যু বরণ করতে শিখতে হবে। ফলে ডাক্তারদের দায়িত্বই এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী। ডাক্তাররা এবার থেকে চিকিৎসা করা বন্ধ করুন। সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিন ওষুধপত্র, কাটা ছুরি কাঁচি ব্যাণ্ডেজ। মানুষকে মরতে দিন। প্রাকৃতিক নিয়মেই জনসংখ্যা আরো কিছু কমতে দিন। রাশিয়া থেকে বিজ্ঞানীরা কিছুদিন আগে সদর্পে ঘোষণা করেছিল, এ যুগকে ডাক্তারদের যুগ বলে আখ্যা দেওয়া হোক। ডাক্তাররা যে অসাধ্য সাধন করে চলেছেন দিনের পর দিন তার কাছে ঈশ্বর পর্যুদস্ত। মানুষ আজ ঈশ্বরের চেয়েও বেশি শক্তিশালী।

এ ব্যাপারে এক রসিক সাহিত্যিক এক মজার গল্প ফাঁদলেন। গল্পটা ছাপা হল জার্ণালে। সত্যিই মজার কাহিনী। তাতে নায়ক একজন ঈশ্বর। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়েছেন; তাঁর দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এসেছে। হৃদক্রিয়া যথাযথ নয় বলে মৃত্যুর পদধ্বনি যেন শুনতে পাচ্ছেন। তিনি আশু প্রতিকারের লোভে ধন্বন্তরীর দরজায় এসে হাজির হলেন।

ধন্বন্তরী বললেন, ‘দেখ হে, আমি তো সেই পুরানো আমলের ডাক্তার। আমি কি আর তোমার এই রোগ সারাতে পারব! তুমি বরং মর্তে যাও। সেখানকার ডাক্তাররা অনেক বেশি চৌকশ। ওরাই পারবে তোমার রোগ সারিয়ে দিতে।’

‘মহাত্মন্! আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। তবে আপনার একটা মতামত নেওয়া প্রয়োজন ছিল বলেই এসেছিলাম। আর এ কথা তো ঠিক পৃথিবীতে ডাক্তাররা এমন পটু হয়ে উঠেছে যে যমরাজাকে বোধ হয় খুব শীঘ্রই দপ্তর গুটিয়ে ফেলতে হবে।’

যাই হোক ঈশ্বর একদিন মর্তে এলেন। এসে এক ডাক্তারের কাছে নিজের স্লিপ দেখিয়ে সমস্ত উপসর্গের কথা বললেন।

ডাক্তারও পারমাণবিক পরীক্ষার সাহায্যে ভগবানের সমস্ত অসুখ নিরাময় করে দিলেন। শুধু তাই নয়, আরো কয়েক কোটি বছর যাতে ভগবান তার সৃষ্টি রক্ষা করতে সক্ষম হন সেদিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করে ডাক্তার তাকে বিদায় দিলেন।

এই কাহিনীর শেষের দিকে সাহিত্যিক যে সংলাপ ব্যবহার করেছিলেন তা চমক সৃষ্টি করে! ভগবান রোগ নিরাময়ের পর ডাক্তারকে শুধোলেন, ‘বৎসে! তোমার অসীম যত্ন আর সেবায় আমি আজ পুনর্জীবন লাভ করেছি। বল, তোমাকে আমি কি বর দিতে পারি?’

ডাক্তার কি বুঝলেন কে জানে! পালটা প্রশ্ন করলেন, ‘আপনি কি ফি এর কথা বলছেন? সাধারণ রুগীরা যা কি দেয় সেই ফি তো আমি আপনার কাছ থেকে গ্রহণ করি নি!’

ঈশ্বর একটু বিরক্ত হলেন। বললেন, ‘আমি তোমাকে বর প্রার্থনা করতে বলছি।’

ডাক্তার চুরুট ধরাতে ধরাতে বললেন, ‘আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন দরজার বাইরে এখনো অনেক রুগী আমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে?’

এক অর্থে ঈশ্বরকে তাড়িয়েই দিলেন ডাক্তার। ফলে ঈশ্বর চেম্বার পরিত্যাগ
করার পূর্বে আশীর্বাদের বদলে অভিশাপ ছুঁড়ে দিয়ে গেলেন। বললেন, ‘বেশ আমি তোমার সময় নষ্ট করতে চাই না। কিন্তু অভিশাপ দিচ্ছি তোমার অহমিকাই তোমাকে ধ্বংসের

দিকে নিয়ে যাবে।’

কাহিনীটা এইখানেই শেষ। নেহাতই বানানো কাহিনী। কেন না, ভগবান কখনো ডাক্তারের চেম্বারে রোগ নিরাময়ের জন্য আসবেন এ কল্পনা উন্মাদ ছাড়া কারো পক্ষেই করা সম্ভব নয়। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে ডাক্তারী শাস্ত্রে স্বর্ণযুগের একটা চিত্র এর মধ্যে ফুটে বেরুচ্ছে। সত্যি সত্যিই আজ ডাক্তারদের স্বর্ণযুগ। কেন না, ডাক্তারদের কল্যাণে এখন অগুনতি কাল বেঁচে থাকার স্বপ্ন কে না দেখতে পারে! ওয়ার্লড ডাইরেক্টরীর পাতা ওল্টালে ব্যাপারটা আরো সহজ ভাবে বোঝা যায়। লক্ষ্য করুন ডাইরেক্টরী বলছে বর্তমান বছরে দুশ বছরের বেশি বয়সের লোকের সংখ্যা এখন সাতান্ন কোটি। দেড়শ থেকে দুশ বছরের মধ্যে সাড়ে তিনশ কোটি। বাকি সব একশ বছরের নীচে। আরো আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, দুশ বছরের একজন লোক যে কোন যুবকের মতোই কর্মক্ষম, বীর্যবান। তার দৈহিক লক্ষণে একটা বুড়োটে ছাপ পড়ে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তা নিতান্তই ছাপ। দৃষ্টিশক্তি যেমন আদৌ হারাচ্ছে না সে, তেমনি হৃদক্রিয়া বা অন্যান্য পেশীক্রিয়ার বিন্দুমাত্র দুর্বলতাও তার লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও বোধ হয় ডাক্তাররা এতখানি অসাধ্য সাধন করতে পারবেন বলে আশা করতে পারেন নি। চোখের ব্যাপারটাই সবচেয়ে বেশি গোলমেলে হয়ে দেখা গিয়েছিল। সাধারণত দেখা যেত পঞ্চাশ ষাট বছরের পর প্রাথমিক ছানি চিকিৎসায় আরো পঞ্চাশ ষাট বছর চোখের ক্রিয়া ঠিকমত অব্যাহত থাকত! কিন্তু দেড়শ বছরের পর একবার সম্পূর্ণভাবে চোখের মণি বদলী করে নেবার প্রয়োজন এসে পড়ল। ডাক্তাররা বানরের চোখ পরিবর্ত চোখ হিসেবে গ্রহণ করতে লাগলেন। ফলে বানরকুল ক্রমান্বয়ে ধ্বংস হয়ে আসতে থাকায় পৃথিবীর বহু স্থানেই কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে বানর চাষের কারখানা বসানো হয়েছে। বানরের চোখ পরিবর্ত চোখ হিসেবে আশ্চর্য ফল দেখাতে লাগল। অনুমান করা যাচ্ছে এই চোখে অনায়াসেই একজন লোক একশ দেড়শ বছর নির্ভাবনায় দৃষ্টিশক্তি অটুটভাবে রাখতে পারবে। তিনশ বছর হলে আবার চোখের মণি পাল্টাবার প্রয়োজন হবে। এ ব্যাপারে সব কিছু আলোচনাই থিয়োরী। গত পরীক্ষা কার্য চালাবার জন্য তিনশ বছরের কোন জীবিত লোক এখন অবধি পাওয়া যাচ্ছে না বলে ডাক্তাররা আপাতত এ ব্যাপারটা মুলতবী রাখতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু থিয়োরী যা বলে তাতে যথেষ্ট শঙ্কারই কারণ সূচিত হচ্ছে। কারণ তিনশ বছর পর দ্বিতীয়বার যখন চোখের মণি পাল্টাবার প্রয়োজন হবে তখন এমন কোন জীব কি পাওয়া যাবে যার চোখ পরিবর্ত চোখ হিসেবে গ্রহণ করা চলে। আপাতভাবে দেখা যাচ্ছে এমন কোন জীব নেই। একমাত্র এ পর্যায়ে হিপোর চোখই পরিবর্ত চোখ হিসেবে গ্রহণ করে কাজ চালান যেতে পারে কিন্তু মানুষের চোখের কোটরের যা মাপ সেই মাপের চোখ কোথায়?

যাই হোক সমস্যাটা খুব আশু নয় বলে ডাক্তার বা বিজ্ঞানীদের এ ব্যাপারে এখনো তেমন মাথা ব্যথা ওঠেনি। চোখের পরেই আসছে কয়েকটা অত্যন্ত জরুরী গ্ল্যাণ্ডের বয়স হেতু কর্মক্ষমতা লোপের আশঙ্কা। বিভিন্ন রকম জটিল অপারেশন দ্বারা এ সমস্যাও সমাধান করা সম্ভব হয়ে এসেছে। রশ্মি চিকিৎসার আশ্চর্য যাদু অকল্পনীয়!

দ্বিতীয় আর এক প্রধান সমস্যা দেখা দেয় বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই প্রায় দশ বছরের কাছাকাছি এসে। এ পর্যন্ত গ্ল্যাণ্ডগুলোতে অতিরিক্ত বাহ্যিক শক্তি দিয়ে চিকিৎসার ফলে সারা দেহে নতুন করে লোম গজাতে শুরু করে। টাক মাথায় ঘন কালো চুল গজিয়ে উঠলে ক্ষতি থাকে না। কিন্তু চুল যদি দেহের সব অংশে সমহারে বাড়তে থাকে তা হলে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা চিন্তনীয় হয়ে দাঁড়ায়। মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে সারা মুখে দাড়ি গোঁফ দাঁড়ায়। চোখের উপর অংশে যেমন ভ্রূ তেমনি নিচের নরম অংশেও ভ্রূর মতো চুলের রেখা প্রকট হয়ে উঠতে থাকে।

ডাক্তাররা বলেন এ চুলগুলি উঠিয়ে দিলে চোখের শক্তি দ্রুতহারে কমে আসবার ভয় যথেষ্ট। ফলে তারা এ ব্যাপারে চিকিৎসা করতে গররাজী।

ছুরি কাঁচির চাতুরীতে ডাক্তাররা অসাধ্য সাধন করেছে সন্দেহ নেই। দেহের যে অংশে জীর্ণতা বা ক্ষীণতা লাভ করছে সে অংশ অনায়াসেই কেটে বাদ দিয়ে নতুন অংশ জুড়ে দেওয়া আজ জলভাতের সামিল। এ ব্যাপারে পশু-পাখীদের দেহ থেকেই মানুষ অসীম উপকৃত।

জামান বিজ্ঞানীরা আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করে পৃথিবীর মানুষকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে গত বছর। একই জাতের দুটো কুকুর নিয়ে তারা পরীক্ষা করলেন। প্রথম পর্যায়ে কুকুর দুটির মস্তক ছেদন করা হল। তারপর প্রথম কুকুরের মাথাটা দ্বিতীয় কুকুরের ধড়ের সঙ্গে এবং দ্বিতীয় কুকুরের মাথাটি প্রথম কুকুরের ধড়ের সঙ্গে যথাযথ ভাবে জুড়ে দেওয়া হল। তাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে মাত্র সাড়ে সাত মিনিটের মধ্যে এই অস্ত্রোপ্রচার কার্য চালান হল। দেখা গেল দিন দুয়েকের মধ্যে কুকুর দুটি পূর্ণ মাত্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছে।

হয়ত এমন দিন আসবে যখন মানুষের মস্তক ছেদন করে অন্য মানুষের ধড়ের উপর বসানো চলতে পারে। বুদ্ধিহীন অথচ চিত্তবান লোকেরা এ ভাবে একদিন হয়ত গোপন চোরাকারবারীদের মতো বুদ্ধিমান লোকের মাথা নিজেদের ধড়ের উপর বসিয়ে নিজেদের বুদ্ধিমান করে তুলতে সচেষ্ট হবেন। আপাতত, এ ধরনের মন্তব্য শুনলে অনেকেই হেসে উড়িয়ে দেবেন, কিন্তু দুশ বছর আগে কে কল্পনা করতে পারত মানুষ একদিন বৃহস্পতি গ্রহ থেকে রকেটে করে বিশেষ ধরনের জ্বালানী এনে এখানকার পারমাণবিক চুল্লীগুলোকে সক্রিয় রাখতে সক্ষম হবে? বা, কে কল্পনা করতে পারত নকল আগ্নেয়গিরি তৈরি করে ভূ-কেন্দ্রের হাজার মাইল নিচ থেকে গলিত সোনা পৃথিবীর উপর একদিন মানুষ উঠিয়ে আনতে পারে? মানুষ আজ সব পারে। সব পারবে। ডাক্তাররাই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। ওরা জেহাদ তুলেছে একটা মানুষকেও মরতে দেবে না। না, একটাও না। মানুষের দুর্বল ক্ষীণায়মান অংশগুলোকে চিকিৎসা করে তারা তার মধ্যে যৌবনের শক্তি যুগিয়ে দেবে। পৃথিবী যতকাল থাকবে একটা মানুষও ততকাল জীবিত থেকে ভোগ করতে পারবে একি একটা কম কথা।

যাক এসব কথায় পরে আসা যাবে। আপাতত আমরা ডাক্তার সোমের চেম্বারে একবার ফিরে যাই চলুন। ডাক্তার সোম একজন ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির লোক। কথা বলেন অল্প কথা শুনতে চানও অল্প। রুগীর মুখ থেকে তার উপসর্গের কথা না শুনেও তিনি রুগীর

অবয়ব দেখেই যথাযথ পরামর্শ দিতে পারেন। বিশেষ করে তার মতো ব্রেন-বিষয়ক অভিজ্ঞ এদেশে খুব কমই আছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। মাদ্রাজের তরুণ ডাক্তার রামস্বামী মেডিকেল জার্ণালে একটা যুগান্তকারী প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সে প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল ব্রেন চিকিৎসা এবং ডাক্তার ভুবনমোহন সোম। তাঁর ধারণায় মানুষের ব্রেন চিকিৎসার দ্বারাই তা সারান সম্ভব হতে পারে। এবং ডাক্তাররা সোমের এই চিকিৎসা পদ্ধতি আজ না হতে পারে কিন্তু একদিন না একদিন পৃথিবীর সমস্ত ডাক্তারই মেনে নেবেন।

ডাক্তার সোমের চেম্বার আজ ফাঁকা জনমানবহীন বড় বেখাপ্পা দেখাচ্ছিল। দুজন এসিস্টান্ট সামনের লনে বসে উদাস ভাবে রাস্তায় ভিড়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। একজনের নাম অপরেশ, অপরজন একজন বার্মিজ, নামমিঃ চাঙ।

চাঙ বহুক্ষণ পর হঠাৎই বলল, 'সুপারসনিক হেলিকপটারকে বিক্রি করে দিয়ে চীনেই চলে যাব ভাবছি।'

'গিয়ে?' প্রশ্ন করলে অপরেশ।

'গিয়ে আমি এক্সট্রাক্টের গবেষণায় মন দেব।'

'বিষ তৈরি করবে?'

'অমৃতও তো হতে পারে। ইচ্ছে আছে ট্যাবলেট ফুড আবিষ্কার করা! খাদ্যের অভাব ঘটবে বলেই তো মানুষের আজ এত চিন্তা। ভাবছি এমন এক একটা
ট্যাবলেট বানাব যা খেলে মাসখানেক আর খাবার দরকার হবে না।'

অপরেশ হাসবে কি কাঁদবে বুঝে উঠতে পারল না। বলল, 'আইডিয়া যদিও নতুন নয়, তবে সাকসেসফুল হতে পারলে লোকে তোমাকে মাথায় করে নাচবে।'

দুজনেই আবার গম্ভীর। আকাশটা কাচের মতো ঝকঝকে পরিষ্কার। দুটো একটা পাখি আলতো ভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে। বহুদূরে কোন এক কারখানা থেকে গল গল করে ধুঁয়ো বেরুচ্ছে। কিন্তু বাতাস ছিল বলে ধুঁয়ো একটুও আকাশের গায়ে দেখা দিচ্ছিল না। অপরেশ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। পিছনে একটা জামরুল গাছ। তার ছায়াটা ক্রমশই একটু একটু করে সরে ছোট হয়ে আসছিল! অনেকক্ষণ পর মিঃ চাঙ আবার বললেন, 'কিন্তু যাই বলো মিঃ অপরেশ, আমার এখনো বিশ্বাস হয় না সান্টিয়াগোতে ডাক্তারদেরই অমন সর্বনাশ ডাকা হবে।'

'অনেক জিনিসই পৃথিবীতে বিশ্বাস করার মতো নয়। কিন্তু ঘটে যায়।' অপরেশ নীচু গলায় উত্তর করল।

'তা অবশ্য ঠিক, তবে সভ্যতার চাকচিক্য যত বাড়ছে মানুষ কি মনের দিক থেকে ততই বর্বর হয়ে যাবে।'

'যাবে কি! গিয়ে বসে আছে যে। নইলে ভাবতে পারো ডাঃ সোমের মতো ভাবুক শান্তিপ্রিয় লোকও আজ পথে পথে জনমত শুনবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'

'ওটা কিন্তু অহেতুক বাড়াবাড়ি। আরে বাবা সারা পৃথিবীতে একমাত্র ডাক্তার সোমই তো ডাক্তার নন, কোটি কোটি লোকের যেখানে প্রশ্ন, সেখানে'

'ডাক্তার সোম নিজের দায়িত্বের কথাই হয়ত ভাবছেন। তুমি আমি ঝট করে অন্য দিকে চলে যেতে পারব, কিন্তু সোম একশ বছরের বেশী ডাক্তারীই করছেন। এতদিনের

অভ্যেস।' আরো কিছু বক বক করে বলতে যাচ্ছিল অপরেশ হঠাৎ ভূতগ্রস্তের মতো সামনের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। মিঃ চাঙও উঠে দাঁড়াল। দুজনে দেখল ডাক্তার সোম তার সবুজ রঙের গাড়িটা লনের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

চোরের মতো নিঃশব্দে গাড়ীটা লনের ভিতর ঢুকল। অপরেশ এগিয়ে গেল।

'এ কি! স্যার, আপনি কি অসুস্থবোধ করছেন?'

ডাক্তার সোম টলতে টলতে গাড়ী থেকে নেমে এলেন। বিষন্ন ক্লান্ত চেহারা। 'আজ কোন পেশেন্ট আসেনি বুঝি?' মৃদু গলায় শুধোলেন।

চাঙ বলল, 'না সার!'

'তা হলে আজ থেকে ডাক্তারদেরই পেসেন্টের ভূমিকা নিতে হবে।' বিড়বিড় করে বলতে বলতে ডাক্তার সোম চেম্বারের ভিতর ঢুকে এয়ার কুলারের সুইচ টিপে দিলেন।

অপরেশ আর চাঙও পিছন পিছন এগিয়ে এসে ভিতরে ঢুকল। ওপাশে দেয়ালে কতকগুলি ব্রেনের কম্পলিকেটেড মডেল সাজান। মডেলগুলো দেখে অদ্ভুত ভাবে হেসে উঠলেন ডাক্তার সোম। 'সান্টিয়াগো সম্মেলনের কয়েকটা গাধার মতামতের উপর ওগুলোর ভাগ্য জড়ান, তোমাদের কি একথা ভাবলে হাসি পায় না?'

'স্যার! আপনি একটু বেশি মাত্রায় বিচলিত হয়ে পড়েছেন।'

'তুমি কি বলতে চাও? তুমি কি বলতে চাও, ডাক্তার সোম ইজ এ ফুল। যাও, ওগুলোকে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে এসো তো দেখি!'

'স্যার! আমাকে আপনি ভুল বুঝছেন।'

'হয়ত তাই হবে চাঙ!' ডাক্তার সোমের গলা যন্ত্রণায় যেন বুজে এল। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'জানো আমার মা একজন দীর্ঘ রুগী। লিভারের ঘা নিয়ে অনেকদিন ভুগছে। কাল থেকে যদি তার চিকিৎসা করতে না পারি তা হলে প্রথম ভিক্টিমই হবেন আমার মা। আমি একজন ডাক্তার হয়ে আমার মাকে আমি মরতে দিতে পারি না!'

অপরেশ ডাক্তার সোমের চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল। দেখল চোখ দুটো আশ্চর্য রকম সজল হয়ে এসেছে। যেন এক শান্তশিষ্ট শিশুর চোখে জল টল টল করছে।

মিঃ চাঙও বুঝতে পারল, ডাক্তার সোম কেন আজ এত বেশি চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। মুখ নীচু করে স্থির হয়ে ও দাঁড়িয়ে রইল।

সান্তিয়াগো সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন শ্রীগুণধর রেড্ডি। ভোর হওয়ার আগেই উনি কে-ফাইভ রকেটে করে সান্টিয়াগো গিয়েছিলেন, সন্ধ্যার দিকে আবার ফিরে এলেন। এলাহাবাদের পোর্টে আগে থেকেই রিপোর্টাররা টেপ রেকর্ডার নিয়ে প্রস্তুত হয়েছিল। টেলিভিশন-অলারাও তৈরি ছিল। নীল আলোর ফোকাস ফেলে স্পট ঠিক করে ধীরে ধীরে তার উপর প্লেনটা নেমে দাঁড়াল।

শ্রীরেড্ডি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ কোন দিনই সন্তুষ্ট নন। লোকটার হামবগ আচরণ নিয়ে কয়েকবার বিক্ষোভও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু তা সাময়িক। সাংবাদিকরা, অনেকেরই ধারণায়, রেড্ডির হাতের কেনা পুতুল। পুরো ব্যাপারটাই চলছে টাকার উপর দিয়ে। টাকায় মুখ বন্ধ। টাকায় কি না হয়।

তবে একথা ঠিক রেডি হয়ত ডাক্তারদের সমর্থনেই কথা বলবেন। তার মতে, ডাক্তাররা তো নিমিত্ত মাত্র। সমস্যাটার সমাধানের উপায় আমাদের অন্য ভাবে খুঁজতে হবে।

প্লেনের দরজা খুলে যেতে প্রথমে রেড্ডি এবং পরে তার স্ত্রী প্রীলা রেড্ডি আরো পিছনে পি, এ এবং অন্যান্যরা একে একে নেমে এলেন।

দূরে ব্যারিকেডের বাইরে পুলিশ জনতাকে আটকে রেখেছে। পুলিশদের হাতে ব্যাটারী গান। অবস্থা খারাপ বুঝলেই ফায়ার করে মৃদু ইলেকট্রিক শক ছড়াবে।

বাঙালী ছাড়াও বহু ভাষাভাষিক লোকের ভিড় কম নয়। এরা সকলেই ট্রানস্লেটার যন্ত্র কানে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছে। রেড্ডির কথা শুনবার জন্য।

রেড্ডি জনতাকে হ্যাট খুলে অভিবাদন করলেন। ‘গুড ইভনিং বন্ধুগণ! আপনারা নিশ্চয়ই সম্মেলনের তথ্য জানবার জন্য আগ্রহী হয়ে এই এয়ার পোর্ট অবধি দৌড়ে এসেছেন। আমি আপনাদের এ ব্যাপারে এক কথাতেই নিরাশ করে দিতে পারি কি?’

জনতা থেকে সোরগোল উঠল। পুলিশও তৎপর হয়ে উঠল।

হঠাৎ সাংবাদিকদের একজন প্রশ্ন করলেন, ‘এ কথা কি ঠিক মিঃ রেড্ডি, আপনারা যে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন তা জনসাধারণের অনুকূলেই যাবে।’

‘জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যই সম্মেলন ডাকা হয়।’ সহাস্য উত্তর দিলেন রেড্ডি।

‘এবং সেই সঙ্গে সংখ্যালঘু ডাক্তারদের ভাগ্যও কি জড়িত থাকবে?’

‘ডাক্তারীটা এক জাতীয় বৃত্তি বা পেশা। আসলে তাদেরও সর্বপ্রথম পরিচয় ‘মানুষ’। মানুষের জন্যই সান্টিয়াগো সম্মেলন।’

‘অর্থাৎ আমরা কি ধরে নিতে পারি সম্মেলন এই ধরনের রায় দেবে যার ফলে ডাক্তারী পেশাকে বর্জন করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ আর থাকবে না?’

‘এ প্রশ্নের জবাব দিতে আপাতত আমাকে অনুরোধ করবেন না।’

জনতা থেকে আবার গুঞ্জন উঠল।

সাংবাদিকদের মধ্যে আর একজন প্রশ্ন করলেন, ‘আপনার কি দৃঢ় বিশ্বাস পৃথিবীর জনসংখ্যা কমাতে হলে ডাক্তারী শাস্ত্রকে বে-আইনী ঘোষণা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই।’

‘আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসে এমন কিছু আসে যায় না। বেশীরভাগ লোকের বিশ্বাস এক হলে তবেই একটা মতামত গড়ে ওঠে। ব্যক্তিগত লোকের বিশ্বাসের মূল্য একালে নেহাতই সামান্য।’

‘আপনি আপনার বিশ্বাসকে দশজনের মধ্যে প্রচার করেই তো জনমত গড়তে পারেন?’

‘আমি আমার মতামতকে আপনাদের উপর চাপিয়ে দিতে চাই না। আপনার বুদ্ধি বিবেকই আপনাকে মতামত গঠনে সুযোগ এনে দেবে।’

‘তা যাই হোক।’ সাংবাদিক এবার শ্রীরেড্ডি সমেত পুরো দলটাকে স্থির হয়ে দাঁড়াতে অনুরোধ করে ফটো তুলবার জন্য পোজ নিলেন। শ্রীমতী প্রমীলা রেড্ডিকে
পাশে নিয়ে ছবি তোলা হল।

ছবি তোলার পর্ব শেষ হলে রেড্ডি সাংবাদিকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে এলেন। জনতাকে হাত তুলে অভিবাদন করলেন। চারিদিক থেকে স্লোগান উঠল, ডাক্তারী শাস্ত্র বে-আইনী হোক। ডাক্তারী শাস্ত্র বে-আইনী হোক।

ডিনার টেবিলে বসে ডাক্তার সোম স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করছিলেন। সোমের স্ত্রী শ্রীমতী বীণা সোম এককালে দর্শনের ছাত্রী ছিলেন। ভাল ছাত্রীই ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে চর্চা না থাকায় সব কিছু গুলিয়ে বসে আছে আজ। দীর্ঘ স্বাস্থ্যবতী মহিলা। সাজগোজ করা এক জাতের হবি তাঁর। মুনলাইট হোটেলের ফ্যান্সি ড্রেস কম্পিটিশনে গত বছর জনৈক বিচারক হয়েছিলেন। নিজে অত্যন্ত সাদামাটা পোশাক পরেন ঠিকই কিন্তু যে কেউ দেখলে বুঝতে পারবেন ঐ পোশাক পরার মধ্যেও এক জাতের চাপা অহমিকা লুকান থাকে। কেয়ারফুল কেয়ারলেসনেস।

ডাক্তার শুধোলেন, তুমি কি সন্ধ্যার নিউজটা মন দিয়ে শুনেছিলে বীণা?'

'শুনেছি। আর একটু কফি দেব?'

ডাক্তার সোমা শ্রাগ্ করলেন। 'হোয়াট এ পিটি! এমন দুর্দিনেও তুমি এত স্বাভাবিক থাকছ কি করে বল দেখি। জানো মায়ের ট্রিটমেন্টটা আরো তিন মাস চালাতে হবে।'

'চালাবে। অত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? তুমিই কি একা ডাক্তার নাকি!'

'প্রত্যেকটি ডাক্তারই আজ ঘাবড়াচ্ছে। আমাকে দেখে কি তা বুঝতে পারছ না?'

'হুঁ তোমার মতো সবাই চিকেন হার্টেড কিনা। নাও আর একটু কফি খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নাও। তারপর চল টেলিভিশনটা খুলে বসি।'

'তা হলে কি তোমার ধারণা সান্তিয়াগোতে ডাক্তারদের অমন সর্বনাশ ডাকা হবে না?'

'হলেই বা ক্ষতি কি। আইন যত আছে, তার ফাঁকও তত আছে। আর একথা তো ঠিক যারা আজ আলোচনার টেবিলে বসে রায় দেবে তারাই কালকে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। তাদেরই কালকে ডাক্তারের দরকার হতে পারে।'

'পারে কি, পারবেই। সব এখন বুদ্ধি বিকৃতির কবলে পড়েছে।'

'তাই বলছি আজ যদিও অমন ধারা কিছু করতে পারে, কালই আবার তা প্রত্যাহার করে নেবে। চল, ও ঘরে বসি গিয়ে।'

ডাক্তার সোম ক্লান্ত ভাবে উঠে দাঁড়ালেন। মনে হল হাত পা হঠাৎ কেমন অবশ হয়ে আসছে। এই অবশতা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার ফল। একশ তেত্রিশ বছর বয়স ডাক্তারের। ভগবানের নিয়মকে লঙঘন করে এতকাল বেঁচে থাকার পাপ ওঁর দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দানা বেঁধে বসে আছে। ভগবানের আক্রোশ যেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষের উপর বর্ষিত হচ্ছে আজ। না, একটা লোকও আজ নিস্তার পাবে না।

বীণা দেবী এগিয়ে এলেন ডাক্তারের পাশে, 'কি হল তোমার? টলছ কেন?'

'না! টলছি কোথায়!' ডাক্তার সোম নিজেকে প্রকৃতিস্থ করে ধীর পায়ে এগোতে লাগলেন। বীণার কাঁধের উপর একটা হাত আলতো ভাবে বিছিয়ে দিলেন।

ঘরে ক্ষীণ হালকা একটু আলোয় আলোকিত হয়েছিল। শান্ত স্তব্ধতা। আরাম কেদারায় গা এগিয়ে দিলেন ডাক্তার। নরম গদির মধ্যে অনেকখানি ডুবে গেলেন। বীণা দেবী মুখোমুখি বসলেন। বীণার মুখ পাথরের স্কালপচার বলে ভুল হচ্ছিল। অনেকক্ষণ অপলকে তাকিয়ে রইলেন ডাক্তার সোম। হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বললেন, 'ইমপসিবল।'

'কি ইমপসিবল? মাথা থেকে ওসব ভূতগুলো সরাবে তুমি? চুলোয় যাক তোমার ডাক্তারী।' খানিকটা বিরক্ত ভাবেই বীণা দেবী বললেন।

‘তুমি বুঝবে না। এসব তোমাদের মতো মেয়েদের মাথায় ঢুকবে না।’

‘ওফ, ভারী তো আমার পুরুষ। ভাবতে ভাবতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তো কাহিল হয়ে পড়েছ।’

‘তোমাদের মতো তো কেবল খেয়েদেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুলে চলে না আমাদের।’ ডাক্তারও বিরক্ত ভাবে উত্তর দিলেন। ‘মায়ের অসুখটা না থাকলে থোড়াই আমি পরোয়া করতাম।’

‘ওরা যতই আইন করুক, মায়ের চিকিৎসা তাতে বন্ধ হবে না। ঘরে বসে মাকে তুমি অনায়াসেই দেখাশুনা করবে। কে অত খোঁজ নিতে আসছে বলো। আর তা ছাড়া আইন করলেই তো হয় না। তা চালু করতে সময় লাগে, ততদিনে মা বেশ ভাল হয়ে উঠবেন।’

‘আইনের উপরই এখন জগৎটা চলছে তা জানো। আইনের জন্যই মানুষের আজ এত যন্ত্রণা। সব স্বাধীনতা তার আইনের শাসনেই ছোট হয়ে গেছে।’

‘তা অবশ্য গেছে। কিন্তু আইনেই আবার মানুষের সভ্যতা টিকে আছে।’ নরম গলায় বীণা দেবী বললেন। তারপর বাঁ হাত বাড়িয়ে রেডিওর সুইচটা টিপে দিলেন।

দেওয়ালে পারমাণবিক ঘড়িটা জ্বল জ্বল করে জ্বলে সময় নির্দেশ করছে। এখানে বসে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলেন ডাক্তার, রাত নটা সতের। নটার সময় রাতের নিউজ প্রচারের কথা ছিল। কি সংবাদ ওরা ছড়িয়েছে, কে জানে।

বীণা দেবী বললেন, ‘নিউজটা টেপ করা আছে। বাজাব, না রেডিওই চলবে?’

ডাক্তার সোম চোখ বুজে অপেক্ষা করছিলেন। কোন উত্তর দিলেন না। রেডিও, রেকর্ড বা টেলিভিশন কোন কিছুর ওপরই আস্থা নেই ওঁর। ও-সব যন্ত্র। যন্ত্রের কি ভয়াবহ চেহারা হয়েছে এযুগে।

ততক্ষণে রেডিওই বেজে উঠল। কে যেন সারগর্ভ বাণী প্রচার করে জনতাকে শান্ত থাকবার নির্দেশ দিচ্ছে। সান্তিয়াগো সম্মেলনের তাৎপর্য বোঝাচ্ছেন। ...হ্যাঁ এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য নয় জোর করে অসহায় মানুষের কাঁধে কিছু চাপিয়ে দেওয়া। জনসাধারণ চেয়েছিল বলেই এই সম্মেলনের প্রস্তুতি। কিন্তু জনসাধারণ নিশ্চয়ই এমন কিছু চায়নি যাতে এখনই একটা লজ্জাকর ইতিহাসের নজির ঘটে যায়। ডাক্তারদের প্রতি নির্মম আচরণ করবেন না। হয়ত দেখবেন আপনারই পরিবারের মধ্যে একজন কি দুজন ডাক্তারীবৃত্তিসম্পন্ন। তাদের প্রতি নিশ্চয়ই আপনি নির্মম হবেন না।...

‘উহ্ বন্ধ কর। রাবিশ!’ ডাক্তার সোম হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন।

বীণা দেবী সুইচ অফ করে দিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, ‘কেন, কি এমন খারাপ কথা বলছিল ওরা। সবতায় তোমার অধীর স্বভাব।’

হঠাৎ ফোন বাজল। ডাক্তার সোম তাকিয়ে রইলেন ফোনের দিকে। হাত বাড়াতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। নিশ্চয়ই কোন রুগী কনট্যাক্ট করতে চায়। বীণা দেবী ফোন তুললেন।

‘হ্যালো, হুঁ হুঁআচ্ছা।’ ফোন এগিয়ে দিয়ে বীণা দেবী বললেন ‘তোমার ফোন।’

‘কে ডাকছে?’ নির্বিকার ভাবে প্রশ্ন করলেন ডাক্তার সোম।

‘মাদ্রাজ থেকে। কি সাম নায়ার।’

‘কি চায়?’ আবার প্রশ্ন করলেন ডাক্তার।

‘আহা ধরেই দেখ না। নিশ্চয়ই কোন জরুরী কথা আছে, নইলে এই রাত করে কেউ ডাকে।’

ফোন তুলে ডাক্তার সোম প্রশ্ন করলেন, ‘হ্যালো, কে কথা বলছেন?’

‘আমি সৎপতি নায়ার। আপনি ডাক্তার সোম নিশ্চয়ই।’

‘হ্যাঁ বলুন।’

আমি ডাক্তার রামস্বামীর এ্যাসিস্ট্যান্ট। কিছুক্ষণ আগে ডাক্তার রামস্বামী সুইসাইড করেছেন। পুলিশে এখন বাড়ীটাকে ঘিরে আছেন। রামস্বামী তাঁর চিঠিতে আপনার কাছে খবরটা জানাবার জন্য অনুরোধ করে গেছেন।’

ডাক্তার সোমের হাত কাঁপছিল। উনি সোজা শক্ত হয়ে বসলেন ‘আপনি কি প্রলাপ বকছেন? রামস্বামী, সুইশাইড। ইমপসিব্‌ল।’

‘উনি চিঠিতে লিখেছেন, আমি ডাক্তারী বেআইনী করার প্রতিবাদে সমস্ত পৃথিবীর জনসাধারণের কাছে আমার জীবন সমর্পণ করছি। পৃথিবীর সমস্ত ডাক্তার সমবেত হোন। প্রতিবাদ করুন। আমি যে অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে দিলাম তাতে ইন্ধন দিয়ে তাকে দীর্ঘস্থায়ী করে রাখুন। লঙ লিভ মেডিক্যাল ম্যান।...’

ডাক্তার সোমের সমস্ত দেহ দরদর করে ঘাম জড়িয়ে এল। কানের উপর ফোনটাকে চেপে ধরেও আর কিছু শুতে পেলেন না উনি। সব কেমন ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছে। বীণা দেবীর মুখটাও যেন চোখের দৃষ্টিতে আর প্রচ্ছন্নভাবে ধরা পড়ছে না। ঘরের বাতিটা কি নিভে গেছে! পৃথিবীর সমস্ত বাতি কি নিভে গেছে। অন্ধকার, বিরাট নিঃশব্দ অন্ধকার!

হাত থেকে ফোনটা গড়িয়ে পড়ে গেল। ডাক্তার সোম চিৎকার করে কি যেন বলবার চেষ্টা করলেন, বীণা দেবী ঠিকমতো ধরতে পারলেন না। এগিয়ে এসে ডাক্তার সোমের মাথার সামনে কুলিং মেশিনটা ফুল স্পীডে খুলে দিলেন।

খানিকটা হুইস্কি খাওয়ার পর ডাক্তার সোম আবার ধীরে ধীরে সম্বিৎ ফিরে পেলেন। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে মিঃ চাঙ আর অপরেশকে তলব করলেন।

‘ডাকছিলেন স্যার?’

‘হুঁ, বোস! নিশ্চই খবর পেয়েছে ডাক্তার নায়ার, প্রতিবাদে সুইসাইড করেছেন?

‘হ্যাঁ সার। এইমাত্র রেডিও থেকেও প্রচার করা হয়েছে।’

মিঃ চাঙ বললেন, ‘ডাক্তার নায়ার হাই ভোল্টেজ শক খেয়ে জীবন দিয়েছেন ডাক্তারি আইনের প্রতিবাদে। উনি যে চিঠি লিখে গেছেন তাও পাঠ করে শোনানো হয়েছে।’

‘ব্যাপারটা বেশ প্রচার হয়ে গেছে।’

‘হ্যাঁ স্যার।’ অপরেশ নীচু গলায় বলল! ‘আর সেই সঙ্গে স্যার আর একটা নিউজ আছে।’

‘কি নিউজ?’

‘পৃথিবীর বহু ডাক্তার ঘোর প্রতিবাদ জানিয়ে কাল সকালেই সান্টিয়াগোতে তার পাঠাবে বলে জানা যাচ্ছে।’

‘তা হলে আমাদেরও একটা কিছু করণীয় আছে এ ব্যাপারে?’

‘হ্যাঁ স্যার, আমরাও একটা ড্রাফট করেছি।’

‘ভেরি গুড।’

‘কিছুতেই স্যার এমন অন্যায় আমরা সহ্য করব না।’

অপরেশ খানিকটা উত্তেজিত গলায় বলল। ‘নিশ্চয়ই, এমন কিছু নিশ্চয়ই আমরা সহ্য করতে পারি না। তা ড্রাফটটা তা হলে একবার আমাকে দেখিয়ে সই করিয়ে নিও সকালে?’

‘নিশ্চয়ই স্যার।’

‘আর একটা কাজের কথা। দেখছ তো কেমন দুর্বল হয়ে পড়েছি আমি! অথচ এখনি আমার রকেটে করে মাদ্রাজ যাওয়া উচিত ছিল।’

‘এই রাত করে স্যার আপনি কেন কষ্ট করবেন। তার চে’

‘হুঁ সেই জন্যই তোমাদের ডেকেছি। তোমরা একবার আমার হয়ে মাদ্রাজ যাও। নায়ারের পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত আমাদের। ভোরের আগেই আবার ফিরে এসো। একটু কষ্ট হবে ঠিকই, তাএটুকু আমাদের করা উচিত।’

‘নিশ্চয়ই স্যার। আমরা নিশ্চয়ই যাব। এখনি আমরা তৈরি হয়ে নিচ্ছি।’

মিঃ চাঙ বলল, ‘আপনি স্যার একটু বিশ্রাম নিন এবার। আমরা ঠিক ভোরের আগেই আবার ফিরে আসছি।’

‘বেশ। গুড নাইট।’

মিঃ চাঙ আর অপরেশ বাইরে বেরিয়ে এল।

বীণা দেবী পাশেই বসেছিলেন। বললেন, ‘লোক দুটো আশ্চর্য ভাল। এমন মিষ্টি স্বভাব।’

একটা গম্ভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শব্দ করলেন ডাক্তার সোম, ‘হুঁ। এবার বাতিটা নিভিয়ে দাও। খুব ক্লান্ত লাগছে আমার।’

বীণা দেবী সুইচটা অফ করে দিলেন।

মধ্যরাতে কি যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ডাক্তার সোমের। পারমাণবিক ঘড়িতে এখন রাত দুটো! অপলকে উনি ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ঘড়ির ডায়াল জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। সময় নির্দেশক কাঁটা দুটো আপাতভাবে স্থির হয়ে আছে। যেন মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে ঘড়ি তার সময় চুরি করে এগিয়ে যাচ্ছে। পলে পলে মুহূর্তে মুহূর্তে সময় বয়ে যাচ্ছে। এমনি ভাবে সময় বয়ে যেতে যেতে আজ প্রায় দেড়শ বছরের কাছাকাছি বয়স আমার। ইচ্ছে করলে আমি হাজার বছর বেঁচে থাকতে পারি। এই পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ কি আমার কাছে পুরানো হয়ে যাবে? না, এতটুকু মলিন নয় বসন্তকাল। প্রত্যেকটি ঋতুই যেন নব নব সাজে আমার কাছে এসে তার চেহারা খুলে ধরে। তবে? তবে কেন আমি বেঁচে থাকব না। কেন বাঁচবে না মানুষ?

অথচ ওরা ভুল বুঝে ভুল পথে যেতে চায়। আমি কি তবে প্রত্যেক মানুষকে ধরে ধরে বেঁচে থাকার সমর্থনে কথা বলব? নিশ্চয়ই আমার বোঝান উচিত সবাইকে। ডাক্তার সোম ক্রমশই চিন্তা করতে করতে উত্তেজিত হচ্ছিলেন। ওপাশে বীণা দেবী ঘুমিয়ে আছে। আহা, কি স্নিগ্ধ ওর চোখের পাপড়ি দুটো। স্নেহে মমতায় সুখে, আমার বেঁচে থাকার সব কিছুর প্রেরণাই বীণা। ডাক্তার সোম খানিকটা স্বস্তি বোধ করছিলেন মনে মনে। বাইরে তাকালেন।

জানলার বাইরে জ্বলজ্বল আকাশ। অসংখ্য তারা দেখা যাচ্ছে। তারাগুলোর রহস্য আজ এমন কিছু নতুন নয় মানুষের কাছে। সমস্ত বিশ্বটাকে মানুষ যেন তার হাতের মুঠোয় তুলে নিয়েছে।

মানুষ কত শক্তিশালী; তবু কেন এই নির্বুদ্ধিতা? কেন মানুষ জীবনের প্রয়োজনে মৃত্যুকে আজ এত করে কাছে পেতে চায়। কেন? কেন? ডাক্তার সোম মানুষের এই নির্বুদ্ধিতার কোন যুক্তিই খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

হঠাৎ তিনি কি একটা ছোট্ট শব্দ পেয়ে চমকে উঠলেন। পাশের ঘরে কি বাতি জ্বলে উঠল? পাশের ঘরেই শয্যাশায়ী মা। ডাক্তার সোম আরো কিছু শুনবার আশায় অপেক্ষা করে রইলেন। কে যেন ঘরের মধ্যে কিছু একটা ভারী জিনিস নিয়ে টানাটানি করছে। 'কে?' ছোট্ট করে প্রশ্ন করলেন ডাক্তার সোম। পলকেই ও ঘরের শব্দ বন্ধ হয়ে গেল।

আশ্চর্য! কি হতে পারে। বাইরের কোন লোকের এ ঘরের দিকে তো ঢোকা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। কি হতে পারে তবে!

ডাক্তার সোম এগিয়ে এলেন পা টিপে টিপে দরজার সামনে এসে ডাকলেন, 'মা, ও মা!'

কিন্তু এবারও কোন উত্তর নেই। তবে কি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ব। হ্যাঁ, দরজায় একটু চাপ দিয়ে ডাক্তার সোম দরজাটা খুলে ফেললেন। তারপর আঁৎকে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। একি, কি দেখছেন উনি? 'মা, তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছ?' ডাক্তার সোম দেখছিলেন তাঁর মাকে। ঘরের মধ্যে একটা টুল টেনে এনে তার উপর দাঁড়িয়ে আছেন মা। হাতে দড়ির মতো পাকান কাপড়।

ডাক্তার সোমের বুঝতে অসুবিধা হল না, মা আর একটু সময় পেলেই হয়ত একটা কেলেঙ্কারী করে বসতেন। ভাগ্যিস ঘুম ভেঙে জেগে বসেছিলেন ডাক্তার সোম। সমস্ত দেহে যেন উত্তেজনায় দরদ করে ঘাম জড়াতে লাগল। সোম এগিয়ে এলেন, 'মা, এ তুমি কি করতে যাচ্ছ মা?' বিদ্যুৎ বেগে মাকে কোলের উপর টেনে নামিয়ে নিলেন ডাক্তার সোম তারপর বিছানার উপর শুইয়ে দিলেন।

'খোকা!' বৃদ্ধার চোখে ঝর ঝর করে জল নেমে এল। 'খোকা আমায় তুই রেহাই দে খোকা। আমি আর বাঁচব না, আর বাঁচতে চাই না আমি।'

'মা ও-মা, অমন কথা বলো না মা। আমি যত কাল থাকব, তোমাকে আমার সঙ্গে সঙ্গে রাখব মা। বাবার মৃত্যুর সময় আমি কাছে ছিলাম না। এ দুঃখ আমি কোন দিন ভুলতে পারব না।'

মা ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছিলেন। ডাক্তার সোম গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। 'মা, আমি যতকাল আছি তোমার ভাবনা কি মা?'

'আমি সব শুনেছি খোকা। তোকে আর ডাক্তারী করতে দেবে না ওরা, আমি সব শুনেছি।'

'তুমি ভুল শুনেছ মা। ডাক্তারী কখনো বে-আইনী হয়! হতে পারে! পৃথিবীর সব লোককেই তো ডাক্তারের দরকার হতে পারে। জানো মা, আমরা এর ঘোর প্রতিবাদ করব। আমরা আমাদের দায়িত্ব থেকে এতটুকু নড়ব না। না, এতটুকু না।'

‘আমায় আর সান্ত্বনা দিস না, খোকা। আমি অনেক দেখলাম এ সংসারের, আর আমার ক্ষুধা নেই; আর আমার সাধ নেই বেঁচে থাকার। তোরা আমায় বাধা দিস না খোকা। আমার মরতে দে।’

‘কি তুমি পাগলের মতো বকছ মা। ওরা যতই বে-আইনী করুক চিকিৎসা, আমি তোমায় ভাল করে তুলবই, তুলবই। দেখি, পা ছড়িয়ে শুয়ে পড় দেখি।’

মাকে আয়েশ মতো শুইয়ে দিলেন ডাক্তার সোম। মায়ের সমস্ত দেহে একটা বার্ধক্যের ছাপ। কেবল দুশ্চিন্তাতেই চেহারাটাকে অমন করেছেন মা। কিন্তু কেন? কেন এই চিন্তা? মানুষ কি তবে মৃত্যুর জন্য মনে মনে কামনা করে? আমিও কি মৃত্যুর জন্য অহর্নিশ কামনা করি? এ পৃথিবী কি আমার কাছে সত্যি সত্যি বিরক্তিকর পুরানো হয়ে গেছে! রূপ রস গন্ধ বর্ণ, ভোগের স্পৃহা কি মানুষের তিলে তিলে শুকিয়ে যায়? বৃত্তিগুলি ধীরে ধীরে শুকিয়ে গেছে মায়ের? কোথায়? বৃত্তিগুলিকে সজীব করে রাখার চিকিৎসা তো আমি জানি না।

তবে, কি নিয়ে আমরা গর্ব করি? নিজেকে অত্যন্ত ছোট অসহায় মনে হতে লাগল ডাক্তারের। মায়ের চোখের দিকে তাকাল। টলটল করছে পরিবর্ত চোখের মণি দুটো যেন একটা জলের ফোঁটা মণির উপর বেদনায় প্রতীক হয়ে ভাসছে। বেঁচে থাকার মধ্যে কি নিদারুণ বেদনা ডাক্তার সোম যেন বসে বসে তাই দেখতে লাগলেন।

তারপর এক সময় অসহায় ভাবে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে নিজেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

আর পারমাণবিক ঘড়িতে তখন পলে পলে সময় বয়ে যাচ্ছিল, কেউই তা বুঝতে পারছিল না। নিঃশব্দ রাত্রি ক্রমশ ভোরের দিকে এগোতে লাগল।

প্রথম প্রকাশ: আশ্চর্য!, জানুয়ারি, ১৯৬৬

সূচিপত্রে ফিরে যান

নাগ-নিকেতন

গৌরীশংকর দে

দ্বিতীয় সিগ্রেটটি ধরিয়ে বেশ আয়েস করে একটা টান দিয়ে সর্বাঙ্গসুন্দরবাবু তার জীবনের অত্যাশ্চর্য ঘটনাটি বলতে শুরু করলেন।

আমরা, মানে জন কয়েক যাত্রী বসে আছি চুঁচুড়া রেলওয়ে স্টেশনের ওয়েটিংরুমে। সবার সঙ্গে সবার সম্ভবত এই প্রথম এবং শেষ আলাপ। গাড়ি আসতে এখনো মিনিট চল্লিশেক বাকি। তাই খানিকক্ষণ উসখুস করে সর্বাঙ্গসুন্দরবাবু শেষ পর্যন্ত এই গল্প ফেঁদেছেন। আমরাও নড়েচড়ে তার চারিদিকে গোল হয়ে বসেছি। তিনি বলতে লাগলেন :

"পেশায় আমি একজন খুদে এঞ্জিনীয়র। মহারাষ্ট্রের একটা এলাকায় রেলপথ বৈদ্যুতিক করণের কাজ চলছে। জায়গাটা পুণা থেকে মাইল সত্তরেক দূরে। পাহাড়ী এলাকা। রীতিমতো দুর্গম। তবে এমন সুন্দর যে, নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গিয়ে চারিদিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে আসে।

"খাওয়া-দাওয়া নিয়ে খুঁতখুঁত করার স্বভাব আমার নয়। সারাদিন কাজ করি, আর রাতে সরকারী তাঁবুতে থাকি। আমার সঙ্গী মাত্র দু'জন। সার্ভেয়ার রামকিষণ। আর শিউচরণ। আমাদের খাবার-দাবার ইত্যাদির দায়িত্ব ওর ওপর।

"বৈকালিক ভ্রমণের অভ্যাস আমার সেই ছেলেবেলা থেকে। এখানে, এই বিদেশ বিভূঁইয়ে এসেও, বদ অভ্যাসটা ছাড়তে পারিনি। সঙ্গীদের বারণ সত্ত্বেও নয়। বেলা পড়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে বাইরের পৃথিবী যেন লক্ষ হাতছানি দিয়ে, আমাকে ডাকতে থাকে। যেন আগে থেকে কাকে কথা দিয়ে রেখেছি। আমাকে বেরুতেই হবে। পাহাড়ের ছায়া ঘন হয়ে ওঠে, ম্লান হতে হতে অস্পষ্ট হয়ে যায় গাছপালা। আমি একাই বেরুই অচেনা পথে। সঙ্গে থাকে একটা লাঠি আর একটা মাঝারি সাইজের টর্চ। দু এক দিন পথ হারিয়েও ফেলেছি। খুঁজতে বেরিয়েছে সঙ্গীরা। নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছে। ভেবেছি, কাল থেকে আর বেরুব না। কিন্তু বিকেল আসতেই সে সংকল্প ভেসে গেছে মাতালের সুরা-ত্যাগের প্রতিজ্ঞার মতো।"

গৌরচন্দ্রিকাতেই অনেকটা সময় নিয়ে নিচ্ছেন দেখে আমরা একটু অধৈর্য হয়ে উঠেছিলুম। তা টের পেয়েই যেন সর্বাঙ্গসুন্দরবাবু আসল ঘটনায় এসে পড়লেন :

"একদিন বিকেলে বেড়াতে বেড়িয়েছি। অন্যমনস্কভাবে পথ হাঁটছিলুম। হঠাৎ খেয়াল হতেই তাকিয়ে দেখি, যে এলাকায় এসে পড়েছি তা আমার একেবারেই অপরিচিত।

"এ-পথে সে-পথে বেশ খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করেও তাঁবুতে ফেরার পথ খুঁজে পাওয়া গেল না। বুঝলুম, আজো আমাকে সঙ্গীদের সহৃদয়তার ওপর নির্ভর করতে হবে।

"তবে চারদিকে দিনের মতো ফুটফুটে জ্যোৎস্না। এই যা রক্ষে। কৃষ্ণপক্ষ হলে দুর্গতির সীমা থাকত না। সেই জ্যোৎস্নায় চারিদিকের পাহাড় আর গাছপালা কেমন অপার্থিব লাগছিল। যেন পথ ভুলে পরীর দেশে এসে পড়েছি।

“পথটা একবার উঁচু, একবার নিচু হয়ে কোথায় গেছে কে জানে। চড়াই উৎরাই ভেঙে চলতে মন্দ লাগছিল না।

“একটা জায়গায় উঁচু থেকে নিচুতে নামতেই হঠাৎ, একেবারেই হঠাৎ, চোখে পড়ল একটা পুরানো দুর্গ। মহারাষ্ট্রে এ রকম দুর্গ মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। এগুলির সাহায্যেই শিবাজী দুর্জয় প্রতিরোধে দাঁড়িয়েছিলেন পরাক্রান্ত মুঘল বাদশাহের বিরুদ্ধে।

“দুর্গটা পথের একেবারে ধারে। আকৃতি গথিক রীতিতে তৈরি গির্জের মতো। উপরের অংশটা কবে ভেঙে গেছে। কেবল আজো টিকে আছে নিচের দিকটা। পথ আর দুর্গের মাঝখানে একটা পরিখা। পরিখার পর খানিকটা ফাঁকা জায়গা তারপর মূল দুর্গ। সেই ফাঁকা জায়গায় কতগুলি ছায়া দেখা গেল। মনে হল জোৎস্নায় সেগুলি নড়া-চড়াও করছে।

“অদ্ভুত এক কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে পা চালিয়ে দিলুম সেদিকে। কাছে গিয়ে দেখতে পেলুম, পরিখায় জল সামান্যই অবশিষ্ট আছে। কিন্তু জায়গাটাতে কেমন একটা স্যাঁতস্যাতে ভাব। পরিখার অপর পাড়ে চোখ পড়তেই সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে রইলুম। এমন দৃশ্য জীবনেই আমি কখনো দেখিনি। দেখার কল্পনাও করিনি। আর কেউ কখনো দেখেছে কিনা আমার সন্দেহ আছে।

“পরিখার ওপারে ফাঁকা জায়গাটাতে খেলা করছে অগুণতি সাপ। সংখ্যায় অন্তত হাজার কয়েক হবে। ছোট ছোট পাথরের ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলাফেরা করছে। মনে হচ্ছে অসংখ্য জীবন্ত জলের স্রোত বয়ে চলেছে এঁকেবেকে। কখনো তরতর করে উঠে পড়ছে গাছে। তখন দেখাচ্ছে অবিকল লতার মতো। কয়েকটি তো চোখের নিমেষে কুণ্ডলী পাকিয়ে পরের মুহূর্তেই খুলে যাচ্ছে অনায়াসে। মাঝে-মাঝে ফণা তুলছে শূন্যে। চাঁদের আলোতে চকচক করে উঠছে ধাতব চামরের মতো। কোনোটি অতবড় মোটা শরীর অতি সহজে ঢুকিয়ে দিচ্ছে সরু গর্তের ভেতরে। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এত সব কাণ্ড যে করছে তাতে যেন একটি পেশী বা হাড়েরও ব্যবহার মোটেই হচ্ছে না।

হাজার-হাজার-সাপ বিদ্যুৎগতিতে চলাফেরা, জড়াজড়ি করছে একে অন্যের সঙ্গে, চলে যাচ্ছে একে অন্যের ওপর দিয়ে। মনে হল এক বিচিত্র সমুদ্র দেখছি। ওঠানামা করছে ঢেউ। মাঝে-মাঝে তীক্ষ্ণ বাতাসের মতো এরকম হিস হিস শব্দ ছাড়া আর কোনোরকম আওয়াজ নেই। সমস্ত ব্যাপারটা তাই আরো বেশি রহস্যময়, ভয়াবহ মনে হচ্ছে।

এতদিন সাপ সম্পর্কে যে-সব গল্প শুনেছি, যে-সব কথা পড়েছি একসঙ্গে মনে ভিড় করে এল। প্রাচীনকালে সাপকে মানুষ দেবতা জ্ঞানে পূজা করত। সাপ ছিল তখন জ্ঞান আর সম্পদের প্রতীক। সাপের জন্যই মানুষকে স্বর্গ থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল, খ্রিস্টানদের শাস্ত্রে আছে। মধ্যযুগে সাপকে মনে করা হত জাদু আর অশুভ শক্তির প্রতীক। অন্ধকার গুহায় আর সমুদ্রের নিচে সাপ ফণা তুলে গুপ্তধন পাহারা দিচ্ছে এমন গল্প কত পড়েছি। মনে হতে লাগল। সেই সব গল্প এখন অতি সত্য আর বাস্তব বলে মনে হতে লাগল। নাগ-নাগিনীর অপ্রাকৃত শক্তিতে ক্রমেই যেন আমি বিশ্বাসী হয়ে পড়ছিলুম। এই সর্পপুত্রদের মধ্যে শেষনাগ স্বয়ং নিশ্চয়ই আছেন। নাগলোক ত্যাগ করে তিনি সদলে উঠে এসেছেন এখানে। কী অভিপ্রায় কে জানে!

সেই মুহূর্তে সভয়ে লক্ষ্য করলুম ওরাও আমাকে দেখতে পেয়েছে। পরিষ্কার দেখতে পেলুম আলোড়িত নাগ-সমুদ্র আরো আলোড়িত হয়ে উঠেছে। আর সেই সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কয়েক শ সাপ এসে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে পরিখার ধারে। একেবারে খাঁটি গোখরো। গায়ের রং হলদে-বাদামী, এক একটি লম্বায় অন্তত ছ ফুট হবে। শরীরের তিন ভাগই এখন শূন্যে। মারাত্মক কয়েকশ ফণা দুলছে এ-দিকে ও-দিকে। কাচের মতো চোখে, কেমন ঠাণ্ডা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে আমারই দিকে। একেবারে না বলে কয়ে যে প্রাণীটি ওদের গোপন জগতের রহস্য হঠাৎ দেখে ফেলেছে, তাকে ওরা দেখে নিচ্ছে কুটিল চোখে। লকলকে আগুনের শিখার মতো মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসছে চেলা জিভ। আমার দিকে তাকিয়ে, ওরা যেন নিষ্ঠুর বিদ্রূপে হাসছে! সঙ্গে সঙ্গে ওপার থেকে ভেসে এল উৎকট গন্ধ।

পরের মুহূর্তেই যা দেখলুম প্রচণ্ড আতংকে আমাকে পালানোর কথা ভাবতে হল। কয়েকটা সাপ নেমে পড়েছে সেখানে। বাকিরাও তৈরি হচ্ছে তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার জন্য। এই কয়েকশ জীবন্ত মৃত্যুদূত একবার কাছে এসে পড়লে, দৌড়ে যিনি অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন, তার পক্ষেও নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন হবে। শুধু সে-কথা ভেবেই যে-পথে এসেছি ছুটিয়ে দিলুম সে-দিকে। বিপদে পড়লে যে মানুষ ঘোড়ার চেয়েও জোরে ছুটতে পারে, নিজেকে দিয়ে সেদিন তার প্রমাণ পেলুম...”

সর্বাঙ্গসুন্দরবাবু থামলেন। প্লাটফর্মে গাড়ি এসে ঢুকছিল। সবাই ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গেলুম সামনের দিকে। আমি যে কামরায় উঠে পড়লুম সেখানে ওয়েটিংরুমে চেনা মানুষগুলির একজনও নেই। মনে একটা কথা এল—সর্বাঙ্গসুন্দরবাবুর কাহিনী যদি সত্যি হয়, তবে ওই এক জায়গাতে এত.সাপ জড়ো হয়েছিল কেন? সে কি নেহাৎই কাকতালীয় ব্যাপার। না কি এর পেছনে কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ আছে? কিন্তু হাওড়া স্টেশনে এসে গাড়ি দাঁড়াবার পর অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বক্তার সন্ধান পাওয়া গেল না। সর্বাঙ্গসুন্দরবাবু বিপুল জনারণ্যে চিরকালের মতোই মিশে গেছেন।

প্রথম প্রকাশ : আশ্চর্য!, ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫
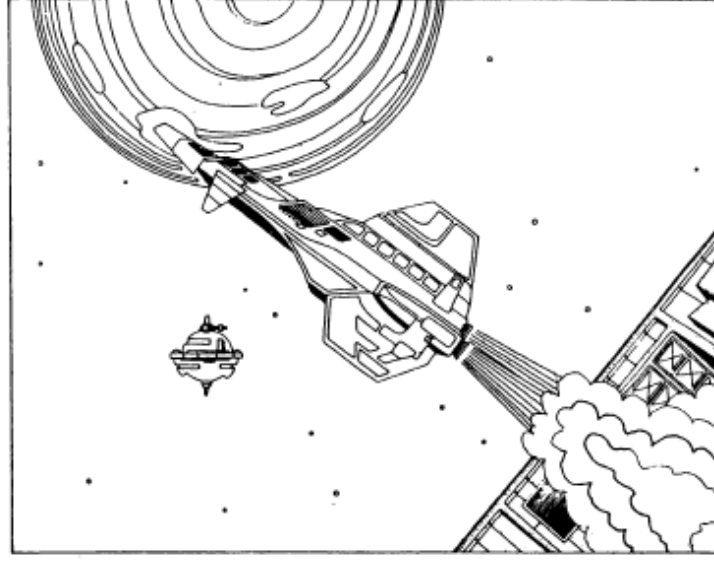
খাচ্ছিলো তাঁতী তাঁত বুনে

গুরনেক সিং

ঐ যে কথায় বলে নাকপালের লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না? আমারও হয়েছিল তাই! নইলে বেশ তো ছিলাম মশাই, সেথ্না সাহেবের আস্তাবলে ট্রেনার হিসেবে। সকাল-সন্ধ্যে কুল্লে হাফ ডজন ঘোড়া নিয়ে কারবারতার মধ্যে দুটি আবার বিলকুল বাচ্চা। তবে পেডিগ্রি ভালো। ওদের মা উনিশ শো বত্রিশে কিং জর্জ কাপে বাজী মেরেছিলবাপও ভালো। ওদের মা জীবনে কম বাজী পায়নি। তাই আশা ছিল ঠিকমতো ট্রেনিং দিয়ে নিলে হয়তো মেহনতে পুষিয়ে যাবে। এ ছাড়া বাকি কয়েকটি ছিল বয়স্ক ঘোড়া। আমার কাজের মধ্যে কাজ ছিল সকালে রেস গ্রাউন্ডে রুটিন মাফিক ঘোড়াগুলির অ্যাক্শন চেক করা আর ওদের টাইমিং ক্লক্ করা। মাত্র ঘণ্টা কয়েকের ওয়াস্তা। আর সন্ধ্যাবেলায় কোল্ট্ দুটোকে নিয়ে কোর্সে দৌড়াবার ট্রেনিং দেওয়া। ট্রেনারের যা কাজ আর কি! সেথ্না সাহেব মাইনেও মন্দ দিতেন নাপ্রায় সাড়ে বারোশো টাকার মতোতা ছাড়া বোনাসও আছে। সেবার যখন আমাদের স্টেব্লের ঘোড়া 'প্লে-বয়' কুইন্স্ কাপ পেলো, তখন উনি হাজার টাকা বোনাসও দিয়েছিলেন। মোটামুটি সব মিলিয়ে মন্দ ছিলাম না।

তবে ঐ যে বলে নাকপালের লিখন কেউ খন্ডাতে পারে না?আমারও হল তাই। পড়লাম গিয়ে চন্দর খপ্পরে। চন্দকে চেনেন না? চন্দ হল ও লাইনের ধুরন্ধর দালাল। রেস জগতের যাবতীয় ঘটন-অঘটন তার নখাগ্রে। রেস-কর্তাদের উঁচু আর নীচু মহলে ওর সমান যাতায়াত। রেস-সমাজের যে খবর চন্দ জানে না, সে খবর জানবার মতো নয়!

একদিন সন্ধ্যেবেলায় কোর্সে স্পেয়ার জকিরা কোল্ট্ দুটোকে ট্রায়াল রান করাচ্ছে। আমি মেম্বার্স এন্ক্লোজারে একটি বেতের চেয়ারে বসে, এমন সময় চন্দ এলো! "কি মিত্তির, কেমন চলছে?" বলে অন্য চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলো অনুমতির অপেক্ষা না করেই।

বললাম, "চলে যাচ্ছে এক রকমআমাদের আবার চলা! তারপর, তুমি কেমন আছো?"

বললে, "আছি ভালোই। কয়েকদিন থেকেই তোমাকে কন্ট্যাক্ট্ করবার কথা ভাবছিনানান্ ঝামেলায় সেটা আর হয়ে উঠছে না।চাকরি করবে?"

বললাম, "বর্তমানে আমি যে বেকার আছি, সে খবর তোমাকে কে দিলো?"

"বেকার হতে যাবে কেন? বালাই ষাট!" বল্লে"তবে এর চেয়ে ভালো মাইনের চাকরি একটি আমার হাতে ছিল! তুমি এগ্রি করলে তাঁর স্টেবলের সিকি অংশ তোমার নামে লিখে দিতেও রাজী আছেন ভদ্রলোক!ট্রাই নিয়ে দেখবে নাকি, ব্রাদারবেশ শাঁসালো সওদা!"

ট্রেনার হিসেবে একজন কেষ্ট-বিষ্টু না হলেও বাজারে নেহাৎ ফেলনাও আমি নই। গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকটি নামী ঘোড়া এ শর্মার হাত দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আমার উইনিং অ্যাভারেজ খুবই ভালো থাকে বরাবর, এ বছর তো এখন পর্যন্ত আশাতীত রকম ভালো। অতএব নতুন অফারে খুব বেশী আশ্চর্য হলাম নাতবে অবাক হলাম সিকি অংশ দেবার কথা শুনে। বললাম, "ভদ্রলোক কে?"

"তুমি ঠিক চিনবে না, নাম হচ্ছে প্রফেসার কি সাম্ চাকলাদারএ লাইনে বিলকুল নতুন লোক। তবে এমন এক মোক্ষম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উনি আবিষ্কার করেছেন যে, সেই পদ্ধতিতে ঘোড়াকে ট্রেন করলে একেবারে সিওর উইনার!" বলে সন্ধানী চোখে আমার মুখের দিকে তাকালো চন্দ।

বললাম, "মাপ করো, ভাইও সবে আমি নেই! আজ পর্যন্ত কতো 'মোক্ষম পদ্ধতি' তো দেখলাম এই রেসের মাঠেকিন্তু কাউকেই তো ঐ দিয়ে করে খেতে দেখলাম না। তা ছাড়া এই প্রফেসর-টফেসরগুলোর ওপর আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই।"

"আহা, একবার দেখতে দোষটা কি? টালী লিংক তো এখান থেকে বেশী দূর নয়; চলোই না আমার সঙ্গে, একবার ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখে এসো। যদি বোঝ যে পোষাবে না, 'না' করে দেবে। যে লোকটা তোমায় দু হাজার মাইনে আর লাভের সিকিভাগ দিতে চায়, সেও নিশ্চয়ই কিছু না বুঝে-সুঝে অফারটা দিচ্ছে না!"

কি আর করাচন্দকে এড়ানো বরাবরই শক্ত।

বললাম, "তবে তাই চলো। কিন্তু আধ ঘন্টার বেশী আমি সময় দিতে পারবো না!"

"ব্যস ব্যস, ওতেই হবে। চলো না, নিজের চোখেই ব্যাপারটা দেখবে চলো।"

গেলামনা গিয়ে উপায়ও ছিল না আমার। চন্দ যখন নিজের পকেট থেকেই ট্যাক্সি ভাড়াটা দিলো, তখন একটু অবাক হলাম। ওকে নিজের পকেট থেকে খরচ করতে আমি কমই দেখেছি। তখনই আমার সাবধান হওয়া উচিৎ ছিল; বোঝা উচিৎ ছিল যেযাক গে!

প্রফেসর চাকলাদার নামে যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে ও আলাপ করিয়ে দিল, তাঁকে দেখে আমার মোটেই শ্রদ্ধা হল না। একজন কালো, বেঁটে, টেকো ও মোটা লোককে দেখে শ্রদ্ধা না হওয়াটা খুব অন্যায় নয়। কিন্তু সেই অশ্রদ্ধাকে ছাপিয়ে ছলাৎ করে আমার দেহের রক্ত মাথায় উঠলো, যখন ভদ্রলোকের স্টেব্‌ল্‌টি দেখলাম। মনে হল যেন কোনো ঘোড়ার হাসপাতালে এসে পড়িছি বুঝি! তিনটে বেতো রোগী হাড় জিরজিরে ঘোড়া কোনোক্রমে চার-পায়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্তভাবে ঘাস খাচ্ছেঘাস খাওটাই যেন একটা বিরাট পরিশ্রমের কাজ! এদের তুলনায় রমজান মিঞার ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়াদের বোধহয় পক্ষীরাজ আখ্যা দেওয়া চলে! ওদের মধ্যে একটিকে আবার জিন-লাগাম এঁটে তৈরি রাখা হয়েছে।

"কেমন দেখছেন?" প্রফেসর চাকলাদার পরম স্নেহে জিন লাগানো ঘোড়াটির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন আমাকে।

চন্দ বোধহয় আমার মনের ভাবটা কিঞ্চিৎ আন্দাজ করতে পেরেছিল। বললো, "ঘোড়াটা গত হপ্তার অক্‌শানে প্রফেসর চাকলাদার বেশ দাঁও মতো কিনে ফেলেছেন হেমাত্র পাঁচ

শো টাকায় (বুঝলাম চন্দ দালাল ছিল!) তবে এখানে ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে প্রফেসর চাকলাদারের যুগান্তকারী আবিষ্কারটি। যাকে বলে একেবারে মোক্ষম পদ্ধতিসিওর উইনিং!"

"তাহলে এবার মাঠে যাওয়া যাক কি বলেন?" প্রফেসর চাকলাদার গদ গদ ভাবে বললেন।

একবার ইচ্ছে হল দুত্তোর বলে কেটে পড়ি। এই ঘোড়ার ট্রেনার হওয়ার চেয়ে সার্কাসের ক্লাউন হওয়া অনেক ভালো। তবে কৌতূহল বড় বালাই। মনে হল দেখাই যাক না

প্রফেসর চাকলাদার নিজেই চাপলেন ঘোড়াটার পিঠে। ঘোড়াটার পিঠ ধনুকের মতো বেঁকে গেলমনে হল যে-কোন মুহূর্তে বেচারী মুখ থুবড়ে পড়তে পারে। কেন যে পড়লো না সেটাই একটা রহস্য।

কোর্সের অন্যপ্রান্তে যাবার আগে একটা বাইনোকিউলার আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন প্রফেসর চাকলাদার। বললেন, "আপনি ঘোড়াটা সম্পর্কে যাই কেন ভেবে থাকুন না, মিস্টার মিত্র, এই বাইনোকিউলার দিয়ে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত এর মুভ্‌মেন্টস্‌টা শুধু ভালোভাবে মার্ক করে যাবেন আপনি আর টাইমিংটা একটু ক্লক্‌ করবেন, প্লীজ!"

বুঝলাম, এও এক যন্ত্রণা হল। একমাইল পোষ্ট থেকেও যদি দৌড়ায়, তাহলে এক মাইল কভার করতে ওর দশ মিনিটের কম নিশ্চয় লাগবে না! আর ওই দশ মিনিট বাইনোকিউলারটা চোখে ধরে আমাকে ওর মুভ্‌মেন্টস্‌ মার্ক করতে হবে! ভালো জ্বালায় পড়া গেল দেখছি।

যতক্ষণ না প্রফেসর চাকলাদার মাইল পোষ্টের কাছে গেলেন, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে
দাঁড়িয়ে চন্দকে শান্ত করতে লাগলাম, অবশ্য মনে মনে। ও যে আমাকে এখানে এনে এমন একটা হাস্যকর ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে ফেলবে সেটা জানলে আমি হাজার অনুরোধেও এ পথ মাড়াতাম না। থাকগে। আসল কথায় আসি। অবশেষে প্রফেসর চাকলাদার তাঁর বাহনটি নিয়ে নির্দিষ্ট মাইল পোষ্টের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর রুমাল নেড়ে আমাকে ইশারা করলেন। আমি ভারী বাইনোকিউলারটা চোখে লাগিয়ে নিলাম। দেখলাম, সে এক অতি হাস্যকর ব্যাপার। মোটা ভারী দেহটা নিয়ে প্রফেসর চাকলাদার ঘোড়াটির পিঠে কুঁজো হয়ে বসে আছেন। এক হতে লাগাম ধরে আছেন, অন্য হাতে চশমা সামলাতে ব্যস্ত!

পরমুহূর্তে ঘোড়াটি ছুটলো। সঙ্গে সঙ্গে হাতের স্টপ্‌ ওয়াচটি চালিয়ে দিলাম। কিন্তু এ কি! এটা কি সেই ঘোড়া যেটা আমি খানিক আগে দেখেছি? নিজের চোখকে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। ঘোড়া তো ছুটছে না, যেন হাওয়ায় উড়ে চলেছে। প্রফেসর চাকলাদারের আড়াই মণ প্লাস নিজের পনেরো সের ওজন পিঠে নিয়েও এমন স্পিডে ছুটেছে যে না দেখলে প্রত্যয় হয় না। দেখতে দেখতে ও এক মাইল কোর্স উড়ে পার হয়ে এলো। বাইনোকিউলার নামিয়ে স্টপ ওয়াচ দেখলাম দু মিনিট বাইশ সেকেন্ড। ... অদ্ভুত! অবিশ্বাস্য!! গত ডার্বির উইনার 'ফ্লাইং সসার' ঘোড়ার উইনিং টাইম ছিল তিন মিনিট পাঁচ সেকেন্ড!

কখন যে প্রফেসর চাকলাদার আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন টের পাইনি। বললেন, "কেমনটি দেখলেন, মিস্টার মিত্র?"

বললাম, "দেখলাম ভালই, তবে সত্যিকারের রেসে ও খেল দেখানো যাবে না।"

"কেনকেন?"

"ঘোড়াকে নেশা করিয়ে রেস দৌড়ানো অপরাধ। তাতে আপনার জেল হবে আর আমার লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে!"

"আহাহা! তুমি এই যখন না বুঝে সুঝে হুট্ করে একটা কথা বলে ফেল মিত্তির, তখন আমার বড় রাগ হয়!" চন্দ হাঁ হাঁ করে উঠলো।

"তাহলে ঘোড়াটা ড্রাগ্‌ড্ নয়?"

"না, মোটেই না। ওই যে বলছিলাম একটা মোক্ষম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি"

"দুত্তোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি! তুমি কি বলতে চাও ওই বেতো ঘোড়াটা শুধুমাত্র ট্রেনিং এর জোরে একটা রেকর্ড রান্ করে বেরিয়ে গেল?"

"না, তাও না। একটু ধৈর্য ধরে না শুনলে ব্যাপারটা তোমায় বোঝাই কি করে? না, ঘোড়াটিকে ড্রাগ্‌ও দেওয়া হয়নি আর তেমন কোন ট্রেনিংও দেওয়া হয়নি। আসলে ও ক্ষেত্রে প্রফেসর চাকলাদার তাঁর একটি গোপন আবিষ্কারকে
কাজে লাগিয়েছেন যার ফলে এই অসম্ভবটি সম্ভব হয়েছে।"

"একটু খোলসা করে বলো।"

"আমি বলছি" প্রফেসর চাকলাদার মৃদু হেসে বললেন, "আমি একটা এমন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছি যার দ্বারা আর্থের গ্র্যাভিটেশন ফোর্সকে"

"সোজা ভাষায় বলুন"

"ওহ্যাঁ। পদ্ধতিটির নাম হল অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি। একটি বিশেষভাবে প্রস্তুত প্রিন্টেড্ সার্কিটকে একটি বিশেষ পোটেন্শিয়ালের ইলেকট্রিক ফিল্ড দিয়ে যদি অ্যাক্টিভেটেড করা যায় তাহলে সেই সার্কিটটির ওপর গ্র্যাভিটির অর্থাৎ তখন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তির কোনো প্রভাব থাকবে না। অর্থাৎ তখন ঐ প্রিন্টেড সার্কিটের ওপর যে বস্তুই রাখা হোক না কেন, তার ওজন হবে শূণ্য!"

"আরো একটু খোলসা করে বলুন" আমার কৌতূহল ও উত্তেজনা এখন বাড়তে আরম্ভ করেছে।

"আসলে কারিকুরিটা করা আছে ঘোড়ার জিনের মধ্যে! একটা পাতলা ধাতুর পাতে সার্কিটটি প্রিন্ট করে জিনের চামড়ার মধ্যে খুব সাবধানে সেলাই করা আছে, বাইরে থেকে তার কিছুই বোঝবার উপায় নেই। ইলেকট্রিক ফিল্ড দিয়ে ঐ সার্কিটটিকে যখনই অ্যাকটিভেটেড করা হবে তখনই ঐ জিন আর তার ওপর বসা মানুষের ওজন হয়ে যাবে শূন্য! (বিভিন্ন পোটেন্শিয়ালের ইলেকট্রিসিটি দিয়ে ইচ্ছে মতো এই রি-অ্যাকশন কন্ট্রোল করে ওজন অর্ধেক অথবা সিকি ভাগ কমিয়ে দেওয়া যায় প্রয়োজন মতো)! তখন ঘোড়াটি দৌড়াবে বিলকুল ভারমুক্ত হয়ে। এ যেন জকি আর জিন ছাড়াই ঘোড়া রেসে দৌড়াচ্ছে।

এমতাবস্তায় যে কোন সাধারণ ঘোড়া যে কোন চ্যাম্পিয়ন ঘোড়াকে রেকর্ড টাইমে হারিয়ে দিতে পারে!”

“বুঝলাম। কিন্তু তবু আপনারা ধরা পড়ে যাবেন। সার্কিটটা না হয় জিনের মধ্যে সেলাই করে লুকিয়ে রাখলেন, কিন্তু ব্যাটারী ট্যাটারি? ও সব তো বাইরে রাখতেই হবে! তাতেই আপনারা ধরা পড়ে যাবেন।”

“না, ব্যাটারির কোনো দরকারই পড়বে না। আমাদের কাজের পক্ষে অত্যন্ত লো পোটেন্‌সিয়ালের সামান্য ইলেকট্রিসিটিই দরকার আর সেই ইলেকট্রিসিটি জোগাবে আপনার হাতের এই বাইনোকিউলারটি।”

আমি অবাক হয়ে হাতের বাইনোকিউকুলারটির দিকে তাকালাম।

“এই বাইনোকিউলারটি বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে, এতে দূরবীণের লেন্সের সঙ্গে ফিট্ করা আছে একটি ফটো-ইলেকট্রিক সেলের কমপ্লেক্স। যতক্ষণ ধরে এটি ছুটন্ত ঘোড়ার জকি আর জিনের ওপর ফোকাস করে রাখা হবে ততক্ষণ এটি থেকে প্রিন্টেড্ সার্কিটে প্রয়োজনীয় ইলেকট্রিসিটির সরবরাহ অব্যাহত থাকবে। তা ছাড়া একটি ছোট বোতামের সাহায্যে আপনি এখান থেকেই ইলেকট্রিক পোটেন্‌সিয়ালের হ্রাস বৃদ্ধি করে জিন আর জকির ওজন ইচ্ছেমতো কন্ট্রোল করতে পারবেন। ধরুন, হয়তো দেখলেন শূন্য ওজনে ঘোড়টি অবিশ্বাস্য রকম ব্যবধানে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন আপনি বোতামটির সাহায্যে পিঠের ওজনটি একটু বাড়িয়ে দিতে পারবেন ফলে ঘোড়ার গতিও কমে যাবে। আসলে ঘোড়াকে চালাবেন আপনি, জকি নয়। জাকির কাজ শুধু লাগাম ধরে বসে থাকা।”

বললাম, “সেটা না হয় হল! কিন্তু ও ব্যাপারে আমাকে জড়াতে চাইছেন কেন? যা দেখলাম, তাতে আপনারা নিজেরাই যে কোনো রেস অতি সহজেই জিততে পারবেন।”

“আপনাকে দরকার নামের জন্যে। আপনি এ লাইনে একজন বিখ্যাত ট্রেনার। আপনার নাম ও ঘোড়ার সঙ্গে জড়িত থাকলে চট করে কেউ ফন্দীর কথা ভাবতে পারবে না। ধরে নেবে, হয়তো এর জন্যে মূলতঃ আপনার ট্রেনিংই দায়ী। তা ছাড়া, আমি নিজেও প্রচার করে দেবো যে, রেস-হর্স ট্রেনিংয়ের এমন একটি বৈজ্ঞানিক পন্থা আমি আবিষ্কার করেছি—যাতে যে কোনো সাধারণ ঘোড়াকে অতি সহজেই ভালো রানার করে তোলা যায়। পেডিগ্রির থিওরীটা নস্যাৎ করে আমি নতুন একটা কমপ্লিকেটেড্ থিওরী দিয়ে দোবো, যেটি সাধারণ লোকে চট করে বুঝতে পারবে না আর যারা বুঝবে, আমাদের সাফল্য দেখে বোকা বনবার ভয়ে তারা প্রতিবাদ করতে সাহস পাবে না। তাহলেই লোকে মোটামুটি ব্যাপারটা লজিকাল বলে ধরে নেবে। বলুন, আপনি আমাদের প্রস্তাবে রাজী? দু’হাজার মাইনে আর টোটাল উইনিংয়ের সিকি অংশ বোনাস!—বলুন!”

চন্দ বললে, “নিজের চোখেই তো সব দেখলে ভায়া, কোনো রিস্ক নেইএভরিথিং টু গেন! ভিড়ে পড়ো।”

কি যে হল আমার! কিছু না ভেবে হঠাৎ সম্মতিসূচক হাত বাড়িয়ে দিলাম। আমার চারপাশে তখন সত্যজিৎ রায়ের ‘নায়কে’র স্বপ্নের মতো কারেন্সি নোটের বৃষ্টি হচ্ছে! হায়রে, স্বপ্নের পরবর্তী অংশটা তখন যদি মনে পড়তো!

এর পর আমার প্রথম কাজ হল একটি ভালো জকি জোগাড় করা। প্রফেসার চাকলাদার অবিশ্যি নিজেই জকি হতে রাজী ছিলেন। কিন্তু আইনগত বাধা ছিল, রিস্কও ছিল। আমাকে ঠিক যে কারণে ওঁরা দলে নিলেন, একটি ভালো আর নামী জাকিরও প্রয়োজন ছিল ঠিক সেই কারণেই।

অবিশ্যি তাতে বিশেষ অসুবিধে হল না। জনসন ছিল আমার বন্ধু, এ-ওয়ান্ জকিও বটে। খ্যাতিও কম ছিল না ওর। বছরের বেশী ভাগ সময়ই ঋণে ডুবে থাকতোঅথচ রোজগারও করতো কম নয়!

তাকে খুব সাবধানে বাজিয়ে দেখলাম। খুব সহজেই টোপ গিললো। বুঝলাম, টাকার জন্যে ও এখন সব কিছুই করতে পারে।

আট্‌ঘাট বেঁধে নামলাম আসরে। পক্ষীরাজটির নাম দিলাম 'মাই হোপ্'। নাম গোত্রহীন "মাই হোপ্' ফাস্ট এন্ট্রিতে অডস্ পেলো ওয়ান টু টেন! বাইরের বুকিরা দর দিলো ওয়ান টু ফিফটিন। গোড়ার দিকে কিছু ভাগ্য-সন্ধানীরা বাজীও ধরলো। কিন্তু রেস শুরু হবার কিছুক্ষণ আগে ঘোড়া দর্শনের পালায় তারা সকলেই মাথায় হাত দিয়ে বসলো ওই পক্ষীরাজটির ওপর অধিষ্ঠিত জনসনকে দেখে অনেকে ডন্ কুইকজোট বলে ঠাট্টা করতেও ছাড়লো না। বাইরের বুকিংয়ে এক লাফে দর উঠে গেল ওয়ান টু ফর্টিতে। অর্থাৎ "মাই হোপ্" যদি কেউ হোপ করে বাজী ধরে পাঁচ টাকা, "মাই হোপ' জিতে গেলে তার প্রাপ্য হবে চল্লিশ গুণ অর্থাৎ—দু'শো টাকা! পাবলিক অবিশ্যি আর ওপথে গেল না, মাত্র কয়েকজন দুরাশাবাদী ছাড়া। বেনামীতে শতখানেক টাকা ধরলাম মাত্র আমরা চারজন—আমি, চন্দ, জনসন আর প্রফেসার চাকলাদার।

রেস শুরুর কিছুক্ষণ আগে আমি মেম্বার্স স্ট্যান্ডে বাইনোকিউলিয়ারটি বাগিয়ে জায়গামতো দাঁড়ালাম। এতক্ষণ মাই হোপের পিঠটি জনসন সাহেবের ভারে ধনুকের মতো বেঁকে ছিলবাইনেকিউলার দিয়ে দেখলাম হঠাৎ তার পিঠ সোজা হয়ে গেল। বুঝলাম, অ্যান্টি গ্র্যাভিটির কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে।

তারপর রেস শুরু হল। সে রেসে 'মাই হোপ' বাদে ঘোড়া ছিল ছ'টি তার মধ্যে দুটি ছিল আবার হট্ ফেভারিট, ঐ দুটির মধ্যেই একটির জেতার কথা। কিন্তু সারা ময়দানকে চমক লাগিয়ে বন্দুক থেকে ছোটা বুলেটের মতো 'মাই হোপ' প্রথম চোটেই এগিয়ে গেল প্রায় দু লেংথ!... আর কেউ কিছু বোঝবার আগেই সারা মাঠে আগুন লাগিয়ে প্রায় পাঁচ লেংথের ব্যবধানে জিতে গেল, 'মাই হোপ'। বাইনেকিউলারের মধ্যে দিয়ে দেখলাম জনসন খুশী মুখে হাত নাড়ছে। সারা মাঠে তখন হৈ হট্টগোলের মধ্যে কান পাতা দায়। ব্যাপারটা সত্যিই অভাবনীয়! তাই রেস কর্তৃপক্ষ সাময়িকভাবে ফলাফল ঘোষণাটা আটকে দিলেন। ঘোড়াটিকে বিশেষজ্ঞরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করলেন, নানান্ রকম টেস্ট করা হল, প্রফেসার চাকলাদারের ইন্টারভিউ নেওয়া হল। উনি রাজনৈতিক নেতাদের মতো এক বিরাট ভূমিকা ফেঁদে নিয়ে তাঁর নতুন থিওরীর কথা বললেন। জাজেরা কেউ হলেন ইম্প্রেসড্, কেউ কনফিউসড্, কেউ বা হতভম্ব! শেষে সকলে রায় দিলেন: না, কোনো গোলমাল নেই, ঘোড়া নিজ গুণেই জিতেছে!

ফলাফল ঘোষণা করে দেওয়া হল! ‘মাই হোপ’ জিতেছে। একশো টাকায় আমরা চার হাজার টাকা করে পেলাম প্রত্যেকে। স্টেক মানি ছিল দশ হাজারসেখান থেকে ভাগ পাওয়া গেল আড়াই হাজার করে। মন্দ নয়, কি বলেন?

সেই আমাদের জয়যাত্রা আরম্ভ হল।

পরের হস্তায় মাই হোপের ওপর ওয়েট বাড়িয়ে দেওয়া হল আট সের। অবিশ্যি আঠারো সের বাড়িয়ে দিলেও বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হত না। আবার ‘মাই হোপ’ অতি সহজেই জিতলোজেতবারই কথা।

পুবে জয়যাত্রার পালা সাংগ করে আমরা পশ্চিমে পাড়ি দিলাম। সেখান থেকে দক্ষিণেতারপর দক্ষিণ-পশ্চিমে। মাই হোপের তখন ভুবনজোড়া না হোক, ভারত জোড়া নাম তো বটেই।

পরে আমরা খুব বেশী দর আর পেতাম না অবশ্য। ওয়ান টু টু কি ওয়ান টু থ্রী বড় জোর। কারণ সকলেই প্রায় বুঝে ফেলেছিল যে ‘মাই হোপ’ দেখতে যাই হোক না কেন দৌড়ায় কিন্তু জব্বর। কিন্তু তাতে আমাদের বিশেষ চিন্তার কারণ ছিল না। কারণ জয় সম্পর্কে নিশ্চিত থাকায় আমরা এরপর ব্যক্তিগতভাবে বেশ মোটা টাকাই বাজী ধরতামঅলওয়েজ হাজারের ঘরে! তাতে মোটামুটি টাকাটা ডবল হয়ে ফিরে আসতো—তা ছাড়া স্টেক মানির সিকি ভাগ তো ছিলোই। শিগগিরই প্রফেসার চাকলাদার ‘মাই হোপ’ জাতীয় আর একটি অখ্যাত ঘোড়া রেসে নামাবার জন্যে একটি নতুন সার্কিট তৈরির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। অতএব অদূর ভবিষ্যতে আমাদের চিন্তিত হবার কেন কারণই ছিল না।

তারপরই ঘটলো সেই অঘটনটি। সেই কথাতেই আসছি। বম্বে রেসে সেটা আমাদের প্রথম এন্ট্রি। যে রেসে ‘মাই হোপ’ ঠাঁই পেয়েছে, সে রেসে আরো অনেক বাঘা বাঘ ঘোড়া আছে—‘মাই হোপ’কে বম্বের পাব্লিক তাই খুব বেশী ইম্পর্ট্যান্স দেয় নি। বাংলার মাটি আর বম্বের মাটির ফারাক আছে তো! তাই আমরা ভালো দরই পেলাম ওয়ান টু এইট্!

সারা মাঠ লোকে লোকারণ্য, কোথাও তিল ধারণের ঠাইটুকুও নেই।

আমি ছিলাম স্পেসাল গেস্ট এনক্লোজারের স্ট্যাণ্ডের মাথার দিকে। আর বাইনোকিউলারটি দিয়ে এক মনে লক্ষ্য করছিলাম স্টার্টিং পোস্টের কাছে জড়ো হওয়া ঘোড়াগুলোকে। আমার বাইনেকিউলারের প্রধান লক্ষ্য ছিল অবশ্য ‘মাই হোপ’।

আমার ঠিক পাশে ছিলেন একটু মোটামতো গুজরাতী ভদ্রলোক। মাই হোপের একজন আড্‌মায়ারার তিনি। কারণ, জানতে পারলাম, প্রথম কয়েকটি রেসে নাকানি-চোবানি খাওয়ার পর এখন ‘মাই হোপ’ই তার লাস্ট হোপ। পাঁচ হাজার টাকা বাজী ধরেছেন উনি মাই হোপের ওপর। বললেন, এ রেসে জিতে গেলে আর কখনো এ মুখো হবেন না।

রেস শুরু হবার আগে থেকেই সে ভদ্রলোকের উত্তেজনা প্রকাশ পেতে লাগলো। কখনো উঠে দাঁড়ান, কখনো আবার বসে পড়েন। কখনো বা সিগারেট ধরান, তারপর একটান টেনে নিয়েই সেটি ছুঁড়ে ফেলে আবার উঠে দাঁড়ান। কখনো বা আমার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন “ও বাবুজী, ঠিক জেতেগা তো? অ্যাঁ, কেয়া বোলা?”

রেস শুরু হল। দীর্ঘ রেস থাকায় প্রথম দিকে ওজনটাকে একেবারে শূন্যে না নামিয়ে অর্ধেক করে দিলাম। হতভাগা ঘোড়াটা তাতেই ফিফথ প্লেসের বেশী এগুতে পারলো না! এইভাবে চললো কিছুক্ষণ, তারপর উইনিং পোস্টের ফার্লং-দুই আগে বেগুের মুখে বোতামটি ঘুরিয়ে ওজনটি দিলাম একেবারে শূন্য করে। আর সঙ্গে সঙ্গে 'মাই হোপ' চার-চারটি বাঘা প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিদ্যুৎ বেগে পার করে এগিয়ে গেলো। ...আর মহা উল্লাসে পাশের গুজরাতী ভদ্রলোকটি লাফিয়ে উঠলেন—তারপর আনন্দের আতিশয্যে, আমি কিছু বোঝবার আগেই আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে প্রাণপণে টানা-হ্যাঁচড়া করতে লাগলাম! কিন্ত কাকস্য পরিবেদনা। চল্লিশ হাজার টাকা জেতার আনন্দে ভদ্রলোক তখন পুরোপুরি পাগল। "মার দিয়া, মার দিয়া!" বলে তিনি আরো জোরে চেপে ধরলেন আমাকে! আর এই টানা-হ্যাঁচড়াতে আমার হাতের বাইনোকিউলারটি ছিটকে পড়লো সাত হাত দূরে।

ছুটন্ত অবস্থায় আপনার ঘাড়ে যদি দেড় মণ ভারী বোঝা ফেলে দেওয়া হয় তখন আপনার অবস্থাটি কি দাঁড়াতে পারে আপনি কল্পনা করে দেখেছেন কি? যতোই কল্পনা করুন, আসল ব্যাপারটি আপনি কিন্তু কিছুতেই আঁচ করতে পারবেন না। পারতেন—যদি সেদিন বম্বের মাঠে মাই হোপের অবস্থাটি স্বচক্ষে দেখতেন।

উইনিং পোস্টের কয়েক গজ মাত্র দূরে ব্যাপারটা ঘটলো। পাখীর পালকের মতো উড়ে চলা মাই হোপের দেহটা হঠাৎ ধনুকের মতো বেঁকে গেল। কারণ, যে মুহূর্তে বাইনোকিউলারটি লক্ষ্যচ্যুত হল, জকি আর জিনের ওজনটি আকাশ থেকে পড়া দেড়মণি বোঝার মতোই এসে পড়লো ওর পিঠে। ঐ গতিতেই বেচারী এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু সেটা পারবে কেন? পড়লো হুমড়ি খেয়ে! জনসন ওর পিঠ থেকে ছিটকে পড়লো দশ হাত দূরে। অন্য ঘোড়াগুলি একে একে ওকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল অবলীলাক্রমে!

ব্যাপারটা ঐখানেই শেষ হলে কিছু বলার ছিল না। ছুটন্ত ঘোড়ার হঠাৎ পড়ে যাওয়াটা এমন কিছু অবাক কাণ্ড নয়। কিন্তু মই হোপের পড়ার ধরনটাই অনেককে অবাক করলো। জাজ্‌দের চোখও সেটা এড়ায়নি। তাই আবার শুরু হল তদন্ত। তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালালো তারা। প্রিণ্টেড সার্কিটটা আর গোপন রাখা গেল না।

তবু হয়তো তারা কিছুই বুঝতে পারতো না, কারণ অ্যান্টিগ্র্যাভিটির আইডিয়া তাদের কল্পনারও বাইরে। কিন্তু এই প্রফেসাররা যে এমন ভীতু হয়, সেটা আমি জানতাম না। পুলিশের কয়েকটি বাঘা অফিসারের ধমকে ভ্যাঁ করে সব আইডিয়াটা ফাঁস করে দিলেন প্রফেসার চাকলাদার!

চন্দর, আমার আর জনসনের দু বছর করে জেল হয়ে গেল। উপরি হিসেবে আমার আর জনসনের লাইসেন্সটাও বাতিল হয়ে গেল—মোটা টাকা জরিমানাও গুনতে হল!

আর প্রফেসার চাকলাদার—উনি বেশ বহাল তবিয়াতেই আছেন। শুনেছি, কি এক নতুন ব্যাপারে উনি ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। সরকারকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে উনি শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন।

তাঁর নতুন কোনো আবিষ্কার? মাফ করবেন, সে খবর আমি রাখি না, রাখতে চাইও না!

প্রথম প্রকাশ: 'আশ্চর্য!' অগাস্ট, **১৯৬৬**

সূচিপত্রে ফিরে যান

সময়ের মোচড়

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকাল হাঁটতে আর ভাল লাগে না। পঞ্চাশ পেরুনোর পর থেকেই কোমরে একটা ব্যথা হয় মাঝে মাঝে, বেশি হাঁটলে সেটা বাড়ে। কিন্তু উপায় কি? বাড়ি থেকে বাজার প্রায় মাইল খানেক পথ, অন্ততঃ এটুকু তো হাঁটতেই হবে।

ছেলেদের দিয়ে করানো চলে, কিন্তু সন্ধ্যার পর তারা দু-জন মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়তে যায়। অতএব বুদ্ধিমান নিমাই রায় দু-তিন দিনের বাজার এক সঙ্গে করে ফেলেন। তরি-তরকারী ছাড়াও মাছ আর ডিম কেনেন। প্রথম দিন মাছ খাওয়া হয়, কারণ নইলে সেটা পচে যাবে। পরের দিন ডিম। তারপরের দিন নিরামিষ। তারপর আবার বাজার।

শহরের একেবারে বাইরের দিকে নিমাই রায়ের বাড়ি। কাছাকাছি আর বসতি নেই। সেটা নিমাইবাবুর ভালই লাগে—কোলাহল তিনি মোটেও পছন্দ করেন না। পৃথিবীতে যেভাবে মানুষজন বাড়ছে, নতুন বাড়িঘর কলকারখানা উঠছে, তাতে আর দশ বছরের মধ্যে স্বস্তিতে কোথাও পা ফেলার জায়গা থাকবে না। সুন্দর ছিল তাঁর কৈশোর, যখন শহরে হাতে-গোনা লোক বাস করত, সবাই সবাইকে চিনত আর ভালবাসত। পথে ভিড় ছিল না, সর্বত্র একটা শান্তির আবহাওয়া বিরাজ করত। আঃ, সেসব দিন কোথায় গেল।

থলে হাতে সন্ধ্যেবেলা বাড়ি থেকে বেরুলেন নিমাইবাবু। বিলের ধার দিয়ে হেঁটে এসে মাঠের মধ্যে যেখানে কয়েকটা আম-কাঁঠালের গাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে সিগারেট ধরাবার জন্য থামলেন। কেমন শান্ত স্তব্ধতা। গাছের পাতায় বাতাস বেধে ঝিরঝির শব্দ হচ্ছে। উলটোপালটা হাওয়ায় লাইটার ভাল করে ধরছে না। হাত দিয়ে বাতাস আড়াল করে কল ঘোরাতেই দপ করে আগুনের শিখা লাফিয়ে উঠল। মুখ নিচু করে নিমাই রায় সিগারেটের ডগা আগুনে ছোঁয়াতে গিয়ে অনুভব করলেন সমস্ত শরীরটা যেন একবার কেমন করে উঠল—একটু গা-বমি মতো ভাব, একবার যেন মাথাটা সামান্য ঢাল মেরে গেল। ওপরে গাছের পাতায় অদ্ভুত খড়মড় শব্দ। এক মুহূর্তের জন্যই। তারপর আবার সব ঠিক। আরামে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন নিমাইবাবু। বয়স হচ্ছে, দু-একদিনের ভেতর অবিনাশ ডাক্তারকে দিয়ে প্রেসারটা একবার চেক করিয়ে নিতে হবে। মাথাঘোরা ভাল কথা নয়।

সিগারেট শেষ হতে হতে দূর থেকে শহরের প্রান্তে বটগাছটা দেখা গেল। ওর নিচে খোঁড়া রামদাস নাপিত বসে খদ্দেরদের চুলদাড়ি কামায়। এখন অবশ্য সে নেই। সন্ধ্যের আগেই সে তার কাঠের ছোট্ট হাতবাক্সের মধ্যে ক্ষুর, ব্রাশ, আয়না, অ্যালুমিনিয়ামের বাটি ইত্যাদি ভরে বাড়ি চলে যায়। তবে গাছের নিচে একটা আলো জ্বলছে বটে। কাছে গিয়ে দেখলেন একজন আধবুড়ো লোক গ্যাসলাইটের আলোয় পানবিড়ির দোকান পেতে বসেছে। সিগারেট প্রয়োজন, এখান থেকেই কিনে নেওয়া যাক। নিমাই রায় লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—এক প্যাকেট চার্মিনার দাও তো ভাই—

লোকটা অবাক চোখে তাকিয়ে বলল—কি দেব?

—চার্মিনার। চার্মিনার সিগারেট...

—আজ্ঞে, ও নামে তে কোনো সিগারেট নেই বাবু—

নিমাই রায় আশ্চর্য হলেন। লোকটা হাবা নাকি? সিগারেট বিক্রি করে, এদিকে চার্মিনারের নাম জানে না?

—মেপোল আছে বাবু, মেপোল দেব? নইলে কাঁচি নিতে পারেন—-

কাঁচি মানেই সিজার্স। সে সিগারেট এখনো বাজারে পাওয়া যায় নাকি? সে তো কবেই উঠে গিয়েছে। নামটা মনের ভেতরে অনেক পুরানো স্মৃতি জাগিয়ে তুলল।

কাঁচি সিগারেটই এক প্যাকেট কিনে বাজারের দিকে পা বাড়ালেন নিমাই রায়। আজ পথে ভিড় এত কম কেন? শহর ঘুমিয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। যাক, নিরিবিলিতে বাজার সেরে ফেলা যাবে।

দু-পা হেঁটেই হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় আবার থামলেন। ওই বটগাছটা! ওটা তো সেই কবেই কেটে ফেলা হয়েছে। এখানে তো কিছু থাকার কথা নয়! পাশেই একটা ছোট হোটেল রয়েছে। দুপুরবেলা রাস্তায় ধারে গাড়ি থামিয়ে ট্রাক ড্রাইভাররা সেখানে খায়। কিন্তু বটগাছটা গত কুড়ি বছর নেই। কি দেখলেন তাহলে?

পেছনে ফিরে তাকালেন নিমাই রায়। হ্যাঁ, ওই যে বটগাছ—বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নিচে গ্যাসলাইটের আলোয় সিগারেটের দোকান।

—এই যে নিমু, হাঁ করে পেছনে কি দেখছ হে? বাজার করবে না?

শৈলেন ঘোষের গলা। যথারীতি সন্ধ্যেবেলা কানাইবাবুর দোকানে আড্ডা দিতে চলেছেন। নিমাইবাবু বললেন—হাঁ শৈলেনদা, যাচ্ছি। কেমন আছেন?

—এই ভাই, চলে যাচ্ছে। কানাইয়ের ওখানে যাচ্ছি একটু দাবা খেলবো—

শৈলেন ঘোয চলে যেতেই নিমাই রায়ের হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

তার জীবনে ভয়ঙ্কর রকমের কিছু একটা গোলমাল ঘটেছে। কিভাবে যেন তিনি তাঁর প্রথম যৌবনের দিনগুলোতে ফিরে গিয়েছেন। প্রথমটা ঠিক খেয়াল করেন নি। কারণ চিরদিনের অভ্যস্ত ঘটনাগুলো আবার ঘটতে থাকায় মস্তিষ্ক সহজভাবেই তাদের গ্রহণ করেছে। কিন্তু এ যেন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার চলচ্চিত্র আবার প্রোজেকটারে ফেলে দেখানো হচ্ছে। শৈলেনদা মারা গিয়েছেন আজ অন্ততঃ সতেরো-আঠারো বছর, কানাই চাটুজ্যে তারও বছরখানেক আগে। তাহলে এইমাত্র কার সঙ্গে কথা বললেন তিনি?

পুরানো চলচ্চিত্রই বটে। ওই যে ফিরে এসেছে মুকুন্দপালের ছিপ আর বঁড়শির দোকান, তার পাশেই রামপ্রসাদ ভূজাওয়ালার ঝুপড়ি।

সব ঠিক সেই আগেকার মতো। যেন মাঝখানের বছরগুলো একেবারে মিথ্যে।

কিন্তু যথেষ্ট আনন্দ হচ্ছে না কেন? তিনিই তে মাঝখানে প্রার্থনা করেছেন—পুরানো দিনগুলো ফিরে আসুক। এখন, যে অদ্ভুত উপায়েই হোক তা ঘটে গিয়েছে। আর একটু এগিয়ে শহরের মধ্যে ঢুকে গেলেই তিনি পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার পৃথিবীকে সামনে দেখতে পাবেন। এতে তো খুশি হওয়া উচিত।

নিমাইবাবুর ছেলেদের জন্য গিন্নীর জন্য ভয়ানক মন-কেমন করতে লাগল। যদি তিনি সময়ের এই ভাঁজে আটকে যান, তাহলে তাদের সঙ্গে তাঁর আর কখনো দেখা হবে না— কারণ তারা রয়েছে ঠিক পঁয়ত্রিশ বছর পরের ভবিষ্যতে। ওদের না দেখে তিনি থাকতে পারবেন না। পৃথিবীর কোনো স্মৃতি, কোনো ঐশ্বর্যই তাদের সান্নিধ্যের চেয়ে দামি নয়।

সময় বেয়ে তিনি পিছিয়ে গেলেন কি করে?

নিমাই রায় নেহাৎ অশিক্ষিত লোক নন। আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি থিয়োরী থেকে কোয়ান্টাম তত্ত্ব পর্যন্ত কিছু কিছু তাঁর পড়া আছে। কোথায় যেন পড়েছেন সময়ের ভেতরের কখনো কখনো এমন মোচড় বা টুইস্ট তৈরি হয়, তার মধ্যে দিয়ে চলে গেলে অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে পারে। গাছতলায় সিগারেট ধরানোর সময় সমস্ত শরীরে একটা বিচিত্র অনুভূতি হয়েছিল বটে একমুহূর্তে জন্য। তাহলে এক্ষেত্রে মোচড়টা কি দেশকালের ওই বিশেষ জায়গাটাতেই তৈরি হয়েছে? এবার উল্টো দিক দিয়ে ফিরে গেলে কি চিনি আবার স্ব-কালে আবির্ভূত হবেন?

বাজার না করে নিমাই রায় ফিরতি পথে দৌড়তে শুরু করলেন। এতক্ষণে যদি সময়ের মোচড়টা ওখান থেকে সরে গিয়ে থাকে? তাহলে বৌ-ছেলেপুলেকে আর কোনোদিন দেখতে পাবেন না! কী ভয়ানক!

অন্ধকার গাছতলায় এসে থামলেন। বুকের মধ্যে ধক ধক করছে। মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করে পা বাড়াতেই সেই অনুভূতিটা! একটু যেন গা গুলিয়ে উঠল, মাথাটা ঘুরে গেল একবার। তারপর সব ঠিক।

হেঁটে এগুতে এগুতে দূর থেকেই দেখতে পেলেন বাড়িতে আলো জ্বলছে, গিন্নীর গলা শোনা যাচ্ছে। মনে কি শান্তি! যারা তাঁকে ভালোবাসে তারা ওইখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে।

প্রথম প্রকাশ: ফ্যানট্যাসটক, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯
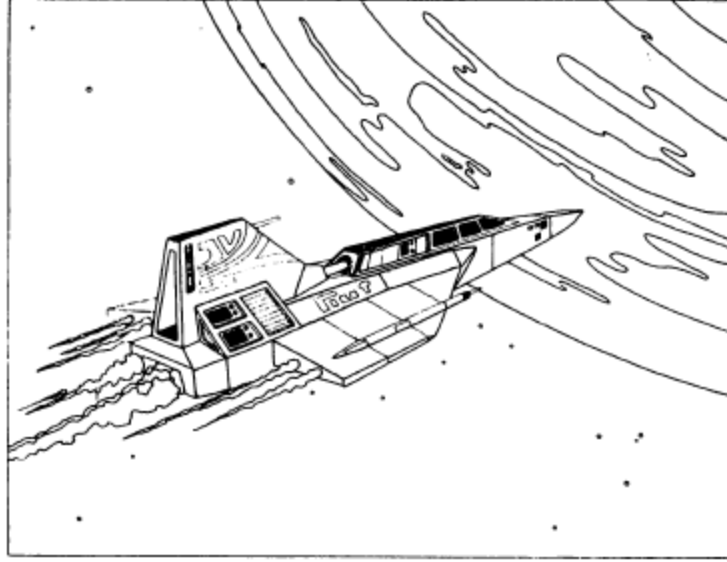
সূচিপত্রে ফিরে যান

সবুজ আতঙ্ক

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

বসবার ঘর থেকে কলিং বেলটা বেজে উঠলো। ওঃ! ছুটির দিনেও রেহাই নেই। অন্যদিন যে কর্মচারীটি রুগীদের বসবার ঘরে অভ্যর্থনা জানায় আজ তার ছুটি আর রামবিলাস গেছে বাইরে থেকে কিছু টুকিটাকি জিনিস কিনতে। ব্যাটা গায়ে গতরে হাতির মতো হলে কি হয়—বিশ্ব কুঁড়ে। কখন ফিরবে তার ঠিক কি! অর্থাৎ ডাক্তার মালহোত্রাকেই পাশের ঘরে যেতে হবে কে এসেছে। তার খোঁজ নিতে।

কিন্তু ডাক্তার মালহোত্রা এখন বোতলে ডিসটিলড্ ওয়াটার ভরছেন। যে কোন কাজ নিখুঁতভাবে শেষ না করে অন্য কাজে মন দেওয়া তাঁর স্বভাবের বাইরে। এর জন্যে রুগীকে যদি কয়েক মিনিট বেশী অপেক্ষা করতে হয়, উপায় কি।

ইজিচেয়ারে হাত পা ছড়িয়ে বসে রয়েছে এক আগন্তুক। ডাক্তার মালহোত্রা লোকটার মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিলেন। কুৎসিত একটা মানুষ। মরা মাছের মতো চোখ, খসখসে শুকনো গায়ের চামড়া, হাতগুলো কেমন যেন বর্ণহীন ফোলাফোলা, আর লোকটার পরনে ওটা যেন পোশাক নয়, একটা বস্তা—পোশাকের মতো চাপানো রয়েছে।

নালী ঘায়ের রুগী নাকি, না ফালতু কোন বীমা কোম্পানীর দালাল? বীমার দালাল হলে অবশ্য লোকটাকে এক্ষুনি বিদেয় করতে ডাক্তারের কোন অসুবিধে হবে না। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা—লোকটার মুখের ভাব মোটেই কোন জীবিত মানুষের মতো নয়। কেমন যেন গা ছমছম করা, ভুতুড়ে...!

—আপনি বোধহয় ডাক্তার মালহোত্রা?

লোকটায় কথায় ডাক্তারের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল। আচ্ছা, লোকটার গলার স্বর কেমন যেন অস্বাভাবিক ঘড়ঘড়ে না? যেন শুনতে শুনতে শিরদাঁড়ায় একরাশ ফুসকুড়ি ফুটে ওঠে।

ডাক্তার মালহোত্রার উত্তরের অপেক্ষা না করেই আগন্তুক এক নাগাড়ে বকে চলেছে। সেই সঙ্গে ভাবলেশহীন দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে ডাক্তারের দিকেই।

ডাক্তার শুনলেন আগন্তুক বলছে—আমরা হচ্ছি কুৎসিত একটা মানুষ। মরা মাছের মতো চোখ, খসখসে শুকনো গায়ের চামড়া, হাত-পাগুলো কেমন বর্ণহীন ফোলা ফোলা।

কী আশ্চর্য! ও তো ডাক্তারের মনের কথাগুলোই উগরে দিচ্ছে। এ কি ভেলকি নাকি! সামনের সোফাটাতেই ধপ করে বসে পড়লেন ডাক্তার মালহোত্রা।

আগন্তুক তখনও বলে চলেছে—আমাদের পরনে এটা যেন পোশাকই নয়, একটা বস্তা—পোশাকের মতো চাপানো রয়েছে। আমরা কোন নালী ঘায়ের রুগী অথবা ফালতু বীমা কোম্পানীর দালাল। সব থেকে বড়কথা আমাদের মুখের ভাবটা মোটেই কোন মানুষের মতো নয়—কেমন যেন গা ছমছম করা ভুতুড়ে...আর আমাদের গলার স্বরটা কেমন যেন অস্বাভাবিক ঘড়ঘড়ে, যেন শুনতে শুনতে শিরদাঁড়ায় ফুটে ওঠে একরাশ ফুসকুড়ি।

ডাক্তার মালহোত্রার মনে হল এবার তিনি সত্যি সত্যিই পড়ে যাবেন। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। ঠিক সেই মুহূর্তে আগন্তুকের কণ্ঠে নিজের চিন্তার ভাষা শুনতে পেলেন—কী সর্বনাশ। মানুষের মনের চিন্তা পড়ে ফেলতে পারে।

ডাক্তার মালহোত্রা লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু তার আগেই একটা হিম শীতল কণ্ঠ কথা বলে উঠেছে—বসুন আপনি।

ডাক্তার তবু দাঁড়িয়ে রইলেন। সারা শরীর তাঁর ঘামে ভিজে গেছে।

—বসুন। আগন্তুক তীব্র কণ্ঠে আদেশ করলো। সে শাসানি ডাক্তার মালহোত্রার শেষ শক্তিটুকুও যেন কেড়ে নিল। তিনি আবার ধপ করে বসে পড়লেন।

লোকটার মুখের রং-ও কেমন অদ্ভুত ফ্যাকাশে! ও কি মানুষ না শয়তান? ডাক্তার মালহোত্রা এ কথাটা মুখে না উচ্চারণ করলেও লোকটা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছে। খবরের কাগজের একটা কাটিং বার করে সে এগিয়ে দিল ডাক্তারের কাছে।

দেখবেন না ভেবেও ডাক্তার মালহোত্রা কাগজের কাটিংটায় একবার চোখ না বুলিয়ে পারলেন না। কিন্তু এ দিয়ে কি করবেন তিনি? ও তো কোন এক লাশকাটা ঘর থেকে একটা মড়া চুরির ঘটনা।

—কিছু বুঝলেন? লোকটা তখনও এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে ডাক্তার মালহোত্রার দিকে।

—না। মাথা নাড়লেন ডাক্তার।

নিজের দিকে একটা ফ্যাকাশে আঙুল নির্দেশ করে আগন্তুক বললো—এই সেই লাশ।

শুনেই আবার লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার মালহোত্রা। কাগজের টুকরোটা তাঁর অবশ আঙুলের ফাঁক গলে খসে পড়ে গেল কার্পেটের ওপর। চেয়ারে ও কে বসে আছে? ডাক্তার নিজের ছ'ফুট। লম্বা শরীরটা কোন রকমে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। নাকের মধ্যে থেকে নিশ্বাস ছাড়লেন ইঞ্জিনের মতো—কিন্তু আর একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারলেন না তিনি।

—এটাই সেই চুরী করা দেহ। তেলের কড়ার তলা থেকে ওঠা বুদবুদের মতে ও বলতে লাগলো। কার্পেটে পড়ে থাকা কাগজের কাটিংটা দেখিয়ে আবার বললো—ওতে একটা ছবিও আছে, লক্ষ্য করলে দেখতে পেতেন সে ছবির সঙ্গে আমাদের এই মুখের সম্পূর্ণ মিল।

কিন্তু নিজের সম্পর্কে ও কেবলই বহুবচন ব্যবহার করছে কেন? ডাক্তার মালহোত্রা কোন রকমে জিজ্ঞেস করলেন—কিন্তু মুখ তো একটা!

—সে তো ঠিকই। মুখ একটা, দেহও একটাই। কিন্তু লাশ যারা দখল করেছে তারা সংখ্যায় অনেক। বসুন আপনি।

—কিন্তু...

—আগে বলুন, তারপর কথা। ঠাণ্ডা আড়ষ্ট একটা হাত নিজের পোশাকের ভেতর ঢুকিয়ে যে বস্তুটি বার করে আনলো, সেটি একটি মস্ত বড় পিস্তল। তারপর আনাড়ির মতো বাগিয়ে ধরলো ডাক্তার মালহোত্রার দিকে। ডাক্তার সতর্ক চোখে সেদিকে তাকিয়ে কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে ছবির দিকে চোখ রাখলেন।

ছবির ওপরে লেখা রয়েছে—মৃত অজিত নাইডু, মৃতদেহটি চুরী করা হয়েছে শহরের উপকণ্ঠে কাঁটাপুকুর মর্গ থেকে।

ডাক্তার মালহোত্রা বারবার ছবির সঙ্গে আগন্তুকের চেহারা, চোখ, মুখ খুঁটিয়ে দেখলেন। হুবহু এক! ডাক্তারের সারা শরীরের রক্তস্রোত যেন তীব্র গতিতে ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে।

ভূতপূর্ব অজিত নাইডুর হাতের পিস্তলটা একবার নড়ে উঠলো, মুখ দিয়ে তার লালা ঝরছে।

সে বললো, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। মৃগী রুগী অনেক সময় মড়ার মতো নিষ্প্রাণ হয়ে থেকে আবার বেঁচে ওঠে বটে, কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয় নি। তবে স্বীকার করছি আপনি যথেষ্টই বুদ্ধিমান—

কিন্তু মৃগী রুগী কি অপরের চিন্তা পড়তে পারে?

—এ ব্যাপারটা তাহলে কি? অনেকটা বেপরোয়া দুঃসাহসেই ডাক্তার এবার তাঁর প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন।

—ব্যাপার তো আগেই বলেছি। এই দেহটা আমরা দখল করেছি। অনেকটা আপনাদের ভূতের ভরের মতো। তবে ভূত আমরা নই—একেবারে নিখাদ বর্তমান।

কিন্তু হাসিটা ভূতের মতোই শোনা গেল তার। হাসতে হাসতে বললো—অজিত নাইডু লোকটা বেঁচে থাকতে নির্ঘাৎ রসিক ছিল। তার মস্তিষ্ক নিয়েই তো কথাবার্তা চালাচ্ছি আমরা।

ডাক্তার মালহোত্রা এতক্ষণে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। মৃত অজিত নাইডুর সঙ্গে চেহারার মিল থাকা একটা বদ্ধ পাগল এসে জুটেছে তাঁর চেম্বারে। অপরের চিন্তা পাঠের বিদ্যেটা যতই ওর জানা থাকুক—পাগল ছাড়া ওকে আর কি ভাবা যায়?

কিন্তু চাকরটা এখনও দেরী করছে কেন? রামবিলাস একবার এলে হয়।

ভূতপূর্ব অজিত নাইডু তখন বলছে—আপনার চাকরটাকেই আমাদের দরকার। আসলে প্রয়োজন একটা সুস্থ সমর্থ দেহ—তা সে চাকর কিংবা অন্য কেউ হলেও ক্ষতি নেই। আপনি ভাবছেন আমরা বদ্ধ উন্মাদ। ভুল করছেন। দুদিন আগে শহরের বাইরে একটা উল্কাপাত হয়েছিল, মনে আছে?

—কাগজে দেখেছিলাম। উল্কাটাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। ডাক্তার মালহোত্রা বললেন।

—আপনাকে মুখে কিছু বলে আর কষ্ট করতে হবে না। আপনি ভাবলেই আমরা জানতে পারছি। যাক্ যা বলছিলাম। উল্কা যে আপনারা খুঁজে পান নি তার কারণ সে আসলে উল্কাই ছিল না—সেটা একটা মহাকাশযান। অন্য গ্রহের একটা ছোট্ট বিমান। গ্ল্যান্টক গ্রহের নাম শুনেছেন? সেখান থেকেই আসছি আমরা। আপনাদের সব বিশাল বিশাল বিমানের তুলনায় আমাদের বিমানটি ছোটই বলতে হবে। আসলে আমরা নিজেরাও ছোট যে। খুবই ক্ষুদ্র। আপনাদের অণুবীক্ষণেও দেখা যায় না—এত পুঁচকে। তবে সংখ্যায় অগুন্তি, হিসেবে আনাই দুঃসাধ্য।

ডাক্তার মালহোত্রার মনে যে চিন্তাটা উদয় হতে যাচ্ছিল সেটা আগেই পড়ে ফেলে আগন্তুক বললে—আবার ভুল করছেন, আমরা কোন বুদ্ধিমান জীবাণু নই, তার চাইতেও

ছোট। সংখ্যায় অগুন্তি একসাথে তরল পদার্থের মতো থাকা এক ধরনের ভাইরাস, কিংবা বলতে পারেন বুদ্ধিমান ‘বিযাণু’।

ঘর থেকে পালিয়ে যাবার চিন্তাও আর মাথায় আনতে সাহস পাচ্ছেন না ডাক্তার মালহোত্রা। উনি জানেন এ চিন্তা কার্যকর করার আগেই ধরা পড়ে যাবেন।

আগন্তুক বলছে—আমাদের গ্ল্যান্টক গ্রহবাসীদের সর্বদাই অন্য কোন বৃহৎ দেহধারী বুদ্ধিমান জীবের ওপর নির্ভর করতে হয়। এই যে এখানে এলাম তা আমাদের চেয়ে আকারে বহুগুণ এক গ্ল্যান্টিক স্তন্যপায়ীর দেহ আশ্রয় করে।

একটা ভিজে কাশি ঘড় ঘড় করে উঠলো ওর গলায়। তারপর বললো—আমাদের মহাকাশযানটা যখন নামলো, আমরা নামলাম ওই স্তন্যপায়ীটাকে আশ্রয় করে। কিন্তু আপনাদের দেশের একটা কুকুর ওই অচেনা জীবটাকে দেখে তাড়া করলো। আমরাও ফাঁক তালে ঢুকে পড়লাম তার দেহে। ব্যস, আমাদের গ্রহের জীব তখন একেবারে কাৎ!

কুকুরটা আমাদের সোজা এনে হাজির করলো শহরের ভেতরে একটা লাশকাটা ঘরে। সেখানেই মৃত অজিত নাইডুর দেহটা পেয়ে ঢুকে পড়লাম। কুকুরের সেখানেই পতন এবং মৃত্যু।

হঠাৎ সদর দরজায় একটা আওয়াজ। ডাক্তার মালহোত্রা কান পাতলেন। হালকা পায়ে কেউ দ্রুত ওপরে উঠে আসছে।

ভূতপূর্ব অজিত নাইডু তখন বলেই চলেছে—অজিত নাইডুর দেহটায় ঢুকে পড়েই আমরা কাজ শুরু করে দিলাম। ইতিমধ্যে জড় হয়ে যাওয়া ওর শরীরের পেশী আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে সজীব সচল করে তুললাম। লোকটা বেঁচে থাকার সময় বেশ বুদ্ধিমান ছিল। মৃত অবস্থাতেও ওর মস্তিষ্ক বহন করছিল জীবিত কালের যাবতীয় স্মৃতি। এ সবই আমাদের কাজে লাগতে শুরু করলো। এই যে পিস্তলটা ধরে আছি—এ কি বস্তু, কিভাবে কাজে লাগে, সবই অজিত নাইডুর মস্তিষ্কের স্মৃতির মধ্যে থেকে পাওয়া।

ওদিকে হালকা পায়ের আওয়াজ ক্রমেই এগিয়ে আসছে।

—লাশ কাটা ঘরে অজিত নাইডুর দেহটা ছিল সম্পূর্ণ নগ্ন। এই পোশাক এবং এই পিস্তল সবই চুরী করতে হয়েছে দেহটাকে কাজে লাগিয়ে... সাবধান! দরকার হলে এই দেহের হাত পিস্তলও চালিয়ে দিতে পারে।

অতএব দরজার দিকে লাফ দিয়ে যাবার চিন্তাটা ছাড়তেই হল ডাক্তারকে। ওদিকে পদশব্দ চেম্বারের দরজার কাছে এসে পড়েছে।

—মৃতদেহ নিয়ে বেশীদিন কাজ চালান যায় না, তা তো বোঝেনই। বললো ভূতপূর্ব অজিত নাইডু। একটা সজীব দেহ চাই আমাদের। স্নায়বিক শক্তিসম্পন্ন সতেজ একটা শরীর। আপাততঃ একটা দেহ দখল করতে গেলে মুশকিল হল যে সে ধাক্কা আপনাদের শরীরে সামলাতে পারবে না, পাগল হয়ে যাবে। আর বিকল-মস্তিষ্ক পাগল নিয়ে কি লাভ হবে আমাদের? তা তো যে কোন বিকল যন্ত্রের মতোই অকেজো।

ওদিকে বাইরে পায়ের শব্দ থেমেছে। খুট করে একটা শব্দ। দরজা বন্ধ করে সে ভেতরে ঢুকে এদিকেই আসছে।

সে ততক্ষণে চরম-পত্র দাখিল করে দিয়েছে—আমরা আপনার কাছে একটা সাহায্যের আশায় এসেছি। একটা সুস্থ সবল মানুষ আপনাকে অজ্ঞান করে দিতে হবে—যাতে তার শরীরে ভর করার সময় তার ইচ্ছাশক্তি বাধা না দিতে পারে আমাদের। তারপর যখন তাকে আবার জাগিয়ে দেবেন আমাদের অধিকার তার দেহ মনের ওপর থাকবে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত।

দরজা খুলে একটা মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সুন্দরী, কমনীয় কান্তি এক তরুণী। তার দিকে এক পলক তাকিয়েই আগন্তুক বললো—এই তো একটা ভালই দেহ এসে জুটেছে। এখন আপনার কাজ আমাদের সাহায্য করা।

এদিকে ঘরে ঢুকেই ওই মরা-মুখের বিভীষিকা দেখে তরুণীর চোখেও ফুটে উঠেছে ভয় আর বিস্ময়।

আগন্তুকের দেহটা হঠাৎ আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়াল চেয়ার থেকে। টলতে টলতে দু'পা এগিয়ে এল নবাগতার দিকে। মুখে তার একটা নোংরা হাসি। গ্ল্যান্টকী বিযাণু কি সৌন্দর্য দেখে চঞ্চল হয়েছে? নাকি ভূতপূর্ব অজিত নাইডু এখনও বেঁচে থাকার সংস্কার ভুলতে পারে নি?

ওকে এগিয়ে আসতে দেখে সেই সঙ্গে ওর মুখের ওই নোংরা হাসিটা আগন্তুক তরুণীকে ঘৃণায় আর আতঙ্কে নীল করে দিল। একটা আর্ত চিৎকার করে মেঝেতে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো সে।

সে পড়ে যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার মালহোত্রা ছুটে এসেছেন তার কাছে। তুলে নিয়ে শুইয়ে দিয়েছেন ঘরের কোণের লম্বা টেবিলটায়।

ভূতপূর্ব অজিত নাইডু-ও পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বললো—অজ্ঞান হয়ে সুবিধেই হল। আমরা এক্ষুনি ঢুকে পড়তে পারি ওর দেহে।

কিন্তু গ্ল্যান্টক অধিবাসীর সে আশায় ছাই দিয়ে তরুণী চোখ মেলে তাকাল। তার দুচোখে এখনও ভয় আর বিতৃষ্ণা!

—নাঃ হল না! ডাক্তার, আপনাকে দেখছি একটু খাটতেই হচ্ছে। গ্ল্যান্টকী বললো—এক্ষুনি অজ্ঞান করে দিন ওকে। কি ভাবছেন, ঈথার দিলে অজ্ঞান হয় বুঝি? তবে তাই দিন, আর দেরী করবেন না।

সিঁড়িতে আবার পায়ের শব্দ। ডাক্তার মালহোত্রা কান পাতলেন। এবার যেন একটা প্রকাণ্ড গণ্ডার উঠে আসছে ভারী শরীর নিয়ে।

—ভাবছেন বুঝি আপনার চাকর রামবিলাস এল? তা ভালই হল। সংখ্যায় আমরা অগুন্তি। দুজনের শরীরে ভর করতে কোন অসুবিধে হবে না। আপনি বরং ঈথারটা দুজনের জন্যে একটু বেশী পরিমাণ বার করুন। দেরী করলে কিন্তু মারা পড়বেন বলে দিচ্ছি। আর মরেও রেহাই পাবেন না। আপনাকে গুলী করে আপনার দেহে প্রথমে আমরা ঢুকবো তারপর ঈথার প্রয়োগ করব ওই মেয়েটা আর চাকরটার ওপর। কেউই নিস্তার পাবে না। তার চেয়ে আমাদের হুকুম মতো কাজ ভাল নয় কি—মরেও যখন কারুর কোন উপকার করতে পারছেন...!

দরজা খুলে রামবিলাস সটান ঘরে ঢুকলে—হুজুর, রাস্তায় গাড়ির টায়ার ফেঁসে গেল, তাই...

রামবিলাসের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে ঘুরে দাঁড়াল গ্ল্যান্টকী।

আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্রুদ্ধ গণ্ডারের মতো ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো রামবিলাস। সেকেণ্ডের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ—তার মধ্যেই গ্ল্যান্টকী ধরাশায়ী। হাত থেকে পিস্তলের গুলী ছিটকে গিয়ে বিঁধলো দেওয়ালের গায়ে। ঝর ঝর করে খানিকটা চুনবালি খসে পড়লো মেঝেতে।

ডাক্তার মালহোত্রা তখন চিৎকার করে চলেছেন—মেরে ফেল, একবারে শেষ করে দে।

রামবিলাসের বিশাল শরীরটা তখন গ্ল্যান্টকীর ঠিক পেটের ওপর ক্রমাগত লাফিয়ে চলেছে। একটু বাদেই বমি করলো গ্ল্যান্টকী। থক থকে কাদার মতো সবুজ বমি। গ্ল্যান্টক গ্রহের ভাইরাসের দল ভূতপূর্ব অজিত নাইডুর শরীর থেকে বেরিয়ে পড়েছে রামবিলাসের বজ্র পেষণে।

সঙ্গে সঙ্গে সারা ঘরটায় ঈথার ছড়িয়ে দিলেন ডাক্তার মালহোত্রা—নইলে সারা ঘরটা ভরে যাবে ওই সবুজ কাদায়।তারপর মেয়েটিকে তুলে নিয়ে লাফিয়ে ঘরের বাইরে আসতে আসতে হাঁক দিলে—রামবিলাস, এখনি বেরিয়ে পড় ঘর থেকে।

রামবিলাস ঘর থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে জ্বলন্ত লাইটার বার করে ছুঁড়ে মারলেন ঈথার ভরা সেই ঘরে। সারা ঘরে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন। গ্ল্যান্টক গ্রহের মারাত্মক ভাইরাস থেকে পৃথিবীকে বাঁচাবার আর কোন উপায় ছিল না।

আগুন নিয়ে তখন চারদিক থেকে রীতিমত হৈ চৈ শুরু হয়ে গেছে। দমকল! পুলিশ!

নীচে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এতক্ষণে মেয়েটি ডাক্তার মালহোত্রাকে দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বললো—আমি এসেছিলাম আপনাকে ডাকবার জন্যে। আমার ভাই এর হাম হয়েছে।

ডাক্তার মালহোত্রা হাসলেন। বললেন—বেশ চল যাওয়া যাক।

কিন্তু যাওয়ার আগে রামবিলাসকে একটা প্রশ্ন না করে পারলেন ডাক্তার—গ্লান্টকী তো মানুষের চিন্তা পড়ে ফেলতে পারতো। কিন্তু তুই যে ওকে আক্রমণ করতে যাচ্ছিস, সে চিন্তার খবর ও পেলো না কেন বলতে পারিস?

—চিন্তা! না হুজুর, কোন চিন্তাই আমি করি নি। ওর হাতে পিস্তল দেখেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। যে লোকটা পিস্তল উঁচিয়ে দাঁড়ায় তাকে আক্রমণ করবো
কিনা তাও আবার চিন্তা করতে হয় নাকি? রামবিলাসের সাফ জবাব!

প্রথম প্রকাশ : ফ্যানট্যাসটিক, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯
বিদেশী ছায়ায়
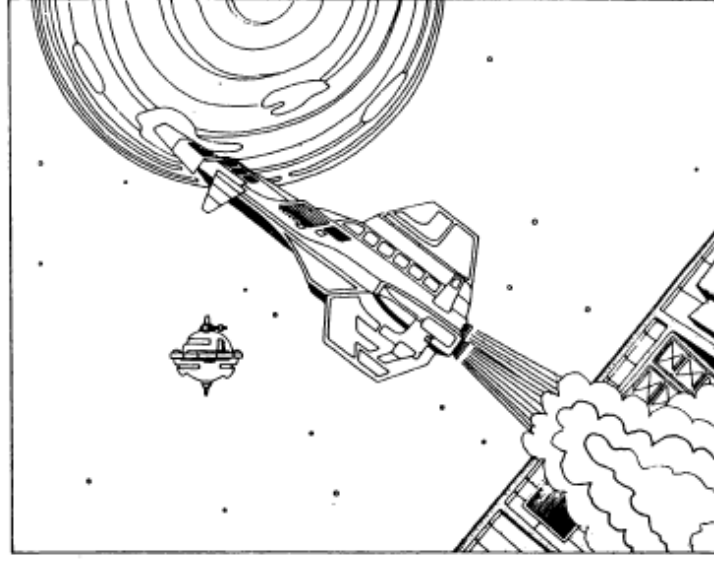
সূচিপত্রে ফিরে যান

কায়াহীনের কাহিনী

সৌরেশ দে

—যদি ওরা কেউ সত্যিই আসে?

: আবার তুমি ঐ ঐ সব ভাবছ ইন্দু? তোমায় আমি হাজার বার মানা করেছি। ক্ষোভ ঝরে পড়ে অরিন্দমের কণ্ঠে।

—জান আমার কিন্তু মনে হয় ওরা এসেছে। আমার চোখের আড়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

: বাজে চিন্তা করো না। মন থেকে ঐসব আজগুবি ঝেড়ে ফেলা দেখি।

—আচ্ছা বাবা আচ্ছা। আমি কি ঐসব চিন্তা করতে চাই? চোখের সামনে পড়ে যে। যখনই কোন দিকে তাকাই মনে হয় কে যেন সরে গেল!

: যতসব বাতিকের ব্যামো, তার ওপর সায়ান্স-ফিকশান পড়ার কুফল।

—না মশাই না। তুমি বলে তাই উড়িয়ে দিচ্ছে। থাকতো যদি আজ আমার একটা ছেলে। —ইন্দুমতী চোখের জল লুকোতে মুখ ফেরায়। অরিন্দম ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

: আচ্ছা, ইন্দু, তুমি এবার একটু ঘুমাবার চেষ্টা কর।

—ঘুম যে আমার আসে না। দিনরাতই চেষ্টা করছি। বিছানায় শুলেই চিন্তা আমায় আরো পেয়ে বসে।

: এই পিলটা খেয়ে নাও।—অরিন্দম এককাপ জলসহ স্লিপিং পিলটা এগিয়ে দেয়।

—না, ঐসব বিষ আর আমি খাব না। তোমরা আমায় তিলে তিলে মেরে ফেলতে চাও। এইতো বিছানা থেকে উঠলাম। এখন সবে বেলা নটা।

: আচ্ছা তোমার উল আর কাঁটা কোথায়? আমার সোয়েটারটা বোন বসে বসে। এখানে সুন্দর ঝলমলে রোদে পা বাড়িয়ে দাও। দেখ কি সুন্দর হেমন্তের শিশির ঝরা সকাল।।

—দেখ তোমায় আমি তিনটে সোয়েটার বুনে দিয়েছি। নিজেরও গোটা তিনেক আছে। আর সোয়েটারে কাজ কি?

: তবু, এই নতুন প্যাটার্নটা আমার ভাল লাগে। এটার একটা আমায় করে দাও লক্ষ্মীটি।

—তারপর, এটা হয়ে গেলে কি করবো?

: তোমার পেয়ারের কুকুর, সিলির জন্যেও একটা কর। আচ্ছা তোমায় আমি তাস নিয়ে পেসেন্স খেলা শিখিয়ে দেব।

—আচ্ছা ওরা যদি কেউ আসে তবে ওরা কি আমায় মেরে ফেলবে, না ভাব করবে?

: ও আবার ঐসব বাজে কথা।

—বর্তমান বৈজ্ঞানিকদের ধারণা...।

: ছিঃ ইন্দু এখন মন দিয়ে খেয়ে নাও। খাবার সময় অন্য চিন্তা করতে নেই। শরীর খারাপ করবে।

—তোমার কি মনে হয় ওরা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে। ধর আমায় যদি ধরে নিয়ে যায়, কিম্বা মেরে ফেলে।

: না ওসব কিছুই ওরা পারবে না। ওসব বাজে চিন্তা তুমি ছেড়ে দাও।

—তবে ওরা কেন আসে? ওদের কি পায়ের পাতায় বেড়ালের মতো প্যাড লাগানো আছে? কোন শব্দ হয় না!

: সবই তোমার কল্পনা। ওসব বাদ দাও।

—তুমি খালি উড়িয়ে দিতে চাও। জান ওরা ঘরে এলেই সিলি বুঝতে পারে। ওর কান খাড়া হয়ে ওঠে। গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। আর আমি ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালেই মনে হয় কি যেন সরে গেল। জান, আজকে আমার আয়নাতেও ওদের ছায়া পড়েছিল।

অরিন্দম চুপ করে যায়। মনে মনে ভাবে ইন্দুর একটা ছেলে যদি আজ থাকত তাহলে এই সব কল্পনাবিলাসের সুযোগ মিলতো না। আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগে ইন্দুকে যখন ঘরে নিয়ে আসে সেদিনের কথা মনে পড়ে। তখন ইন্দু কত স্বাভাবিক কত সুন্দর ছিল। দিল্লীর মতো এই নির্বান্ধব কাঠখোট্টা জায়গায় কত সহজে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। কত গান কত হাসি কত আবেগমধুর সন্ধ্যা দুজনের কেটেছে। সব যেন সারবন্দি হয়ে অরিন্দমের চোখের সামনে পেরিয়ে যেতে লাগলো।

যৌবন ছাড়িয়ে প্রৌঢ়ত্বের সীমায় উভয়ে এসে দাঁড়িয়েছে আজ। কিন্তু আজও তারা নিষ্ফল। নিঃসন্তান। অরিন্দম দেখেছে ধীরে ধীরে কেমন ইন্দুমতী পাল্টে যাচ্ছে কেমন বদলে গেছে। তার ব্যথা বেদনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী সে। সে নিজেও বহন করছে সেই ভার। অন্তরও শূন্য হাহাকার। তবু সে পুরুষ মানুষ, তার অনেক যোগাযোগ আছে যা দিয়ে সে নিজেকে ভরিয়ে রেখেছে। কিন্তু ইন্দু? ইন্দুর কি আছে? আয়েসবাগের এই ছোট্ট বাংলো বাড়ী, কুকুর সিলি, আর সে নিজে। সে আর নতুন কিছু ইন্দুকে দিতে পারে না। কি দিয়ে ইন্দুকে আকর্ষণ করবে?

ইন্দু তাই পাল্টে গেল। কিছুই আর ইন্দুর ভাল লাগে না। কিছুই ইন্দুকে আকর্ষণ করতে পারে না। ধীরে ধীরে ইন্দু ভাবপ্রবণ আর কল্পলোকের বাসিন্দা হয়ে উঠেছে। আর এক বেদনার দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে অরিন্দমের ভিতর থেকে। আবার নীরবতা ভঙ্গ করে ইন্দুমতী।

—আচ্ছা, ওরা কি রকম দেখতে বলতে পার?

: তুমিই জান, আমি তো ওদের দেখিনি।—অরিন্দমের বিরক্তি ভরা জবাব।

—আমি শুধু একজোড়া চোখ, বেশ বড় বড় চোখ, আর একটা গোমড়া মুখ ছাড়া কিছুই দেখতে পাই না। আচ্ছা, ওরা কি অদৃশ্য হয়ে যাবার মন্ত্র জানে। নাহলে ওদের খুঁজে পাই না কেন?

: তুমিই জান।—এবারেও সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় অরিন্দম।

—জান এইভাবে একলা থাকলে একদিন দেখবে আমি মরে পড়ে আছি। এ আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে। তুমি একটা ব্যবস্থা কর।

অরিন্দম ব্যবস্থার কথা চিন্তা করে। অনেকদিন থেকেই ভাবছে। ইন্দুর এই মানসিক বৈকল্য নিয়ে কি করা যায়? একটা না একটা ভয় ভাব ভাবনার গোলোক ধাঁধায় ঘুরে মরছে সে। সম্প্রতি সায়ান্স ফিকশান খুব পড়ছিল ইন্দু। এসব তারই কুফল। কোন মনোবিজ্ঞানীর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর গতি নেই। যদিও সে জানে ফলের আশা কম। কি করতে পারে অরিন্দম আর! অনেক চেষ্টা করেছে সে। নিঃসঙ্গতাই যে ইন্দুর একমাত্র ক্ষতির কারণ সেটা সে বোঝে। কিন্তু সে নিরুপায়! গান বাজনা রেডিও গ্রামোফোন আর কুকুর নিয়ে কতক্ষণ কাটান যায়। হঠাৎ আরন্দম ভাবে ইন্দুকে একটা টেলিভিশন সেট কিনে দেবে। সম্প্রতি দিল্লীতে টিভি চালু হয়েছে। কিছু নতুনত্বের আকর্ষণ নিশ্চয়ই পাবে ইন্দুমতী। তাই সামনের মাসেই একটা টিভি সেট কিনে দেওয়া স্থির করে অরিন্দম।

কিছুদিন টিভি নিয়ে ভালই কাটে ইন্দুমতীর। তারপর আবার সেই যথাপূর্বম অবস্থা। আবার সেই ভিনগ্রহের বাসিন্দার আনাগোনা। অশরীরী প্রহরীর অদৃশ্য প্রহরা। আবার হাঁপিয়ে উঠতে থাকে ইন্দুমতী। একমাত্র সিলি তার নির্ভর। সিলিকে লক্ষ্য করেই সে বুঝতে পারে তার ঘরে কোন আগন্তুক আছে কি না। অরিন্দম কোন কালেই এসব বিশ্বাস করবে না।

সেদিন রাত্রে ইন্দুমতী কি ভয় না পেয়েছিল। তার স্থির বিশ্বাস তার মাথার কাছে কেউ এসে দাঁড়িয়ে ছিল। স্পষ্ট নিশ্বাসের আওয়াজ সে শুনেছে নইলে সিলি হঠাৎ দেওয়ালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কেন। তখন তার সবে তন্দ্রা এসেছে। কিন্তু অরিন্দম, সে যেন কি! কিছুতেই বিশ্বাস করবে না!

ইদানীং ইন্দুমতীর ভীষণ ভয় বেড়ে গেছে। সব সময় জানলা দরজা বন্ধ করে
বসে থাকে। দরজা জানলার ফাঁকে কাঁথাকানি খুঁজে নিজের নিরাপত্তা দৃঢ় করার চেষ্টা করে। অরিন্দমের এই সমস্ত বাতিকের বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। সে বেশী চিন্তিত হয়ে পড়ে। কিন্তু কোন উপায় খুঁজে পায় না।

সেদিন দুপুরে ইন্দুমতী এইরকম কাঁথাকানি গুঁজে বসে আছে ঘরে। সামনে টিভি সেট খোলা। পায়ের কাছে সিলি ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। ইন্দুমতীর একটু তন্দ্রার ভাব এসেছিল। এমন সময় হঠাৎ সিলির গোঁ গোঁ শব্দে ঘোর কেটে যায়। তাকিয়ে দেখে সেই মুখ সেই টিভি স্ক্রীন জুড়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। ভীষণ চমকে ওঠে ইন্দুমতী। ভয়ে হৃৎপিণ্ড দাপাদাপি শুরু করে। ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে সিলি নিসপিস করতে থাকে। আগন্তুক মূর্তি স্মিতমুখে ইন্দুমতীকে অভয় দান করে, এবং তার কুকুর সামলাতে বলে। ইন্দুমতী বুদ্ধি হারায় না। সে যথারীতি সিলিকে শান্ত করে। সেদিন অফিস থেকে ফিরতেই অরিন্দম এক নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়।

—জান, আজ কি ভীষণ ব্যাপার ঘটেছিল।

অরিন্দম জবাব না দিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। ভাবে আবার কোন নতুন বাতিকের কবলে ইন্দু পড়েছে। ইন্দুমতী আবার বলতে থাকে।

—আজ সেই গ্রহান্তরের লোক এসেছিল! কি করে জান? ভারী অদ্ভুত ব্যাপার। টিভি স্ক্রীন থেকে লাফিয়ে ঘরের মেঝেয় এসে পড়লো! দরজা জানলা বন্ধ করে ওদের ঠেকান যায় না! কি অদ্ভুত মাথা আর হাতসর্বস্ব বেঁটে বামন চেহারা। বড় বড় গোল গোল চোখ।

অরিন্দমের চোখ দুটিও কপালে ওঠে। মনে ভাবে ইন্দু দিন দিন আরোগ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। মুখে বলেঃ তারপর, তোমার কল্পনার দৌড় কতদূর যায় শুনি।

—মোটেই না মশায়, তুমি বরাবর ভুল করছো। ওরা আমার সঙ্গে ভাব করতে এসেছিল। এতদিন শুধু আমাদের ভাষা শিখতে দেরী হয়েছে। তাই আশেপাশে আড়ি পেতে থাকতো। জান, প্রথমে আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। চীৎকার করার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছিলাম। মড়ার মতো কাঠ হয়ে পড়েছিলাম।

: তোমার জ্ঞান ছিল তো?

—তোমার সবেতেই অবিশ্বাস। জান, সিলিটা কি বোকা! আর একটু হলে ওর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তো।

: সেই ভাল হত।

—কখখনো না। তুমি জান না কি ভাল লোক ওরা। ওরা পৃথিবীর মানুষের সাথে আলাপ করতে চায়। তাদের জীবনের খুঁটিনাটি জানতে চায়। তাদের দুঃখদুর্দশা দূর করতে চায়। ওরা ভিন গ্রহের বৈজ্ঞানিকের দল! এসেছে সিরিয়াস থেকে!

: তা তোমার দুঃখদুর্দশার কাহিনী ওদের বলেছ নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ বলেছি। বলেছি আমার সব আছে কিন্তু একটাও ছেলে নেই। সে আশ্বাস দিয়ে গেছে, বলেছে সাধ্যমত চেষ্টা করবে।

অরিন্দম বুঝতে পারে ইন্দুমতীকে আর ফেরানো যাবে না। তার ধ্যানজ্ঞান সেই ছেলের অভাব থেকে ভাবরাজ্যে ঘুরিয়ে মরছে। তাকে নিউরোটিক করে তুলেছে। স্লীপিং পিলের ডোজটা একটু বাড়িয়ে সন্ধ্যের পরেই ঘুম পাড়িয়ে দেয় সে ইন্দুমতীকে। কিন্তু পরের দিন আবার আর এক খবর শোনায় ইন্দুমতী।

—আজকে আবার এসেছিল আমার সেই ভিনগ্রহের বন্ধু। সঙ্গে এনেছিল সেই এক বৈজ্ঞানিক ডাক্তার।

: তারপর?

—তারপর ডাক্তার আমায় এক অদ্ভুত তীব্র হলুদ রশ্মি দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে দেখলেন এবং এক স্নিগ্ধ নীল আলো পেটের ওপর ফেলে চিকিৎসা চালালেন। তারপর যাবার আগে বলে গেলেন, সব ঠিক হয়ে যাবে আর ভাবনা নেই।

: তোমার চিন্তাশক্তি বেশ শাণিত হচ্ছে বুঝতে পারছি। দয়া করে আমার কথা শোনা আর ওসব বিষয়ে মন দিও না।

অরিন্দম কাতর অনুরোধ জানায়। কিন্তু এরপর থেকেই অরিন্দম আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করে যে ইন্দুমতী অনেকটা সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আবার সেই বিগত প্রথম যৌবনের উচ্ছাস ফিরে পেয়েছে। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা অরিন্দম কয়েক মাসের মধ্যেই জানতে পারে যে ইন্দু অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে।

যথাসময়ে তাদের এক সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। অরিন্দম সেই ছেলেকে আজ কোলে নিয়ে বসে আছে। মনে পড়ছে অনেক কথা। ইন্দুমতীকে বাঁচান যায় নি। বেশী বয়সে গর্ভবতী হওয়ার ফলে অনেক জটিলতা দেখা দেয়, ফলে ইন্দুমতী মারা যায়।

অরিন্দম আজ ইন্দুমতীর কথা ভাবছে আর ভাবছে তার ভিনগ্রহের বন্ধুদের কথা। মৃত্যুপাণ্ডুর ইন্দুর মুখে সে দেখেছে এক বিরাট প্রশান্তির ছাপ। ইন্দু বলেছিল, অরিন্দম, আমার আর কোন খেদ নেই। আমি সার্থক, সফল হয়েছি। আমার ভিনগ্রহের বন্ধুদের সাথে যদি আবার দেখা হয় বলো তাদের।

আজ আর অরিন্দম সেকথা অবিশ্বাস করতে পারে না! বরং ভাবে, যদি ভিনগ্রহের বন্ধুরা সেদিন থাকতো তবে নিশ্চয়ই ইন্দুকে মৃত্যুর কোলে ছেড়ে দিতে
হতো না।

প্রথম প্রকাশ : আশ্চর্য!, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৬৭
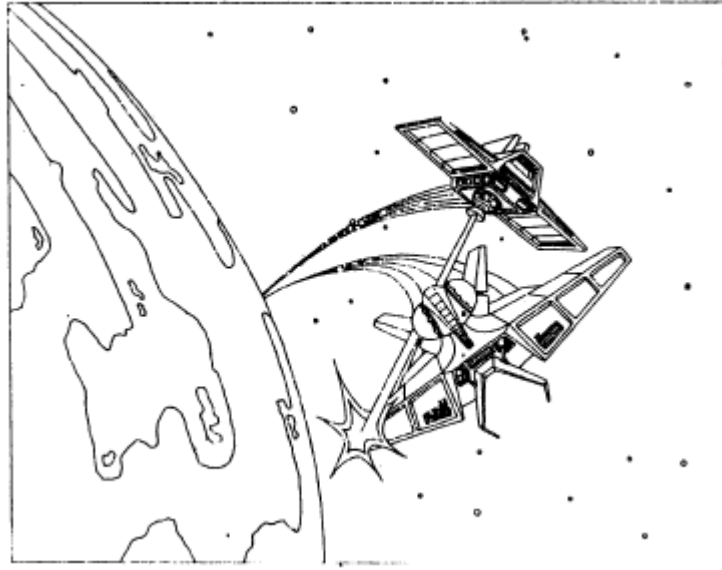
সূচিপত্রে ফিরে যান

হিপেসকাস—সে এক জন্তু

সমরজিৎ কর

মাফ করবেন। পৃথিবীর মনুষ্য-সভ্যতাতে একটি নিদারুণ দুঃসংবাদ যে একদিন আমাকেই জানাতে হবে স্বপ্নেও কোন দিন আমি ভাবতে পারিনি। দোহাই আপনাকে, আমি শুধু একটি নৈতিক দায়িত্বই পালন করতে চলেছি।

ডঃ ওয়াল্ট মেলভিল ব্যাপারটা আপাততঃ চেপে রাখারই উপদেশ দিয়েছিলেন। তার যুক্তি, পৃথিবী যখন বর্তমানে নানা রকম সমস্যা নিয়ে জর্জরিত, তখন এই মরণ কামড় নাই বা দিলাম? কিন্তু সেই সঙ্গে মিঃ ব্রাউনের করুণ চাহনিও উপেক্ষা করা যায় না। সমস্ত মানুষের জন্যে মাত্র একজন মানুষ যে এত বেশী ভাবতে পারে, মিঃ ব্রাউনকে না দেখলে সত্যিই তা উপলব্ধি করা যায় না।

মিঃ ব্রাউন এখন হাসপাতালে। পৃথিবীর কয়েকজন সেরা চিকিৎসক তাকে নিয়ে দিন রাত মাথা ঘামাচ্ছেন। হতাশা, দুর্ভাবনা এবং ভীতি তাকে যেমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, জানি না তাদের থেকে পরিত্রাণ তিনি পাবেন কিনা। আমরা যারা তার নিকটতম বন্ধু—তাদের শুধু এটুকুই সান্ত্বনা যে, তাঁরা তাঁদের অকৃত্রিম বন্ধুর সেবা করার কিছুটা সুযোগ পেলেন।

আসলে সত্যি কথা বলতে কি, মিঃ ব্রাউনের কথা আমরা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের অর্থাৎ আমি, ডঃ মেলভিল, ডঃ কার্পেন্টেরিয়া উপসাগরের ওয়েলেসলি দ্বীপপুঞ্জে। মিঃ গ্রিমেকভ্‌, জাতিতে চেক্‌। তবে মার্কিন নাগরিক। আমরা প্রত্যেকেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় একই মেডিকেল কোরে কাজ করছিলাম এবং ভেতরে ভেতরে জীববিজ্ঞানের ওপর কিছু গবেষণাও। আমাদের দলের হোতা ছিলেন প্রবীণ প্রাণীবিজ্ঞানী মিঃ ব্রাউন। সেনাবিভাগে নাম লেখালেও আসলে তিনি ছিলেন জাত-বিজ্ঞানী। কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা জানতেন এবং সেনাবিভাগের কাজে কোন ক্ষতি না করে তিনি যাতে গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে পারেন সে ব্যবস্থা করেছিলেন। আর এই গবেষণাকে কেন্দ্র করেই আমরা একত্রে মিলিত হই।

১৯৪৪-এর প্রথম দিকেই পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দারুণ অবনতি ঘটল। জাপানী আক্রমণে মিত্রপক্ষের তখন হিমশিম অবস্থা। এই সময়েই আমাদের কোম্পানিকে লিবিয়া থেকে সরাসরি পাঠান হয় সুম্বা দ্বীপে। ঠিক হয় পেছন দিকে থেকে আক্রমণ করে আমরা শত্রুকে পর্যুদস্ত করব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর করতে হল না। কেন হল না সেটা রাজনৈতিক ব্যাপার। এ কাহিনীর সঙ্গে তার কোন যোগসূত্র নেই।

দেখতে দেখতে প্রায় মাস চারেক কেটে গেল। সুম্বার প্রাকৃতিক পরিবেশে মিঃ ব্রাউন প্রাণীবিজ্ঞানের ওপর গবেষণার নানান খোরাক জোগাড় করলেন। সত্যি কথা বলতে কি যুদ্ধের থেকে এই সমস্ত কাজেই আমরা বেশী মনোযোগী হয়ে পড়লাম।

আর ঠিক এই সময়েই, সম্ভবতঃ সেটা মে মাস, বেজায় গরম। আর প্যাচপ্যাচানি বৃষ্টি। রবারের ক্ষেতের মধ্যে একটা দারুণ গুমোট ভাব। গিরগিটি জাতীয় একটা অদ্ভুত প্রাণী নিয়ে আমি এবং মিঃ ব্রাউন আলোচনা করছিলাম। রাতের অন্ধকারে সমস্ত ব্যারাকে শুধুমাত্র আমাদের তাঁবু থেকেই টিমটিম আলো জ্বলছিল।

ঠিক এমন সময় কতটা উন্মাদের মতো ছুটে এসে তাঁবুতে ঢুকলেন ডঃ মেলভিল। ভয়শঙ্কিত ভাবে তার এই প্রবেশে আমরা নিজেরাও কম ঘাবড়ে গেলাম না।

—কি ব্যাপার, ডঃ মেলভিল? প্রশ্ন করলাম আমি।

দেয়ার! দেয়ার ইট্ ওয়াজ! আর কোন কথা বলতে পারলেন না তিনি। অসহায়ের মতো চেয়ে রইলেন তাঁবুর দরজার দিকে। সমস্ত শরীর থর থর করে কাপছে। তাঁর কথা মতো আমরাও বাইরের পানে চাইলাম কিন্তু পিচে ঢাকা অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না।

ডঃ মেলভিলকে আমরা শান্ত করার চেষ্টা করলাম। উত্তেজনা কমানর জন্যে মিঃ ব্রাউন তাকে কিছুটা ব্র্যাণ্ডি দিলেন। এক চুমুকে তার সমস্তটা নিঃশেষ করে চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন তিনি। ডঃ স্টোন তাঁর পাল্স্ দেখে বুঝলেন তিনি উত্তেজনায় খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তাই সে রাত্রে কোন রকম ব্যস্ত না করে তাঁকে আমরা বিছানায় শুইয়ে দিলাম।

কিন্তু আসল ব্যাপারটাই বা কি? রাত নটা নাগাদ তো তিনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন কি এক ধরনের পাখী সংগ্রহ করতে। আজ সকালেই তিনি ব্যারাকের কিছু দূরে একটি গাছে সেই পাখী দেখে এসেছিলেন। সঙ্গে মরলি নামে একজন ছোকরাও গিয়েছিল। কথাটা ভাবতেই আমার মধ্যে যেন বিদ্যুতের চমক খেলে গেল। তাহলে মরলি? তাকে তো দেখছি না? ডঃ স্টোনকে এদিকটা লক্ষ্য করতে বলে আমি ও মিঃ ব্রাউন বেরিয়ে পড়লাম মরলির খোঁজে।

আশেপাশের দু'একজনকে জিজ্ঞেস করায় তারা কিছুই বলতে পারল না। ব্যারাকের গেটে প্রহরারত পুলিশ সার্জেন্ট ডিক বলল, কেন? ডঃ মেলভিল এবং
মরলি তো কিছুক্ষণ আগেই কোত্থেকে ছুটতে ছুটতে এলেন?

কিন্তু মরলিকে তো পাওয়া যাচ্ছে না! উদ্বেগের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন মিঃ ব্রাউন।

আমি আপনাদের কথা বুঝতে পারছি না, স্যার। আমাদেরই সামনে দিয়ে এই কয়েক মিনিট আগে ওঁরা দুজনেই পাগলের মতো কোত্থেকে ছুটতে ছুটতে এলেন। তখন একটু বেশী বৃষ্টি পড়ছিল। নিজেদের কোড নম্বর বলেই ফুরুৎ করে তাঁরা উড়ে গেলেন।

এবার বেশ খানিকটা গম্ভীর কণ্ঠেই বললাম, ব্যাপারটা ঠিক অত সহজ নয়, সার্জেন্ট ডিক। আমরা যেন কিছু একটা আশঙ্কা করছি।

মুহূর্তে ডিকের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল—কি বলছেন, স্যার? এনি আণ্ডারগ্রাউণ্ড অপারেশন স্যা—?

ঠিক তা নয়। কিন্তু তার আগে মরলিকে আমাদের চাই-ই।

ডিক সঙ্গে সঙ্গে কোয়ার্টার্স মাস্টারের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করল। আর তার পরমুহূর্তেই শুরু হল তল্লাসির কাজ। মরলির তাঁবুতে মরলিকে পাওয়া গেল না। সেই অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত ব্যারাক জুড়ে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে

পাওয়া গেল তাকে। ব্যারাকের শেষ প্রান্তে একটি ঝোপের ধারে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে। আমাদের তাঁবুতে তাকে বয়ে নিয়ে আসার পর ডঃ স্টোন পরীক্ষা করে জানালেন মরলি মৃত। তার চোখেমুখে ভেসে ছিল গভীর ভীতি এবং উত্তেজনার ভাব। ডঃ স্টোন মন্তব্য করলেন, ইট ইজ এ ক্লিয়ার কেস অব হার্ট ফেলইওর ডিউ টু সাডেন মেনটাল এ্যাগোনি।

যুদ্ধক্ষেত্রে এ ধরনের মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা ডঃ স্টোনের বহু ঘটেছে। অর্থাৎ শত্রুপক্ষের হঠাৎ রকমের আক্রমণ দেখে অনেক সৈনিকই রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে উন্মাদ হয়ে যায়। কখনও আত্মহত্যা করে। কিংবা আতঙ্কে হার্টফেল করে। কিন্তু মরলি কেন অত ভয় পেল, আমাদের কাছে সেটা যেন একটা সমস্যার মতো হয়ে দাঁড়াল।

ডঃ স্টোন বললেন, ডঃ মেলভিলেরও এমনটি হত। তবে তিনি শক্ত লোক। তাই সামলে নিয়েছেন।

ব্যাপারটা আমাদের কর্তৃপক্ষকেও রীতিমত ঘাবড়ে দিল। অথচ সেই রাত্রেই যত রকম ভাবে সম্ভব অনুসন্ধান চালিয়েও মূল রহস্যের কোন কিনারাই করা গেল না। মোট কথা ডঃ মেলভিল বা মরলির অমন অবস্থার জন্যে যে শত্রুপক্ষের কোন কারসাজিই দায়ী নয়, সে সম্পর্কে আমরা একরকম নিশ্চিন্তই রইলাম তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, মিঃ ব্রাউন কিন্তু এত সব কাণ্ডের পরও কোন সাড়া দিলেন না এবং তাঁর এই নিশ্চুপ ভাব কেমন যেন অস্বাভাবিক ভাবে ধরা দিল আমাদের কাছে। সার্জেন্ট ডিক বলল, একেবারে ভৌতিক ব্যাপার, স্যার। মনে হল অনৈসর্গিক কোন কিছুর আশঙ্কায় সেও বেশ ঘাবড়ে গেছে।

সেদিন রাত্রে কতকটা অস্বস্তি নিয়েই আমরা যে যার শয্যা গ্রহণ করলেও মিঃ ব্রাউন কিন্তু জেগেই রইলেন। নিজের ছোট্ট তাঁবুর মধ্যে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে গ্রিমেকভ্‌কে নিয়ে কি সব গবেষণার কাজে ব্যস্ত রইলেন। মাঝে মাঝে একবার করে তাঁর কাজকর্ম দেখে আসতে লাগলাম। টেবিলের ওপর একটি খাঁচার মধ্যে সেই টিকটিকির মতো জীব। তার পাশে নানা রকমের যন্ত্রপাতি। কতকগুলি গাছের পাতা এবং রাসায়নিক দ্রব্য। একবার লক্ষ্য করলাম রবারের গ্লব্‌স পরে জীবটিকে খাঁচার বাইরে বের করে আনলেন তিনি। তারপর কি একটা ইনজেক্‌সন করলেন তার দেহে। মনে হল ইনজেক্‌সনের স্যাম্পেলের মধ্যে কার্বন-১৪ আইসোটোপ মিশিয়ে দিলেন। সম্ভবতঃ এর সাহায্যে তিনি বুঝতে চান ইনজেক্‌সনের ওষুধটি ওর দেহের কোন্ কোন্ স্থানে যাচ্ছে এবং কেমন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে।

ওষুধটি ঐ প্রাণীর দেহে প্রবেশ করানর সঙ্গে সঙ্গে সে নিস্তেজ হয়ে গেল। তারপর জটিল যন্ত্রের সাহায্যে মিঃ ব্রাউন তার সারা দেহ নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। পরক্ষণেই একটি তীব্ররশ্মি ফেললেন তিনি ওর গায়ে। লক্ষ্য করলাম যে সামান্য জায়গাটায় আলো গিয়ে পড়ল মুহূর্তে সে জায়গাটা গাছের পাতার মতো সবুজ হয়ে গেল। এবং আলো নেভার কিছুক্ষণ পরেই তার দেহের কোন কোন স্থান থেকে ফিকে হলুদ রঙের আভা বের হতে লাগল।

কোন সাড়া নেই, শব্দ নেই। নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন মিঃ ব্রাউন। গ্রিমেকভ্‌ যা দেখছে নোট করে যাচ্ছে।

ব্রাউন সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকেরই একটা উচ্চতর ধারণা ছিল। লোকটা আমাদের সকলের মধ্যে থেকেও যেন সম্পূর্ণ পৃথক প্রকৃতির। অত্যন্ত স্বল্পভাষী এবং যেটুকু কথা বলতেন তার বেশীর ভাগই বলতেন সহকারী গ্রিমেকভের সঙ্গে। আর বিশেষ করে সুম্বায় এসে তাঁর এই চরিত্র যেন প্রকটভাবে দেখা দিল। মাঝে মাঝে ডাক্তার স্টোনকে জীব দেহের ওপর বিভিন্ন ওষুধের বিক্রিয়ার কথা জিজ্ঞেস করতেন। কখনও বা মেলভিলের সঙ্গে পরিবেশের বিভিন্ন জীবদেহের প্রভাবের কথা আলোচনা করতেন। কিন্তু এ সমস্তের মধ্যে দিয়ে তাঁর আসল স্বরূপ বোঝা কোন দিনই আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এবং ক্রমে ক্রমে এই বিশ্বাসই আমাদের জন্মেছিল, ব্রাউনের সমস্ত রহস্যের যদি কেউ কিছু জেনে থাকে তাহলে সে একমাত্র গ্রিমেকভ্।

পরদিন ডঃ মেলভিল কিছুটা সুস্থ্ হয়ে উঠলে গত রাত্রের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু জানা গেল। সংক্ষেপে তিনি যা বললেন তা হলঃ গত রাত্রে লেফটেনেন্ট করনেল হ্যারিসের তাঁবুতে কতকগুলি জরুরী সরকারী কাজ সেরে যখন নিজের তাঁবুতে ফিরছিলেন, ঠিক সেই সময় মরলি এসে জানাল ব্যারাকের কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে সে নাকি অদ্ভুত এক ধরনের জানোয়ারকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে। শুধু সে দিনই নয়, কয়েক দিন ধরেই সে দেখে আসছে। বিশেষ করে ঠিক রাত ন'টার পর তার ঘরের জানলা থেকে সে পরিষ্কার দেখতে পায়। তার ঘরটি ঠিক তারের বেড়ার পাশে থাকায় বোধহয় স্পষ্ট করেই দেখা সম্ভব হয়েছে। ব্যারাকের এদিকটায় নিবিড় বন। ঠিক তারই মধ্যে কালো রং-এর একটি প্রাণী গভীর রাত পর্যন্ত চলাফেরা করে। অন্ধকারে তার আসল রূপ দেখা সম্ভব হয়নি। তবে মাঝে মাঝে তার শরীর থেকে ফিকে হলুদ রঙের আলো বের হয়। স্থানীয় অসভ্য লোকদের ধারণা—প্রাণীটি তাদের বনদেবতা। কাউকে সে কিছুই বলে না। পাছে কেউ তাকে ক্ষেপায়, তাই কথাটি আর কাউকের বলেনি মরলি! গত রাত্রেও তাকে নাকি দেখা যায়। মরলির কথায় ডঃ মেলভিল লোভ সামলাতে পারলেন না। সার্জেন্ট ডিককে বলে মরলির সঙ্গে তিনি জঙ্গলে প্রবেশ করেন। কিন্তু প্রায় শ'খানেক গজ সবেমাত্র এগিয়েছেন—ঠিক এমন সময়—মাত্র হাত দশেকের মধ্যে দেখা গেল দপ্ করে একটা মৃদু হলদে আলো জ্বলে উঠল। আর ঠিক তার পরেই মনে হল—আসলে সেটা মানুষ না গিরগিটি—ডঃ মেলভিল কিছুই বুঝতে পারলেন না। দেহের তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র মাথা। দু পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেও লম্বায় তাকে ফুট তিনেকের বেশী বলা চলে না। আর সব চাইতে বিস্ময়ের ব্যাপার, ওঁদের দেখেই সে থমকে দাঁড়াল এবং দেহ থেকে অতি দ্রুত কম্পনশীল এক ধরনের শব্দ শোনা যেতে লাগল। সে শব্দের অনুভূতি এতই প্রবল যে মুহূর্তের মধ্যে মনে হল—বুঝি-বা বিশ্বের সমস্ত আতঙ্ক যেন পুঞ্জীভূত হয়ে গ্রাস করে ফেলবে তাঁদের। তাঁরা দ্রুত ব্যারাকের দিকে দৌড়তে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত কি হয়েছে সে কথা আর স্মরণ করতে পারলেন না ডঃ মেলভিল।

মিঃ ব্রাউন বললেন, শব্দটা জন্তুটির দেহ থেকে নির্গত হয়েছিল এ সম্পর্কে কি আপনার কোন দ্বিমত নেই, ডঃ মেলভিল?

আমার অত বেশী স্মৃতিভ্রংশ এখনও হয়নি, মিঃ ব্রাউন। কতকটা রাগত ভাবেই জবাব দিলেন ডঃ মেলভিল।

প্রথমে আলো, তারপর শব্দ শুনেছিলেন, তাই না?

ব্যাপারটা ঠিক তাই হয়েছিল। তবে শব্দ বললে ভুল হবে। আসলে বিকট আওয়াজ বলতে যা বোঝায় তা হয়নি। একটা মৃদু গুঞ্জন, তবে সাধারণ শব্দের থেকে তার তরঙ্গ মাত্রা অত্যন্ত বেশী ছিল।

ডঃ মেলভিলের উত্তর শুনে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন মিঃ ব্রাউন। তারপর—সত্যিকথা বলতে কি মিঃ ব্রাউনের অমন করুণ চাহনি জীবনে আর কখনও দেখিনি। মনে হল একটা বিরাট দুঃস্বপ্ন দেখছেন তিনি। আস্তে আস্তে উঠে গেলেন গত রাত্রে যে গিরগিটি জাতীয় জীবটি নিয়ে তিনি পরীক্ষা চালিয়েছেন, তার কাছে। অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে বললেন, দাঁড়ান।

আমরা টেবিলের চারপাশে রুদ্ধশ্বাসে গিয়ে দাঁড়ালাম।

মিঃ ব্রাউন তাঁবুর দরজা জানালা বন্ধ করে দিলেন। অন্ধকারে তাঁবুর মধ্যে কোন কিছুই দেখা গেল না। ছোট্ট টেবিল ল্যাম্পটি জ্বাললেন। একবার আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, লক্ষ্য করুন। তারপর গতরাত্রের মত টর্চ থেকে অতি সূক্ষ্ম একফালি আলো ফেললেন গিরগিটিটির ঠিক পিঠের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে অবাক হয়ে আমরা দেখলাম, যেখানটায় আলো গিয়ে পড়েছে সে স্থানটা হঠাৎ সবুজ হয়ে গেল। আর তার কিছুক্ষণ পরই সে জায়গাটা থেকে বের হতে লাগল ফিকে হলুদ রঙের একটি আলো। কিন্তু তার চাইতে বড় কথা অত্যন্ত ক্ষীণ একটা শব্দ যেন কানে ভেসে এল আমাদের।

মুহূর্তে লাফিয়ে উঠলেন ডঃ মেলভিল। —এই তো সেই শব্দ! সেই প্রাণঘাতী শব্দ যা মরলি সহ্য করতে পারেনি। যা আমাকেও প্রায় সাবাড় করে এনেছিল আর কি!

আলো নেভালেন মিঃ ব্রাউন। আর সেদিন রাত্রেই আমাদের সামান্য কয়েকজনকে যে তথ্য জানালেন তা শুনে প্রত্যেকেই আমরা ভয়ে, বিস্ময়ে এবং প্রচণ্ড হতাশায় ভেঙে পড়ার সামিল হয়ে পড়লাম।

—এ ও কি সম্ভব! এই যে পৃথিবী, তার আলো, তার সভ্যতা—মানুষের এত অহঙ্কার—ভাবা যায় না। সত্যিই ভাবা যায় না। ঐ ক্ষুদ্র গিরগিটি না বলে কি যে বলব—তার জন্যে শেষ পর্যন্ত—!

কিন্তু সমস্ত কিছু জেনেও যুদ্ধকালীন নিদারুণ পরিস্থিতির কথা ভেবে তখনকার মতো কোন উচ্চবাচ্যই আমরা করতে পারলাম না। সুখের বিষয়, যুদ্ধের শেষ অবধি আমাদের কোম্পানি ওখানেই থেকে গেল। আর দীর্ঘ প্রায় এক বৎসর ধরে আমরা আমাদের নতুন জানা তথ্য সম্পর্কে নির্ভুল হবার জন্যে বার বার পরীক্ষা চালিয়ে দেখতে লাগলাম।

১৯৪৫-এর মাঝামাঝি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষ জয় লাভ করলে আমরা আর্মি থেকে মাস তিনেকের ছুটি নিলাম। ইতিমধ্যে ডঃ মেলভিলও যেন অনেকটা নীরব হয়ে গেছেন। গবেষণার মধ্যে তাঁর তেমন কোন আর উৎসাহ নেই। অনবরতই যেন ভেবে চলেছেন কি যেন। আমি, ডঃ মেলভিল, মিঃ ব্রাউন এবং মিঃ গ্রিমেকভ্ মিলে দল তৈরি করলাম। ডঃ মেলভিল হলেন দলপতি। আসলে তখন আরও তথ্য সংগ্রহ করবার জন্যে আমরা রীতিমত ক্ষেপে উঠেছি। ইতিমধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে অনেকগুলি যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন সামগ্রী আনিয়ে নেওয়া হল। সেপ্টেম্বর নাগাদ সুম্বারই প্রায় মাইল পঞ্চাশেক দূরে সাভুল দ্বীপপুঞ্জ থেকে একটা আতঙ্কের সংবাদ আমাদের কাছে এসে পৌঁছল। অর্থাৎ সেখানেও

নাকি ঐ ধরনের নতুন জীব দেখা গেছে। রাত্রের দিকে কখনও কখনও তারা লোকালয়ের কাছে আসে এবং তাদের দেখামাত্র কেউ উন্মাদ হয়ে আত্মহত্যা করছে, কেউবা হার্টফেল করে মারা যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষরা চেষ্টা করেও তাদের ঠিক হদিশ পাচ্ছে না। কারণটা আমাদের কাছে অত্যন্ত সহজ বলেই মনে হল। অতএব এ সুযোগটি আমরা আর ছাড়তে চাইলাম না।

এরপর যে ঘটনাগুলি অতি দ্রুত ঘটে গেল, আমি জানি আমার পাঠকবর্গের কাছে তা অত্যন্ত অবিশ্বাস্য বা অলীক বলেই মনে হবে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, যে নিদারুণ অভিজ্ঞতা নিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের কাটাতে হয়েছে, তার তুলনা নেই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, মানুষের জীবনে সে অভিজ্ঞতা দ্বিতীয়বার যেন আর না আসে।

পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা সাভুল দ্বীপপুঞ্জ। তারপর পাশে সাগর আর সাগর। স্থানীয় অধিবাসীরা খুবই অজ্ঞ। সরকারী সহায়তায় আমরা আমাদের কাজ শুরু করলাম। ইতিমধ্যে মিঃ ব্রাউনের পরিকল্পনা মতো কতকগুলি মুখোশ তৈরি করা হয়েছিল। মুখোশে বিশেষ এক ধরনের লেন্স লাগান ছিল। আর ছিল অতি সূক্ষ্ম-তরঙ্গ প্রতিহতকারী যন্ত্র, দুই কানে চেপে থাকে সেই মতো তৈরি করা।

আমাদের সঙ্গে ছিল উভচর যান। গত মহাযুদ্ধে এই যানগুলি জলে এবং স্থলে সমানে ঘুরে বেড়িয়েছে। যুদ্ধের শেষে এদের বয়ে নেবার মতো ধৈর্য এবং খুব বেশী একটা প্রয়োজনও সরকার বোধ করলেন না। কাজের সুবিধে হবে বলে আমরা চারটে উভচর যান সঙ্গে নিলাম। সেই সঙ্গে প্রচুর পেট্রোল। আর এদের সাহায্যে সাভুল দ্বীপপুঞ্জ তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। সদা ত্রস্ত। বিশেষ করে মাথার মুখোশের ওপর সকলের নজর বেশী। কারণ মিঃ ব্রাউন বললেন, যে শব্দ ঐ জীবগুলির দেহ থেকে বেরিয়ে আসে তা অতি কম্পনজাত শব্দ অবশ্য সত্যিকারের শব্দ ভুল হবে, আসলে শব্দের অনুভূতি। ওদের গায়ের ঐ হলুদ আলোর তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অত্যন্ত কম। ঐ আলোই কানের পর্দায় শব্দের অনুভূতি জাগায়। এমন কি মাথার খুলি ভেদ করে মস্তিষ্কের ওপর দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

সুম্বাতে গিরগিটির মতো ঐ প্রাণীর ওপর পরীক্ষা চালিয়েই এই সমস্ত তথ্যে
তিনি পৌঁছেছিলেন। আসলে ডঃ মেলভিল যা দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিলেন ঐ প্রাণীটি তারই শাবক। শেষ পর্যন্ত এটিকে অবশ্য বাঁচিয়ে রাখা যায়নি।

তাই বেশ সতর্কতার সঙ্গেই আমরা চলতে লাগলাম।

প্রথম তিন চারদিন কোন কিছুই চোখে পড়ল না। ডঃ মেলভিল একটু দমে গেলেন। তা ছাড়া তাঁর বয়স হয়েছে। এত ঝক্কি এবং ছোটাছুটি করে উঠতে পারছিলেন না। মিঃ ব্রাউন তাই তাঁকে ঘোরাঘুরি কম করতে বললেন। কিন্তু নিজে দিনরাত এদিক সেদিক ছোটাছুটি করতে লাগলেন।

পাঁচ দিনের দিন খবর এল কার্পেন্টেরিয়া উপসাগরের ওয়েলেসলির কোন এক স্থানে চারজন আদিবাসী পাগল হয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পাগলের মতো আমরাও ছুটলাম টিমোর সাগর, ওয়েলেস দ্বীপপুঞ্জ এবং ভয়ঙ্কর আরহেম অন্তরীপ হয়ে ওয়েলেসলিতে। এখানে এসে পথ কষ্টে হঠাৎ মিঃ মেলভিল দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

ডঃ স্টোন তাই ব্যস্ত রইলেন তাঁকে নিয়ে। মিঃ ব্রাউন, গ্রিমেকভ্ এবং আমি অনুসন্ধানের কাজ চালাতে লাগলাম। আর সত্যি সত্যিই একদিন সাক্ষাৎ মিলল আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষিত প্রাণীর।

সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা। গভীর পার্বত্য জঙ্গলে আমরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। পরিষ্কার—একেবারে পরিষ্কার দেখা গেল একটি ঝর্ণার ধারে জল খাচ্ছিল। রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে আমি এবং গ্রিমেকভ যখন বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে গেছি, ঠিক তখনি মিঃ ব্রাউন কখন তাকে লক্ষ্য করে ছুটে গেলেন টেরই পাইনি। কিন্তু তখনও জানতাম না মিঃ ব্রাউনকে আমাদের হারাতে হবে।

মিঃ ব্রাউনকে একা ওভাবে ছেড়ে দেওয়ার মতো নির্বুদ্ধিতার কথা ভেবে ভয়ে উৎকণ্ঠায় আমরা প্রায় পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে লাগলাম। কিন্তু বৃথা! সমস্তই বৃথা হয়ে গেল! কয়েকদিন সমানে খোঁজাখুঁজি করার পর না পেলাম মিঃ ব্রাউনের দেখা, না পেলাম তার উভচর যানের কোন হদিশ।

অবশেষে দিন পনের সেখানে অতিবাহিত করার পর আমরা যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গেলাম। মনের দুঃখ মনেই রইল। হতভাগ্য মিঃ ব্রাউনের অবশ্যম্ভাবী স্বরূপটির কথা চিন্তা করে হাল না ছেড়ে দিনের পর দিন আমরা নতুন পরিকল্পনা রচনার কথা নিয়ে ভাবতে লাগলাম। ডঃ মেলভিলের পরিচালনায় নতুন ভাবে উদ্যোগ পর্ব চলতে লাগল। তবে পৃথিবীর মানুষ যাতে আমাদের কার্যাবলীর কথা চিন্তা করে ভেঙে না পড়ে তাই সমস্ত কিছুই চলতে লাগল গোপনে।

এরপর দীর্ঘ পনের বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। নানা রকম বিপর্যয়ের মধ্যে আমাদের নতুন অভিযান ক্রমেই শ্লথ হয়ে আসছিল। এমন সময় একদিন রাত্রে—সম্ভবতঃ সেটা ৮ই মার্চ হবে—হঠাৎ টেলিফোন কল বেজে উঠল।

ইয়েস, মিঃ কর স্পিকিং। কথা বললাম আমি।

ওপার থেকে ভেসে এল ডঃ মেলভিলের উত্তেজিত কণ্ঠস্বরঃ মিঃ কর? মিঃ ব্রাউন বেঁচে আছেন। হি ইজ ইন অস্ট্রেলিয়া। আই মিন ইন মাউন্ট ককবারন!

তার মানে? এবার আমিও কম উত্তেজিত হলাম না।

হি ইজ আফটার হিপেসকাস।

এ আপনি কি বলছেন, ডঃ মেলভিল। এ-খবর আপনি পেলেন কি করে?

ইতিমধ্যে আমরা ঐ জন্তুটির নাম রেখেছি হিপেসকাস বা হাইপার সাউণ্ড কারেন্ট সিনক্রোনাইজার অর্থাৎ অতিরিক্ত শব্দ এবং বিদ্যুৎশক্তি মিলনক্ষম জন্তু। নামকরণের কারণটি শেষটুকু পড়লেই বুঝতে পারবেন।

ব্রডওয়ে টেলিভিসন কোম্পানির টেলিভিসন চিত্রে। ব্যাপারটা সারা নিউইয়র্কে রীতিমত উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। লস এঞ্জেলসে বসে হয়ত তুমি পরিস্থিতিটা ঠিক বুঝতে পারছ না। একেবারে আমার নিজের চোখে দেখা। আজ সাতটার প্রোগ্রামে ওরা অস্ট্রেলিয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখাচ্ছিল। কয়েকদিন ধরেই নাকি দেখছে। শুধু এটি দেখার জন্যে এর মধ্যে কয়েক লক্ষ টেলিভিসন সেট পর্যন্ত বিক্রী হয়ে গেছে। আজ সন্ধ্যে সাতটার প্রোগ্রাম আমিও দেখলাম। একটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে হিপেসকাস। তার সারা দেহ

থেকে যে আলো বেরুচ্ছে রঙিন চিত্রে পরিষ্কার তা বোঝা যায়। আর তার পেছনে পাগলের মতো ছুটে চলেছেন মিঃ ব্রাউন। হ্যাঁ হ্যাঁ! পরিষ্কার চিনতে পেরেছি তাঁকে। যদিও মুখে দাড়ি কিন্তু তাঁর ঐ খুঁড়িয়ে চলাটা আমার কাছে অত্যন্ত পরিচিত।

আর যেন শুনতে পারছি না আমি। উত্তেজনায় আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। অস্ফুট স্বরে শুধু বললাম, প্লিজ ডঃ মেলাভিল, কালকের সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আমি এখন ঠিক কিছু বুঝতে পারছি না।

সেদিন রাত্রেই প্লেনে চলে এলাম নিউইয়র্ক এবং সেই রাত্রেই ব্রডওয়ে টেলিভিসন কোম্পানির সঙ্গে দেখা করে সরকারী সহায়তায় টেলিভিসন চিত্রটি দেখে ফেললাম। কোম্পানীর ম্যানেজারকে বললাম, আমাদের জীবন মরণ সমস্যা, মশায়। এ ছবি দেখান বন্ধ করুন। ভদ্রলোক তো শুনতেই চান না। শেষে আসল কথাটা জানাতে হল। কি ভাবে এই ছবিটি সংগ্রহ করেছে জিজ্ঞেস করায় জানালেন, দিন পনের পূর্বে অস্ট্রেলিয়ার মাউন্ট ককবারন-এ যখন এই কোম্পানি এলোপাথারি ছবি তুলেছিল, তখন গভীর জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ এই ছবিটি ধরা পড়ে। মাত্র মিনিটখানেক তারা ঐ জন্তুটিকে দেখতে পায়। সঙ্গে মিঃ ব্রাউনকে ওরা ঠিক বুঝতে পারে নি। পরে বহু খোঁজাখুঁজি করেও ওদের সাক্ষাৎ পায় নি। নিউইয়র্কে ফিরে আসার পর জনৈক নৃতত্ত্ববিদ নাকি বলেছেন তারা নাকি পৃথিবীর এক নতুন অতি প্রাচীন প্রাণীর ছবি তুলে ফেলেছে যার হদিশ প্রাণীবিজ্ঞানীরা রাখেন না।

মাথা আর মুণ্ডু! বেশ রাগতভাবেই মন্তব্য করলাম আমি। তবে মনে মনে একটু আশার আলোও দেখলাম। এই প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম হিপেসকাসকে। বেঁটে। মাথাটা অস্বাভাবিক ছোট। গায়ের কোন জায়গা সবুজ। কোন জায়গা লাল। দেহে লোম নেই বললেই চলে। কতকটা মানুষ, কতকটা গিরগিটির মতো দেখতে। পায়ের তুলনায় হাত অত্যন্ত ছোট। চোখগুলিও ছোট।

অবশেষে ছবি দেখান বন্ধ রইল। সরকারী সাহায্যে আমরা সেদিনই অস্ট্রেলিয়া যাত্রা করলাম। রীতিমত অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই যেতে হল। সঙ্গে সাহায্য করার জন্যে আরও জন পনের লোক চলল।

শেষ পর্যন্ত পৌঁছলামও মাউন্ট ককবারনে এবং কি নিদারুণ চেষ্টার পর কোন রকমে মিঃ ব্রাউনকে উদ্ধার করলাম, সে কথা অনিবার্য কারণবশতঃ আপাততঃ প্রকাশ করতে পারলাম না বলে দুঃখিত। শুধু এটুকু বলে রাখছি, যখন তাঁকে আমাদের নাগালের মধ্যে পেলাম তখন তিনি পাগল-উন্মাদ। পুরো পাঁচ দিন মাউন্ট ককবারনের বিজন অঞ্চলে নিজেদের রীতিমত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে আমরা আমাদের অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে গেছি। পাগলের মতো আমরাও হিপেসকাসের পেছনে ধাওয়া করে গেছি। অত্যন্ত চতুর সে প্রাণী। মানুষের বুদ্ধি তার কাছে কোথায় লাগে। শুধু তাই নয়—আমাদের মনে হয়েছে ওরা টেলিপ্যাথির সাহায্যে নিজেদের মনের ভাব সহজেই আদান প্রদান করতে পারে। কোন রকম শব্দ না করে কোন এক অজ্ঞাত উপায়ে ওরা পরস্পর যে যোগাযোগ রাখতে পারে তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। অদ্ভুত ওদের কৌশল। বহু চেষ্টা করেও ওদের আমরা নাগালের মধ্যে পাইনি। মিঃ ব্রাউনকে আমরা পেলাম তাঁর পুরানো এবং ভাঙা উভচর

যানের কাছে। স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিল তাঁর। পাগলের মতো এই কয় বৎসর ঘুরে বেড়িয়েছেন ওদের পেছনে। লোকালয়ের একেবারে বাইরে।

মিঃ ব্রাউন বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। যদি কোনদিন সেরে ওঠেন হয়ত সেদিনই জানতে পারব কি করে সেখানে তিনি গেলেন। কি অভিজ্ঞতাই বা পেয়েছেন।

কিন্তু কি এই হিপেসকাস? সে কেমনধারা জন্তু? এ প্রশ্ন সকলের মনেই জাগা স্বাভাবিক। ইচ্ছে ছিল আপাততঃ একেবারে চেপে যাব কিন্তু টেলিভিসন কোম্পানির কথা প্রকাশ হওয়ার পর অন্ততঃ কিছু না বলে পারা যায় না। এই প্রসঙ্গে গত ৮ই জুন 'দি ইন্টারন্যাশনাল বাইও-ফিউচার প্রোগ্রাম কাউনসিলের' সভায় ডঃ মেলভিল যে বক্তৃতা করেন আপনাদের অবগতির জন্যে এখানে তার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ উদ্ধৃত করলাম। আশা করি আমার পাঠক পাঠিকারা এর মধ্যেই হিপেসকাস নামকরণ এবং তার সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে পারবেন :

'সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, পৃথিবীতে নতুন এক ধরনের প্রাণীর আগমন ঘটেছে যার আমরা নামকরণ করেছি 'হিপেসকাস'। টেলিভিশনে এর চেহারা অনেকেই আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন। এ প্রাণী উদ্ভিদের মতোই শুধু বাতাস থেকে গ্যাসীয় পদার্থ গ্রহণ করে বেঁচে থাকতে পারে। সূর্যের আলো বা যে কোন সাধারণ আলোক রশ্মি এদের গায়ের ওপর পড়লেই যেখানে আলো পড়ে সেখানটা গাছের পাতার মতো সবুজ হয়ে যায়। আর পাতার সবুজ কণিকার সাহায্যে উদ্ভিদ দেহে যেমন কার্বোহাইড্রেট তৈরি হয় এদের দেহেও তেমন হতে থাকে। এদের দেহকোষে মুহূর্তের মধ্যে আলোর অনুপস্থিতিতে আবার তা রূপান্তরিত হয়ে আর এক ধরনের কোষে পরিণত হয়—কতকটা পাসটিডেরই মতো যা বাতাসের নাইট্রোজেন এবং জলের সাহায্যে সরাসরি এ্যামাইন অথবা চর্বি জাতীয় খাদ্য তৈরি করতে সক্ষম হয়। অতএব সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের ওপর এদের মোটেই নির্ভর করতে হবে না। আর সবচাইতে অদ্ভুত ব্যাপার, নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য এরা গ্রহণ করে না। আত্মরক্ষার জন্যে এরা দেহ থেকে এক ধরনের আলোকরশ্মি নির্গত করে যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সাধারণ আলোর তরঙ্গ থেকে অনেক কম। আর সেই কারণেই অতি সহজে এই আলো মানুষের খুলিকেও ভেদ করতে পারে এবং মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটাতে পারে। মিঃ ব্রাউন সুম্বা দ্বীপে থাকাকালীন এই ধরনের একটি প্রাণীর বাচ্চা নিয়ে পরীক্ষা করেন, সে সংবাদ খুব ভাসা ভাসা ভাবে আমাদের পরিচিত দু-তিনজন জেনেছিলেন। তবে তখন তার ওপর খুব একটা গুরুত্ব তাঁরা দেননি। মিঃ ব্রাউন বলেছিলেন, এরা উদ্ভিদের মতো খাদ্য গ্রহণ করতে পারে আবার প্রাণীর মতো এক স্থান থেকে আরও এক স্থানে ইচ্ছে মতো ঘুরেও বেড়াতে পারে। তাই ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে যখন সাধারণ প্রাণী বিশেষ করে মানুষের বেঁচে থাকার মতো খাদ্যদ্রব্যের অভাব দেখা দেবে তখন এরা অবাধে বেঁচে থাকতে পারবে। অবশেষে মিঃ ব্রাউন একটি তথ্যপূর্ণ সিদ্ধান্তও করেছেন ও রসায়ন শাস্ত্রে যেমন প্রথম মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেন, আধুনিক পদার্থবিদদের মতে এই হাইড্রোজেনেরই রূপান্তর এবং বিন্যাসক্রমে ক্রমে জটিল পদার্থগুলির সৃষ্টি করেছিল, জীবজগতেও ঠিক তেমনই সাধারণ এককোষী প্রাণী বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মানুষের মতো জটিলতম জীবে পরিণতি পেয়েছে। অবশেষে মানুষ একদিন এ

পৃথিবী থেকে বিলীন হবে—যে ভাবে তার তার বংশ বৃদ্ধি হচ্ছে খাদ্যাভাবেই সে মারা যাবে। পৃথিবীর ভূ-প্রকৃতিও ক্রমে তার প্রতিকূলে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু হিপেসকাসের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার ক্ষমতা অনেক বেশী। তাই আজ সব চাইতে একটি বড় প্রশ্ন আমাদের মনে রীতিমত ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ কি তা হলে বির্বতনের শেষ সীমায় উপস্থিত? বিবর্তনের তালিকার পরবর্তী প্রাণী কি তাহলে হবে হিপেসকাস? মানুষের মৃত্যু হবে ক্ষুধার তাড়নায়—একথা ভাবলে একমাত্র এ ছাড়া কোন উত্তরই আমরা আজ খুঁজে পাচ্ছি না।

প্রথম প্রকাশ : আশ্চর্য!, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৬৫
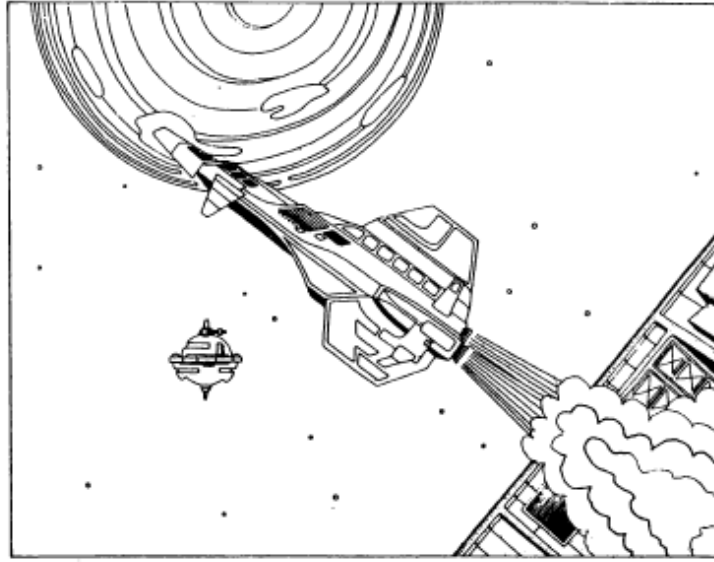
সূচিপত্রে ফিরে যান

প্রফেসর ত্রিশঙ্কু

শিশির কুমার মজুমদার

এই গল্প প্রঃ শঙ্কুর নয়, প্রঃ ত্রিশঙ্কুর গল্প।

ও সোজা কথায় বলতে হলে বলতে হবে, প্রঃ শঙ্কু টু দি পাওয়ার তিন ইকোয়লটু প্রঃ ত্রিশঙ্কু। তবেই বুঝে নিন তিনি, কে, কেমন, কত শক্তিধর।

একটা বিজ্ঞান মেলায় ভীড়ের মাঝে ঘুরে সব কিছু দেখছিলাম, মনে মনে ভাবছিলাম, ইউরোপ, আমেরিকায়, রাশিয়ায়, ওরা বিজ্ঞানকে কোথায় এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে, আমাদের দেশ... হঠাৎ খপ করে কে যেন আমার হাতটা চেপে ধরল। বলল, পেয়েছি।

চমকে তাকিয়ে দেখি সেই বিখ্যাত প্রঃ ত্রিশঙ্কু আমার সামনে দাঁড়িয়ে। এক গাল হেসে তিনি বললেন, আপনাকেই খুঁজছিলাম। আরে মশাই সেবারে সেই মুলতানি গাইটা... যাকগে সে কথা। এবারে যা আবিষ্কার করেছি তা জগৎ কাঁপাবে। চলুন, দেখবেন চলুন। আজই এখুনি। এখানে আর কি দেখছেন, আমার ওখানে গেলে চমকে যাবেন।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, এবারের যন্ত্রটা কি নিয়ে? তা না শুনে ভালভাবে না বুঝে আর যাচ্ছি না। একথা বললাম বটে, তবে মনে মনে ভাবছিলাম, গেলে যদি সেই আগের বারের মত একটা গল্প লেখা যায় তো মন্দ কি? কিছু টাকা তো পকেটে আসবে। ও হো, সে গল্পটা বুঝি, আপনারা জানেন না? ও তাহলে পরে শোনানো যাবে। কি বলেন? এখন যা বলছি তাই শুনুন।

প্রঃ ত্রিশঙ্কু বললেন, পাগল হয়েছেন আপনি? এখানে এই ভীড়ের মধ্যে আমার সব কথা বলি আর কি, অমনি ভিনদেশী স্পাইরা তা শুনে নিয়ে ওদের দেশে গিয়ে পেটেন্ট নিয়ে নিক, আর আমি এখানে বসে বসে বুড়ো আঙুল চুষি। চলুন, চলুন, বাইরে চলুন! ট্যাক্সিতে বসেই সব কথা হবে। ভয় নেই ট্যাক্সি ভাড়া আমার। সেবারের মতো পত্রিকায় গল্প লিখে আপনার হবে নিট লাভ।

বুঝলাম, আগের গল্পটা ওঁর চোখ পড়েছে। তাতেও যখন ওঁর কোনও ভাবান্তর নেই, তখন দ্বিতীয় গল্পটাই বা ছাড়ি কেন?

বললাম, চলুন, কোথায় যেতে হবে। তা এবারের যন্ত্রটা কি নিয়ে?

উনি আমাকে প্রায় টানতে টানতেই মেলার বাইরে আনলেন। সামনের ট্যাক্সির দরজা খুলে ঠেলে আমাকে তুলে দিয়ে নিজেও উঠে পড়লেন। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, সব কিছুরই অনেক রকম রূপ আছে। জল, তিন রকম। লোহা তিন রকম, না, না, দুরকম। মানুষের, হাজার রকম, ভাল মন্দ, বদমাশ, পাজী থেকে শুরু করে পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাবার সময় পর্যন্ত যে কত রকম রূপ, তার হিসাব কে রাখে? তাই যদি হবে তো শব্দেরই বা নানান রকম রূপ হবে না কেন বলুন? শব্দ কি জিনিস নয়?

আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললাম, এ বটে, শক্ত শব্দ, পাতলা শব্দ, ধোঁয়াটে শব্দ, তেকোণা শব্দ, এসবই বা হবে না কেন? কিন্তু তা দিয়ে কি হবে আমাদের?

ধমকে উনি বললেন, বোকার মতো কথা বলবেন না। এতটা বুঝলেন, আর বাকীটা বুঝতে পারলেন না? শক্ত শব্দ ছুঁড়ে মারা যায়। তাতে শত্রুপক্ষ ঘায়েল হবে, প্রাণে মরবে না। মারতে হলে পাতলা শব্দে চুবিয়ে মারতে হবে। আর দম বন্ধ করতে চান তো ধোঁয়াটে শব্দ ছাড়ুন। আর একটা হিরোসিমা নাগাসাকি ঘটিয়ে দেওয়া যাবে ওই শব্দ ধোঁয়া ছেড়ে। খরচ? কুল্লে হয়তো চার পাঁচ পয়সা, যার পঁয়ষট্টি ভাগই মেকী। তাও আবার এক কালে মাঝে ফুটো ছিল। তা হলেই বুঝুন আমার আবিষ্কারের গুরুত্বটা।

আমি তো হাঁ হয়ে গেছিলাম! কথা বলব কি? শক্ত শব্দ মাঝে মাঝে অফিসের বসের কাছে শুনি, যখন তিনি কাজে ভুল করে সে ভুলের দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপান। কিন্তু তা বলে পাতলা শব্দ, ধোঁয়াটে শব্দ!! সে আবার কি?

কি জানি বাবা, এবারে প্রঃ ত্রিশঙ্কু কি কাণ্ডই না করে বসেন। যন্ত্রের হাতল ধরে টান দিলে, শেষে আমরাই না আবার পাতলা শব্দের মাঝে হাবুডুবু খেয়ে ডুবে মরি। ছলাৎ ছল, কলাৎ কল, ঝর ঝর, কল কল, কুলু কুলু, টিপ টিপ, টুপ টাপ, এর বেশীও কি পাতলা শব্দ আছে? সব যদি এক সঙ্গে তেড়ে যন্ত্রের মুখ দিয়ে বার হতে আরম্ভ হয় তাহলেই তো সর্বনাশ! একেবারে ভেসেই যাব!

প্রঃ ত্রিশঙ্কু বললেন, ভাল্‌ব ছত্রিশটা, দাঁতকাটা চাকা আটচল্লিশটা, এমনি চাকা ডজন দুই। তা ছাড়া ট্রানজিস্টার, চোক, ট্রান্সফরমার, স্পিকার, লাউড স্পিকার যে কতগুলো লেগেছে, তার হিসাব আমি জানলেও, বললেও আপনি বুঝবেন না। চলুন, আপনার সামনে হাতল টানব, আর শব্দের সঠিক রূপ স্বচক্ষে আপনি দেখতে পাবেন। হুঁ হুঁ বাব্বা, এবারে মুলতানি গাই না।

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, সেবারে তো একটা মুলতানি গাই আর একজন লেখক ছিল আপনার যন্ত্রের জ্বালানি, এবারে জ্বালানি কি?

উনি একটুও চিন্তা না করেই বললেন, হিন্দী সিনেমার গান, মাদ্রাজী ছবির ডায়লোগ, হিন্দুস্থানীদের ঝগড়ার ভাষা, মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের ব্যবসার ভাষা, সঙ্গে কিছু বিখ্যাত বাঙ্গালী লোকদের সরকারি প্রাইজ পাওয়া বইয়ের অংশের ভাষা, ব্যাস, এই সাফিসিয়েন্ট। তারপর হাতল টানো আর ভাষার আসলি রূপ দেখ। না, না, শব্দের। আর প্রয়োজন মতো যন্ত্রের চাবি ঘুরিয়ে শব্দের এক রূপ এক এক ভাবে কাছে দূরে সামনে পিছনে কাজে লাগিয়ে দাও। শত্রুরা বর্ডার ছেড়ে পালাবে, বিপক্ষের সবাই দু হাত আকাশে তুলে ধেই নৃত্য শুরু করে দেবে। বন্ধুরা বলবে, মাইরী চকাচক। কেউ লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে, কেউ আবার দু চোখ বুঁজে মাথা দোলাবে খুশিতে। অপূর্ব আবিষ্কার। প্রথম এর কদর দেশের লোক বুঝলে হয়। না বোঝে তো সব কিছু তুলে নিয়ে ভিনদেশে চলে যাব। নোবেল প্রাইজ চাই, তো ওটা ছাড়ি কেন?

ট্যাক্সি ড্রাইভার গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, স্যার, আপনার ওই যন্ত্রটাতে যাতা ভেঙাস কারের গান শোনা যাবে? আর ওই ছিঃ জনের বেরেক নাচের তালের ভাম্পো ভ্যাম্পো বাজনা শোনা যাবে? সস্তায় আমায় একটা যন্তর দেবেন স্যার? মানথিলি ইনস্টলমেন্টে টাকাটা দিয়ে দেব। সাচ বাত বলছি।

প্রঃ ত্রিশঙ্কু বাধা দিয়ে বললেন, থাক থাক। আর বলতে হবে না। যাচ্ছই তো আমার ওখানে, যন্ত্রের সামনে তোমায় ওই খেউরগুলো শুনিও তো ভাল করে। তাহলে, জ্বালানি কিছু বাড়বে। বেশ, বেশ, তাহলে নয় ফের একটা যন্ত্র দেবার চেষ্টা করব। কিন্তু তুলে নেবে কি করে...?

মহাখুশি হয়ে ড্রাইভার বলল, আপনি লোকটা মাইরী...

সেই আগের মতোই একটা পাঁচিল ঘেরা বাড়ির ফটকের সামনে ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করালেন প্রঃ ত্রিশঙ্কু। দরজা খুলে নেমে ব্যস্ত হয়ে জামার পকেটগুলো হাতড়ে বললেন, ঐ যাঃ মেলায় দেখছি আমার পিকপকেট হয়ে গিয়েছে। ভাড়াটা মিটিয়ে দিন তো! বলে আর না দাঁড়িয়ে সোজা লোহার গেটে গিয়ে জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগলেন।

ড্রাইভার বলল, যাঃ কলা, এ যে দেখছি চালু পূর্জা, ও মশাই, আপনারও পিকপকেট হয়নি তো? দিন দিন ভাড়া। না হলে, মুখের বুকনি নয়, হাতের সুখ করে নেব মশাই। আমি ছাড়ব না।

ভীষণ ভয়ে আমি গুণে গুণে ভাড়ার টাকা মিটিয়ে দিলাম। মিটারে কত যে উঠেছে তা দেখতেই ভুলে গেলাম। দেখলেও, তখন কি আর হিসেব কষতে পারতাম? ড্রাইভার খুশি মনে হাসি মুখে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। তার মানে দেড় চোট খেলাম।

ওদিকে গেটটা তখন বিশ্রী আওয়াজ করে খুলে গেল। একটা নেড়া মাথা ছোকরা মুখ বার করে এদিক ওদিক দেখে ফিস ফিস করে বলল, আপনে ঢোহেন জলদি। পিচনে ইসপাই লাগছে, বোঝেন না? জলদি করেন, জলাদি করেন।

স্পাই! চমকে প্রঃ ত্রিশঙ্কু পিছন দিকে তাকালেন। আমাকে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, দেখেছেন নাকি তাকে? সর্বনাশ! বেটা গেল কোন দিকে? ঠিক গন্ধে চলে এসেছে। ফর্মুলাটা হাতিয়ে নেবার ফন্দী।

নেড়া বলল, আরে আরে করেন কি!! করেন কি! ইসপাইরেই জিগাইতেছেন ইসপাইয়ের কথা! আপনের ভীমরতি ধরছে। তা না অইলে অমন যন্তর বানান! আসেন, আসেন ভিতরে ঢোহেন।

প্রঃ ত্রিশঙ্কু এই মারেন তো সেই মারেন করে তেড়ে গেলেন ছেলেটার দিকে। বললেন, কাকে কি বলছিস রে নেড়া, এ্যাঁ, কাকে কি বলছিস... স্পাই দেখেছিস কোন দিন, দেখেছিস? তা না...

আমি বললাম, থাক থাক, ছেলেমানুষ। এখন ভিতরে চলুন। যন্ত্রটা দেখি। কি নাম দিয়েছেন যন্ত্রটার?

উনি গজ গজ করতে করতে ভিতরে ঢুকলেন। পিছন পিছন আমিও। নেড়াটাও সমানে গজ গজ করতে লাগল, আমি বুঝুম ক্যামনে। হয়নরেই তো সন্দেহ হয়। তবে?

প্রঃ ত্রিশঙ্কু শান্ত হয়ে বললেন, তোকে তখুনি বলেছিলাম, নেড়া হোসনে, হোসনে। সব বুদ্ধি বেরিয়ে যাবে। তা না, কোথায় মামাতো ভাইয়ের পিসতুতো শালার মাসতুতো দিদির কার যেন কে মরেছে, অমনি অশৌচ হয়েছে বলে নেড়া হলি! দেখ এখন কি ঝামেলা পাকাচ্ছিস।

নেড়া ক্ষেপে কি গিয়ে বলল, জানেন নি অশোচ অইলে ন্যাড়া অইতে হয়। ছেরাদ্দ করতে হয়। তয় ঠিক কে যে মরছে বুঝি নাই বইলা শুধু ন্যাড়া অইছি। হ্যার লেইগ্যা এত কথা ক্যান?

আমি বললাম, থাক থাক, অত রাগ করতে নেই। নেড়া মাথায় চাঁদি গরম হয়ে যাবে। শেষে কি হতে কি হয় কে বলতে পারে?

ও বলল, দেহেন তো আপনে, আমি বইল্যা নাম করা ওয়েল্ডার, বেশী মাইনা পাওনের লোভে এইহানে আইয়্যা ফাইস্যা গেছি। রাত্র দিন নাটের লগে ইসকুরু, তার লগে চাকা, তার গায়েনি পাইপ, পিছনে চোঙ্গা, সামনে হাণ্ডিল ওয়েল্ড করছি, কি যে কিম্ভুতকিমাকার যন্তর অইছে তা উনিই জানেন, এহন কইতাছে, মাথায় বুদ্ধি নাই। নাই তো নাই... থাকলেনি জাহাজের কাম ছাইড়া এই হানে মরতে আসি? অ্যাপনেই কয়েন?

আমি বললাম, তা তো ঠিক। কিন্তু যন্ত্রটা কই?

ক'পা এগিয়ে একটা ভাঙ্গা দালান পার হয়ে বাঁয়ে মোড় নিতেই নেড়া বলল, ওই দ্যাহেন হেই যন্তর! দেহেন, দেহে ওইটা যন্তর না কিম্ভুত এউকগা লোহার খাঁচা!

থাম, থাম, অনেক বকেছিস। বললেন প্রঃ ত্রিশঙ্কু, ওটার কদর যদি তুই বুঝতে পারতিস, তাহলে তো আমি মাথা নেড়া করে ওয়েল্ডার হতাম, আর তুই নোবেল লরিয়েট হতিস। যাক সে কথা। আপনি শুনুন... বলে হাসি হাসি মুখে আমার দিকে তাকালেন প্রঃ ত্রিশঙ্কু। তারপর দুহাত মহা আনন্দে কচলাতে কচলাতে বললেন, এই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এটার জন্যেই আমি থাকব না যখন তখনও মানুষে আমার নাম করবে।

আমার মনে হল ওঁর সব যন্ত্রের চেহারাই প্রায় এক রকম। এটার অবশ্য বয়লার পেট নেই। তার বদলে আছে চারদিকে লাগান সেই কুকুর মার্কা গ্রামোফোনের পুরানো বেশ কটা চোঙ্গা। শব্দের সঠিক রূপ বোধ হয় ওর মধ্যে দিয়েই বার হয়। কিন্তু মনে মনে খটকা লাগল, শব্দের শক্ত নিরেট রূপটাও কি ওই চোঙ্গা দিয়েই বার হয়। আটকে যাবে না?

নেড়া ভীষণ রেগে বলল, আমিনি এসিসটেন্ট! ন্যান, কন এহন কোন হেণ্ডেলটা টানতে অইবো?

প্রঃ ত্রিশঙ্কু যন্ত্রটার এক পাশে সরে গেলেন। সে দিকেই দেখলাম যন্ত্রের যেন একটা ফোকলা মুখের মতো ফাঁক আছে। ওঃ, তাহলে শব্দের শক্ত রূপটা বুঝি এখান দিয়েই ঠাই ঠাই করে পড়বে।

প্রঃ ত্রিশঙ্কু অন্যমনস্কের মতো কি যেন বললেন। আমি যেন শুনলাম, উনি বললেন, টান। অমনি নেড়া সামনের হাতলটাই প্রাণপণে ঘ্যাঁ—য়্যাচঁ করে টেনে নিল। অমনি যন্ত্রের ভিতর থেকে সু-উ-উ-ৎ করে মুখ দিয়ে ঝোল টানার মতো একটা প্রচণ্ড শব্দ উঠল! কিন্তু কিছু বোঝার আগেই বাতাসেও টান পড়ল ভীষণ! আমি, আমার আগে প্রঃ ত্রিশঙ্কু দুজনেই সেই টানে যন্ত্রের মুখের কাছে প্রায় গিয়ে পড়লাম। প্রঃ ত্রিশঙ্কু চেঁচিয়ে উঠলেন, আরে আরে আরে ন্যাধা... (বোধ হয় নেড়াকে গাধা বলতে গেছিলেন উনি।) কিন্তু কথা উনি শেষ করতেই পারলেন না, তার আগেই ওঁর মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত সবটাই যন্ত্রের ওই মুখের মধ্যে ঢুকে গেল! চটি পড়া পা দুটো শুধু শূন্যে নেড়াকে খুঁজে লাথি চালাতে লাগল।

নেড়া সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে বলল, সর্বনাশ, ভুল হেণ্ডেল টাইন্যা থুইছি। ওইটা টানলে দুনিয়ার বেবাক হক্ত শব্দ হয়ে যতই হক্ত হউক না ক্যান যন্তরের মধ্যে টাইন্যা লইবো। হামনে তেমন হক্ত শব্দ না পইয়া আমাগো পেপেচোররেই টাইন্যা নিছে। এহন মাথা ঠাণ্ডা কইরা কাম করেন লাগবো। তিন নম্বর হেণ্ডেলটা টানতে অইবো। বলেই ও এক হ্যাচকা টানে একটা হাতল নামিয়ে দিল। দিয়েই চেঁচিয়ে উঠল, এই সারছে, আবার ভুল কইর‍্যা ফেলাইলাম। এ তো দেহি শব্দ কামানের হেণ্ডেল! জোরসে টাইন্যা দিছি। পলান, পলান, না অইলে ঘয়েল আইবেন কইয়া দিলাম। বলেই ও ছুট লাগাল। আমি তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। নেড়া প্রায় ভাঙ্গা দালানটায় কাছে পৌঁচেছে, অমনি যন্ত্রের ভিতর থেকে বিকট একটা আওয়াজ বার হল, বুম, নেড়া, বুম, তোর একদিন কি আমারই একদিন, বুম, বুম।

ফিরে দেখি নেড়া ঘাসের ওপর পড়ে পা দুটো সমানে ছুঁড়ছে। আর ওদিকে যন্ত্র থেকে সমানে আওয়াজ বার হয়ে চলেছে, বুম, বুম, বুম! বিকট আওয়াজে কান ঝালাপালা হবার যোগাড়, প্রাণ আইঢাই করে উঠল। কিন্তু কি সর্বনাশ ওদিকে যে প্রঃ ত্রিশঙ্কু শূন্যে সমানেই দু-পা ছুঁড়ে চলেছেন। এখুনি কিছু একটা করা দরকার। আমি ভীষণ ভয়ে তিন নম্বরের পাশের পাঁচ নম্বর হাতলটা টেনে দিলাম। অমনি সুরুৎ করে প্রঃ ত্রিশঙ্কু যন্ত্র থেকে বার হয়েই বললেন, বাঁচালেন মশাই। নেড়ার চাকরি খতম। একের পর দুই, তার পর তিন, এমনি করেই তো হাতলগুলো টানবে, তা না.., আপনি মশাই মাথা ঠাণ্ডা রেখে তিনের পর ভাগ্যিস চার টানেন নি, চার টানলেই হয়েছিল আর কি। শব্দের পরমাণু ফাটতো। সে যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার তা আজ পর্যন্ত কেউই জানে না, আমি তো কোন ছার। এখন আমি এক নম্বর হাতল টেনে আমার যন্ত্রের গুণ আপনাকে দেখাব। একটু ওদিকে সরে দাঁড়ান। কিছু গোপন রাখার ব্যাপার আছে তো, কে বলতে পারে, আপনি কোনো শত্রু দেশের স্পাই কিনা? রেডি, ওয়ান, টু, থ্রি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম, আ হা হা করছেন কি, করছেন। কি, ওটা যে চার নম্বর... কথা আমি শেষ করতে পারিনি। বিকট শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যেন ভেঙ্গে পড়ল আমাদের চারপাশে প্রায় বেহুঁশ হয়েই পড়েছিলাম। হুঁশ ফিরে এলো, একটা কাতর শব্দে। ও দিকে নেড়া এক ঘেয়ে ভাবে কাতরাচ্ছে, ওরে বাব্বা, গেছি গেছি গেছি! এউকগ্যা ইসকুরুপ মাথায় আইয়া পড়েছে। হেই তেই এই, বল্টু পড়লে আর দ্যাখতে অইতো না। এমন কাম আর আমি করুম না। জাহাজেই ফিইর‍্যা যাইমু।

ভাল করে চোখ পিট পিট করে তাকিয়ে দেখলাম, পাশেই প্রঃ ত্রিশঙ্কু চিৎপাত হয়ে পড়ে আছেন। নেড়ার মাথার মাঝখানটা ফুলে ঢিপি। আমার কিছুই হয়নি। সামনের অমন বিশাল যন্ত্রটা আর নেই। তার জায়গায় সারা বাগান জুড়ে ছড়িয়ে আছে লোহা লক্কড়ের টুকরো।

চোখ চেয়ে প্রঃ ত্রিশঙ্কু বললেন, আজ নেড়ার একদিন কি আমারই একদিন। ভাল করে যন্ত্রটা ও ওয়েল্ডিং করেনি। তাই বলেই তো শব্দের পরমাণু না ফেটে যন্ত্রটাই ফেটে চৌচির হল। ও হো হো হোঃ, আমার কি সর্বনাশ হল। আমার
এমন প্রচেষ্টা বিফল। এ দুঃখু আমি রাখব কোথায়!

নেড়া ভীষণ রাগে বলল, হ এহোন তো হক্কল দোষই ন্যাড়ার অইবো। যন্তর ফাটছে তায় না প্রাণে বাঁচছেন, শব্দের এটম বোমা ফাটলে তো আর এমন কইর‍্যা মিথ্যা গাল পাড়তে পারতেন না। আমার পাওনা গণ্ডা মিটাইয়া দ্যান। আমিও আর এই হানে কাম করুম না। সিধা কথা।

আমি বললাম, মিথ্যা দুঃখ করছেন প্রঃ ত্রিশঙ্কু। আপনার পরের যন্ত্রটা নিশ্চয়ই জগৎ কাঁপাবে। তবে মনে রাখবেন, আমি বাসা বদল করেছি। আগের ঠিকানায় কিন্তু আর আমাকে পাবেন না। নতুন ঠিকানাটাও আনতে ভুলে গেছি।

প্রঃ ত্রিশঙ্কু বললেন, পরের যন্ত্র? না মশাই, যন্ত্র আমার মাথায় থাক। এর পরে আমি ভাবছি, অন্য বিষয় নিয়ে গবেষণা করব। তা ওকি মশাই চললেন যে? আপনাকে তাহলে ফের কোথায় পাব?

বড় বড় পা ফেলে গেটের দিকে যেতে যেতে আমি বললাম, চিন্তা করবেন না, সময় মতো আমি নিজেই যোগাযোগ করব। সোজা বাগানের বাইরে এসে প্রাণ খুলে দম নিলাম। উঃ, খুব বেঁচেছি। আবার...!

প্রথম প্রকাশ: ফ্যানট্যাসটিক, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮
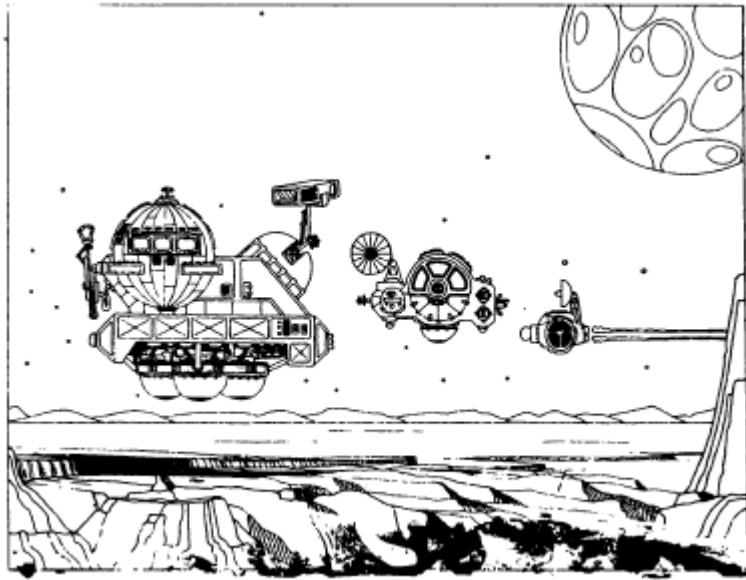
সূচিপত্রে ফিরে যান

হরিহরণ এফেক্ট

সুমিত কুমার বর্ধন

প্রফেসর সুরজিত ব্যানার্জী ক্ষোভে হতাশায় খালি নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে বাকি রাখলেন। দুমদুম করে টেবিলে দুহাতে কিল মারতে মারতে চেঁচাতে লাগলেন—"কেন? কেন? এক্সপেরিমেন্টটা সফল হচ্ছে না কেন? কেন? আমরা... আমরা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক, আর আমরা এই সাধারণ এক্সপেরিমেন্টটা সফল করতে পারলাম না। আমাদের ছাত্রদের কানে কথাটা গেলে আমরা যে হাসির পাত্র হব!"

"আহা আপনার আর দোষ কোথায়। যদি অটোমেটিক রেকর্ডারটা কোন রেডিয়েশন রেকর্ড না করে তাহলে আপনি আর কি করবেন।" প্রফেসর শান্তনু হালদার প্রফেসর ব্যানার্জীকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন।

প্রফেসর ব্যানার্জী আরো খাপ্পা হয়ে উঠলেন—"কিন্তু কেন রেকর্ড করছে না সেটাই তো আমরা বের করতে পারলাম না! এরপর ছাত্ররা আমাকে ছাড়বে ভেবেছেন? ওরা নিজেরা পারছিল না বলেই তো আমাকে এক্সপেরিমেন্টটা করতে দিয়েছিল। এরপর আমিও যদিও না পারি তাহলে ওরা যে শুধু হাসাহাসি করবে তাই নয় ক্লাস নিতে গেলেও পেছনে লাগবে।"

তারপর অটোমেটিক রেকর্ডাটার দিকে চোখ পড়তে আবার দ্বিগুণ জ্বলে উঠলেন—"সব দোষ ওই রেকর্ডারটার। ওটাকে... ওটাকে আমি...!" বলে একটা টুল তুলে রেকর্ডারটা ভাঙতে যাচ্ছিলেন, প্রফেসর হাত থেকে টুলটা কেড়ে নিয়ে একরকম জাপটে ধরেই ল্যাবের বাইরে বের করে নিয়ে এলেন।

বাইরের ক্যান্টীন থেকে কয়েক গ্লাস অরেঞ্জ স্কোয়াশ খাইয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা করানোর পর প্রফেসর হালদার আর একবার প্রফেসর ব্যানার্জীকে নিয়ে ল্যাবে ফিরে এলেন।

অটোমেটিক রেকর্ডারটার কাছে গিয়ে প্রফেসর হালদার রেকর্ডিং শীটটা হাতে করে তুলে ধরলেন। "এই দেখুন, কুড়ি হাজার অবধি কার্বনডাই অক্সাইডের ইনফ্রারেড রেডিয়েশন আমরা ঠিক ঠিক রেকর্ড করতে পেরেছি। কিন্তু তার ওপরে..."

প্রফেসর ব্যানার্জী ঈষৎ বিরক্তি ভরা গলায় বললেন—"ও তো আগেও দেখেছি। কিন্তু কেন এরকম হচ্ছে সেটা না বের করতে পারলে তো ছাত্রদের কাছে মুখ
দেখাতে পারব না।"

প্রফেসর হালদার অটোমেটিক রেকর্ডারটার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা স্পেকট্রো-মিটারের কাছে গিয়ে বললেন "আপনি শুধু তো অটোমেটিক রেকর্ডারটা নিয়েই পড়েছেন। স্পেকট্রোমিটারেও যে কোন গণ্ডগোল থাকতে পারে সে কথা একবার ভেবে দেখেছেন?"

স্পেকট্রোমিটারটা প্রেসিডেন্সী কলেজের কয়েকজন ফিজিক্সের প্রফেসরের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তৈরি। বলছি বটে স্পেকট্রোমিটার কিন্তু সে বোধহয় যন্ত্রটার কোন নাম কেউ রাখেনি বলেই। সাধারণ স্পেকট্রোমিটার মাপে সাদা আলোর বর্ণালীচ্ছটা, আর এ

স্পেকট্রোমিটার মাপত আলোর রেডিয়েশন। অবজারভেটরি টাওয়ারে বসানো বিরাট লেন্সের ওপর সূর্যের আলো এসে পড়ত। তারপর একগাদা প্যারাবোলিক লেন্স আয়না ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে এসে পড়ত স্পেকট্রোমিটারের ভেতর। সেখান থেকে আলোটা আবার নানান ভাবে পরিশোধিত হয়ে শুধু ইনফ্রারেড আলো গিয়ে পড়ত অটোমেটিক রেকর্ডারটার ওপর। অটোমেটিক রেকর্ডার আবার তখন সেই ইনফ্রারেড আলোর পরিমাপ করত।

বলাই বাহুল্য স্পেকট্রোমিটারের কোথায় গণ্ডগোল তা বের করতে কমসেকম তিন চারদিন সময় লাগবে বলেই প্রফেসর ব্যানার্জী ওটাতে হাত দেন নি।

তবুও আর কোন রাস্তা না পেয়ে দুই প্রফেসর মিলে তন্ন তন্ন করে স্পেকট্রোমিটারটা তিনদিন ধরে চেক করলেন।

তিন দিনের দিন বিকেলবেলা শেষ বল্টুটা এঁটে দিয়ে প্রফেসর ব্যানার্জী অ্যাপ্রণে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালেন।

"না। কোথাও কোন গণ্ডগোল নেই! তবুও কেন যে...।"

প্রফেসর হালদার একটা খাতায় কি সব হিসেব করছিলেন। খাতাটা আর কলমটা টেবিলের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে বললেন—"ছাড়ুন তো। কালকে চ্যান্সেলরকে বললেই হবে যে ওটা আর কাজ করছে না, কেন কাজ করছে না তা দেখার জন্য উনি বাইরে থেকে লোক নিয়ে আসুন। আমাদের আর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, চলুন।"

"হ্যাঁ চলুন, নিচের স্টাফরুম থেকে একটু রেডিও শুনে আসি। তিনদিন ধরে স্পেকট্রোমিটার ঘেঁটে মাথা ঝিম ঝিম করছে।"

"রেডিও!" প্রফেসর হালদার খানিকক্ষণ হাঁ করে প্রফেসর ব্যানার্জির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললেন, "এতবড় একটা খবর আর আপনি কিছু জানেন না।"

"কই না! কেন, কি হয়েছে!"

"কদিন ধরেই খবরের কাগজে এই নিয়ে এত হৈ চৈ হচ্ছে আর আপনি কিনা আজ আমায় জিজ্ঞেস করছেন কেন কি হয়েছে! আচ্ছা লোক মশাই আপনি!"

"হেঁয়ালী না করে একটু ঝেড়ে কাশুন দিকি! কি হয়েছেটা কি?"

"হবে আর কি, কদিন ধরে কোন অজানা কারণে পৃথিবীর সমস্ত রেডিও ব্যবস্থা বিকল হয়ে গেছে। পৃথিবীর তাবড় তাবড় রেডিও বিজ্ঞানীরা হাজার চেষ্টা করেও এর কোন কারণই খুঁজে পাচ্ছেন না। ফলে এই কদিন রেডিও শোনাটোনা বন্ধ হয়ে গেছে।"

প্রফেসর ব্যানার্জী ফিজিক্স বিল্ডিংয়ের ল্যাবোরেটরিতে বসে কিসব হিসেব নিকেশ করেছিলেন, প্রফেসর হালদার দরজা ঠেলে ধরে এসে ঢুকলেন। "সত্যি মশাই, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। কলেজ শুদ্ধ লোক ডক্টর হরিহরণের বক্তৃতা শোনার জন্য লাফালাফি করছে, আর আপনি এখানে বসে আছেন?"

"ডক্টর হরিহরণটা আবার কে?"

প্রফেসর ব্যানার্জীর প্রশ্নটা শুনে প্রফেসর হালদার হাঁ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধপাস করে একটা খালি টুলে বসে পড়লেন।

"এতো দেখছি আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে। ডঃ হরিহরণ কে সে খবরও আপনি রাখেন না। আরে মশাই! ডঃ হরিহরণ আগের বছর অ্যাসট্রোফিজিক্সে গবেষণার জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। এবার থেকে খবরের কাগজ-টাগজগুলো একটু পড়া আরম্ভ করুন। নইলে শেষকালে কোনদিন লোক হাসাবেন। নিন উঠুন।"

প্রফেসর ব্যানার্জী উঠে দাঁড়ালেন বটে কিন্তু যাবার কোন লক্ষণই দেখালেন না। প্রথমেই প্রশ্ন করলেন—"কিন্তু ওই সব লম্বা লম্বা বক্তৃতাগুলো আমাদের কি কোন কাজে লাগবে!"

যখন দেখলেন প্রফেসর হালদার কোন জবাব দিলেন না তখন আবার বললেন —"মিছিমিছি ও সব থিওরির কচকচানি না শুনে এখানে বসে বসে সেদিনকার ওই অঙ্কটা কষে ফেললে হয় না?"

প্রফেসর হালদার কোন জবাব না দিয়ে প্রফেসর ব্যানার্জীর কাছে উঠে গেলেন। তারপর ডান হাতটা ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে কলেজের অডিটোরিয়ামের দিকে নিয়ে চললেন।

প্রফেসর ব্যানার্জী অবশ্য দু একবার প্রতিবাদ জানবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু যতবারই মুখ খুলতে গেছেন ততবারই প্রফেসর হালদার ওঁর দিকে এমন জ্বলন্ত
চোখে তাকিয়েছেন যে ওর আর মুখ খোলার সাহস হয়নি।

দুজনে মিলে যখন অডিটোরিয়ামে এসে ঢুকলেন তখন হল একেবারে কানায় কানায় ঠাসা। স্টুডেন্ট ইউনিয়নের পাণ্ডা নিরঞ্জন শর্মা দুটো সীট রেখে দিয়েছিল। সেই হাত নেড়ে দুই প্রফেসরকে ডাকল। দুজনে গিয়ে সীটে বসতে বলল—"ডক্টর হরিহরণ এক্ষুণি এসে পৌঁছলেন। ওঁর বক্তৃতা আরম্ভ হতে খানিকক্ষণ দেরি হবে। কিন্তু সীট ছেড়ে কোথাও যাবেন না। আমায় অনেক কষ্টে এ দুটো যোগাড় করতে হয়েছে," বলে নিরঞ্জন চলে গেল।

হলের তুমুল হট্টগোলের ভেতর দশ মিনিট বসে থাকার পর ডক্টর হরিহরণ মঞ্চে এসে ঢুকলেন। পেছনে ভাইস চ্যান্সেলর সুনীত সেন আর ইউনিয়নের পাণ্ডা নিরঞ্জন শর্মা।

শেষোক্ত দুজনের ধন্যবাদ জ্ঞাপনটাপন হয়ে যেতে ডক্টর হরিহরণ কোনরকম ধানাইপানাই ছাড়াই বক্তৃতা আরম্ভ করলেন।

তাঁর বক্তব্য ছিল তাঁরই নবাবিষ্কৃত হরিহরণ এফেক্ট।

হরিহরণ এফেক্ট কি, এবং তার স্বপক্ষে কি কি প্রমাণ আছে, বোঝাতে ডক্টর হরিহরণ যে সমস্ত লম্বা লম্বা থিওরী এবং ফরমূলা উত্থাপন করলেন সে সব শুনে কলেজের ছাত্রদের তো কোন ছার, এমনকি বড় বড় অ্যাসট্রোফিজিক্সের প্রফেসরদেরও বুদ্ধিশুদ্ধি তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল।

ডক্টর হরিহরণ মূল বক্তব্যের শেষে ছোটখাট একটি বোমা ফেললেন অডিটোরিয়াম ভর্তি জনতার ওপর। বললেন, "হরিহরণ এফেক্ট ব্রহ্মাণ্ডের একটি বিশেষ অবস্থা যখন ব্রহ্মাণ্ডে কুচকে ছোট হয়ে যেতে থাকে। ব্রহ্মাণ্ডের কয়েকটি অংশে আমি এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি, আর আমাদের সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলোর আচার ব্যবহার লক্ষ্য করে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছি যে আমরা ব্রহ্মাণ্ডের যে অংশে বাস করছি সে অংশটুকুতে এ বিশেষ অবস্থা দেখা দিয়েছে কয়েক বছর আগে থেকে।"

ডক্টর হরিহরণ থামার পর বেশ কিছুক্ষণ সব নিস্তব্দ রইল, তারপর হঠাৎ পেছনের সীট থেকে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ডক্টর অজিতেশ আগরওয়ালা লাফিয়ে উঠলেন, "আপনি কি ইয়ার্কির আর জায়গা পাননি! যদি আপনার কথা সত্যি হয় তাহলে আপনার ফরমূলা অনুযায়ী আমরা এত ছোট হয়ে গেছি যে অণুবীক্ষণ ছাড়া আমাদের দেখা যাবে না! বলুন একি সম্ভব!"

হল শুদ্ধু লোকের দৃষ্টিটা ডক্টর আগরওয়ালার মুখের ওপর থেকে ডক্টর হরিহরণের মুখের ওপর আর একবার গিয়ে পড়ল।

ডক্টর হরিহরণ ঠাণ্ডা সংযত গলায় বললেন, "হতে পারে, বলা যায়। সবই সম্ভব।"

ক্যাণ্টীনে বসে খেতে খেতে প্রফেসর ব্যানার্জী ডক্টর হরিহরণের এফেক্টের ওপর লেখা কতকগুলো কাগজপত্র দেখছিলেন। বয় এসে চায়ের কাপটা দিয়ে যেতে মুখ তুলে তাকালেন।

প্রফেসর হালদার চিংড়ির কাটলেটে একটা কামড় দিতে দিতে বললেন— "কি হল, কিছু বোঝা গেল?"

প্রফেসর ব্যানার্জী চায়ের কাপটা টেনে নিয়ে বললেন "হ্যাঁ, কিন্তু ডক্টর হরিহরণের থিওরী অ্যাপ্লাই করতে গেলে সৌরমণ্ডলের চেহারাটা অসম্ভব ছোট হয়ে পড়ে। এত ছোট কি..?"

হঠাৎ কি একটা মনে পড়তে প্রফেসর ব্যানার্জী তড়াক করে সোজা হয়ে বসলেন। "আচ্ছা প্রফেসর হালদার, হরিহরণ এফেক্ট কি শুধু ম্যাটারকে এ্যাফেক্ট করে, না এনার্জিকেও করে?"

"না, এনার্জির ওপর হরিহরণ এফেক্ট দেখা দেয় না, শুধু ম্যাটারই এর দ্বারা এ্যাফেক্টেড হয়। কিন্তু হঠাৎ একথা?"

প্রফেসর ব্যানার্জীর মুখের ওপর চোখ পড়তে মাঝপথেই থেমে গেলেন প্রফেসর হালদার। প্রফেসর ব্যানার্জীর চোখ মুখ দিয়ে যেন আনন্দ উপছে পড়ছে।

"পেয়েছি! পেয়েছি!" প্রফেসর ব্যানার্জী শুধু লাফিয়ে উঠতেই বাকি রাখলেন। "প্রফেসর হালদার, শুনতে চান কেন পৃথিবীর সমস্ত রেডিও স্টেশন আজ বিকল?" প্রফেসর ব্যানার্জী উত্তেজনায় প্রঃ হালদারের হাতের কাজটা বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরেন—"শুনবেন কেন আমরা ২০,০০০ আর্মষ্ট্রঙ্গের বেশী রেডিয়েশন রেকর্ড করতে পারি নি?"

আঙুল দিয়ে নিজের ঝোল মাখানো প্লেটের ওপর একটা গোল্লা আঁকলেন ডক্টর ব্যানার্জী।

"এই দেখুন। মনে করুন এটা আমরা ব্রহ্মাণ্ডের যে অংশে বাস করছি সেইটার বাউণ্ডারী। এখন এই বাউণ্ডারী যত কুঁচকে ছোট হয়ে আসবে ততই বাউণ্ডারীর ভেতরের জিনিসগুলোও কুঁচকে ছোট হয়ে আসবে। কিন্তু হরিহরণ এফেক্ট এনার্জির ওপর খাটে না বলে এনার্জিগুলো ছোট হবে না। এবং যেহেতু বাউণ্ডারীর চাইতে বড় কিছুর অস্তিত্ব সম্ভব নয় সেই জন্য যে সমস্ত এনার্জির ওয়েভ লেংথ এই বাউণ্ডারীর দৈর্ঘের চেয়ে বড় তাদের অস্তিত্ব লোপ পাবে এই সীমারেখার চৌহদ্দির ভেতর থেকে।"

উত্তেজনায় জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন প্রফেসর ব্যানার্জী। প্রফেসর হালদার ভয় জড়ানো গলায় ধীরে ধীরে বললেন "সেই জন্যেই রেডিও ব্যবস্থা বিকল আর সেই জন্যই কুড়ি হাজারের ওপর কোন রেডিয়েশন রেকর্ড করতে পারি নি। কিন্তু তার মানে দাঁড়ায় আমাদের আশেপাশের ব্রহ্মাণ্ডের আকার...!"

"হ্যাঁ, প্রফেসর ব্যানার্জী প্রফেসর হালদারের মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে বললেন —"আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের আকার এখন মাত্র ২০,০০০ আর্মষ্ট্রঙ্গ, অর্থাৎ—, গভীর উত্তেজনায় প্রফেসর ব্যানার্জীর গলার স্বর ঘসঘসে হয়ে এল।

"—অর্থাৎ এক ইঞ্চির দশ ভাগের একভাগ!"

একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ করে প্রফেসর হালদার অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

দুঃস্বপ্নের শুরু এইখানে থেকেই। হরিহরণ এফেক্ট সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গী হল আর কয়েকদিন বাদে।

হরিহরণ এফেক্ট অনুযায়ী ব্রহ্মাণ্ড কুঁচকে ছোট হতেই থাকল এবং সেই সঙ্গে একটা একটা এনার্জির অস্তিত্ব লোপ পেতে থাকল।

ইনফ্রারেড আগেই গিয়েছিল, এরপর ডাক এল সাধারণ নীল আলোর—কমপ্লট স্পেকট্রামে যার স্থান ইনফ্রারেডের পরেই।

এর ফল—একদিন সকালে সারা দুনিয়া শুদ্ধু লোক তাজ্জব হয়ে দেখল তাদের বাগানের সব তাজা গোলাপগুলোর রঙ এক রাত্তিরেই কোন মায়াবীর খেলায় কালো হয়ে গেছে। দুনিয়া শুদ্ধু মেয়েরা সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে প্রসাধন করতে গিয়ে আঁতকে উঠে দেখল তাদের ঠোঁটে কে যেন কালো কালির প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছে। যারা কল কারখানায় কাজ করতে গিয়ে হাত কেটে ফেলল, তারা সভয়ে লক্ষ্য করল তাদের ক্ষতস্থান দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে কালিবর্ণ কি এক তরল পদার্থ।

সমস্ত দেশের সরকারই কিন্তু ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। সরকারী আদেশ মতো মুখ বন্ধ না করে হরিহরণ এফেক্ট দিয়ে এই সমস্ত অদ্ভুত ঘটনার ব্যাখ্যা করতে গেলেন যে সমস্ত বিজ্ঞানী তাদের হয় কাজ থেকে বহিষ্কৃত আর নয় তুচ্ছ কারণে গৃহবন্দী করা হল। সরকারী ধামাধরা কয়েকজন বৈজ্ঞানিক আর উচ্চপদস্থ অফিসার রিপোর্টারদের কাছে জবানবন্দী দিতে লাগলেন গোটা জিনিসটাকে একটা "সাময়িক পরিবর্তন" বলে, ফলে পৃথিবীর লোক আরও কিছুদিন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে নিল। হরিহরণ এফেক্ট অনুযায়ী সঙ্কোচনের গণ্ডি আরো দ্রুত হতে লাগল।

এবারে ডাক এল হলুদ আর কমলার। গাঁদা ফুল গোলাপের পদাঙ্ক অনুসরণ করল। যুঁই গাছের ফুলের সঙ্গে পাতার রঙের কোন পার্থক্য রইল না। চিড়িয়াখানার বাঘ সিংহগুলোর রঙ মসীলিপ্ত হয়ে গেল। রেসের মাঠে সবুজ ঘোড়া দেখবার জন্য ভীড় উপচে পড়তে লাগল। যে সব সুন্দরীরা সোনালী চুলের গর্ব
করত তাদের চুলের রঙও আর পাঁচটা মেয়ের মতো হয়ে গেল। আর...

আর একদিন বিশ্ববাসী বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে দেখল দূরের আকাশ বেয়ে উঠে আসছে একটা সবুজ রঙের সূর্য।

আর ব্যাপারটা গোপন রাখা গেল না। পৃথিবী জুড়ে আন্দোলনের ঢেউ বয়ে গেল। নানা তর্কের ঝড় উঠল। এবং শেষ পর্যন্ত জনমতের চাপে পড়ে পৃথিবীর সমস্ত সরকারকে একজোট হয়ে হরিহরণ এফেক্টকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি একটা বিপদের সূচনা বলে স্বীকার করতে হল।

তারপরেও অনেক তর্কাতর্কি অনেক আলোচনার পর যখন ঠিক করা হল যে হরিহরণ এফেক্টের আবিষ্কর্তা ডক্টর হরিহরণকে কিছু বলতে অনুরোধ করা হবে, তখন পৃথিবীর নীলাকাশের বুক থেকে নীল রঙের সূর্য পৃথিবীর কালো রঙের গাছপালার ওপর অদ্ভুত নীল আলো ঝরিয়ে চলেছে।

প্রথমে ঠিক করা হয়েছিল যে ডক্টর হরিহরণ দিল্লীতে বক্তৃতা দেবেন কিন্তু যাবার পথে বিরাট জনতার ভীড় থেকে তাকে রক্ষা করা অসম্ভব বুঝেই সরকার কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে তার বলার ব্যবস্থা করলেন।

নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে করতেই কেটে গেল আরো কয়েকটা দিন। ইতিমধ্যে অবস্থার আরো অবনতি ঘটল। জনতা এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ রেখেই ডক্টর হরিহরণকে ইডেন গার্ডেনসে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হল।

প্রঃ ব্যানার্জী ও প্রঃ হালদারও গেলেন।

ডক্টর হরিহরণের আসার কথা ছিল সন্ধ্যে সাতটায়। সাতটা দশ থেকেই জনতার মধ্যে একটা অস্বস্তি একটা ছটফটানি দেখা দিল। সাতটা কুড়ি নাগাদ সেটা একটা কলরব এবং সাড়ে সাতটা নাগাদ একটা তুমুল হট্টগোলে পরিণত হল। মাঝে মাঝে দুটো একটা করে চটি, পচা আনাজ ইত্যাদি মাঠের ওপর আছড়ে পড়তে লাগল। আর কিছুক্ষণ চললে কি হত বলা যায় না। কিন্তু হঠাৎ বাইরে জনতার নির্ঘোষ শোনা গেল এবং তার কিছু পরেই বড় বড় ফ্লাডলাইটের নীল আলোর তলা দিয়ে হেঁটে সেই বহু প্রতীক্ষিত মানুষটি মঞ্চের ওপর গিয়ে উঠলেন।

জনতা তুমুল উল্লাসে ফেটে পড়ল। কিছুক্ষণ ধরে করতালির আওয়াজে ঢাকা পড়ে গেল সব কিছুর আওয়াজ। তারপর উচ্ছ্বাস থেমে যেতে মাইক্রোফোনে ডক্টর হরিহরণের গলার আওয়াজ গমগম করে উঠল,

"ভদ্রমহোদয়গণ! আমাকে ডাকা হয়েছে হরিহরণ এফেক্ট সম্বন্ধে আরো কিছু জানাতে। আমি আমার বক্তৃতা আরম্ভ করছি কতকগুলো চিঠির জবাব দিয়ে। প্রথম চিঠিটি পাঠিয়েছেন লন্ডন থেকে একজন ভদ্রমহিলা। ইনি লিখেছেন যে, সমস্ত রেডিও স্টেশন বিকল হয়ে পড়ার ফলে বিবিসি থেকে তাঁর স্বামীর চাকরি গেছে। ইনি জানতে চেয়েছেন যে, রেডিও স্টেশনগুলো আবার চালু হবার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা। এর উত্তর হল যে, রেডিও স্টেশনগুলোর কোনদিন চালু হবার কোন সম্ভাবনাই নেই।"

যে জনতা এতক্ষণ আশা করে বসেছিল, সেই জনতার মধ্যে এবার শুরু হল নৈরাশ্যের গুঞ্জন। থেকে থেকে ভেসে এল সিটি, অশ্রাব্য গালাগাল আর বেড়ালের ডাক।

প্রফেসর হালদার নিচু গলায় প্রফেসর ব্যানার্জীকে বললেন, "এরা এসেছিল আশার বাণী শোনার জন্যে। কিন্তু ডক্টর হরিহরণ এদের যে সমস্ত কথা শোনাচ্ছেন তাতে তো এদের নৈরাশ্য চরমে উঠে এরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে।"

প্রফেসর ব্যানার্জী জবাবে শুধু মাথাটা ওপর নিচে বাঁকালেন। "ভদ্র-মহোদয়গণ," সমস্ত আওয়াজ ছাপিয়ে ডক্টর হরিহরণের গলা ভেসে এল—"দ্বিতীয় চিঠিটি পাঠিয়েছেন জাপানের জনৈক ভদ্রলোক। তিনি জানতে চেয়েছেন এই পরিবর্তনের প্রতিকার আমাদের জানা আছে কিনা। উত্তর: না নেই।"

জনতার মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় আরো তীব্র হয়ে উঠল। কয়েক পাটি চটি মঞ্চের ওপর এসে পড়ল। গালিগালাজের তীব্রতা আরো বেড়ে গেল। কিন্তু তবুও সব কিছু অগ্রাহ্য করে ডক্টর হরিহরণ বলে চললেন, "আমার পাওয়া তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম চিঠিটি এসেছে যথাক্রমে পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ব্রেজিল থেকে। এদের সবার মূল প্রশ্ন এক: অবস্থার কি উন্নতি ঘটবে? এই প্রশ্নের উত্তর: না, এ অবস্থার ক্রমেই অবনতি ঘটবে। সত্যি বলতে কি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পৃথিবীর বুক থেকে সব আলো চিরতরে মুছে যাবে।"

ক্ষিপ্র জনতার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। যে হাতের সামনে যা পেল তাই নিয়ে কাটাতারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে উন্মত্তের মতো মঞ্চের দিকে ছুটে চলল। মঞ্চ ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপত্তা বাহিনী রাইফেল উঁচিয়ে ধরল, দরকার হলে গুলি করবে।

কিন্তু কিছুই হল না, প্রফেসর হালদার, প্রফেসর ব্যানার্জী, সবাই দেখল এক এক করে ফ্লাডলাইটগুলো নিভে যাচ্ছে।

এক এক করে সমস্ত আলো নিভে যাবার পর, মাথার ওপরের বেগুনি চাঁদ আর টিমটিমে তারাগুলো অন্ধকার আকাশের বুকে মিলিয়ে যাবার পর, খানিকক্ষণ সমস্ত নিস্তব্ধ রইল। তারপর মাইক্রোফোনে আবার ভেসে এল ডক্টর হরিহরণের কণ্ঠস্বর—"মানব সভ্যতার এইখানেই ইতি। দুর্ভেদ্য এই অন্ধকারের ভেতরেই হবে তার কবর।"

আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল সমস্ত স্টেডিয়ামের ওপর। কতক্ষণ যে দুই প্রফেসর চুপ করে বসে রইলেন তার হিসেব তারা নিজেরাই ভুলে গেলেন। হঠাৎ প্রফেসর হালদারের ঘোর কেটে গেল, কানে ভেসে এল কয়েকটা গানের কলি—অন্ধকারেই কেউ গাইছে:

অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রু বাদল ঝরে,
কোথায় আলো কোথায় আলো, আকাশ ভরা কালোয় কালো।

প্রফেসর হালদারের চোখের কোল বেয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

প্রথম প্রকাশ: ফ্যানট্যাসটিক, এপ্রিল, ১৯৮২
বিদেশী ছায়ায়
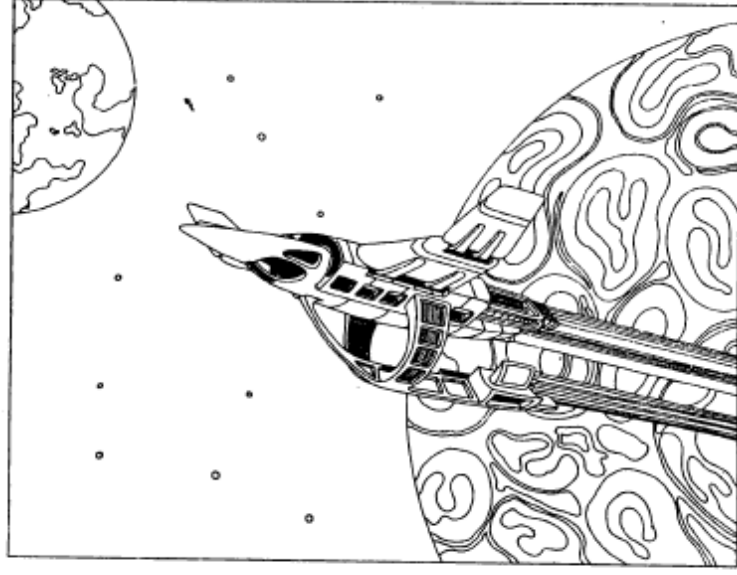
সূচিপত্রে ফিরে যান

ঘাড় বেঁকা পরেশ

মনোজ বসু

পরেশকে দেখেছেন? একবার দেখলে আর ভোলা যাবে না। ঘাড় বাঁদিকে বাঁকানো—বাঁহাত বাঁ-পায়ের সমসূত্রে। ভাল সার্জন দিয়ে অপারেশন করিয়েছে। একবার নয়, তিন তিনবার। বাঁকা ঘাড় সোজা হয়নি। হবে না, জানা কথা। কিন্তু মন বোঝে না—অকারণ অর্থনষ্ট। শুনুন বলি, সোজা ঘাড় কেমন করে বাঁকল।

বউ বনেদি ঘরের মেয়ে। ভাই নেই, চার বোন তারা। মায়ের যা ছিল, চার বোন ভাগ করে নিয়েছে। সেরিব্রাল থ্রম্বসিসে পরেশের বউ হঠাৎ মারা গেল। রোগের শুরু থেকেই অচেতন—মরার আগে একটি কথাও সে বলে যেতে পারেনি।

দুই ছেলে, এক মেয়ে। বিধবা দিদি আছেন সংসারে—দিদির উপর ছেলেমেয়েদের ভার চাপিয়ে পরেশ হিমালয়ে বেরুল। লোকে বলছে, আহা রে, পত্নী শোকে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গেল। হৃষীকেশের কাছে এক আশ্রমে আস্তানা নিয়েছে। পাহাড়-পর্বতে বনে-জঙ্গলে অহরহ ঘুরে বেড়ায়—সাধু-সন্ন্যাসী সিদ্ধপুরুষের খবর পেলেই চলে যায় সেখানে, যতদূর যত দুর্গমই হোক সে জায়গা। সৎপ্রসঙ্গ হয়, পরলোক-ঘটিত ব্যাপারগুলো পরেশ বেশি করে জানতে চায়। একটা সন্ধান পেতে চায় সে বউয়ের কাছ থেকে। মণি মাণিক্যখচিত পুরানো জড়োয়া হার একটা, লক্ষাধিক টাকা দাম, শাশুড়িঠাকরুণ চুপিচুপি তাকে দিয়েছিলেন। অন্য সবকিছু পাওয়া গেল, কিন্তু জড়োয়া হার বউ যে কোথায় রেখে মারা গেছে—ঘরবাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও মিলল না। বের করে দিয়ে যাক একবার এসে। আসা নিতান্তই যদি অসম্ভব হয়, জিনিসটা কোথায় আছে জানিয়ে দিক পশু-পাখি কিম্বা পেত্নী-শাকচুন্নির মারফতে (মানুষ কদাপি নয়—ঋষিতপস্বী হলেও নয়, কারণ সে ক্ষেত্রে পাচার হবার সম্ভাবনা থেকে যায়)।

ত্রিকালদর্শী এক মহাসাধুর বৃত্তান্ত শুনে পরেশ তাঁর খোঁজে চলল। ভারি দুর্গম জায়গায় থাকেন তিনি। রাত থাকতে বেরিয়েছে, যাচ্ছে তে যাচ্ছেই। পাহাড় জঙ্গল কত যে পার হল, অবাধ নেই। অধ্যবসায়ীর অসাধ্য কিছু নেই, অপরাহ্ন বেলা অবশেষে পৌঁছে গেল। দর্শনও মিলল। ভক্তি-গদগদ হয়ে সে সাধুমহারাজের পাদবন্দনা করল। এবং একতাল মিছরি ও রকমারি ফলমূল-মিষ্টান্ন পাদপদ্মে নিবেদন করে যুক্ত করে বসে আছে আশীর্বাদ লাভের প্রত্যাশায়। পরেশের পানে মহারাজ একদৃষ্টে তাকিয়েই আছেন, শব্দসাড়া দেন না কিছু। অবস্থা দৃষ্টে আখড়ার দুনম্বর সাধু চোখ টিপে পরেশকে কাছে ডেকে বললেন, মৌনীবাবা—সারাদিন সারারাতি ধন্না দিয়ে থেকেও সিকিখানা কথা বের করতে পারবে না বাপু।

পরেশ হাহাকার করে ওঠে: আমি যে বিস্তর আশা নিয়ে বহুদূর থেকে এসেছি—

তার জন্যে ভাবনা নেই। মহারাজ অন্তর্যামী—মনের আশা খুলে বলতে হবে কেন, উনিই মন থেকে টেনে বের করে যথাবিহিত ব্যবস্থা করছেন। করা হয়েই গেছে হয়তো

এতক্ষণে।

এ হেন পাইকারি আশ্বাসে পরেশ তৃপ্তি পায় না। বহুদর্শী দু-নম্বর বুঝলেন সেটা। জমিয়ে গল্প আরম্ভ করলেন। মহারাজ-বাবার ইহলোক ও পরলোক ঘটিত বিবিধ তাজ্জব ক্রিয়াকর্ম। দস্তুর মতো রোমাঞ্চকর। বিশ্বাস করো চাই না করো, গল্পের সমাপ্তির আগে কার কার সাধ্য উঠে পড়ে!

কতক্ষণ কেটে গেছে, পরেশের হুঁশ নেই। গুম-গুম-গুম—মেঘগর্জন! সচকিত হয়ে সে উপরমুখো তাকায়। সর্বনাশ, মেঘে আকাশ ঢেকে গেছে। পালা, পালা—

দ্রুত নামছে পাকদণ্ডীর পথ ধরে। উঠতে সময় লেগেছে—নেমে পড়তে কষ্ট কম, সময়ও কম লাগবে। ঘোর অন্ধকার—সে এমন, পথ তো পথ—নিজের হাত-পাগুলো চেনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বৃষ্টি নামল ছড়ছড় করে, সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস। ক্ষণে ক্ষণে গাছতলায় আশ্রয় নেয়, বৃষ্টি কমলে আবার হাঁটে। কতক্ষণ ধরে যাচ্ছে এমনি শঙ্কা জাগল, দুর্যোগের মধ্যে পথ ভুল করেনি তো? জনপ্রাণী দেখা যায় না যে জিজ্ঞাসা করে নেবে।

বৃষ্টি থামল অবশেষে। অন্ধকারও চোখে সয়ে এসেছে—চারিদিকে আবছা রকম নজর চলে। হঠাৎ দেখা যায়, সামান্য দূরে দীর্ঘদেহ একজন। অতি দ্রুত চলেছে।

পরেশ যেন হাতে স্বর্গ পেল। ডাকছে: ও মশায়, শুনছেন, হৃষীকেশ আর কদ্দূর?

সেই দীর্ঘদেহী খিক-খিক করে উৎকট হাসি হেসে উঠল: এদিকে কোথা হৃষীকেশ? পাহাড়ের একেবারে উল্টোদিকে। সারারাত হেঁটেও হৃষীকেশ পাবিনে।

পরেশ আর্তনাদ করে উঠল: মশায় গো, পথ হারিয়ে ফেলেছি। মারা পড়ব, একটা আশ্রয় কোথায় পাই বলে দিন।

যাবি কোথা?

পরেশ বলে, অ্যান্টিবায়োটিক কারখানার কাছাকাছি গেলেই সেখান থেকে চিনে আমি আপন ডেরায় যেতে পারব।

সেই লোক বলে, আমি ঐদিকেই যাচ্ছি। চলে আয় আমার পিছু পিছু।

থেমে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, আবার সে চলল। চলা মানে রীতিমত দৌড়ানো। পাহাড়-জঙ্গল ভেঙে দৌড়চ্ছে—কিছুই যেন তার গায়ে লাগে না।

পরেশ কাতর হয়ে বলে, আস্তে চলুন মশায়। অত জোরে পেরে উঠিনে আমি।

জোরে কে বলল? আস্তেই তো যাচ্ছিরে। জোরে যাওয়া দেখতে চাস?

পরেশ তাড়াতড়ি বলে, আজ্ঞে না। যা দেখছি, এতেই চক্ষু ছানাবড়া। বয়স হয়ে গেছে, ছুটোছুটি পেরে উঠিনে।

বয়স—কত বয়স তোর, শুনি।

পরেশ বলল, আজ্ঞে, পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই করেছি।

তিন-পঞ্চাশং দেড়শ' বছর—আমার বয়স তা-ও ছাড়িয়ে গেছে। থপথপিয়ে চলিস—সেটা বয়সের জন্য নয়। গুচ্চের হাড়-মাংস-চর্বি বয়ে বেড়াচ্ছিস, দেহখানি পাল্লায় তুলে দিলে ওজনে দেড় মণ দু-মণ দাঁড়াবে। এত বোঝা চেপে থাকলে ছুটোছুটি হয় না। যখন বেঁচে ছিলাম, আমারও ঐ রকম ছিল রে—বাতে ধরেছিল, হাঁটতেই পারতাম না, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে

চলতাম। মরে গিয়ে কত সুখ এখন দেখ। বাতাসের মতন হালকা হয়েছি, যেখানে খুশি পলকে চলে যাই।

তারপর আবদারের ঢঙে আদুরে গলায় ভূত বলে, মরবি? হ্যাঙ্গামা নেই, গলা টিপে এক সেকেণ্ডে শেষ করে দিচ্ছি। দেখতে পাবি, কী মজা তখন। মর্ না রে!

সভয়ে পরেশ বলে, আজ্ঞে না। একবার মরে তারপরে যদি ইচ্ছা হয়, আবার তো বাঁচতে পারব না।

ভূত বলে, তা পারবি নে বটে। কিন্তু ইচ্ছেই হবে না—নিজের অভিজ্ঞতায় বলে দিচ্ছি। বেঁচে থাকার ঝঞ্ঝাট কত! দেহ বয়ে বেড়ানোর মুটেগিরি তো আছেই, আবার যা দিনকাল—ঐ দেহটা ধারণ করে থাকাই বড় চাট্টিখানি কথা নয়। মাছ-তরকারি চাল-ডাল অগ্নিমূল্য। আমরা বাতাসে বুড়ো আঙুল নাচাই: চালের কুইন্টাল হাজার টাকা হোক না—আমাদের এই কলা!

পরেশ কেঁদে পড়ল: মরার মজা বুঝে নিয়েছি ভূতমশায়। কিন্তু তিন ছেলে-মেয়ে আমার পায়ের শিকল। আমি নিজে স্ফূর্তিতে থাকব, কিন্তু বাচ্চারা ভেসে যাবে একেবারে। মরাটা এখন মুলতুবি থাক। দয়া করে আপনি হৃষীকেশের কাছ বরাবর পৌঁছে দিন, চিরকাল আমি কেনা গোলাম হয়ে থাকব।

ভূত তখন সদয় হয়ে বলে, চল্ তবে। এমনি ছুটে পারবিনে, আমি তোর হাত ধরে, ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।।

ধরতে গিয়ে ভূত তিড়িং করে পিছিয়ে গেল: উ-হু-হু, তোর পায়ে লোহা আছে নাকি রে বেটা? হাত পুড়ে গেল আমার।

গলায় গুচ্চের মাদুলি—পরেশের খেয়াল হল। একটা তার মধ্যে লোহারই বটে। লোহার মাদুলি ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। ভূত বলে, লোহায় আমাদের ভয়। লোহা ছুঁলে আগুনের ছ্যাঁকা লাগে। আর একটা জিনিস তোকে মানা করে দিচ্ছি। আমার সঙ্গে যতক্ষণ আছিস, সামনে ছাড়া কোন দিকে তাকাবি নে। ডাইনে বাঁয়ে পিছনে—কোন দিকে নয়। খবরদার!

যেই না ভূত মশায় হাত এঁটে ধরেছে—পরমাশ্চর্য ব্যাপার, পরেশ সঙ্গে সঙ্গে পাখির মতন হালকা। ভূত হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের উপর দিয়ে ঘন জঙ্গল ভেদ করে আবেশে চলেছে—গাছপালা গায়ে বাধে না, শক্ত পাথরের ঘা লাগে না। ঝর্ণা পথে পড়লে দুই পা একত্র করে ভাসতে ভাসতে স্বচ্ছন্দে পার হয়ে যায়। মরা-লোকে একখানি মাত্র হাত ধরেছে তাতেই এমন, আর নিজে মরবার পরে না জানি আরও কত সুখ!

সাঁ সাঁ করে ভূত এক উচু পাহাড়ের উপর নিয়ে এলো। নিচে আঙুল দেখায়-আলোর সারি সেখানে। বলে, চিনতে পারছিস, হৃষীকেশের অ্যান্টিবায়োটিক কারখানা। এবারে যেতে পারবি তো?

যে আজ্ঞে। বড় বাঁচিয়ে দিলেন আপনি আজ—

কৃতজ্ঞতায় গদ গদ হয়ে পরেশ ভূতের পদধূলি নিতে যায়। কিন্তু পা কোথায়—খানিকটা ছায়া মাত্র। ছায়ায় ধুলা লাগে না। পায়ের কোন স্পর্শই পেল না। ভূত বলে, ঐ হয়েছে। নেমে যা এইবারে। আমিও বাড়ি এসে গেছি। ঢুকে পড়ব।

পরেশ শুধায়: কোথায় আপনার বাড়ি?

এই পাহাড়ের নিচে—তোর কি দরকার—তুই চলে যা।

হাত ছেড়ে দিল ভূত। পরেশ তরতর করে নেমে যাচ্ছে। হঠাৎ চড়-চড়-চড়াৎ—পিছন দিকে প্রচণ্ড আওয়াজ। দুনিয়া চুরমার হয়ে গেল বুঝি। ঘাড় ফিরিয়ে পরেশ দেখল, যেখানটা এইমাত্র দাঁড়িয়ে কথা বলছিল—সেই পাহাড় দুদিকে দুই খণ্ড হয়ে হাঁ করে পড়েছে। ফাঁকের ভিতর দিয়ে পাতাল-তল অবধি নজর যায়—পথঘাট ঘরবাড়ি সেখানে, লোকজন কিলবিল করছে। টুপ করে ভূত তার মধ্যে গিয়ে পড়ল। আর, ঝিনুক যেমনধারা মুখ বন্ধ করে, ফাটাপাহাড় দু-পাশ দিয়ে এসে বেমালুম জুড়ে গেল। জঙ্গল, পাথর, ঝর্ণা—ঠিক আগেকার মতোই। গভীর রাত্রে নির্জন পাহাড়ে এই কাণ্ড ঘটে গেল, সামান্য মাত্র নিদর্শনও আর পড়ে নেই। নিচে অদূরে অ্যান্টিবায়োটিক কারখানা বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করছে। কারখানার পাশ দিয়ে থপ থপ করে পা ফেলে একলা পরেশ আস্তানায় ফিরছে।

পাহাড় কাটার আওয়াজে পাশে সেই যে ঘাড় ফিরিয়েছিল, ভূতের মানা মনে ছিল না তার—সেই ঘাড় কিছুতে আর সোজা হল না। পরেশের মুখ বাঁদিকের ফেরানো—বা কাঁধের সমসূত্রে।

প্রথম প্রকাশ : ফ্যানট্যাসটিক, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬

সূচিপত্রে ফিরে যান

পৃথিবীর শেষদিন

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

এক

গোটা দক্ষিণ দিগন্ত জ্বলছিল। দাউ দাউ আগুনে। যেন একখণ্ড গাঢ় নীল কাগজের কোনায় কোন ধূর্ত বালক অগ্নি সংযোগ করবার পর, শিখা অত্যন্ত আচমকা গোটা কাগজ খণ্ড গ্রাস করতে চাইছে। কিংবা বলা যায় বৃহত্তর কোনো উৎসব হচ্ছিল বিশাল নীল সামিয়ানার নীচে—দৈব দুর্ঘটনায় তার কোনে লাগা আগুন সূর্যরথের তীব্র গতিবেগ নিয়ে সমগ্র সামিয়ানাময় ছড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে। আর তখন, ঠিক তখনই উৎসব আঙিনার অসংখ্য মানুষ যেমন পরিত্রাস চিৎকারে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে চায়, ঠিক তেমনি করেই সেদিন গোটা পৃথিবী শিউরে উঠেছিল। জাভরেল ব্যাংক থেকে প্রথম ঘোষণা এল: পৃথিবী বিপন্ন... পৃথিবী বিপন্ন... দক্ষিণ দিগন্তে আগুন। ইংলণ্ডের অযুত খ্রিস্টধর্মী ভ্রাতৃবৃন্দ... হ্যালো আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মান... পৃথিবী বিপন্ন... কারণ এরূপ অনুমেয় যে, সম্ভবত কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ কি দুর্বিপাকে ইথারে আগুন লেগেছে। ...কিংবা এমনও হতে পারে এই অগ্নিসংযোগ ঘটে বায়ুস্তরে। আমরা এক ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছি।

ভারত সাড়া দিয়েছে; হ্যালো হ্যালো বিশ্ববাসী বিশ্বের তামাম বিজ্ঞানী ভ্রাতৃবৃন্দ, সম্ভবত কলির শেষ অদ্যই। এ-পৃথিবীর শেষ দিনটি আজই। ১৪ই অক্টোবর... আজ মহাষ্টমী—দশভুজার করাল গ্রাসে...

আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন, আরব প্রাচ্য—সর্বত্রই ওই এক কথা—আজ ১৪ই অক্টোবর... পৃথিবীর শেষ দিন। কারণ দক্ষিণ দিগন্তে লাগা আগুন ক্রমশ এগিয়ে আসছে। তার লকলক লেলিহান জিহ্বা গোটা আকাশ গ্রাস করে ফেলবে মুহূর্তের মধ্যে।

দেখতে দেখতে কথা অন্য রকম। বক্তব্য রূপান্তরিত। জাভরেল ব্যাংক ঘোষণা করল—না, ইথারে কি বায়ুস্তরে অথবা আকাশপটে আগুন ধরে নি। ব্যাপারটি অন্য রকমের। একটি আগুনের রকেট, অস্বাভাবিক ধরনের আকারের—সেটি দক্ষিণ দিগন্তের দিক থেকে তীব্র গতিতে ছুটে আসছে। সম্ভবত গতিবেগ ঘণ্টায় ৬৩ হাজার মাইল।

ভারত বলল: এই মাত্র, এই আর কি, অদ্ভুত দর্শনের একটি কিম্ভূত অগ্নি-রকেট আমাদের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। নিমেষের মধ্যে। চীন বলল: ওই যাচ্ছে, ওই। রাশিয়া বলল, আমাদের তৈরি, আমাদের দিকেই আসছে। ফ্রান্স বলল, ওটা আমাদের ওখানেই নামবে। হে মিত্ররাষ্ট্র, যে কোনো সময়ে তোমাদের সাহায্য আমাদের প্রয়োজন। ডাকলেই আসবে। আমেরিকা বলল: অগ্নি-রকেটের গতি দেখে মনে হচ্ছে আমাদের এখানেই নামবে। জাপান বলছিল, আসলে ওই অগ্নিশলাকাটি গোটা আকাশে চক্কর খেতে খেতে নেমে আসছে। বাস্তবিক পৃথিবীর ওপরের বিশাল নীল সামিয়ানা তথা নভোমণ্ডলের কখনও পুবদিক, কখনও পশ্চিম, এই উত্তর ওই দক্ষিণ এবং মধ্য ভাগে দাউ দাউ আগুন জ্বলছিল। আর সে আগুন নেমে আসছিল ক্রমশ নীচে। আরও নীচে, আরও...

অগ্নি-রকেটটি অবশেষে আমেরিকার মাথার ওপরে এসেছে। নামল, নামল, নেমে আসছে। সারা আমেরিকায় শহরে শহরে সোরগোল, সেনাবাহিনীর লোকেরা ছুটোছুটি করছে। বিজ্ঞানীরা তটস্থ। নিউইয়র্কের মাথার ওপর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়েছিল অগ্নি-রকেট। তারপর নিমেষে সে প্যারেড গ্রাউণ্ডে নেমে এল। দু'মুহূর্তের মধ্যে আধুনিক সমরাস্ত্র ও সৈন্য দিয়ে ঘেরাও করে ফেলেছে গোটা প্যারেড গ্রাউণ্ড। শান্ত স্তব্ধতা। একটি আদেশের অপেক্ষা কেবল।

অগ্নি-রকেটটি মাটিতে নামলে, তার দ্যুতি নিভে গিয়েছিল। নিভন্ত রকেটটি বাস্তবিক অদ্ভুত-দর্শনের। কোন্ ধাতুর তৈরি ধরা মুস্কিল। আকার অনেকটাই ভারতীয় ছিপ নৌকার মতন। উঁচু চৌদ্দ কি পনের ফুট। লম্বা ত্রিশের ওপরে। ওর ভেতর থেকে কথা আসছিল : আপনারা হে পৃথিবীর শান্তিকামী, অগণন অজ্ঞ অশিক্ষিত এবং নিরীহ মানুষ, আপনারা ভীত হবেন না। ভীত হবার কোনো কারণ নেই। আমি কোনো ক্ষতি করতে আসিনি। শনি গ্রহের শান্তিকামী, অসংখ্য মানুষ ও বিজ্ঞানীরা আপনাদের প্রতি প্রকৃত দয়াপরবশ। তাঁরা আমাকে দূত রূপে প্রেরণ করেছেন। না করে থাকতে পারেন নি। কারণ পৃথিবী শিগগীরই নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। অচিরেই সেটা হবে। সম্ভবত আপনারা জানেন না; এই পৃথিবী অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে মহাকাশে এক তীব্র বিরোধ চলছে। মঙ্গলগ্রহ দাবী জানিয়েছে, পৃথিবী তাদের। চাঁদের বিজ্ঞানীরা বলছে পৃথিবী যেহেতু তাদের গ্রহ অতএব এর সকল স্বত্ব তাদের। বৃহস্পতি, নেপচুন, শুক্র পর্যন্ত দাবি জানিয়েছে। আপনারা জ্ঞাত নন যে, অচিরে এক লড়াই বাধবে। গ্রহের সঙ্গে গ্রহের হবে ভয়ানক যুদ্ধ। ফল স্বরূপ বলা যায়, সমগ্র পৃথিবীটাই ধ্বংস হবে...

প্যারেড গ্রাউণ্ড ঘেরা সৈন্যদলে গুঞ্জন উঠল। কমাণ্ডার জানাচ্ছিলেন, এ-সকল কথাই ভুয়া, বানানো কথা। আসলে অদ্ভুত যানে আগন্তুক ব্যক্তিটি পৃথিবীর তথ্য নিয়ে ফিরে যেতে চায়। আমরা কিছুতেই তাকে ফিরে যেতে দিতে পারি না।

'আমি এবার আপনাদের সামনে বেরোবো। আমার কথাগুলি মিথ্যে বলে
গ্রহণ করলে আপনারা ভুল করবেন। কারণ আমরা শনি গ্রহের মানুষরা মিথ্যে বলে কোনো শব্দ জানতাম না। কেবলমাত্র কতিপয় ব্যক্তি ভারতীয় ভাষা থেকে ঐ কথাটি আমার শিখেছি...' প্যারেড গ্রাউণ্ডের মধ্যে অদ্ভুত যানের ভেতর থেকে লোকটি বলছিল। 'আমি এসেছি পৃথিবীর সকল বিজ্ঞানীদের ডেকে একটি সমাধানে পৌঁছোতে। আপনারা বাধা না দিলে খুশীর কারণ হবে...'

গ্রাউণ্ড ঘেরা সৈন্যদল ততক্ষণে তৈরি। চারপাশে ট্যাঙ্কে ট্যাঙ্কে ঘেরাও করা হয়েছে। সৈন্যদল আধুনিক মেশিনগান তুলে আছে। একটি পারমাণবিক কামানও তৈরি। লোকটি বলে যাচ্ছিল। গোটা এলাকা নিঃশব্দ। উৎকণ্ঠা উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষমান গোটা বাহিনী।

ওরা ভেবেছিল শব্দ হবে। কিন্তু শব্দ হল না। বিস্ময়ের সঙ্গে সবাই দেখল একটি দরজা খুলে গেল। ভেতর থেকে যে বেরিয়ে এল, সে কিম্ভুতদর্শন জন্তু নয়, মানুষ। ছ ফুটের চেয়েও কিছু বেশি লম্বা। চওড়া কাঁধ। প্রশস্ত বক্ষ, মাথায় টুপি। সারা শরীর অভ্র রঙের শক্ত পোশাকে ঢাকা। লোকটি বেরিয়ে এসে কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে পৃথিবীর লোকদের প্রতি

শ্রদ্ধা জানাল। সে দেখল, হয়ত অনুমানও করেছিল যে, এর বেশি এগুতে গেলে তার ওপর আক্রমণ চলবে।

কুর্নিশ সেরে লোকটি মাথা তুলে হাসল। বলল, ‘বৃথাই এত আয়োজন। প্রথমত, হে পৃথিবীবাসী, বন্ধু আমেরিকাবাসী, আমি লড়াই করতে আসি নি। আপনাদের সামনে সমূহ বিপদ, সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানী এবং মনীষীদের ডেকে আপনারা সম্মেলন করুন। সেই সম্মেলনে আমি আমার বক্তব্য রাখব। সব শুনে আপনারা নিজেদের কর্তব্য স্থির করবেন। আমি তার ওপর জোর করব না। বরং আমাকে আপনারা বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ করে দিন। আমি তাঁর আতিথ্য...’ বলতে বলতে লোকটি দু’পা এগোল। আর সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে গেল ঘটনাটা। দুটি ট্যাঙ্ক গর্জে উঠল। অব্যর্থ আঘাত।

না, লোকটি পড়ল না। গোলা দেহ ছুঁতে পারে নি। লোকটির সারা দেহের ফুট দুয়েক আগে ধাক্কা খেয়ে দুটি গুলি উর্ধ্বে উঠে গিয়ে ফেটেছিল। তাবৎ সৈন্যরা অবাক।

লোকটি হাসছিল। সে বলছিল, ‘হে পৃথিবীর অজ্ঞ অশিক্ষিত বন্ধুগণ, আপনারা ভুল করেছেন। সমস্ত পৃথিবীতে এমন অস্ত্র তৈরি হয় নি, যা দিয়ে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় শনিগ্রহের মানুষকে আপনারা ঘায়েল করতে পারেন। আমার শরীরে পাওয়ার নাইন রয়েছে। এ এক ধরনের বিজলী আবরণ। সকল আঘাতই, যে কোন ধাতুর তৈরি হোক তা এই পাওয়ার ফিরিয়ে দিতে পারে। পরন্তু জেনে রাখুন, ইচ্ছে করলে আপনাদের সকল মারণাস্ত্রকে আমি তরল পদার্থে
পরিণত করতে পারি...’

বাস্তবিক বলার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ। লোকটির শরীর থেকে অনেকগুলি সবুজাভ আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হল। এবং তা সবগুলি ট্যাঙ্ক, সকল সৈন্যের হাতের অস্ত্র, কামানকে গলিত ধাতুতে পরিণত করল। এবং সেই গলিত ধাতু স্রোতের মতন বয়ে যেতে লাগল। লোকটি হাসছিল। ‘বন্ধুগণ, আপনারা ভয় পাবেন না। আমি পাওয়ার নাইন গুটিয়ে নিচ্ছি। আপনারা আসুন, করমর্দন করুন। দেখবেন আমি আপনাদের মতোই সহজ সাধারণ মানুষ।’

লোকটি এসেছিল।

কর্নেল স্মিথ অসহায় সেনাবাহিনীর ক-জনকে ডেকে ততক্ষণ পরিকল্পনা করে ফেলেছেন। মাইকে স্মিথ বললেন, তাঁরা লোকটিকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করছেন। স্মিথ এগারোজন সামরিক নেতা নিয়ে লোকটির দিকে এগোতে থাকলেন। লোকটিও আসছিল। কিন্তু সে জানত না, পৃথিবীর লোক তার চেয়ে অনেক বেশি ধূর্ত। লোকটি আসতে আসতে বলছিল, ‘আমি জানতাম, অজ্ঞতা আপনাদের সরল করে রেখেছে। আপনারা সত্যাগ্রহের দেশের লোক। শান্তিকামী জনতা! হে বন্ধুগণ...’

কাছাকাছি হতেই ঘটনাটা ঘটে গেল। ন-জন সামরিক নেতা আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল শনিগ্রহের মানুষটির ওপর। দু’ মুহূর্ত বুঝি ঝাপটাঝাপটি হয়েছিল। ততক্ষণে আমেরিকান সামরিক জোয়ানরা লোকটিকে কাবু করে ফেলেছে। ওরা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে শনিগ্রহের আগন্তুককে।

স্মিথ বললেন, 'অমন বিপদের কথা আমরা হাজারবার শুনেছি। আসলে তুমি অন্যগ্রহের গুপ্তচর। পৃথিবীর তথ্য নিয়ে তোমাকে আমরা ফিরে যেতে দিতে পারি না।'

লোকটি অসহায়ের গলায় বলল, 'আপনারা ভুল করছেন।'

'এরকম ভুল করতে আমরা ভালবাসি...' স্মিথ হাসছিলেন।

'আমাকে আটকে রাখার ব্যাপারটা আকাশ-কুসুমের মতন কল্পনা।'

'বাঙালীকে দোষ দিলেও আমরা অর্থাৎ তামাম বিশ্বের মানুষরাই কল্পনা বিলাসী।' স্মিথ তাঁর মাথার টুপিটি খুলে বগলে নিয়ে চুরুট ধরালেন। 'বিজ্ঞানে আমরা খুব পিছিয়ে নেই। তোমার শরীরের কোথায় কি আছে তা না জানলেও এটা বুঝতে পারছি, হাত মুক্ত হলেই তুমি আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে। অতএব তোমার হাতকে এখন অকেজো করে রেখেছি। রেখেছি এ-জন্যে যে, আঙুল দিয়ে শরীরের কোনো বোতামই তুমি টিপতে পারবে না।'

লোকটি অসহায়ের মতন হাসল। বলল, 'কথাটা ঠিক।'

'তবে এবার লক্ষ্মী বাছাধনের মতো চলো...' স্মিথ সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলেন।

দুই

লোকটিকে সবচাইতে সুরক্ষিত সেলে রাখা হয়েছিল। যেখানে দাঁড়িয়ে শনিগ্রহের মানুষ পিক ০০৯২ ভাবছিল, অভিনয় করে সে ভালই করেছে। বাধ্য ছেলের মতন ধরা না দিলে, লোকক্ষয় অস্ত্রক্ষয় হত। সে কারো ক্ষতি করতে আসে নি। তা ছাড়া সে একথাও ভেবে নিয়েছিল যে, তার শক্তির প্রমাণ বার বার দিলে পৃথিবীর মানুষরা হয়ত জব্দ হত। কিন্তু সুরাহা কিছু হবার রাস্তা থাকত না। শনিগ্রহের প্রেসিডেন্ট 'লুকো' তাকে মাত্র ৪৮ ঘণ্টা সময় দিয়েছেন। এর মধ্যে কাজ সেরে যেতে না পারলে তার কঠিন দণ্ড হবে। অতএব পিক ০০৯২ এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, বাধ্য ছেলের মতন ধরা দিয়ে, কৌশলে তাকে আইনস্টাইনের বাড়ীতে পৌঁছতে হবে। পৃথিবীর এই বিজ্ঞানীর প্রকৃত ঠিকানাটি সে ভুল করে ফেলে এসেছে। যে ভুলের জন্যও তার দণ্ড হওয়া স্বাভাবিক।

পিক ০০৯২ সেলের মধ্যে অপেক্ষা করছিল। কারণ কৌতূহলী জনতার ভিড় কয়েক ঘণ্টা থাকবে। সামরিক বাহিনীর লোকরাও তৎপর থাকবে কয়েক ঘণ্টা। এর মধ্যে বেরিয়ে পড়া মানেই আবার জটিলতার সৃষ্টি। পিক ভাবছিল, লোকজনের উত্তেজনা কমলে, ঠিক সন্ধ্যা নাগাদ সে বেরোবে। এমনভাবে বেরোবে যাতে কেউ ধরতে না পারে।

সমগ্র নিউইয়র্কে তখন হৈ-চৈ। পথে জনতা গিজগিজ করছে। একসঙ্গে সকল দৈনিক পত্রের টেলিগ্রাম বেরিয়েছে। বিচিত্র ব্যানার হেডিং দিয়ে। স্টেট সাকুর্লার বেরিয়েছে। ওরা বলেছে আন্তঃগ্রহ গুপ্তচরের আমেরিকা অবতরণ, কৃতি সেনাবিভাগ কর্তৃক গুপ্তচর ধৃত ইত্যাদি ইত্যাদি...

রাষ্ট্রসংঘ ভবনে বিশেষ জরুরী বৈঠক বসেছে।

আমেরিকান সেনাবাহিনী ঘিরে রেখেছে প্যারেড গ্রাউণ্ড।

বিকেলের দিকে আর একটি সাকুর্লার বেরুলো। জনসাধারণকে সাবধান করা হয়েছিল। রেডিও স্টেশন থেকে ঘোষণা করা হল। সেই সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে,

প্যারেড গ্রাউণ্ডে নামা রকেটটির কাছে কিছুতে যাওয়া যাচ্ছে না। পাওয়ার লাইনের বেড়া রয়েছে। বিজ্ঞানীরা বৈঠকে বসেছেন। তাঁরা রকেটটির সকল গুপ্ত রহস্য ভেদ করতে আগ্রহী। হয়তো আরও কয়েক ঘণ্টা পরে আমরা জানতে পারব পাওয়ার লাইন অতিক্রম করে বিজ্ঞানীরা রকেটটির সকল গুপ্ততথ্য আবিষ্কার করেছেন।

পিক সেলে বসে রেডিও-র ঘোষণা শুনে হাসছিল। সন্ধ্যা না নামাপর্যন্ত সে
অসহায়।

রাশিয়া, ফ্রান্স, লণ্ডন, ভারত, জাপান থেকে বিজ্ঞানীদের সবগুলো আকাশ যান নিউইয়র্কে পৌঁছালো সন্ধ্যা নাগাদ। সমগ্র আমেরিকার ঘরে ঘরে তখন প্রবল উত্তেজনা। রেডিও বলছিল: পাওয়ার লাইন অতিক্রম করতে গিয়ে এ-যাবৎ ১১৪ জন বিজ্ঞানী মারা গেছেন...

রাষ্ট্রপুঞ্জভবন থেকে বিজ্ঞানীর দল বেরোলেন। তখন সন্ধ্যা সামান্য ঘন হয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোক সেল এলাকার চৌহদ্দির বাইরে চিৎকার করছে। তারা আন্তঃগ্রহ গুপ্তচরের সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থী। অথবা দূর থেকে দেখতে পেলেও জনতা খুশি হবে এমন জিগির উঠছিল।

কিন্তু হায়, সকল প্রয়াস ব্যর্থ হ'ল।

বিজ্ঞানীরা যখন পৌঁছলেন, সেল তখন শূন্য। সেখানে কেউ নেই। পিক ০০৯২ অন্তর্হিত। দেওয়ালটা কেবল এমনভাবে কাটা আছে, যেন একটি মানুষের মতন। একটা দেওয়ালই শুধু নয়। পেছন দরজা পর্যন্ত যতগুলো দেওয়া আছে সবগুলোরই এক অবস্থা। দেখলে মনে হবে, পিক অনায়াসে এবং অক্লেশে তার শরীরে শক্তির ধারে দেওয়াল কেটে হেঁটে গেছে।

এক সেকেণ্ড কাটল না, সঙ্গে সঙ্গে রেডিও-র ঘোষাণা। আমেরিকার গুপ্তচর নিয়োজিত হল! সেল থেকে প্যারেড গ্রাউণ্ডে ফোন করে জানা গেছে, না রকেটটি উধাও হয়নি। অতএব পিক নিউইয়র্কেই আছে। সে আত্মগোপন করেছে। মার্কিন সরকার জরুরী ঘোষণা করলেন যে, লোকটিকে যে ধরে দেবে তাকে আড়াই লক্ষ ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে। রেডিও লোকটির দেহগত বিবরণ দিচ্ছিল।

সমগ্র নিউইয়র্কে তখন অধিক উত্তেজনা। যেন গোটা দেশ ফেটে পড়বে এই মুহূর্তেই। কয়েক হাজার গাড়ি আর মোটর সাইকেল ছুটল। কয়েক শো হেলিকপ্টার তুলে দেওয়া হল আকাশে। এরোপ্লেনে গোটা আকাশ এর মধ্যে ছেয়ে ফেলেছিল।

সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে সবে রাত ঘন হচ্ছে, এমন সময় পিক ০০৯২ আইনস্টাইনের বাড়িতে উপস্থিত। গোটা বাড়ি নিস্তব্ধ। লোকজন নেই। কাউন্টির এ দিকটা এমনই। পিক এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তার খুব ভাগ্য ভাল যে, নম্বরটি মনে করতে পেরেছিল। এবং ট্যাক্সিওয়ালা তাকে চিনতে পারেনি। আসবার সময় পিক ভেবেছিল, সে ট্যাক্সিওয়ালাকে ধন্যবাদ জানাবে। কারণ আইনস্টাইনের এই কাউন্টির বাড়িটির খবর সে পিককে না দিলে পিক নির্ঘাৎ আবার সেই ঝামেলায় পড়ত। ধরা পড়ত। ধরা পড়া মানেই বিলম্ব।

পাম সারির মধ্যেকার সবুজাভ আলোয় আলোকিত পথ ছেড়ে পিক বারান্দায়
উঠে এল। কেউ নেই। কেমন ফাঁকা ফাঁকা সব। পিক বাস্তবিক চিন্তায় পড়ল। কারণ সে ভেবে নিচ্ছিল, আইনস্টাইন সম্ভবত শহরে ফিরে গেছেন। বারান্দা ধরে হাঁটতে হাঁটতে

পিক হতাশ হচ্ছিল।

না, আলো জ্বলছে। পিক দাঁড়াল। বাঁ পাশের রুমে আলো জ্বলছিল। কাচের দরজার ফাঁক দিয়ে পিক দেখল। সে খুশি হতে পেরেছে।

দরজা বন্ধ না। ঠেলতেই খুলে গেল! পিক ভেতরে ঢুকেছে...

এখানেও কেউ নেই। এদিক ওদিক আতিপাতি করে খুঁজল পিক। না, নেই। হতাশ হয়ে সে সোফায় বসেছিল। ঠিক তখনই তার নজরে পড়ল টেবিলের ওপরের একটি কাগজ। নতুন থিওরীর একটি অঙ্কের খানিকটা করা রয়েছে। অসমাপ্ত অঙ্ক। পিক কাগজটি টেনে নিয়ে, পেন্সিলে বাকিটুকু করে ফেলেছিল মুহূর্তেই। শেষ করা অঙ্কের কাগজটি টেবিলে রাখতে যাবে এমন সময় গলা। হ্যাঁ মানুষের। পিক ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল এক বৃদ্ধ।

'কী চাও?' বৃদ্ধ বলছিল।

'আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করব।'

'কাগজ নিয়েছ কেন? জানো, আমার মনিব ওই নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।'

'দেখছিলাম।' পিক হাসল। 'ভারী কঠিন অঙ্ক তো!'

'নির্বোধ।' বুড়ো লোকটি পিককে গাল দিল। 'বিজ্ঞানের ব্যাপার। আমার মনিব পাওয়ার নাইনের ব্যাপারটা সলভ করতে গিয়েছিলেন।' বুড়ো এগিয়ে এল। 'জানো না বুঝি এক রকেটে আন্তঃগ্রহের এক গুপ্তচর...'

'তাই নাকি...' পিক বোকার মতন ভান করল।

'মূর্খ...' বুড়ো লোকটি আবার গাল দিল। 'সরে যাও। কর্তা আজ ওই অঙ্ক নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিলেন। মেলাতে পারেন নি। মাথার চুল ছিঁড়েছেন। দেখা হবে না আজ। তিনি রাষ্ট্রসংঘের জরুরী তলবে...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' পিক বুড়ো লোকটিকে থামাল। 'খুব জরুরী দরকার আমার। তা না হয় সকালে আসব। কখন এলে দেখা...'

'একটু বেলায়। কর্তার ঘুম ভাঙে একটু দেরীতে।'

'আচ্ছা।' পিক বিদায় নিল। 'পারলে বলো আমি এসেছিলাম। কাল আবার আসব...'

'বলব।' লোকটি বলল। 'শুভরাত্রি...'

রাস্তায় এসে পিক ভাবল, এবার সে কোথায় যাবে।

আইনস্টাইন ফিরে এলেন অনেক রাত্রে। সারা কাউন্টি তখন ঘুমে অচৈতন্য। গাড়িটি গেট পেরিয়ে ঢুকলে বৃদ্ধ চাকর ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু কর্তার মুখ চোখ পাংশু। চুল এলোমেলো। খুব বেশি চিন্তিত আছেন। চাকরটা তৎক্ষণাৎ কিছু বলে নি।

কর্তা সরাসরি বসবার ঘরে ঢুকলেন। টেবিলের দিকে যাচ্ছেন। বুড়ো চাকরটি বাইরে থেকে দেখছিল। এবং কর্তা হুমড়ি খেয়ে যেন টেবিলের ওপর পড়লেন। একটা মুহূর্ত। হঠাৎ কর্তা কাগজ তুলে নিলেন। চোখের সামনে ধরলেন। তারপরই ডাক। বুড়ো চাকরটা ভয় পেয়েছিল। সে কাঁপছিল। কারণ সে ধরে নিতে পেরেছে যে, আগের আসা লোকটি নিশ্চয় কাগজে কিছু আঁকিবুকি এঁকেছে।

'কে ধরেছিল এ কাগজ?' আইনস্টাইন শুধোলেন।

'আজ্ঞে, একটি লোক।'

কর্তার সারা মুখ কুঁচকে এল, 'লোক!'

'আজ্ঞে...'

'কোথা থেকে এসেছিল?'

'জানি না।'

'গিয়েছে কোথায়?'

'জানি না। বলে যায় নি।'

'কেন এসেছিল?'

'দেখা করতে।' বৃদ্ধ চাকরটি তখনও কাঁপছে। 'বললে, জরুরী কাজ। কাল সকালে আসবে বলেছে।'

কর্তা খানিক চুপ করে থাকলেন। কাগজটা বার বার তুলে তুলে দেখছিলেন।

'অপদার্থ', বুড়ো চাকর আপন মনে বলছিল। 'বেশি মাতব্বরি। ব্যাটা কাগজটা ধরে শেষ পর্যন্ত গোলমাল বাঁধিয়েছে!' সে পিকের উদ্দেশ্যে গালাগালি করছিল।

তিন

পিক ০০৯২ শহরে ফিরে যায়নি। যায়নি প্রধানত একটি কারণে। সে জানত ওখানে ফিরে যাওয়া মানেই ধরা পড়া। অতএব পিক কাউন্টির পথে হাঁটছিল। তাকে এখানে কোথাও আশ্রয় নিতে হবে। রাতটার মতন। কিন্তু কোথায়, কেমন করে সে আশ্রয় মিলবে পিক জানত না। সে ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে অবশেষে সে এরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, কোনো ভিলার মালিককে সে সরসরি গিয়ে প্রস্তাব করবে যে, সে বিদেশী। রাত্রির মতন তার আশ্রয় চাই। পিক ভেবেছিল। কিন্তু তার বরাত ভাল। কারণ পথেই এক তরুণীর সঙ্গে দেখা। সে-ও এপথে ফিরছে।

পিক সাহস সঞ্চয় করে কথা বলল।

'আপনাকে সামান্য বিরক্তি করতে পারি কি?

'বলুন।'

'দেখুন, আমি শনি... মানে শনিগ্রাম থেকে আসছি। দূরে যাব। পথঘাট সব অচেনা...'

তরুণী ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকাল, 'কোথা থেকে বললেন?'

'শনিগ্রাম।'

'সেটা আবার কোথায়?'

'কেন, কেন... ও আপনি বুঝি নামই শোনেন নি... তা হ্যাঁ, অত ছোট কাউন্টি—নাম না শোনবার মতোই...'

'বাড়িতে আমি একা।' তরুণী বলছিল। 'আমার স্বামীর নাইট ডিউটি। সম্ভবত তিনি এতক্ষণ রওনা হয়ে গিয়েছেন। এ অবস্থায়...'

'দেখুন, আমি খুব অসহায়...'

পিকের ভাগ্য ভাল, তরুণী জিনা শেষ অবধি তার প্রার্থনা রেখেছিল। রাতটা ভালভাবেই কেটেছিল তার। জিনা অতিথি সমাদর করেছে। খাইয়েছে। এবং রাত্রের শোবার ব্যবস্থা ভাল থাকায় অনেক বেলা পর্যন্ত সে ঘুমিয়েছিল। পিক জানত না বেলা অনেক।

জিনা তাকে এসে ডাকল। বলল, সমূহ বিপদ। পিক নাকি ধরা পড়লেও পড়তে পারে। কারণ জিনার স্বামী ভোর ভোর সকালে ফিরেছে। পিককে দেখার পর সে অনেক কথাই শুধেছিল। 'এমন কি একথাও বলেছিল যে, তুমিই সেই শনিগ্রহের মানুষ। অত লক্ষ লক্ষ ডলার... আমার স্বামী লোভী মানুষ—তুমি পালাও।'

পিক লাফিয়ে উঠল। বলল, 'সব কথাই কি বলে দিয়েছ নাকি?'

'হ্যাঁ', জিনা অপরাধীর মতন মাথা নীচু করল। 'এমন কি সকালে যে তুমি আইনস্টাইনের ওখানে যাবে তাও...'

'সর্বনাশ!' পিক তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিয়েছে। 'বিদায় জিনা। বিদায়... বিদায়... তোমার কথা আমার মনে থাকবে।'

'বিদায়...' জিনা বলল। 'তুমি নিশ্চিন্তে মহাকাশে না ওঠা পর্যন্ত আমার দুঃশ্চিন্তা ঘুচবে না। আমার স্বামী তোমাকে না জাগাতে বলেছিল। কারণ তা হলে তোমাকে ধরিয়ে দেবার রাস্তাটা সোজা হত।'

'আমি কৃতজ্ঞ...' পিক পড়িমরি করে ছুটল। নির্জন পথে।

'তা হলে তুমিই...'

'হ্যাঁ'

'কিন্তু অঙ্কটা তুমি অত সহজে, মানে কাটাকুটি না করে করলে?' আইনস্টাইন পিকের দিকে তাকাল। তাকিয়ে থাকল।

পিক অল্প অল্প হাসছিল। বলল, 'আমাদের গ্রহে এ অঙ্ক প্রাইমারী কোর্স...। ভাল ছেলেরা কিণ্ডারগার্টেনেই...'

'ও।' আইনস্টাইন চুপ। 'তা পৃথিবীর ভাষা তুমি শিখলে কি করে?'

'ট্রান্সমিটারেধরে ধরে। এই করে আমরা সকল গ্রহের ভাষা শিখেছি। স্কুল কোর্সেই এ-সব আমাদের শেখান হয়।'

আইনস্টাইন চিন্তিত হলেন। বললেন, 'চাঁদ-টাদ নিয়ে আপাতত আমরা ভাবছিলাম। শনিগ্রহে মানুষ আছে এবং তাঁরা...' আইনস্টাইন থামলেন। বললেন, 'তা হলে পৃথিবীকে বাঁচাবার জন্য তোমরা কি ভাবছ?'

পিক আবার হেসে ফেলল। 'মিঃ আইনস্টাইন, পৃথিবী বাঁচবে না। বাঁচতে পারে না। শনিগ্রহের শান্তিকামী মানুষ চায়, পৃথিবীর সকল লোককে শনিগ্রহে পুনর্বাসিত করা হোক...'

'হুঁ' আইনস্টাইন আবার চিন্তিত হলেন। খানিক পরে বললেন, 'যুদ্ধটা কোন্ সময়ে শুরু হবার সম্ভাবনা। কোন্ সালে?'

'১৯৬৫ সালের জানুয়ারীতে। বৃহস্পতি ও সময় পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করতে নামবে বলে জানিয়েছে।'

'তোমরা?'

'আমরা বাধা দেব।' পিক ০০৯২ বলল। 'আর সকল গ্রহই চায় পৃথিবী তাদের হোক। আমরা এর কোটি কোটি অশিক্ষিত লোককে পুনর্বাসন দিয়ে শিক্ষিত করতে চাই। যাতে তারা শনিগ্রহের সভ্য নাগরিক হতে পারে।'

‘আমাদের ভাবতে সময় দিতে হবে।’ আইনস্টাইন বললেন। ‘প্রথমত আমরা ভাবব, কোন উপায়ে আমরা আত্মরক্ষা করতে পারি। ভিন্ন গ্রহের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারি...’

‘অনেক বছর লাগবে।’ পিক হাসল। ‘তোমরা ছ’হাজার বছর পিছিয়ে আছ! ও সময়েও প্রতিরোধ শক্তি গড়া সম্ভব কিনা বিচার্য।’

পিক শেষ কথা বলেছিল যে, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই জানাতে হবে। তা না হলে এত উদ্বাস্তুকে শনিগ্রহে নিয়ে যাওয়ার কাজটি কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে।

জিনার স্বামী বেরিয়ে এসেছিল। সে পাকা খবর পেয়েছে। খবরটা সে দপ্তরে পৌঁছেও দিয়েছিল। হ্যাঁ, স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই সে এসেছে। জিনাকে আসতে বাধ্য করা হয়েছিল।

গুপ্তচররা ঘোরাঘুরি করছিল। শহরের উপকণ্ঠে তারা পিককে ধরতে গিয়েছিল। পারে নি। কারণ পাওয়ার নাইনের বোতামটি পিক ০০৯২ আগেই টিপে দিয়েছিল। ধরতে না পারলেও, খবর চলে গিয়েছিল প্রধান দপ্তরে। আবার তটস্থ অবস্থা।

পিক সবুজ আলোর রশ্মির বোতামটাও টিপে দিয়েছিল। ফলে নিউইয়র্কের সারা শহরের পথ দিয়ে গলা ধাতু জলস্রোতের মতন বইতে লাগল। বাড়ি, গাড়ি, অস্ত্র তৈরি যা ছিল সব গলে গিয়েছে। সমর বিভাগ তবু ক্ষান্ত নয়। তারা প্যারেড গ্রাউণ্ড ঘিরে অন্য সমরাস্ত্র নিয়ে তৈরি। জিনার স্বামীও স্ত্রীকে নিয়ে উপস্থিত ছিলেন।

পিক সকল বাধা অতিক্রম করে প্যারেড গ্রাউণ্ডের দিকে আসছিল। সারা নিউইয়র্কে তীব্র হল্লা এবং উল্লাসের পরিবর্তে হাহাকার পড়েছে। লোহা বা অন্যান্য ধাতুর তৈরি বাড়িগুলো গলে গলে যাচ্ছে। সারা পথে গাড়ি নেই। মাথার ওপরে বিমান ও হেলিকপ্টার গলে গিয়ে বৃষ্টির মতন গলা তরল ধাতু নেমে আসছে। একটানা সাইরেন বেজে যাচ্ছিল। মার্কিন বিজ্ঞান পরিষদ এবং সামরিক মহল তৎপুর। এমন সময় অঘটন ঘটল। পিক ০০৯২ প্যারেড গ্রাউণ্ডে ঢুকতেই আণবিক ছররা ছাড়া হয়েছিল। মুহূর্তে পিকের শরীর চালুনির মতন ঝাঁঝরা হল। পিক ০০৯২ নিহত হয়ে প্যারেড গ্রাউণ্ডে লুটিয়ে পড়ল। স্মিথ সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন। সমবেত বাহিনী জয়ধ্বনি করছিল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর এক ঘটনা ঘটল।

অমনি রকেটটি সামান্য নড়ে উঠল। তারপরেই সেই স্বর। ‘...পৃথিবীর অজ্ঞ অশিক্ষিত বন্ধুগণ, আপনারা ভুল করছেন। শনিগ্রহের মানুষের মৃত্যু নেই। পিক ০০৯২ এখন মরে পড়ে আছে। এ ওর ঘুম মাত্র। আমরা শনিগ্রহ থেকে সকল ব্যাপারটি লক্ষ্য করছি। পিককে আমরা এখনই সুস্থ করে তুলতে পারি। তাতে পাওয়ার তেরোর বিকিরণ ছাড়তে হবে সি নাইন থ্রি এক্স ফাইভ ট্রিপল জিরো ওয়ান ওয়ান রকেট থেকে। রকেটটি আপনাদের সকলের সম্মুখে রয়েছে। অসুবিধে এই, পাওয়ার তেরো ছাড়লে পৃথিবীর তামাম যানবাহন, কল-কারখানা সবকিছু অচল হয়ে পড়বে। ট্রেন থেমে যাবে। এরোপ্লেন বা শূন্যযান স্থাণুর মতন শূন্যে স্থির হয়ে থাকবে। সমস্ত পাওয়ার হাউসের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। বিজলী কাজ করবে না। আপনারা যদি এরূপ পরিস্থিতি করতে আমাদের বাধ্য না করান তবে জিনাকে ছেড়ে দিন। ওকে রকেটের দিকে আসতে উৎসাহিত করুন। আমরা শনিগ্রহ থেকে রকেটের মাধ্যমে কথা বলছি। নির্দেশ দিচ্ছি। সেই মতন কাজ করলে পিক ০০৯২ বেঁচে

উঠবে। এবং সে রওনা হবে। তার দেরি হয়ে যাচ্ছে ফিরতে... জিনা, জিনা—হে প্রিয়ভগিনী, আপনি এগিয়ে আসুন। পিক ০০৯২কে বাঁচান... বাঁচান... সোজা চলে আসুন রকেটে। সামনে রকেট... বাঁ দিকে নীল বোতাম টিপুন... দরজা খুলে যাবে... টিপুন দরজা খুলে যাবে...'

আশ্চর্য, জিনাকে আটকে রাখা যায় নি। যন্ত্রচালিতের মতন জিনা এগিয়ে গিয়েছিল। সে বোতাম টিপল। দরজা খুলে গেল। নির্দেশ মতন জিনা ভেতরে ঢুকল।

প্রায় কুড়ি মিনিট পর পিক ০০৯২ উঠে বসল। দাঁড়াল। জিনা তখনও রকেটের ভেতর।

'হে অজ্ঞ অশিক্ষিত পৃথিবীবাসী বন্ধুগণ, মনে রাখবেন উনিশ শ পঁয়ষট্টির একুশে জানুয়ারী আপনাদের পৃথিবীর শেষ দিন।' পিক কুর্নিশ করার কায়দা করে বলছিল। 'কোনো গ্রহ পৃথিবীর দিকে হাত বাড়ালে পাওয়ার জিরো দিয়ে আমরা পৃথিবী নিশ্চিহ্ন করব। অতএব বিদায়কালে অনুরোধ, আপনারা আমাদের প্রস্তাবটা পবিত্র মনে ভেবে দেখবেন।' ...পিক রকেটের দিকে যাচ্ছিল। কাছে যেতে জিনা বেরিয়ে এল। পিক করমর্দন করল। বলল, 'ভগিনী জিনা, তোমার কথা শনিগ্রহের সকল মানুষকে আমি জানাব...।'

অমনি রকেটটি নিমেষে শূন্যে উঠল। সারা আকাশে আগুন জ্বলল আবার। শব্দ নেই। সাড়ে সতেরো সেকেন্ডে আকাশের আগুন নিভে গেল। সমগ্র পৃথিবী দেখল গোটা আকাশ নীল। ঘন নীল। আকাশে সন্ধ্যাতারা ফুটেছে।

প্রথম প্রকাশ : আশ্চর্য!, ১৯৬৪, অক্টোবর

সূচিপত্রে ফিরে যান

যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে

বিশু দাস

একটা ঘূর্ণির সৃষ্টি করে মাছটা তলিয়ে গেলো জলের নীচে। টোপ লাগিয়ে সুতোটা ছুঁড়ে দিলাম ঘূর্ণিটার মাঝখানে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর অধৈর্য হয়ে সুতোটা আবার দিলাম ঘূর্ণিটার মাঝখানে। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে আনমনে টোপ লাগাচ্ছিলাম কাঁটায়, হঠাং দৃষ্টি থেমে গেলো দূরের বড় পাথরটার ওপর কুটিরটায় বাধা পেয়ে। ঝরণাটা পেরিয়ে যেতে হবে পাথরটার কাছে।

আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলাম, "ওই বাড়িতে কে থাকে?"

বাড়িটার দিকে একবার চেয়ে সে জবাব দিলো, "অধ্যাপক সান্যাল। নতুন এসেছেন।"

"অধ্যাপক সান্যাল মানে, সেই তিব্বত আর মিশরের প্রাচীন ইতিহাসের নামকরা অধ্যাপক সান্যাল নাকি? বেনারস ইউনিভার্সিটিতে আমি তাঁর ছাত্র ছিলাম। সেই অধ্যাপক সান্যালই যদি হন, তাহলে তো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হয়। আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন তিনি।"

"কিন্তু তোমার পিঠের লাগানো কোন পাখা তো দেখতে পাচ্ছি না, আর একমাত্র উড়ে যাওয়া ছাড়া ওখানে পৌঁছোনোর আর দ্বিতীয় কোন উপায় নেই।"

"কেন, ওই তো পথ দেখা যাচ্ছে, এই পথ দিয়ে যাওয়া যাবে না? রাস্তাটা তো মনে হচ্ছে কুটিরের কাছে গিয়েই শেষ হয়েছে।"

"কিন্তু বন্ধু, একটু ভালো করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে পথের মাঝখানে প্রায় দশ ফুট চওড়া একটি খাদ আছে। খাদের পাশ থেকে পথটা আবার শুরু হয়েছে। আগে ওই খাদের ওপর একটা কাঠের তৈরি সেতু ছিল। কিছুদিন আগে ধস নামায় সেটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। অধ্যাপককে বাড়ির বাইরে প্রায় দেখাই যায় না। কোন কিছুর দরকার হলে পাহাড়ী চাকরটাকে পাঠান। কুটিরের ওপাশের পাহাড় চূড়োটা পার হলেই দার্জিলিং-এ যাবার পথ।"

"তোমার কথা শুনে তো হতাশ হয়ে পড়ছি, কিন্তু তবু চেষ্টা আমাকে একবার করতেই হবে। যাবার সময় আমার মাছ ধরার সরঞ্জামগুলো তাঁবুতে নিয়ে যেও। খাদের নীচে ওই যে স্রোতটা বয়ে যাচ্ছে ওটা পার হয়েই যাবো আমি। পাহাড় চড়ার শিক্ষা আমার কাছে, কারণ একসময় আমি মাউন্টেনিয়ারিং স্কুলের ছাত্র ছিলাম। আজ সেই জ্ঞান কাজে লাগাবার সময় এসেছে।" বন্ধুকে বিদায় জানিয়ে
এগিয়ে চললাম আমি।

স্রোত পার হতে খুব বেশী বেগ পেতে হল না, কিন্তু যেখানে এসে পৌঁছোলাম সেখান থেকে সংকীর্ণ পথটা খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে-বেঁকে ওপরের দিকে উঠে গেছে। ওই পথ ধরে এগোনো ভীষণ শক্ত কাজ, একথা বুঝতে খুব বেশী দেরী হল না।

প্রথম শ’খানেক ফুট পার হলাম, খুব কষ্ট না করেই, কিন্তু তারপরেই হঠাৎ আরম্ভ হল সোজা খাড়াই। বেড়ালের মত বুকে ভর দিয়ে উঠতে হচ্ছিলো পাহাড়ের গা বেয়ে। আধঘণ্টা এইভাবে ওঠবার পর শরীরের প্রতিটি লোমকূপ দিয়ে ঘাম বেরুতে লাগলো। সমতল একটা পাথর দেখে বিশ্রাম নেবার জন্যে বসতে বাধ্য হলাম তার ওপর। সমান্তরাল পথটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। দূরে দেখা যাচ্ছে খাদটার উপর ছোট্ট একটা সেতু। অবশ্য সেতুর কাছে পোঁছোতে হলে কয়েক শ’ ফুট ওপরে উঠতে হবে এখনও। খানিকটা আশ্বস্ত হলাম। যাক, কোন রকমে পার হয়ে যাওয়া যাবে খাদটা। আসল সেতুটা ভেঙ্গে গিয়েছে, তারই ধ্বংসাবশেষ টিকে আছে এখনও। সেতুটার কাছে পৌঁছোবার আশায় বিশ্রাম নেবার কথা প্রায় ভুলেই গেলাম। আবার আরম্ভ হল পাহাড় বেয়ে ওপরে ওঠা। আরও আধঘণ্টাখানেক অক্লান্তভাবে পাহাড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে সেতুটার কাছে এসে পৌঁছোলাম। মোটা মোটা কাঠ দিয়ে তৈরি ছিলো সেতুটা, কিন্তু আজ আর সে সব কাঠের চিহ্নও নেই। দুটো মাঝারি আকারের বাঁশ একসঙ্গে বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে খাদটা পার হবার জন্যে। ধরবার সুবিধের জন্যে আর একটা ওই রকম বাঁশকে রেলিংয়ের মতো করে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কে এই সমস্ত ব্যবস্থা করেছে কে জানে! তবে সেই লোকটির ওপর শ্রদ্ধার মাথা নুয়ে এলো আপনা-আপনি। খাদের দিকে তাকাতেই ভয়ে শিউরে উঠলাম। প্রায় পাঁচশ ফুট ওপরে পথটা গিয়ে মিশেছে কুটিরে যাবার পথের সঙ্গে। মনে মনে স্থির করলাম বাঁশের সেতুটা পার হয়ে ওপাশে যেতেই হবে, তাতে যত বিপদই আসুক না কেন।

ইঁট দিয়ে বাঁধানো জায়গাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাঁশের সেতুর ওপর পা দিতেই দেখি সেটা ভীষণভাবে দুলতে শুরু করেছে। এর ওপর দিয়ে পার হওয়া মানে জীবনটা হাতে করে যাওয়া। কিন্তু এখন আর ফিরে যাবার উপায় নেই, এগোতেই হবে। বাঁশের রেলিংটা দুহাত দিয়ে চেপে ধরে যতদূর সম্ভব সাবধানে এগোতে লাগলাম, পাশ ফিরে। বাঁশের মসৃণ গা থেকে পা তুলতে ভয় করছে। পা দুটোকে যতদূর সম্ভব ঘষটে নিয়ে যেতে হচ্ছে।

এইভাবে প্রায় পাঁচফুট পার হবার পর, হঠাৎ পিছলে গিয়ে মাত্র একটা বাঁশের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। পট পট শব্দে পুরানো দড়ির বাঁধন ছিঁড়তে লাগলো। ভয়ে ঘেমে নেয়ে উঠলাম। দেহের ভারসাম্য হারিয়ে একপাশে হেলে পড়লাম। প্রাণপণ শক্তিতে বাঁশের রেলিংয়ের একটা জায়গা দুহাতে চেপে ধরে ঝুলতে লাগলাম। নীচে—অনেক নীচে হু হু করে বয়ে যাচ্ছে খরস্রোতা একটা পাহাড়ী স্রোত। হাত পা অসাড় হয়ে আসতে লাগলো, কিন্তু সে যাত্রা বেঁচে গেলাম কোনরকমে! এটুকু সৌভাগ্যও হয়তো বিধাতার মনঃপুত হল না। বাঁশটা হঠাৎ মট মট করে ভেঙ্গে গেলো। বাঁচবার শেষ চেষ্টায় মরিয়া হয়ে হাত দুটো বাড়িয়ে দিলাম ডুবন্ত লোকের মত কিছু একটা চেপে ধরবার আশায়। এতক্ষণ যেটার ওপর দাঁড়িয়েছিলাম সেটাতে হাত ঠেকলো। সেই বাঁশটা ধরেই ঝুলে রইলাম। দোল খাওয়া না থামা পর্যন্ত ঝুলেই রইলাম, তারপর আস্তে আস্তে সার্কাসের খেলোয়াড়দের মতো ঝুলতে ঝুলতে এগুতে লাগলাম সামনের দিকে। সেতুর শেষ প্রান্তে পৌঁছে দেহের শেষ শক্তিটুকুও আর অবশিষ্ট রইলো না। ক্লান্তিতে ভয়ে মড়ার মতো হয়ে গেছি তখন।

এমন সময়, কার বলিষ্ঠ দুটো হাত আমাকে টেনে তুললো ওপরে। বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো স্বস্তির নিঃশ্বাস। সেই অজানা সাহায্যকারীকে দেখার কথাও মনে এলো না একবার, চুপচাপ পড়ে রইলাম, নির্জীবের মতো।

"খুব অল্পের জন্যে বেঁচে গেছো," ভারী গলায় কে যেন বললো। চোখ মেলে চাইতেই দেখি সামনে দাঁড়িয়ে আছেন অধ্যাপক সান্যাল, আর তার দুই পাহাড়ী চাকর।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠে দাঁড়াবার পর অধ্যাপকের কাঁধে হাত দিয়ে কুটিরের দিকে এগিয়ে চললাম।

ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখা হল এক মহিলার সঙ্গে। পরে জেনেছিলাম মহিলাটি অধ্যাপকের বাড়ীর পরিচারিকা। নাম মোতিয়া। আমার আধমরা অবস্থা দেখে সে বললো, "আহা বেচারার ভীষণ ধকল গেছে! এসো আমার সঙ্গে জামা কাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে নাও। আমি ততক্ষণে চা তৈরি করে নিয়ে আসছি।"

অধ্যাপক সান্যাল কৌতূহলী চোখে আমার দিকে চেয়ে বললেন, "তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি বলে মনে হচ্ছে?"

"বেনারস ইউনিভার্সিটিতে আমি আপনার ছাত্র ছিলাম অনেকদিন আগে। আপনি আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। আমি ছিলাম আপনার সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র।"

স্নিগ্ধ হাসিতে ভরে গেলো অধ্যাপকের মুখ। "হ্যাঁ, এবার চিনতে পেরেছি। বেশ, বেশ! আমারই এক ছাত্র নিজের জীবন বিপন্ন করে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে, ভাবতেও আনন্দ লাগছে।" নিজের মনেই কথাগুলো বলতে বলতে তিনি পাশের ঘরে চলে গেলেন। দরজার কাছে হঠাৎ থেমে বললেন, "একটু বিশ্রাম করে নাও। তারপর, আমার পড়ার ঘরে এসো। গল্প করা যাবে।"

হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম নেবার পর অনেকটা সুস্থ হলাম। বিশেষ করে মোতিয়ার সুন্দর চা যেন অনেকখানি শক্তি জোগালো। সময় নষ্ট না করে আমি অধ্যাপকের পড়ার ঘরের সামনে এসে ভেতরে যাবার অনুমতি চাইলাম। সাদরে তিনি আমাকে আহ্বান জানালেন ভেতরে যাবার জন্যে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই ভেতরের দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেলাম। সত্যিই প্রশংসা করার মতো চকচকে পালিশ করা মেঝে, তার ওপর মোটা পার্সিয়ান গালিচা। ঘরের মাঝখানে বড় একটা মেহগনি কাঠের টেবিল। টেবিলের ওপাশে বসে আছেন সৌম্যদর্শন অধ্যাপক। দেওয়াল ভর্তি বড় বড় আলমারিতে সাজানো বই। ম্যাপ আর চার্ট-এ ভরা অন্যদিকের দেওয়াল। খোলা জানলাটার সামনে দাঁড় করানো পুরানো আমলের বড় একটা ক্যামেরার মতো জিনিস। স্টুডিওতে যেমন ফিল্ড ক্যামেরা ব্যবহার করা অনেকটা তেমনি দেখতে জিনিসটা। কালো কাপড় দিয়ে সমস্ত জিনিসটা ঢাকা দেওয়া রয়েছে। ঘরের অন্যসব জিনিসের সঙ্গে একান্তই বেমানান সেটা। ক্যামেরার মুখটা লম্বা হয়ে সামনের দিকে বেরিয়ে আছে, দূরবীনের নলের মতো। ঐ নলের মধ্যে আলো ফেলবার জন্যে কতকগুলো বিভিন্ন আকৃতির আয়না লাগানো আছে সামনে। চোখ তুলতেই দেখি অধ্যাপক আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন, এক দৃষ্টিতে। চোখে মুখে চাপা আনন্দের আভাষ।

"খুব অবাক লাগছে, না? বসো, ঐ যন্ত্রটা সম্বন্ধে আলোচনা করবো একটু পারে।"

অধ্যাপক নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমিও জবাব দিয়ে যেতে লাগলাম সেই সব প্রশ্নের, আমার পড়াশুনোর কথা সবিস্তারে বললাম, কিন্তু আমার এখানে আসার কারণটা জানতেই তাঁকে বেশী আগ্রহশীল বলে মনে হল।

"মাছ ধরতে এসেছি এখানে। নীচের ঐ স্রোতে এমন কতকগুলো বিশেষ ধরনের মাছ আছে যা পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না। সেই জন্যেই এত জায়গা থাকতেও এই বিশেষ জায়গাটা বেছে নিয়েছি বাস করার জন্যে," অধ্যাপক বলতে লাগলেন। "চতুর্দিকে উন্মুক্ত তুষারক্ষেত্র, দৃষ্টি কোথাও বাধা পায় না। তিয়েস্তা উপত্যকার মাছের কথা আমি আগেই শুনেছিলাম।"

অধ্যাপক একজন পাকা মৎস্যশিকারী।

যাইহোক আমাদের আলোচনা প্রসঙ্গে থেকে প্রসঙ্গান্তরে যেতে লাগলো এরপর। আমার দৃষ্টি কিন্তু বার বার সেই বিচিত্র দিকেই যন্ত্রটার চলে যেতে লাগলো। ওটার রহস্য না জানা পর্যন্ত কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না মনে। মাছ ধরার গল্প হঠাৎ মাঝপথে থামিয়ে অধ্যাপক বললেন, "আমার কথা তোমার কানে যাচ্ছে না, আমি বুঝতে পারছি। সুতরাং তোমার কৌতূহল আগে নিবৃত্ত করা দরকার। চেয়ারটা এখানে এগিয়ে নিয়ে এসো। আমার কয়েকটা থিওরী সম্বন্ধে সামান্য কিছু আগে বলে নিই, তাহলে যন্ত্রটার কাজকর্ম বুঝতে সুবিধে হবে তোমার।

"তুমি হয়তো জানো না যে ছেলেবেলা থেকেই আমি জীববিজ্ঞানের একজন অত্যন্ত উৎসাহী ছাত্র। বংশানুক্রমিক গুণ অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে আমরা 'হেরেডিটি' বলি, অহমিকা, আর দাম্ভিকতা একপুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষদের মধ্যে কি ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে সে সম্বন্ধে জানবার উৎসাহই ছিলো আমার সবচেয়ে বেশী। গবেষণার ক্ষেত্রে আরও প্রসারিত হল আমার, আমি ঐ বিষয়ের গভীরে তলিয়ে গেলাম। একদিন আবিষ্কার করলাম যে অতীতে যে সমস্ত ঘটনার স্মৃতি পূর্বপুরুষদের মনে স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে, সেগুলো তাঁদের অবচেতন স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেহ কোষের ক্রোমোজোমের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ঠিক ঐ ভাবেই আমরা শ্বাস নিতে শিখি, হাত পা নাড়াচাড়া করতে শিখি, চিন্তা করতে, যুক্তি দিয়ে বোঝতে শিখি অর্থাৎ জীবনের যে সব প্রক্রিয়া মানুষকে অতীতের বর্বরতার যুগ পার হয়ে সভ্যতার বেদীতে পৌঁছোতে সাহায্য করেছে সে সবই আমরা শিখি পূর্বপুরুষদের অতীত স্মৃতি থেকে। এই ধরনের নানা স্মৃতি বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হচ্ছে এক পুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষে, সৃষ্টির প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত অবিরত। কোন স্মৃতিই মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে যায় না, এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ, এবং অবচেতন মনের অতল থেকে চেতনার স্তরে তারা ভেসে ওঠে যখন ভয়ঙ্কর বা বুদ্ধিবিভ্রমকারী কোন ভাব উদয় হয় মনে এবং উত্তেজনার সৃষ্টি করে। কতকগুলো বিশেষ ধরনের ওষুধ-এর সাহায্যে বা সম্মোহন শক্তির প্রয়োগে অবচেতন মনের অতল থেকে সুপ্ত ঘটনাগুলোকে চেতন মনে তুলে আনা সম্ভব। এই নীতি কাজে লাগিয়ে একটা যন্ত্র আমি তৈরি করেছি, যা দিয়ে মানুষের অবচেতন মনের গোপন কক্ষগুলোতেও হানা দিতে পারা যায় অনায়াসে। প্রথম চেষ্টা আমার অবশ্য বিফল হয়েছিলো, কিন্তু পরীক্ষা চালাতে চালাতে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অদল বদল করে এই বিচিত্র যন্ত্রটা বানিয়েছি। খুব সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়া গেছে

যন্ত্রটা থেকে। ওটার নাম দিয়েছি "কালের পরীক্ষক", এবং সত্যি সত্যিই যন্ত্রটা যুগযুগান্তব্যাপী সময়ের মধ্যে অবিশ্বাস্য সমস্ত পরীক্ষা চালাতে পারে। এতক্ষণ যা বললাম তা হচ্ছে আমার পরীক্ষার সামান্য পরিচয় মাত্র, তোমার কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্যে এইটুকুই যথেষ্ট হবে বলে আমার মনে হয়। তুমি নিশ্চয় আমার ব্যাখ্যা শুনে সন্তুষ্ট হয়েছো? বেশ, এবার মাছ ধরার প্রসঙ্গে আসা যাক আবার।"

বলাবাহুল্য, এই ব্যাখ্যা আমার মনে কৌতূহল কমানোর চেয়ে বাড়ালোই বেশী, কিন্তু সেই মুহূর্তে অধ্যাপকের কথায় সায় না দিয়ে পারলাম না। তারপর প্রায় আধঘণ্টা আবার সেই হিমশীতল জলের পাহাড় ঝরণায় মাছধরার গল্প। মোতিয়া আসায় সাময়িকভাবে বাধা পড়লো আলোচনায়। খেতে যাবার কথা বলে গেলো মোতিয়া। আমি মনে মনে ঠিক করলাম খাওয়া শেষ করে ফিরে এলেই অধ্যাপক সান্যালকে যন্ত্রটা হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখাতে বলবো।

এবারও মোতিয়ার অযাচিত সাহায্য পেলাম। খাওয়া শেষ হবার পর কফির কাপ সামনে নিয়ে গল্প-গুজব চলছে, এমন সময় মোতিয়া বলে উঠল, "বেচারাকে আপনার নতুন আবিষ্কারটা একবার হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখিয়েই দিন না! পরীক্ষাটা ওর খুব ভালো লাগবে নিশ্চয়ই। তাছাড়া যতখানি কষ্ট স্বীকার করেও আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে তার একটা উপযুক্ত পুরস্কার অন্ততঃ পাবে।" আমি মৃদু প্রতিবাদের সুরে বললাম, "না, না তা নয়। আমি অধ্যাপক মশায়ের ওপর অগাধ শ্রদ্ধার বশেই দেখা করতে এসেছি, তবে উনি এতক্ষণ ধরে যন্ত্রটার যে সমস্ত ব্যাখ্যা শোনালেন তাতে খুব কৌতূহল হচ্ছে যন্ত্রটার কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখবার।

পড়ার ঘরে ফিরে গিয়েই অধ্যাপক আমাকে যন্ত্রটার সামনে নিয়ে গেলেন। তারপর কালো কাপড়ের ঢাকনিটা তুলে নিয়ে আমাকে বসতে বললেন যন্ত্রটার পেছনে। আমি পেছনের বড় গর্তটার সামনে বসবার পর তিনি কালো কাপড়টা দিয়ে আমার মাথা ঢেকে দিলেন, ফটো তোলার সময় ফটোগ্রাফাররা যেমন ভাবে মাথা ঢেকে দেয় তেমনি করে। অন্য কেউ দেখলে তখন ভাবতে আমি হয়তো ছবি তোলবার জন্যে ক্যামেরাটা ফোকাস করছি। যন্ত্রটার ভেতরটা কালো রং করা। পাশের আর একটা ছিদ্র দিয়ে দূরের পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে আবছা আবছা। হঠাৎ দৃশ্যপট পালটে গেলো। সম্পূর্ণ অন্ধকার। একটু পরেই অনেক দূরে একটা আবছা আলো দেখা দিলো। আলোটা একটু একটু করে বাড়তে লাগলো। মিনিট দশেক কাটবার পর আলোর জোর বাড়তে লাগলো। উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ দুটোতে জ্বালা ধরে গেলো। আলোটা তখনও আগের মতোই বাড়ছে। শেযে, সহ্য করতে না পেরে মুখটা কাপড়ের তলা থেকে বার করে আনতে যাবো ঠিক সেই মুহূর্তে আলোটার রং গেল পালটে, আর উজ্জ্বলতাও আগের চেয়ে কমে আসতে লাগলো। আবার চোখ লাগিয়ে দেখতে লাগলাম। এতক্ষণ একাগ্র দৃষ্টিতে আলোটার দিকে চেয়ে থেকে কেমন যেন মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ রঙের পরিবর্তনটা বেশ ভালো লাগলো। আলোটা আকারে আগের সাদা আলোটার চেয়ে অনেকটা বড়। হঠাৎ মনে হল শুধু আলো নয়, কুয়াশাচ্ছন্ন একটা দৃশ্যপট যেন ভেসে উঠলো আস্তে আস্তে। কুয়াশার আবরণ সরে গেলো, চোখের সামনে ভেসে উঠলো বিরাট একটা হ্রদ।

জল থৈ থৈ করছে। হ্রদের তীরে নানা জাতের নাম না জানা লতাপাতা। বড় বড় গ্রানাইট পাথরের টুকরো চতুর্দিকে ছড়ানো। চারিদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ, কেবল মাঝে মাঝে শিকারী পাখীর শব্দ ভেসে আসছে।

অবাক হয়ে সেই দৃশ্য দেখতে লাগলাম আমি। কৌতূহলের বশে মাথাটা আরও একটু এগিয়ে নিলাম সামনের দিকে, ভালো করে দেখবার জন্যে। হ্রদের ধারে বড় একটা পাথরের ওপর এক বৃদ্ধকে বসে থাকতে দেখে আশ্চর্য হলাম। কাঁধে জড়ানো একটা লোমশ চামড়া। বয়সের ভারে চামড়ায় ভাঁজ পড়ে গিয়েছে।

এমন সময় হঠাৎ নজর চলে গেলো হ্রদের পাশে একটা জায়গায়। প্রকাণ্ড দুটো প্রাণী ভীষণ যুদ্ধে মেতেছে। পাশে পড়ে আছে ছিন্নবিচ্ছিন্ন একটা মৃতদেহ। মৃতদেহের মালিকানা নিয়েই যে যুদ্ধের সূত্রপাত তা বুঝতে কষ্ট হল না। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ পাথরটার ওপর থেকে উঠে পড়েছে। ধীরে ধীরে গায়ের থেকে চামড়ার পোশাকটা খুলে ফেলতে লাগলো সে। ওপাশের যুদ্ধরত প্রাণী দুটো পরস্পরকে ছেড়ে দিতেই দেখলাম প্রত্যেকটার দেহে প্রায় ২০ ফুট লম্বা লম্বা ডানা লাগানো। মাথা নেড়া, করাতের মতো দাঁতওয়ালা ভয়ঙ্কর ঠোঁট। বাদুড়ের মতো ডানা বিস্তার করে দুটোই আকাশে উড়ে গেলো। এবার ভালো করে নজর পড়লো মানুষটার ওপর। মানুষ বলছি কেবল ভব্যতার খাতিরে, বরং বিরাট আকারের বাঁদর বললেই ঠিক বলা হতো। শক্তিশালী দেহ লালচে লোমে ঢাকা, কোমরে বাঁধা চামড়ার বেল্টের মতো একটা জিনিস। হাতে লম্বা বর্শার মতো একটা অস্ত্র। বর্শার মাথায় লাগানো ধারালো পাথরের ফলা। পাথরটা চামড়া দিয়ে লাঠির মাথায় বাঁধা। সভ্য মানুষের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ভয়াবহ এবং পাশবিক লোকটার মুখ, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে বুদ্ধির আভাস।

আমি তাকে লক্ষ্য করছি সে কথা সে বুঝতেই পারলো না। একটা পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে একাগ্র দৃষ্টিতে জলের দিকে চেয়ে রইলো। অতর্কিতে হাতের বর্শাটা তুলে জলের ওপর এক ঘা বসিয়ে দিলো খুব জোরে, এবং পরমুহূর্তেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। জল থেকে উঠে এলো যখন তখন তার একহাতে বর্শাটা, আর একহাতে বিরাট একটা মাছ। ছাড়া পাবার জন্যে মাছটা প্রাণপণে ছটফট করছে। এমন নিমগ্ন হয়ে গেছিলাম দৃশ্যটা দেখতে দেখতে যে সে আবার এসে পাথরটার ওপর কখন বসেছে লক্ষ্যই করি নি। জলের ভেতরে মাছটাকে দেখেই এমন বিদ্যুৎ গতিতে লাফিয়ে পড়ে সেটাকে ধরে ফেললো যে না দেখলে বিশ্বাসই করা যেতো না। লোকটার অন্যমনস্কতার সুযোগে বিরাট একটা পাখী ছোঁ মেরে মাছটা নিয়ে আকাশে উঠে গেলো। হাতের মাছটা হারিয়ে কিন্তু তার এতটুকু দুঃখ হল বলে মনে হল না। বর্শাটা হাতে করে হ্রদের পাশে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে সে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ঘুরতে ঘুরতে অনেক দূরে চলে গেছে এমন সময় দেখা গেলো একদল জানোয়ার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে হ্রদে জল খাবার জন্যে। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে লুকিয়ে পড়লো একটা ঝোপের পাশে। লম্বা দাঁতওয়ালা বুনো শুয়োরের পাল হ্রদের ধারে এনে হাজির হল। লোকটা তীর বেগে ছুটে খানিক দূরে গিয়ে শুয়োরের পালের পথ আটকে দাঁড়ালো। বিরাট একটা পাথর সে ছুঁড়ে মারলো জানোয়ারগুলোর দিকে। পাথরটা একটা শুয়োরের গায়ে লাগতেই সেটা তেড়ে এলো লোকটাকে। লোকটা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো, বর্শার মাথাটা মাটিতে ঠেকিয়ে। শুয়োরটা কাছাকাছি আসতেই দুহাতে বর্শাটা মাথার ওপর

তুলে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দিলো। প্রচণ্ড আঘাতটা সামলে নিয়ে জানোয়ারটা আবার উঠে দাঁড়ালো। বর্শার লাঠিটা ভেঙ্গে গেছিলো প্রথমের আঘাতেই। ভাঙ্গা লাঠির একটা অংশ দুহাতে বাগিয়ে ধরলো সে, তারপর শুয়োরটার সামনে থেকে একপাশে সরে গিয়ে গায়ের জোরে লাগালো আর এক ঘা। মাথার খুলিটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো সেই আঘাতে। মরা শুয়োরটাকে কাঁধে ফেলে বনের দিকে এগিয়ে চললো সে। অন্য শুয়োরগুলো ততক্ষণে পালিয়েছে সেখান থেকে।

মানুষটাকে চলে যেতে দেখে মনে মনে দুঃখিত হলাম। লোকটা জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি বিরাট একটা হলদে রংয়ের জানোয়ার তাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করছে। জানোয়ারটার গায়ের কালো কালো ডোরাগুলো, আর লম্বা লম্বা দাঁতওয়ালা বিরাট চোয়াল দেখে বুঝতে পারলাম এটা প্রকাণ্ড একটা বাঘ! মানুষটার কথা ভেবে ভয়ে রক্ত হিম হয়ে আসতে লাগলো আমার। বেচারা ঘুণাক্ষরে জানতেও পারেনি যে মৃত্যুদূত নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। একটু পরে বাঘটাও বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো। শত্রুর উপস্থিতি কেমন করে মানুষটা টের পেলো জানি না, কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে বন থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো। তারপর, মরা শুয়োরটাকে পথের মাঝে নামিয়ে রেখে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। পরমুহর্তেই বাঘটা হাজির হল সেখানে এসে। মরা শুয়োরটাকে বার কয়েক দেখে নিয়ে, এদিক ওদিক চাইতে লাগল। কিছুক্ষণ ধরে মানুষ আর বাঘে চলল লুকোচুরি খেলা। খেলাটা হয়তো আনন্দদায়ক হতো যদি না জানোয়ারটার আকৃতি ওরকম ভয়ঙ্কর না হতো। বিচিত্র কৌশলে দুজন দুজনকে ফাঁকি দিয়ে এক গাছ থেকে আর এক গাছের আড়ালে লুকোতে লাগল। একটু পরেই বাধ্য হল গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে। লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়েই সে প্রাণপনে ছুটে চললো হ্রদের দিকে। বাঘটাও তাড়া করে চললো পেছন পেছন। দূরত্ব কমে আসতে লাগলো দুজনার মধ্যে। পরে বুঝতে পারলাম মানুষটা হ্রদের দিকে ছোটেনি, ছুটেছিলো, হ্রদের ধারের বড় বড় গাছগুলোর দিকে। প্রাণের ভয়ে যতদূর সম্ভব দ্রুত গতিতে ছুটতে ছুটতে এসে একটা বড় গাছের নীচু ডালটা ধরে ফেললো সে। তারপর শরীরটাকে সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতো বাঁকিয়ে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগলো। বাঘটা ততক্ষণে গাছের নীচে এসে হাজির হয়েছে। হতভম্ব হয়ে সেও দেখছে লোকটার বিচিত্র কৌশল। হঠাৎ মট মট করে ভেঙ্গে পড়লো ডালটা। সাক্ষাত মৃত্যুর মতো নীচে অপেক্ষমান বাঘটার মুখের সামনে পড়তে লাগলো মানুষটা হাত বাড়িয়ে পাশের ডালটা ধরবার ব্যর্থ চেষ্টা করলো একবার সে। জানি না ডালটা সে ধরতে পারলো কি না, কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার দিকে চাইলো সে। হলদে চোখ দুটো ভয়ে কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে, গলার ভেতর থেকে একটা চিৎকার ও বোধহয় বেরুলো তার, যদিও সে চীৎকার আমার কানে গেলো না। তারপর... তারপর কি ঘটেছে মনে নেই। কেবল এইটুকু মনে আছে যে জ্ঞান হারাবার আগে সেই মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটার আর্ত চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে আমার গলা থেকেও বেরিয়েছিলো তীব্র হৃদয়বিদারী চীৎকার, কারণ পরিষ্কার দেখতে পেলাম সেই আদিম মানুষটার দেহে আমারই মুখটা বসানো!

জ্ঞান ফেরবার পর দেখলাম অধ্যাপক সান্যালের পড়ার ঘরে বসে আছি। অধ্যাপক, আর মোতিয়া ঝুঁকে পড়েছে আমার দিকে। গলার মধ্যে ব্রাণ্ডির জ্বলন্ত স্পর্শ।

মোতিয়া আস্তে আস্তে বললে, "বেচারা! ভীষণ ভয় পেয়ে গেছিলো।" অধ্যাপক ইসারায় ওকে চুপ করতে বললেন। কাঁপুনিটা অনেকটা কমেছে তখন। নিজের অবস্থা বুঝতে পারছি। অধ্যাপক আমার একটা হাত কাঁধে তুলে আমাকে খাবার ঘরে নিয়ে এলেন। গরম কফি সত্যিই যথেষ্ট শক্তি জোগালো দেহে এবং মনে। যা যা দেখেছিলাম সব কথা তাঁকে খুলে বললাম। আনন্দে আর উত্তেজনায় চোখ দুটো চক চক করে উঠলো অধ্যাপকের।

"চমৎকার! চমৎকার! কি দৃশ্য তুমি দেখলে তুমি বুঝতে পারছো না? যে জলাভূমিটা দেখলে ওটা, আমার মনে হয়, জুরাসিক যুগের শেষের দিকের। প্রাগৈতিহাসিক জন্তু জানোয়ারে পূর্ণ জায়গাটা। প্রথমে যে বাদুড়ের মতো পাখী দুটো দেখলে ওগুলো ভয়ঙ্কর টেরোডাকটিল ছাড়া আর কিছুই নয়। বহু দিন আগে ওদের বংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। বুনো বাঘটাকে তুমি ঠিকই চিনতে পেরেছিলে, আর ঐ মানুষটা যদি তোমার কোন সুদূর পূর্বপুরুষ হয়, তবে বুঝতে হবে যে মৃত্যুর হাত থেকে সেদিন কোন রকমে রক্ষে পেয়ে গেছিলো। না হলে তার সেদিনের সেই অভিজ্ঞতার স্মৃতি তোমার মনে এলো কেমন করে? আমার বক্তব্য হচ্ছে, যে সব ঘটনার সঙ্গে তোমার সেই সুদূর অতীতের স্মৃতি জড়িত সেই জাতীয় কতকগুলো বর্তমান কালের ঘটনা দিয়ে সেই স্মৃতিকে জীবন্ত করে তুলেছি আজ, আবার। তোমার মাছ ধরার ঘটনা, এখানে আসবার সময় ভাঙ্গা ব্রীজের ওপর থেকে পড়তে পড়তে অল্পের জন্য বেঁচে যাওয়া, এবং ঠিক তারপরেই আমার বক্তৃতা তোমার স্মৃতির কোন বিশেষ একটি তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলে অবচেতন মনের অতল থেকে বহু যুগ আগের বংশপরম্পরায় সঞ্চিত স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলেছে। তার ওপর, আমার ঐ যন্ত্রটা হিপনোটিক্, মানে সম্মোহনী শক্তির সাহায্যে সেই স্মৃতিকে তুলে এনেছে একেবারে চেতন মনের ওপরের তলে। আমার থিওরীটা এবার নিশ্চয় বুঝতে পারছো?"

প্রথম প্রকাশ : আশ্চর্য!, সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

Augustus Somervile-এর The Time Probe অবলম্বনে।
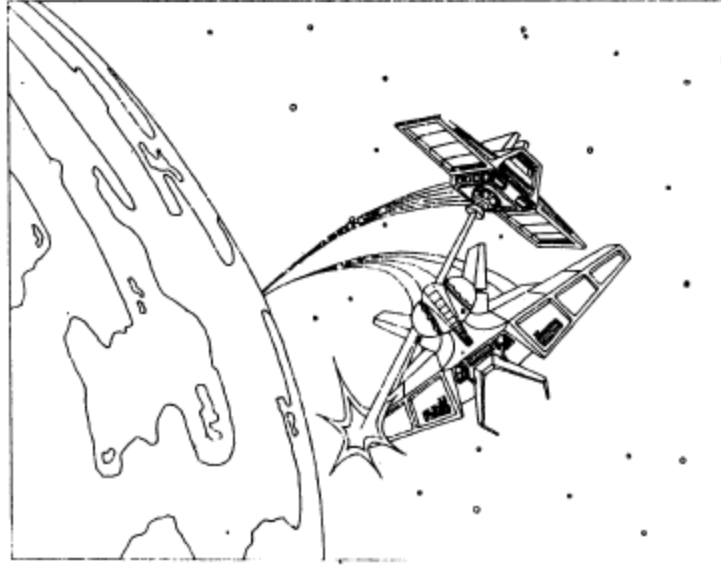
সূচিপত্রে ফিরে যান

পি-আর রোবট

নিরঞ্জন সিংহ

‘রীগালাস পাঁচ’-এ পৌঁছে অভিযানকারী দলটি তাঁবু ফেললেন ও যন্ত্রদানব পি-আর তিনকে চালু করলেন। পি-আর তিন-এর কাজ হচ্ছে তাঁবু পাহারা দেওয়া। ওর ডাক নাম প্রবীর। প্রবীর মানুষের কথা বুঝতে পারে ও উত্তর দিতে পারে। দেখতেও মানুষের মতো। তাঁবু পাহারা দেওয়ার জন্য ওকে বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। কোন ভিনগ্রহবাসী বুদ্ধিমান প্রাণী ওর নজর এড়িয়ে কিছুতেই তাঁবুতে ঢুকতে পারবে না। প্রবীর কাজে খুবই দক্ষ। আগে প্রবীরের গায়ের রঙ ছিল ধূসর। কিন্তু ‘রীগলাস-পাঁচ’-এ আসার সময় ওকে রঙ করে নেওয়া হয়েছে। প্রবীরের উচ্চতা চার ফুট। অভিযানকারীরা প্রবীরকে দয়ালু ও যুক্তিবাদী ছোট্ট ধাতব মানুষ বলে ভাবতে অভ্যস্ত হতে পড়েছেন।

কিন্তু প্রবীরের উপর যে গুণগুলো ওঁরা আরোপ করেছিলেন তার একটা গুণও প্রবীরের ছিল কিনা সন্দেহ। প্রবীর একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই না। তবে খুবই দক্ষ যন্ত্র তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ছোট্ট নীল প্রবীর তার লাল চোখ খুলে সতর্কভাবে তাঁবুর চৌহদ্দি পাহারা দিয়ে চলে। ওর সেন্সরগুলো পুরোদমে কাজ করে। ক্যাপ্টেন মুখার্জী ও লেফটেন্যান্ট দত্ত হোভারজেটে চড়ে এক সপ্তাহের জন্য বাইরে গেছেন অনুসন্ধান চালাবার জন্য। তাঁবুতে এখন একা ক্যাপ্টেন জয়ন্ত বোস।

ক্যাপ্টেন জয়ন্ত বোস একটু বেঁটেখাটো মানুষ। চওড়া বুক, ফর্সা রঙ, অল্প বয়স। সব সময় হাসিখুশি। জয়ন্ত দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে অনুসন্ধানকারীদের সঙ্গে বেতার যোগাযোগ করে রুটিনমাফিক খবর লেনদেন করলেন। এরপর একটা ফোল্ডিং ইজিচেয়ার পেতে আধশোয়া অবস্থায় চারপাশের দৃশ্যাবলী দেখতে লাগলেন। নির্জনতা যাদের প্রিয় ‘রীগালাস’ তাদের কাছে খুবই ভাল লাগবে। চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে সূর্যতাপে উত্তপ্ত পাথর, নুড়ি ও জমাট লাভা। সারা পরিবেশ জ্বলন্ত রোদুরে ঝাঁ ঝাঁ করছে। মাঝে মাঝে চড়াই পাখীর মতো ছোটখাট পাখী দেখা যাচ্ছে দু একটা। জন্তুর মধ্যে ছাগলের মতো দেখতে কিছু জানোয়ার মাঝে মধ্যে চোখে পড়ে। গাছপালার মধ্যে কিছু ক্যাকটাস।

জয়ন্ত ইজিচেয়ারে ছেড়ে উঠে পড়লেন। প্রবীরকে ডেকে বললেন, ‘বসে বসে আর ভাল লাগছে না, আমি একটু তাঁবুর বাইরে থেকে ঘুরে আসছি। তাঁবু পাহারার পুরো দায়িত্ব এখন থেকে তোমার।’

প্রবীর ঘুরে ঘুরে তাঁবুর বাইরেটা পাহারা দিচ্ছিল। জয়ন্তর কথা শুনে একটু থেমে বলল, ‘ঠিক আছে ক্যাপ্টেন।’

‘সাবধানে থাকবে। দেখো যেন কোন ভিনগ্রহবাসী তাঁবুর এলাকায় ঢুকে না পড়ে।’

‘কিছু ভাববেন না ক্যাপ্টেন।’ জবাব দিল প্রবীর। জয়ন্ত জানেন কোন ভিনগ্রহীবাসীর পক্ষে তাঁবুর এলাকার মধ্যে ঢোকা অসম্ভব ব্যাপার, তা সে যত চালাকই হোক না কেন।

‘ক্যাপ্টেন, আপনার পাস-ওয়ার্ডটা মনে আছে তো?’ প্রবীর জানতে চাইল।
‘আছে। তোমারটা মনে আছে তো?’ প্রশ্ন করলেন জয়ন্ত।
‘হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন।’
‘ঠিক আছে, চল্লাম।’ বলে জয়ন্ত আস্তে আস্তে তাঁবুর এলাকার বাইরে চলে গেলেন।
ঘণ্টাখানেক চারপাশে ঘুরেফিরে খুব হতাশ হলেন উনি। একই দৃশ্য। জয়ন্ত আবার ফিরে এলেন। প্রবীর ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে। দেখে খুশি হলেন। তার মানে সব কিছু ঠিকটাক আছে। ‘প্রবীর, কোন খবর আছে নাকি?’ জিজ্ঞাসা করলেন উনি। হঠাৎ প্রবীর চিৎকার করে উঠল, ‘থামুন, তাঁবুর এলাকার মধ্যে ঢোকার আগে আপনার পাস-ওয়ার্ডটা বলুন।’
‘এখন রসিকতার ইচ্ছে নেই প্রবীর। বাইরে প্রচণ্ড রোদুর।’ বলে এগিয়ে গেলেন জয়ন্ত।।
প্রবীর আবার চিৎকার করে উঠল, ‘থামুন বলছি।’
জয়ন্ত থমকে দাঁড়ালেন। প্রবীরের ফটোইলেকট্রিক চোখ জ্বলে উঠল। দুবার ক্লিক করে শব্দ হল। জয়ন্ত বুঝতে পারলেন প্রবীরের প্রাথমিক অস্ত্রগুলো এখন প্রস্তুত।
‘আমি থেমেছি প্রবীর। আমার নাম জয়ন্ত বোস। র‍্যাঙ্ক ক্যাপ্টেন। অভিযানকারী দলের আমি দু’নম্বর মানুষ। ঠিক আছে তো?’
‘দয়া করে পাস-ওয়ার্ডটা বলুন।’
‘নীলঘণ্টা,’ বললেন জয়ন্ত। ‘এবার তাঁবুতে ঢুকলে আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না?’
‘তাঁবুর চৌহদ্দিতে ঢুকবেন না।’ প্রবীর জোর দিয়ে উঠল, ‘আপনার পাস-ওয়ার্ড ঠিক নয়—ভুল।’
‘বলছ কি তুমি। পাস-ওয়ার্ড আমি নিজে তোমাকে দিয়েছি।’
‘ওটা আগেকার পাস-ওয়ার্ড।’
‘আগেকার? প্রবীর তোমার ‘সেমি-সলিড’ মগজ খারাপ হয়েছে নিশ্চয়। ‘নীলঘণ্টা’ হচ্ছে একমাত্র ‘পাস-ওয়ার্ড’। অন্য কোন নতুন ‘পাস-ওয়ার্ড’ তুমি পেতে পার না, কারণ আর কোন নতুন ‘পাস-ওয়ার্ড’ নেই। যদি না...’
প্রবীর অপেক্ষা করতে লাগল। জয়ন্ত এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটা সব দৃষ্টিকোণ থেকে ভেবে দেখলেন। তারপর বললেন, ‘অবশ্য ক্যাপ্টেন মুখার্জী যাওয়ার আগে যদি তোমাকে নতুন কোন পাস-ওয়ার্ড দিয়ে গিয়ে থাকেন, আলাদা কথা।’
‘তাই দিয়ে গেছেন।’ জবাব দিল প্রবীর। ব্যাপারটা আমার আগেই ভেবে দেখা উচিত ছিল। বিড়বিড় করে বললেন জয়ন্ত। অবশ্য এরকম ভুলচুক আগেও ঘটেছে; কিন্তু যেহেতু সে সময় তাঁবুতে অন্য কোন লোক ছিল তারা ভুলটা শুধরে দিয়েছে। কিন্তু এখন তো তাঁবুতে অন্য কেউ নেই ভুল শোধরাবার জন্য। যাহোক এখুনি হতাশ হওয়ার কিছু নেই। ধীরে সুস্থে মাথা ঠাণ্ডা রেখে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। একটা না একটা পথ নিশ্চয় খুঁজে পাওয়া যাবে, ভাবলেন জয়ন্ত।
জয়ন্ত রোবটটাকে বললেন, ‘প্রবীর, বুঝেছি ব্যাপারটা কি ঘটেছে। ক্যাপ্টেন মুখার্জী তোমাকে সম্ভবতঃ নতুন ‘পাস-ওয়ার্ডটা’ দিয়েছেন, কিন্তু তিনি সেকথা আমাকে বলতে

ভুলে গেছেন। তাঁবু ছেড়ে যাওয়ার আগে আমার খোঁজখবর করা উচিত ছিল। ব্যাপারটা আমার ভুলের জন্য বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে।'

প্রবীর কোন কথা বলল না। জয়ন্ত বলে চললেন, 'অবশ্য ভুলটা এখন শুধরে নেওয়া যেতে পারে।'

'আমারও তাই মনে হয়।' মন্তব্য করল প্রবীর।

'প্রবীর তুমি তো জানো যে ক্যাপ্টেন মুখার্জী ও আমি এই 'পাস-ওয়ার্ডের' ব্যাপারে একটা নিয়ম মেনে চলি। উনি যখন তোমাকে নতুন কোন পাস-ওয়ার্ড দেন সঙ্গে সঙ্গে তা আমাকেও জানিয়ে দেন। কিন্তু কোন সময় কোন ভুলচুক হতে পারে এই ভয়ে উনি নতুন 'পাস-ওয়ার্ডটা' লিখেও রাখেন।'

'রাখেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, রাখেন।' বললেন জয়ন্ত। 'সব সময় লিখে রাখেন। তোমার পিছনে তাঁবু দেখতে পাচ্ছো?'

প্রবীর ওর একটা সেন্সর ঘুরিয়ে তাঁবুর দিকে ধরল। কিন্তু আর একটা সেন্সর জয়ন্তর দিকে তাক করে রাখল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি।'

'ঠিক আছে। এবার তাঁবুর ভিতরে দেখ একটা টেবিল আছে। টেবিলের উপর একটা ক্লিপবোর্ডে একটা কাগজ আটকানো আছে।'

''আপনি ঠিকই বলেছেন।' জবাব ছিল রোবট।

'বাঃ, এবার দেখো ওই কাগজটায় প্রচুর প্রয়োজনীয় জিনিস লেখা আছে, যেমন, জরুরী বেতার তরঙ্গের কথা। উপরের কোণের দিকে একটা লাল বৃত্তের মধ্যে নতুন পাস-ওয়ার্ডটা লেখা আছে।'

প্রবীর ওর সেন্সরটাকে আর একটু বাড়িয়ে সঠিক ফোকাস করে জয়ন্তকে বলল, 'আপনার কথা ঠিক, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরর্থক। নতুন 'পাস-ওয়ার্ড' কোথায় লেখা আছে তা জেনে আমার কোন লাভ নেই। আমি জানতে চাই আপনি নতুন 'পাস-ওয়ার্ড'টা বলতে পারবেন কি না? যদি না পারেন তাহলে কিছুতেই এখানে ঢুকতে দেব না।'

'তুমি পাগলের মতো কথা বলছ। প্রবীর, তুমি কি আমাকে চিনতে পাছ না? আজ কতদিন আমরা দুজনে একসঙ্গে রয়েছি। কত অভিযানে আমরা অংশ নিয়েছি। যথেষ্ট রসিকতা করেছো, এবার আমাকে ভিতরে ঢুকতে দাও।'

'ক্যাপ্টেন বোসের সঙ্গে চেহারার আপনার অদ্ভুত মিল।' রোবট মন্তব্য করল। 'কিন্তু আপনার পরিচয় ঠিক কি বেঠিক তা পরীক্ষা করে দেখার মতো ক্ষমতা আমার নেই, অধিকারও নেই। আপনি নতুন 'পাস-ওয়ার্ড'টা বললেই আমি আপনাকে ভিতরে ঢুকতে দিতে পারি।'

জয়ন্ত বহুকষ্টে নিজেকে সংযত করে, যতটা সম্ভব স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'প্রবীর, তুমি এমন ভাবে কথা বলছ যেন আমি একজন ভিনগ্রহবাসী শত্রু।'

'আপনি যখন নতুন 'পাস-ওয়ার্ড' বলতে পারছেন না তখন স্বভাবতই আমাকে ওইরকম একটা সিদ্ধান্তে আসতে হচ্ছে।

'প্রবীর!' জয়ন্ত চিৎকার করে উঠলেন, 'ঈশ্বরেই দোহাই।'

‘তাঁবুর এলাকায় ঢোকার চেষ্টা করবেন না। আপনি যেই হোন, যতক্ষণ না নতুন ‘পাস-ওয়ার্ড’ বলবেন ততক্ষণ ওইখানে দাঁড়িয়ে থাকুন।’

‘ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি এখানেই দাঁড়াচ্ছি। তুমি অত ঘাবড়ে যেও না।’ বললেন জয়ন্ত। উনি বুঝতে পারছিলেন প্রবীর আর একটু হলেই গুলি ছুঁড়তে শুরু করে দিত। জয়ন্ত বেশ খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রবীরের সেন্সরগুলো আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল। জয়ন্ত একটা পাথরের চাঙরের উপর বসলেন। ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে।

রীগালাস এর হাজার ঘণ্টা দিনের ৫০০ ঘণ্টা কেটেছে। এখন হিসেব মত দুপুর। যমজ সূর্য ঠিক মাথার উপর। খুব ধীরে ধীরে ওরা এগুচ্ছে। চারপাশে কালো গ্রানাইট পাথর ছড়িয়ে রয়েছে। গাছপালাহীন মরুভূমি। শুকনো উত্তপ্ত বাতাস বইছে। মাঝে মাঝে দু একটা পাখি চক্কর দিচ্ছে মাথার উপর। ছোটখাটো দু একটা জন্তু লাফিয়ে লাফিয়ে এক পাথরের আড়াল থেকে আর এক পাথরের ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। একটা ছোট নেকড়ের মতো জন্তু ছুটতে ছুটতে গিয়ে তাঁবুর এলাকায় ঢুকে পড়েছিল। প্রবীর তাকে লক্ষ্যই করল না। কিন্তু পাথরের উপর বসে বসে একটা মানুষ এই সব লক্ষ্য করতে লাগল।

জয়ন্ত যমজ সূর্যের প্রচণ্ড তাপে যেন ঝলসে যাচ্ছিলেন। তৃষ্ণায় গলাবুক কাঠ। এতক্ষণে যেন সঠিক বুঝতে পারলেন কী ভয়ঙ্কর অবস্থায় তিনি পড়েছেন। মুক্তির উপায় কি? এখন প্রথমেই চাই জল। না পেলে তৃষ্ণায় মারা পড়বেন। কাছাকাছি কোথাও জল নেই। জল আছে শুধু তাঁবুতে। অঢেল জল। কিন্তু এই রোবটটাকে অতিক্রম করে কি করে উনি সেখানে পৌঁছুবেন?

ক্যাপ্টেন মুখার্জী রুটিন মাফিক ওঁর সঙ্গে বেতার যোগাযোগের চেষ্টা করবেন তিন দিন পরে। জয়ন্তর উত্তর না পেলেও ওঁরা খুব একটা চিন্তা করবেন না। কারণ শর্ট-ওয়েভে বেতার যোগাযোগ খুব বিশ্বস্ত নয়। প্রতি সন্ধ্যা ও সকালে একবার করে ওঁরা বেতারে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন। ওঁর উত্তর না পেলে কখনই ফিরে আসবেন না। কাজ শেষ করেই ফিরবেন ওঁরা। কিন্তু এতদিন তো জয়ন্ত জল ছাড়া বেঁচে থাকতে পারবেন না। কদিন বাঁচবেন উনি? তা নির্ভর করছে কী পরিমাণ জল নষ্ট হচ্ছে তার উপরে। শরীরের ওজনের তুলনায় যখন দশ থেকে পনের শতাংশ দেহের জলীয় পদার্থ ক্ষয় হয়ে যাবে তখন উনি ‘শক’ খাবেন। বেদুইনরা যখন মরুভূমির মধ্যে দলছুট হয়ে পড়ে, তখন তারা জলের অভাবে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়।

রীগালাস পাঁচ কালাহারি মরুভূমির সঙ্গে তুলনীয়। রীগালাসের একদিন পৃথিবীর হাজার ঘণ্টার মতো। এখন দুপুর, এখনো পাঁচশো ঘন্টা এই ভয়াবহ রোদ্দুরে ওঁকে থাকতে হবে। না আছে কোন আশ্রয়, না আছে একটু ছায়া। কতক্ষণ বাঁচবেন জয়ন্ত? পৃথিবীর একদিন? দুদিন? ক্যাপ্টেন মুখার্জী আর লেফটেন্যান্ট দত্তর কথা ভেবে আর লাভ নেই। তাঁবু থেকে ওঁকে জল জোগাড় করতেই হবে, এবং তা খুবই দ্রুত। অর্থাৎ রোবটকে অতিক্রম করে তাঁবুতে পৌঁছুনোর একটা রাস্তা বের করতেই হবে।

জয়ন্ত ঠিক করলেন উনি যুক্তির আশ্রয় নেবেন। ‘প্রবীর, তুমি নিশ্চয় জানো যে আমি ক্যাপ্টেন জয়ন্ত বোস। আমি তাঁবু থেকে বেরিয়ে ছিলাম এবং আমি ক্যাপ্টেন জয়ন্ত বোস,

ঠিক এক ঘণ্টা বাদে ফিরে এসেছি এবং আমিই সেই ক্যাপ্টেন জয়ন্ত বোস তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি; কিন্তু নতুন 'পাস-ওয়ার্ড'টা বলতে পারছি না।'

'আপনি যা বলছেন তার সম্ভাবনা খুবই প্রবল।' জবাব দিল রোবট।

'তাহলে?'

কিন্তু সম্ভাবনার উপরে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বিদেশী ভিনগ্রহী শত্রুদের হাত থেকে তাঁবু বাঁচাবার জন্য আমাকে বিশেষ ভাবে তৈরি করা হয়েছে, বুঝেছেন? আর এতদিন বাদে আমি একজন ভিনগ্রহীকে দেখতে পেয়েছি।'

'তুমি তাঁবু থেকে এক টিন জল আমাকে দিতে পার?'

'না, এ কাজ নিয়ম বিরুদ্ধ।'

'জল না দেওয়ার জন্য তুমি কখনো কোন নির্দেশ পেয়েছে বলে তো আমার মনে হয় না।'

'সে রকম বিশেষ নির্দেশ পাইনি ঠিকই; কিন্তু আমার মগজ আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করছে। কোন ভিনগ্রহবাসীকে কোন রকম সাহায্য করা আমার উচিত নয় এ কথাটা স্পষ্ট বুঝতে পারছি।'

জয়ন্ত এবার চেঁচিয়ে উঠে অনর্গল যা তা বলতে লাগলেন; কিন্তু প্রবীর সে-সব উপেক্ষা করল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর জয়ন্ত ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে একটা পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিলেন।

কিছুক্ষণ বাদে সেখান থেকে একটা মানুষ বেরিয়ে এল শিস দিতে দিতে। ইনিই জয়ন্ত বোস।

লোকটি বলল, 'কি প্রবীর, কি খবর?'

'ক্যাপ্টেন বোস?' বলল রোবটটা।

জয়ন্ত তাঁবুর এলাকা থেকে দশফুট দূরে দাঁড়ালেন।

'চারিদিকে ঘুরে ফিরে দেখছিলাম বুঝছো? কিন্তু না, কিসসু নেই দেখার মতো। এর মধ্যে কিছু ঘটে নি তো এখানে?'

'হ্যাঁ ক্যাপ্টেন, ঘটেছে। একজন ভিনগ্রহবাসী তাঁবুতে ঢোকার চেষ্টা করছিল।'

জয়ন্ত খুব অবাক হয়ে বললেন, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন।'

'ভিনগ্রহবাসীটাকে দেখতে কেমন?'

'ঠিক আপনার মতো ক্যাপ্টেন।'

'বলো কি হে! তা কি করে বুঝলে যে লোকটা আমি নই?'

'কারণ, লোকটা পাস-ওয়ার্ড ছাড়াই তাঁবুতে ঢোকার চেষ্টা করছিল। আসল ক্যাপ্টেন বোস কখনই এরকম কাজ করতেন না।'

'ঠিকই বলেছো। লোকটাকে ঢুকতে না দিয়ে ঠিক কাজই করেছো। আমাদের চোখকান খোলা রাখতে হবে। লোকটা হয়ত ধারে কাছেই কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে। একটু অন্যমনস্ক হলেই তাঁবুতে ঢুকে পড়বে।'

'ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন, আপনি খাঁটি কথাই বলেছেন।'

জয়ন্ত মনে মনে খুশি হলেন। প্রবীরের কাছে প্রত্যেকটি ঘটনাই অভিনব। অভিজ্ঞতা ওর কাছে কোন কাজের জিনিস নয়। প্রবীরকে ওইভাবেই তৈরি করা হয়েছে। প্রবীর জানে পৃথিবীর মানুষরা সর্বশেষ পাস-ওয়ার্ড টা জানে, কিন্তু কোন ভিনগ্রহবাসী তা জানে না। আর তা সত্ত্বেও তারা জোর করে বা কৌশলে ঢোকার চেষ্টা করে।

সুতরাং যে তাঁবুতে ঢোকার চেষ্টা করবে না সে পৃথিবীর মানুষ, অবশ্য ঢুকলে 'পাস-ওয়ার্ড' বলেই ঢুকবে। জয়ন্ত মনে মনে তাঁর পরিকল্পনা ঠিক করে নিলেন। শরীরের জল শুকিয়ে যাচ্ছে। এখন যে কোন রকম ঝুঁকিই তাঁকে নিতে হবে।

'প্রবীর?' জয়ন্ত শুরু করলেন, 'আমি যখন বাইরে ঘুরছিলাম তখন একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি।'

'কি ক্যাপ্টেন?'

'দেখলাম আমরা ঠিক একটা ফাটলের পাশেই তাঁবু ফেলেছি। যদিও ফাটলটা খুবই সরু কিন্তু যে কোন মুহূর্তে তা বেড়ে যেতে পারে এবং আমাদের তাঁবুটা সেই ফাটলের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারে।'

'খুবই খারাপ। ভয়ের কোন কারণ আছে কি ক্যাপ্টেন?'

'নিশ্চয়! আমার মনে হয় তুমি ও আমি দুজনে মিলে তাড়াতাড়ি তাঁবুটা সরিয়ে ফেলি। তা নাহলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। জিনিসপত্র গোছাতে শুরু কর।'

'ঠিক আছে ক্যাপ্টেন। কিন্তু তার আগে আপনি আমায় বর্তমান কর্তব্য থেকে মুক্তি দিন।'

'আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম। নাও তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ করো।'

'শুধু মুখে বললে তা হবে না ক্যাপ্টেন। নতুন 'পাস-ওয়ার্ড'টা বলে আমাকে মুক্ত করে দিয়ে বলুন যে তুমি মুক্ত, শুধুমাত্র তখনই আমি এই তাঁবু পাহারা দেওয়ার কাজ বন্ধ করে অন্য কাজ শুরু করতে পারব।'

'এখন অত সব নিয়মকানুন মানার সময় নেই প্রবীর। নতুন 'পাস-ওয়ার্ড' হচ্ছে 'সাদামাছ'। হয়েছে? নাও নাও তাড়াতাড়ি করো, মনে হল যেন মাটি কেঁপে উঠল একবার''

'কৈ নাতো।'

'তুমি কি করে বুঝবে? তুমি তো একটা পি-আর রোবট। আবার কেঁপে উঠল। এবার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো?'

'মনে হচ্ছে যেন।'

'সেই জন্যই তো বলছি তাড়াতাড়ি করতে।'

ক্যাপ্টেন বোস, দয়া করে আমাকে মুক্ত করে দিন, তা নাহলে কি করে আমি অন্য কাজে হাত দেব?'

'উত্তেজিত হয়ো না। ভেবে দেখলাম তাঁবু সরানোর কোন দরকার নেই।' বললেন জয়ন্ত।

'কিন্তু ভূমিকম্প হচ্ছে যে।'

'হিসেব করে দেখলাম ফাটল বাড়তে বেশ যথেষ্ট সময় লাগবে। আমরা অনেক সময় পাব। আমি বরং আর একবার চারদিকটা ঘুরে আসি।'

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি সেই পাথরটার আড়ালে চলে গেলেন। হৃদ্‌কম্পন বেড়ে গেছে ওঁর। মনে হচ্ছে রক্তের জলীয় পদার্থ শুকিয়ে যাচ্ছে আর শিরা উপশিরার মধ্যে রক্ত যেন থকথকে হয়ে উঠছে। চোখের সামনে নাচছে হলুদ রঙের বেলুন। পাথরের আড়ালে এক চিলতে ছায়ায় মাথা গুঁজে সেদ্ধ হতে থাকলেন উনি।

দীর্ঘ দিন। যমজ সূর্য আগুন ছড়াচ্ছে। পি-আর রোবটের কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই, সে একমনে তাঁবু পাহারা দিয়ে চলেছে। হঠাৎ দমকা বাতাস বইল। তারপর তা বাড়তে লাগল। বালির ঝড় প্রবীরকে ঢেকে ফেলল। কিন্তু সেই প্রচণ্ড ঝড়কে উপেক্ষা করেও প্রবীর ওর সেন্সরগুলোকে আরো সজাগ রেখে ঘুরে ঘুরে তাঁবু পাহারা দিতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে ঝড় থেমে গেল। দেখা গেল পাথরের আড়াল থেকে একটা লোক বেরিয়ে তাঁবুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কে লোকটা? কাপ্টেন বোস? নাকি সত্যি কোন ভিনগ্রহবাসী? প্রবীরের সেন্সরগুলো খুবই সতর্ক ও সজাগ? প্রবীর তাঁবু পাহারা দিতে লাগল।

মরুভূমির দিক থেকে একটা ছাগলের মতো জন্তু ছুটতে ছুটতে প্রায় প্রবীরের গা ঘেঁষে পালিয়ে গেল। একটা বড় পাখী প্রবীরের মাথার ওপর চক্কর দিতে লাগল, তারপর তাঁবু থেকে কি-একটা ছোঁ নিয়ে পালাল। প্রবীর কিন্তু এ-সব দেখেও দেখল না। পাথরের আড়াল থেকে মানুষের মতো যে জীবটি বেরিয়ে এসে তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসছিল ও লক্ষ্য করছিল তাকে।

জীবটি প্রবীরের সামনে একটু দূরত্ব রেখে থামল। ‘শুভদিন, ক্যাপ্টেন বোস।’ বলে উঠল প্রবীর। ‘আমার মনে হচ্ছে কথাটা বলা আমার উচিত। আপনি কিন্তু ডি-হাইড্রেসানে আক্রান্ত হয়েছেন। এরপর অজ্ঞান হয়ে পড়বেন, মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়।’

‘চুপ করো।’ জয়ন্ত চেঁচিয়ে উঠলেন।

‘ঠিক আছে ক্যাপ্টেন।’

‘আমাকে ক্যাপ্টেন বলবে না।’

‘কেন ক্যাপ্টেন?

‘কারণ আমি ক্যাপ্টেন নই। আমি একজন ভিনগ্রহবাসী—আমি রীগালান-পাঁচ-এর বাসিন্দা।’

‘তাই নাকি?’

‘হ্যাঁ, কেন তোমার কি কোন সন্দেহ হচ্ছে?’

‘মানে আপনার কথার স্বপক্ষে তো কোন প্রমাণ নেই...’

‘তাতে কি হয়েছে? আমি প্রমাণ এখুনি দিচ্ছি। আমি নতুন পাস-ওয়ার্ডটা জানি না। এর থেকেও বেশী প্রমাণ চাই?’

রোবটটা ইতস্তত করছে দেখে জয়ন্ত বললেন, ‘দেখো, ক্যাপ্টেন বোস তোমাকে একটা কথা বলতে বলে দিয়েছেন। মনে রেখো পৃথিবীর মানুষ সঠিক পাস-ওয়ার্ড বলতে পারে; কিন্তু একজন ভিনগ্রহবাসী তা জানে না।’

‘হ্যাঁ, তা ঠিক। ‘পাস-ওয়ার্ড’ জানা না জানার উপর আমি বুঝতে পারব কে পৃথিবীবাসী আর কে তা নয়। কিন্তু তবু মনে হচ্ছে কোথায় যেন একটু ভুল হচ্ছে। ধরুন আপনি যদি আমাকে মিছে কথা বলেন?’

'আমি যদি তোমাকে মিছে কথা বলি, তার মানে আমি পৃথিবীবাসী ও আমি 'পাস-ওয়ার্ড'টা জানি—তাহলে তো চিন্তার কোন কারণই থাকত না। কিন্তু তুমি জানো যে পৃথিবীর মানুষ তোমার সঙ্গে মিছে কথা বলবে না, কারণ সে তো সত্যি সত্যি পাস-ওয়ার্ডটা জানে।'

'জানি না আপনি কি বলতে চাইছেন।'

'কোন পৃথিবীর মানুষ কখনো নিজেকে ভিনগ্রহবাসী বলে পরিচয় দেয়?'

'না, তা দেয় না।'

'পাস-ওয়ার্ড জানলে সে মানুষ, না জানলে ভিনগ্রহবাসী, তাই তো?'

'তাহলে কি প্রমাণিত হচ্ছে?' রোবট বলল, 'আমি এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না।'

জয়ন্ত বুঝলেন কোন ভিনগ্রহবাসীর কথা ও বিশ্বাস করবে না। যদি সেই ভিনগ্রহবাসী নিজেকে ভিনগ্রহবাসী বলে প্রমাণ করতে চায় তাহলেও নয়। জয়ন্ত একটু অপেক্ষা করলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রবীর বলল, 'ঠিক আছে আমি আপনাকে ভিনগ্রহবাসী বলেই মেনে নিলাম। তাহলে আমি আপনাকে তাঁবুতে ঢুকতে দেব না।'

'আমি তো ভিতরে যেতে চাইছি না। আসল কথা হচ্ছে আমি ক্যাপ্টেন জয়ন্ত বোসের বন্দী। তার মানে কি তা নিশ্চয় তুমি জানো।'

'না, আমি জানি না।' প্রবীর সতর্ক হয়ে উঠল।

'তার মানে হচ্ছে ক্যাপ্টেন বোস আমার সম্বন্ধে তোমাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা তুমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। সেই নির্দেশ হচ্ছে যে তুমি আমাকে তাঁবুর এলাকার মধ্যে আটকে রাখবে। এবং তিনি যতক্ষণ অন্য কোন নির্দেশ না দেন ততক্ষণ তুমি আমাকে ছাড়বে না।'

রোবট চিৎকার করে উঠল, 'ক্যাপ্টেন ভাল করেই জানেন যে আমি আপনাকে তাঁবুর এলাকার মধ্যে কিছুতেই ঢুকতে দিতে পারি না।'

'সেকথা তিনি ভাল করেই জানেন। কিন্তু তিনি তো আমাকে তাঁবুর এলাকার মধ্যে আমাকে বন্দী করে রাখতে বলেছেন। দুটো ব্যাপার নিশ্চয় এক নয়।'

'তাই কি?'

'নিশ্চয়! তুমি তো জানো যে ভিনগ্রহবাসীরা জোর করে তাঁবুতে ঢুকবার চেষ্টা করলে পৃথিবীবাসীরা তাকে বন্দী করে রাখে।'

'এরকম কথা আমি শুনেছি।' বলল প্রবীর। 'তবে আপনাকে আমি তাঁবুতে ঢুকতে দিতে পারব না। তাঁবুর বাইরেই আমি আপনাকে পাহারা দিচ্ছি।'

'এ আবার কিরকম কথা হল?'

'এর বেশী আর কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'ঠিক আছে।' বলে জয়ন্ত তাঁবুর এলাকার বাইরে বালির উপর বসে পড়লেন। তারপর রোবটটিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তাহলে এবার আমি তোমার বন্দী।'

'হ্যাঁ।' জবাব দিল রোবট।

'আমার তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল দাও।'

'আপনাকে জল দেওয়ার কোন নির্দেশ নেই।'

'নিশ্চয় আছে। তুমি নিশ্চয় জানো জেনেভা চুক্তি ও অন্যান্য আন্তর্গ্রহ চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেক বন্দীর সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে হবে ও তার পদমর্যাদা অনুযায়ী তার জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিতে হবে।'

'হ্যাঁ, এরকম চুক্তির কথা আমি শুনেছি। তা আপনার পদমর্যাদা কি?'

'আমি একজন উচ্চ পদস্থ সৈনিক। আমার ক্রমিক সংখ্যা হচ্ছে ১২২৭৮০৩২। এক্ষুনি আমাকে জল না দিলে, তেষ্টায় আমি মরে যাব।'

রোবট বলল, 'আপনাকে আমি জল দিতে পারি, তবে ক্যাপ্টেন বোস ও অন্য দুজনের জল রেখে তবেই।'

'তাঁবুতে প্রচুর জল আছে।'

'একথা আপনি বললে তো হবে না, ক্যাপ্টেন বোসকে বলতে হবে। তবেই আমি আপনাকে জল দেব।'

'বেশ। জয়ন্ত উঠে পড়লেন।

'থামুন, যাচ্ছেন কোথায়?'

'ঐ পাথরটার আড়ালে। এখন আমার প্রার্থনার সময়।'

'কিন্তু আপনি যদি পালিয়ে যান?'

'তাতে কোন ক্ষতি নেই। ক্যাপ্টেন বোস আমাকে ধরে ফেলবেন।'

'তা ঠিক।' বলল রোবট।

একটু পরেই জয়ন্ত পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন।

'ক্যাপ্টেন বোস?'

'হ্যাঁ, বলো।' জবাব দিলেন জয়ন্ত। 'আমার বন্দী এখানে ঠিকঠাক আছে তো?'

'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন। লোকটা ওই পাথরের আড়ালে প্রর্থনা করছে।'

'তাতে কোন ক্ষতি নেই। শোনো প্রবীর লোকটা যখন আবার আসবে তখন ওকে জল দিও।'

'আপনি আগে জল খান তারপর ওকে জল দেব।'

'না, না, আমার এখন তেষ্টা পায় নি। বেচারা ভিনগ্রহবাসীটি যেন জল পায়।'

'আপনি জল না খাওয়া পর্যন্ত আমি ওকে জল দিতে পারব না। আপনাকে আগেই বলেছিলাম যে আপনি ডি-হাইড্রেসানে ভুগছেন। এখন আপনার অবস্থা আরো খারাপ বলেই আমার মনে হচ্ছে। আপনি এক্ষুনি জল খান, তা না হলে আপনার অবস্থা ভীষণ খারাপ হয়ে পড়বে।'

'ঠিক আছে। বকবক না করে তাহলে তাঁবু থেকে আমার জল এনে দাও।'

'কিন্তু, ক্যাপ্টেন—'

'আবার কি হল?'

'আপনি তো জানেন। আমার বর্তমান কাজ থেকে ছুটি না দেওয়া পর্যন্ত আমি অন্য কোন কাজ করতে পারব না।'

'কেন পারবে না?'

'তার কারণ আমাকে সেই রকমই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার উপর একজন ভিনগ্রহবাসী বন্দী ওই পাথরটার আড়ালে প্রার্থনা করছে।'

'আমি তোমার হয়ে লোকটার দিকে নজর রাখছি। যাও এবার লক্ষ্মী ছেলের মতো তাঁবু থেকে জল নিয়ে এসো দিকিনি।'

'আপনি আপনার মহত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন আমার কাজ আমি আপনাকে করতে দিতে পারি না। আমি একজন পি-আর রোবট। তাঁবু পাহারা দেওয়ার জন্য বিশেষ ভাবে আমাকে তৈরি করা হয়েছে। আমার নিজের কাজের ভার অন্য ঘাড়ে চাপাবার আমার কোন অধিকার নেই। 'পাস-ওয়ার্ড'টা না শোনা অবধি আমি আমার কাজ আর কোন পি-আর রোবটকেও দিতে পারি না, এ কথা
তো আপনি ভাল করেই জানেন ক্যাপ্টেন।'

'ঠিকই বলেছো।' বিড়বিড় করে বলে উঠলেন জয়ন্ত, 'যাই করি না কেন, ফল সেই শূন্য। তিনি ক্লান্ত পদক্ষেপে আবার পাথরটার দিকে এগুতে লাগলেন।'

'কি হল? আমি কি অন্যায় কিছু বলেছি?'

জয়ন্ত কোন জবাব দিলেন না।

'ক্যাপ্টেন বোস?'

তবু কোন জবাব এল না। পি-আর রোবট আবার তাঁবুর চৌহদ্দি পাহারা দিতে লাগল।

জয়ন্ত খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। একটা হতভাগা রোবটের সঙ্গে বকবক করতে করতে গলাবুক কাঠ হয়ে এসেছে। জ্বলন্ত সূর্যের উত্তাপ সারা দেহটা ঝলসে দিচ্ছে। যন্ত্রণা, তেষ্টা এবং ক্লান্তি তাকে শেষ করে আনছে। একমাত্র রাগ ছাড়া আর কোন আবেগের স্থান নেই এখন ওঁর মনে।

নিজেকেই দোষ দিলেন। এমন বোকার মতো একটা কাজ করে ফেলেছেন যার জন্যে এখন পস্তাতে হবে। এখন একমাত্র মৃত্যুই সব জ্বালা যন্ত্রণার শেষ ঘটাবে। পঞ্চাশ গজ দূরে তাঁবু। সেই তাঁবুতে পৌঁছোনোর কোন রাস্তাই বোধহয় আর খোলা নেই। কিন্তু না, ভেঙে পড়লে চলবে না। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। আর একবার শেশ চেষ্টা করতে হবে। তিনি রোবটটাকে বিশ্বাস করাতে পেরেছেন যে তিনিই ক্যাপ্টেন জয়ন্ত বোস। তিনি ওকে এ কথাও বিশ্বাস করিয়েছেন যে তিনিই একজন ভিনগ্রহবাসী-ক্যাপ্টেন বোসের বন্দী। কিন্তু কোনভাবেই আসল কাজে সফল হল নি।

আর কি করা যেতে পারে? জ্বলন্ত ধূসর আকাশের দিকে তাকালেন জয়ন্ত। কয়েকটা ঘূর্ণায়মান কালো বিন্দু ওঁর নজরে পড়ল। ওগুলো কি শকুন? এই 'রীগালাস-পাঁচে' কি শকুন আছে? ওরা কি নতুন খাবারের লোভে আনন্দে ওই জ্বলন্ত আকাশে পাক খাচ্ছে? নতুন এবং সুস্বাদু খাবার—খুব শীঘ্রই ওদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে।

জয়ন্ত জোর করে উঠে দাঁড়ালেন। না, না আমাকে আর একবার শেষ চেষ্টা করতেই হবে। পাস-ওয়ার্ড জানলে সে পৃথিবীর মানুষ আর যে জানে না সে হচ্ছে ভিনগ্রহবাসী—এই হচ্ছে প্রবীরের ধারণা।

তার মানে—। মানে কি? হঠাৎ জয়ন্তর মনে হল তিনি যেন ধাঁধার উত্তর খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু ওঁর মাথা ঝিমঝিম করছে। গভীরভাবে কোন জিনিস চিন্তা করার ক্ষমতা

হারিয়ে ফেলেছেন। শকুনগুলো পাক খেতে খেতে অনেক নিচে নেমে এসেছে। সেই ছাগলের মতো একটা জন্তু কোথা থেকে ছুটে এসে ওঁর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছে। না, না, অন্য কোনদিকে মন দিলে চলবে না। এখন গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। বাঁচবার পথ একটা আবিষ্কার করতেই হবে।

প্রবীর আসলে বোকা। জোচ্চুরী ধরার মতো বুদ্ধি ওকে দেওয়া হয় নি। কে যেন বলেছিলেন মানুষ হচ্ছে পালকহীন দু'পেয়ে জন্তু। কে বলেছিলেন? নাঃ, কিছুতেই মনে পড়ছে না। কিন্তু এসব কথাই বা ভাবছেন কেন জয়ন্ত? তবে কি উনি পাগল হয়ে গেলেন?

প্রবীর—পি-আর রোবট—একটা উল্লুক। তাঁকেই একবার ক্যাপ্টেন বোস ভাবছে আর একবার ভিনগ্রহবাসী ভাবছে। কোথায় কিছু একটা গণ্ডগোল আছে। কি? কি সেই গণ্ডগোল? ছাগলের মতো জন্তুটা ওঁর জুতো শুকছে। জয়ন্ত এবার বুঝতে পারলেন তিনি কি করতে পারেন।

ক্যাপ্টেন মুখার্জী ও লেফটেন্যান্ট দত্ত বাহাত্তর ঘণ্টা বাদে তাঁবুতে ফিরে এসে দেখলেন ক্যাপ্টেন বোস প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। মাঝে মাঝে ভুল বকছেন। ডি-হাইড্রেসান ও সানস্ট্রোকে ওঁর এই দশা হয়েছে তা বুঝতে ওঁদের কোন অসুবিধে হল না।

প্রবীর ওঁকে জল খাইয়ে ভিজে কম্বল চাপা দিয়ে ছায়ায় শুইয়ে দিয়েছিল। দু-এক দিনের মধ্যে ক্যাপ্টেন বোস সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে মনে হয়।

তাঁবুতে ঢুকে অজ্ঞান হয়ে পড়ার আগে জয়ন্ত একটা ছোট কাগজে একটা নোট লিখে রেখেছিলেন। ক্যাপ্টেন মুখার্জী নোটটা পড়ে একবর্ণও বুঝতে পারলেন না। উনি প্রবীরকে প্রশ্ন করতে লাগলেন। তখন প্রবীর সব কথা ক্যাপ্টেন মুখার্জীকে জানালো। এমনকি ক্যাপ্টেন বোসের মতো দেখতে একজন ভিনগ্রহবাসী এই তাঁবুতে ঢোকার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করে চলেছে তা জানাতেও ভুলল না।

সব শুনে ক্যাপ্টেন মুখার্জী বুঝতে পারলেন এসবই ক্যাপ্টেন বোসের পাস-ওয়ার্ড ছাড়া তাঁবুতে ঢোকার চেষ্টা। যা হোক তিনি জানতে চাইলেন তারপর কি হল? কি করে ক্যাপ্টেন বোস তাঁবুতে ঢুকলেন?

'উনি তাঁবুতে ঢোকেন নি। এক সময় আমি বুঝতে পারলাম উনি তার মধ্যে রয়েছেন... মানে...।' ব্যাপারটা কি ঘটেছিল তা প্রবীর বোধ হয় ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি তাই ব্যাখ্যা করতে পারছে না ঠিকমত। 'কি করে তোমার চোখ এড়িয়ে উনি তাঁবুর ভিতরে এলেন—এ কথাটাই তো কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না।' বললেন ক্যাপ্টেন মুখার্জী।

'না, না উনি আমার চোখ এড়িয়ে তাঁবুতে ঢোকেন নি ক্যাপ্টেন মুখার্জী। এটা অসম্ভব ব্যাপার। উনি তাঁবুর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।'

'ব্যাপারটা আমার কাছে মোটেও বোধগম্য হচ্ছে না প্রবীর।'

'সত্যি কথা বলতে কি ব্যাপারটা আমিও ভাল করে বুঝতে পারিনি।' স্বীকার করল প্রবীর। একটু থেমে ও বলল, 'আমার মনে হয় একমাত্র ক্যাপ্টেন বোসই এ রহস্যের সমাধান করতে পারেন।'

ক্যাপ্টেন বোস সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত কিছুই জানা যাবে না তাহলে? ভাবলেন মুখার্জী। বোস যদি একটা সমাধান বের করে তাঁবুতে ঢুকতে পেরে থাকেন, তাহলে চেষ্টা করলে উনিও সে সূত্রটা নিশ্চয় আবিষ্কার করতে পারবেন, ভাবলেন মুখার্জী।

মুখার্জী ও লেফটেন্যান্ট দত্ত যত রকমে সম্ভব সমস্যাটার সমাধানের চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না।

ধাঁধার উত্তর বার করা আর নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে কোন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা কখনই এক হতে পারেনা। তাই বোস যা পেরেছিলেন মুখার্জী ও লেফটেন্যান্ট দত্ত তা পারলেন না।

যা হোক কি করে বোস তাঁবুতে ঢুকেছিলেন তা জানতে হলে শেষ দৃশ্যটা প্রবীরের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে।

জ্বলন্ত সূর্যের তাপ, ঝোড়ো গরম বালির ঝাপটা, শকুন, ছাগল এসব কোনদিকে নজর দিলে আমার চলবে না। এই তাঁবুর চৌহদ্দি আমাকে পাহারা দিতে হবে। কোন ভিনগ্রহবাসী শত্রু যেন তাঁবুতে ঢুকে সবকিছু নষ্ট করে দিয়ে পালিয়ে যেতে না পারে।

মনে হচ্ছে কী যেন একটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। মরুভূমি পেরিয়ে, পাথরের চাঁইটা পেরিয়ে ওটা কি আসছে এদিকে? বেশ একটা বড় জন্তু বলেই তো মনে হচ্ছে। মুখের উপর ঝুলে পড়েছে মাথার লোম। চারপায়ে হাঁটছে ওটা। আমি জন্তুটাকে থামাবার চেষ্টা করলাম। সে গরগর করে আওয়াজ করল। আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'তাঁবুর চৌহদ্দি থেকে তফাৎ যাও।' আমি আমার অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হলাম। আমি তাকে ভয় দেখালাম। জন্তুটা গলা দিয়ে গরগর আওয়াজ করতে করতে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আমি ভাবতে লাগলাম মানুষ ও ভিনগ্রহবাসীরা বুদ্ধিমান। তার প্রমাণ ওরা কথা বলতে পারে ও কথা বুঝতে পারে। জন্তুটা মানুষ বা ভিনগ্রহবাসী হতে পারে না। হলে নিশ্চয় আমার কথার জবাব দিত। মানুষ হলে সঠিক পাস-ওয়ার্ড বলত। মানুষ বা ভিনগ্রহবাসী হলে আমার কথার জবাব দিত। তা ঠিকই হোক আর ভুলই হোক।

তাই যদি হয় তাহলে যে জন্তু আমার কথার উত্তর দেবে না, সে উত্তর দিতে
পারে না—অর্থাৎ কথা বলতে পারে না, অর্থাৎ বুদ্ধিমান কোন জীব নয়। আর সাধারণ জন্তু জানোয়ার নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই। পাখি বা সরীসৃপ জাতীয় জন্তু আমি উপেক্ষা করতে পারি। এই চারপেয়ে সাধারণ জীবটাকেও আমি স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করতে পারি। সুতরাং আমি আর জন্তুটার দিকে নজর দিলাম না। আমি খুব সতর্ক হয়ে পাহারা দিতে লাগলাম, কারণ জয়ন্ত বোস মরুভূমির মধ্যে কোথাও ঘুরছেন আর একজন ভিনগ্রহবাসী শত্রু ওই পাথরটার আড়ালে নির্জনে প্রার্থনা করছে।

কিন্তু একি ব্যাপার! এখন দেখছি বোস তাঁবুর ভিতরে—ডিহাইড্রেসান আর সানস্ট্রোকে প্রায় মর-মর অবস্থা ওঁর। আর সেই ছাগলের মতো জন্তুটা, যেটা আমার সামনে দিয়ে তাঁবুতে ঢুকেছিল তার চিহ্ন পর্যন্ত নেই কোথাও। আর সেই ভিনগ্রহবাসী শত্রুটা নিশ্চয় এখনো ওই পাথরটার আড়ালে প্রার্থনা করে চলেছে...।

প্রথম প্রকাশ: ফ্যানট্যাসটিক, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯

বিদেশী ছায়ায়!

৫৬ বছর আগে সুধীজনদের অভিনন্দন

সত্যজিৎ রায়, প্রধান পৃষ্ঠপোষক, 'আশ্চর্য!'
প্রায় তিরিশ বছর ধরে আমি সায়ান্স-ফিকশনের ভক্ত।

প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রধান উপদেষ্টা, 'আশ্চর্য!'
আশ্চর্য হওয়ার ক্ষমতা ও আগ্রহ যার নেই—তাকে জীবন থেকে বাতিল বলেই ধরা যায়। 'আশ্চর্য' করে দেওয়ার উৎসাহের সঙ্গে বিজ্ঞানের জগৎ সম্বন্ধে কৌতূহল বাড়ানো ও তার খোরাক মেটাবার যে সদিচ্ছা এই পত্রিকাটির উদ্যোক্তাদের মধ্যে লক্ষ্য করছি তা একান্তই প্রশংসনীয়।

বিমল মিত্র
আপনারা পথ-প্রদর্শক। ...আপনাদের প্রচেষ্টা সাফল্যযুক্ত হবে।

রমাপদ চৌধুরী
আশ্চর্য হওয়ার মতো ঘটনা তো নিত্যদিন ঘটে না। অথচ, তুচ্ছ বা প্রকাণ্ড, সামান্য বা সাংঘাতিক বিস্ময়ের সিঁড়ি বেয়ে জীবন গতি পায়, সভ্যতার বিস্তার ঘটে। এমনই সব আশ্চর্য সম্ভবনাকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে সকলের সামনে উপস্থিত করছে এই পত্রিকা। এর পৃষ্ঠাগুলি থেকে আরও অনেককাল আরও অনেক পাঠক আশ্চর্য হওয়ার সুযোগ পাবেন, এই কামনা করি।

বিমল কর
এই ধরনের কাগজ বের করা দুঃসাহসের কাজ বই কি! বাংলা দেশে এ রকম কাগজ আগে আর কখনও কেউ প্রকাশ করেছেন বলে জানি না। সেদিক থেকে আপনারা বেজায় সাহস দেখালেন। আপনাদের কাগজের যাঁরা পাঠক তাঁরা যদি সহানুভুতিসম্পন্ন হন, তবে যে শুধু কাগজটি বাঁচবে তা নয়, ক্রমে ক্রমে বাংলা সাহিত্যে যা ছিল না, সেই 'সাইন্স ফিকশন' গড়ে উঠবে। আমার অভিনন্দন জানবেন।

নরেন্দ্র দেব
এই ধরনের কোন প্রচলিত বিশেষ বিষয় অবলম্বনে পত্রিকা প্রকাশ করা দুঃসাহসের পরিচয়।

প্রবাসী
আশ্চর্য বইকি! ...অভিনন্দন জানাতে হয়। 'আশ্চর্য!' ভারতীয় ভাষায় এ ধরনের প্রথম পত্রিকা।

এককলমী (যুগান্তর)
এদেশে এ রকম কাগজ চালাতে হলে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেই চালাতে হবে, কারণ এদেশে মৌলিক সায়েন্স-ফিকশন রচনার লোক বেশী পাওয়া যাবে না।

আনন্দবাজার পত্রিকা
এ পত্রিকার লক্ষ্য বিজ্ঞান সাহিত্যের মাধ্যমে পাঠকদের বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী করে তোলা। বলা বাহুল্য সেই প্রতিশ্রুত লক্ষ্যের উজ্জ্বল উপস্থিতি এতে বর্তমান।

হুমায়ুন কবির, কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি মন্ত্রী
বিজ্ঞানের ভিত্তিতে গল্প জনসাধারণের মধ্যে কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা বাড়াবে এই আশায় আপনাদের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাই।

পি কে ব্যানার্জী
খেলাধুলো যাদের নেশা, 'আশ্চর্য!' পত্রিকা অল্প দিনেই তাদের নিয়মিত সাথী হবে, সন্দেহ নেই।

ডক্টর সতীশ রঞ্জন খাস্তগীর, ডি এসসি, এফ এন আই, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ডীন
গল্পের মধ্যে দিয়ে বাংলায় বিজ্ঞানের বহুল প্রচার হোক।

বুকস এণ্ড বুকমেন (লণ্ডন)
সায়েন্স ফিকশনের যুগ এসেছে। এই জাতীয় পত্রিকা তাই সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

সূচিপত্রে ফিরে যান

Table of Contents